সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

গল্পসমগ্র

জন্ম : ১৫ আগস্ট ১৯২২ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মৃত্যু : ১০ অক্টোবর ১৯৭১

গল্পসমগ্র

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

সম্পাদনা ✿ জীবনপঞ্জি ✿ গ্রন্থপঞ্জি
হায়াৎ মামুদ

প্রতীক

©
Anne-Marie Waliullah

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ২২০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 - 446 - 040 - 9

GALPO SAMAGRA (Collected Stories by Syed Waliullah)
Published by PROTIK. 46/2 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100
Second Edition : December 2005 Price : Taka 220 Only.

একমাত্র পরিবেশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা) ঢাকা-১১০০

সূচি

নয়নচারা

নয়নচারা ৩
জাহাজী ৭
পরাজয় ১৪
মৃত্যু-যাত্রা ২১
খুনী ২৮
রক্ত ৩৪
খণ্ড চাঁদের বক্রতায় ৪০
সেই পৃথিবী ৪৪

দুই তীর ও অন্যান্য গল্প

দুই তীর ৫৩
একটি তুলসীগাছের কাহিনী ৬৬
পাগড়ি ৭২
কেরায়া ৭৭
নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা ৮৩
গ্রীষ্মের ছুটি ৮৯
মালেকা ৯৫
স্তন ১০৪
মতিনউদ্দিনের প্রেম ১১০

অগ্রন্থিত গল্পাবলি

সীমাহীন এক নিমেষে ১১৯
চিরন্তন পৃথিবী ১২৩
চৈত্রদিনের এক দ্বিপ্রহরে ১২৬
ঝোড়ো সন্ধ্যা ১৩১
প্রাস্থানিক ১৩৬
'পথ বেঁধে দিল...' ১৪৪
মানুষ ১৫০
অনুবৃত্তি ১৬০
সাত বোন পারুল ১৬৮
সাত বোন পারুল [দ্বিতীয় দফা] ১৭৮

ছায়া ১৮৪
দ্বীপ ১৯১
প্রবল হাওয়া ও ঝাউগাছ ১৯৬
হোমেরা ১৯৭
স্থাবর ২০২
স্বপ্ন নেবে এসেছিল ২০৭
ও আর তারা ২০৯
সবুজ মাঠ ২১৫
স্বগত ২১৯
মানসিকতা ২২৩
কালচার ২৩০
সূর্যালোক ২৩৩
মাঝি ২৩৭
অবসর কাব্য ২৪১
নকল ২৪৮
রক্ত ও আকাশ ২৫৫
মৃত্যু ২৬০
স্বপ্নের অধ্যায় ২৬৪
সতীন ২৮৩
বংশের জের ২৮৮
নানির বাড়ির কেল্লা ২৯৪
না কান্দে বুবু ৩০২

পরিশিষ্ট : এক
গ্রন্থপরিচয় ৩০৯

পরিশিষ্ট : দুই
জীবনপঞ্জি ৩১৫
গ্রন্থপঞ্জি ৩১৯

ভূমিকা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অতিপ্রজ লেখক ছিলেন না। তিনি স্বল্পায়ু ছিলেন, কিন্তু আনুপাতিকভাবে তাঁর লেখকজীবন দীর্ঘ ছিল, যেহেতু বাইশ-তেইশ বৎসর বয়স থেকেই তাঁর রচনা প্রকাশ পেতে শুরু করে। কিন্তু পঁচিশোর্ধ্ব বৎসরের সৃষ্টিশীলতায় মাত্র তিনটি উপন্যাস, দুটি গল্পগ্রন্থ, কিছু অগ্রন্থিত গল্প এবং তিনটি নাটক ও কতিপয় ইংরেজি-বাংলা বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধের সম্ভারকে কোনো অর্থেই বিশালায়তন বলা সম্ভব নয়; তাঁর সমস্ত লেখা পুঞ্জীভূত করে দু' খণ্ডে যে-রচনাবলি বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছেন তার পৃষ্ঠাসংখ্যা আট শ'র ওপরে যায় নি। এতৎসত্ত্বেও তিনি আমাদের কথাশিল্পীদের মধ্যে অগ্রগণ্য তো বটেই, অদ্যাবধি সর্বাধুনিক লেখককুলের অন্যতম বলেও বিবেচিত হয়ে আসছেন। এই মূল্যায়নে, আমাদের স্বভাবজ আবেগপ্রাবল্য ও অতিকথনের ত্রুটি সত্ত্বেও, কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। তাঁর শারীরিক দূরস্থিতি তথা উচ্চপদাসীনতার কারণে প্রবাসজীবন এদেশের মধ্যবিত্ত পাঠকের মনে সম্ভ্রম ও প্রশ্রয় জন্ম দিয়েছিল—যদি মনেও করি, তথাপি 'লালসালু'র জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে তা আদৌ যথেষ্ট নয়।

'লালসালু'র প্রকাশ শিল্পী ওয়ালীউল্লাহ্‌র লেখকজীবনে কত বড় অতিক্রমণ তা পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'নয়নচারা'র গল্পাবলির কাহিনী, নির্মাণকৌশল ও ভাষাশৈলীর সঙ্গে প্রতিতুলনায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। অধিকন্তু তাঁর শিল্পদৃষ্টি ও কথনভঙ্গিমা সেখানে এমন এক পরিণতিতে স্থায়িত্ব পায় যে উপন্যাসত্রয়ীতে তো বটেই, তার ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্ন থাকে নাট্যরচনাসমূহেও। আমরা গভীর বিস্ময়ে লক্ষ করি যে যাপিত ধর্মাচারের তলায় লুকোনো ধর্মখোলসের অন্তরালে সাধারণ ও আবিল দেহধারী মানুষের আদিম নগ্ন চেহারা বারংবার তাঁর রচনায় ফুটে ওঠে। মজিদ, কাদের ও 'বহিপীরে'র পীরসাহেব যে-সরল সম্পর্করেখা নির্মাণ করে তার সমান্তরালে প্রতিস্থাপিত হয়ে যায় জমিলা, শিক্ষক আরেফ আলী ও তাহেরা। তবে, পীরসাহেবকে শেষাবধি অন্যভাবে যে জেগে উঠতে দেখি তার কারণ সম্ভবত এই যে, এ্যাবসার্ড নাটকের ছায়াপাতে এ-কাহিনী সত্য-মিথ্যার মাঝখানে কাঁপতে থাকে। বস্তুতপক্ষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র যাবতীয় রচনাকে দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা চলে বলে আমার ধারণা : এক দিকে তিনি বাস্তব জগৎসংসারের অভিজ্ঞতা ছেনে তৈরি করেন দুনিয়ার প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও তার অন্তরালে ক্রিয়াশীল জীবনসত্যকে; অন্য দিকে তিনি ঐ অভিজ্ঞতার সারাৎসার বুনে দেন অস্বচ্ছ এক মায়াবী জগতের মাটিতে যেখানে কুসুম ফুটে

ওঠে প্রতীকে ও ব্যঞ্জনায়। তাঁর কাহিনীগঠনের এক প্রান্তে যদি থাকে 'লালসালু', তো আরেক প্রান্তে 'কাঁদো নদী কাঁদো'। তাঁর সংসার এভাবে নির্মিত হয়ে ওঠে বাস্তব ও পরাবাস্তব মিশিয়ে; কখনো একই কাহিনীশরীরে উভয়ের সংশ্লেষণ, কখনো-বা মোটা দাগে এ-দুয়ের পৃথক অস্তিত্ব।

'নয়নচারা', তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, বেরুবার পরে প্রথম সমালোচনার পর্যবেক্ষণ লক্ষ্যযোগ্য। 'পরিচয়' পত্রিকায় সুশীল জানা লিখেছিলেন : "ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেবের ঝোঁক মনঃসমীক্ষণের দিকেই বেশি। এতে বিপদ আছে, বিশেষ করে যে শ্রেণীর মর্মকথা তিনি লিখছেন সে ক্ষেত্রে। মধ্যবিত্তিক ভাবপ্রবণতা আবেগের ঝোঁকে ঘাড়ে চেপে বসে গিয়ে নিপীড়িত শ্রেণী-জীবনের ওপরে। জীবন আড়াল হয়ে যায়। যা বর্তমান সাহিত্যে খুবই সুলভ। এতে রচনা জীবন-ধর্মী না হ'য়ে, হ'য়ে পড়ে ভাবধর্মী।" অর্ধশতাব্দী পূর্বে, ১৩৫৩ সালে, প্রকাশিত এ-রচনায় আশা ব্যক্ত করা হয়েছিল যে তাঁর মতো "মুসলমান লেখকের আবির্ভাব বহুদিনের একটি মর্মান্তিক অভাব ক্রমেক্রমে পরিপূর্ণ করে তুলবে, বাংলা সাহিত্য পাবে তার সমগ্ররূপ"।

মনঃসমীক্ষণের ঘটনা বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর পূর্বেও ছিল, এবং মধ্যবিত্তসুলভ যে-ভাবপ্রবণতার আশঙ্কা বিষয়ে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে তা তাঁর রচনায় দুর্নিরীক্ষ্য। কিন্তু ভাবধর্মিতা ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনার এক সামান্যলক্ষণ, বলতেই হয়; অথচ তা 'জীবন-ধর্মী' নয় এমনও বলা যাবে না। এ দুই বিপরীত চারিত্র্যের মেলবন্ধন কী আশ্চর্য কৌশলে তিনি ঘটিয়ে তোলেন তা অভিনিবিষ্ট ও সন্ধানী পাঠকের চোখ এড়ায় না। জীবদ্দশায় তাঁকে তিনটি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল : তেতাল্লিশের মন্বন্তর, সাতচল্লিশের দেশভাগ এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। তাঁর প্রথম গল্পসংকলনের "নয়নচারা" ও "মৃত্যু-যাত্রা"য় কাহিনীর নকশা দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ফুটে উঠেছে, তেমনি 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে "একটি তুলসী গাছের কাহিনী"তে দেশভাগের চালচিত্রে সাম্প্রদায়িকতা ও মানুষী লোভের ক্লিন্নতা স্থাপিত হয়ে থাকে। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের মধ্যপথে তাঁর জীবনাবসান না-হলে সম্ভবত সেই দুঃসময়ও তাঁর কোনো কথকতায় প্রতিবিম্বিত হত। কিন্তু এর পরেও পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে যে তাঁর কাহিনীতে বাস্তবপ্রসূত অভিজ্ঞতা কমই ধরা আছে; বরং ভিন্নস্বাদী প্রতীকব্যঞ্জনামুখর গল্প-কাহিনী সংখ্যায় গরিষ্ঠ ও অধিক বলশালী। তাঁর গল্পাবলির ভিতরে এক ঝাঁক কাহিনী—"জাহাজী" কি "রক্ত" কিংবা "কেরায়া" বা "স্তন" অথবা "দ্বীপ" কি "না কান্দে বুবু"—মিলবে যেখানে গল্প-কবিতা মেশামিশি হয়ে আমাদের মনের বুদ্ধি বা চেতনার স্তরে নয়, অন্য কোনো গহীন অচেতন স্তরে বা বোধে অনুরণন তোলে। দারিদ্র্যের হাহাকার ও অমানবিকতার রূপায়ণও তাঁর গল্পে কম নেই, অথচ আমাদের কারুণ্য বা ক্ষোভ বা ক্রোধ তাঁর অভীপ্সিত নয়, তিনি বস্তুজাগতিক বিশ্বের ভিতরেই স্বপ্ন ও বাস্তবের মাঝামাঝি এক প্রদোষান্ধকারে নিয়ে যান আমাদের।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মনের প্রবণতা ছিল, আমার ধারণায়, দার্শনিকের। এই সত্য তাঁর নিজের নিকটেও উন্মোচিত হয়েছিল। সমবয়সী কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানকে

তিনি জীবনের শেষদিকে লিখেছিলেন : "আমার ইচ্ছা সাংবাদিক কাগজের রিপোর্টারের উর্ধ্বে ওঠা। কিন্তু তোমরা যেন চাও সাহিত্যিক রিপোর্টার হয়েই থাকুক। সেটি হবে না। তা হলে কষ্ট ক'রে লেখার প্রয়োজন কী? মনের কোণে লুকানো আশা বা স্বপ্নের (সে সবের দাম যা-ই হোক) কথা কিছু প্রকাশ না করলে চলে কী ক'রে?" এই অনুসন্ধান, বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, কাহিনীকথকের নয়। তিনি নিজস্ব ভূমিকা সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন : তিনি মনুষ্যজন্মের অন্তর্লীন যুক্তি খুঁজে পেতে আগ্রহী, মানুষকে কেন বেঁচে থাকতে হবে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কোন্ লক্ষ্যে তার যাত্রা—এই দার্শনিক অন্বেষণই তাঁর শিল্পীদায়িত্ব। বৃদ্ধ করিম সারেঙ্গ বা ধর্মব্যবসায়ী শঠ মজিদের মনে যে-প্রশ্নাবলি উত্থিত হয়, কিংবা যুবক শিক্ষকের মনে সে-সব জীবনজিজ্ঞাসা এত নান্দনিক, সাত্ত্বিক ও মেধাবী যে নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত মানুষের তা বোধশক্তির বাইরে রয়ে যাওয়ার কথা; ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীর ভিতরে গোপন সম্পর্কসূত্র বস্তুতপক্ষে তারা খোঁজে না, খোঁজেন শিল্পী নিজে। অথচ যে-পরিপ্রেক্ষিত তিনি রচনা করে নেন সেখানে তাদের নিষ্ফলা অনুসন্ধান বিশ্বাসযোগ্যতা পায়।

'লালসালু' উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য ভণ্ড পীরের নষ্ট হৃদয় খুলে দেখানো কিংবা গ্রামীণ বাংলায় পীরবাদের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নেওয়া—এমন ব্যাখ্যায় আমার যুক্তিবোধ সায় দেয় না। মজিদের ভণ্ডামি আমাদের সমর্থন পায় না ঠিকই, কিন্তু আমাদের ঘৃণা তার দিকে ছুটে যায় না; কারণ দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব তার প্রবঞ্চনাকে ক্ষমার্হ করে তাকে আমাদেরই মতো সাধারণ ও দুঃখদীর্ণ মানুষে রূপান্তরিত করে এবং তার অ-সুখ যে জীবনের অর্থহীনতাকে বুঝতে-বুঝতে অর্থ খুঁজে পাওয়ার সিসিফাস-শ্রম—তা লেখক আমাদের বুঝতে দেন, তার জন্য এক অব্যাখ্যেয় গোপন কষ্টও ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে আমাদের ভিতরে। 'চাঁদের অমাবস্যা'য় বাহ্যত পীরসুলভ কাদের যে প্রকৃতই এক নীচ-নিষ্ঠুর জল্লাদ তেমন সন্দেহ পাঠকের মনে প্রথমাবধিই উঁকি দেয়, ক্রমশ তা সংক্রমিত হয়ে দাদাসাহেবের বিশ্বাসেও ঘুণ ধরায়। তবে, 'চাঁদের অমাবস্যা'র কেন্দ্রবিন্দু কাদের নয়, যুবক শিক্ষক আরেফ আলী। যদিও কোথাও বলা হয় নি তবু অবিশ্বাস্য ও ভয়াবহ এক পরিণাম আরেফ আলীর জন্য অপেক্ষমাণ দেখতে পাই—যে-খুন সে করে নি অবস্থাবৈগুণ্যে তারই দায়ভাগ কাঁধে নিয়ে হয়তো প্রাণ দিতে হবে তাকে। পাপী নিষ্কৃতি পায় এবং অন্যের অপরাধে শহীদ হয় নিষ্পাপ—কাহিনীর ভিতরের এই সত্য শুধু জাগতিক বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে না, তৎসঙ্গে যে-প্রশ্ন তোলে তার স্বরূপ নৈতিক ও দার্শনিক। তিনি জানতেন এবং বলেওছেন যে "দরিদ্র গ্রাম্য শিক্ষকও ও-সব ভাবে না করে না যা 'চাঁদের অমাবস্যা'র যুবক শিক্ষকটি ভেবেছে বা করেছে।" ফলে, আরেফ আলীর বৃত্তিসঞ্জাত পরিচয় আমাদের কাছে গৌণ হয়ে যায়; সে তখন নির্বিশেষ 'মানুষে'র প্রতিভূকল্প হয়ে মানুষের অস্তিত্বের জন্য মৌলিক কিছু প্রশ্ন তুলে সমাধান খুঁজে ফেরে। জনৈক তরুণ গবেষক জানিয়েছেন যে প্রয়াত শিল্পীর কাগজপত্রের মধ্যে এই উপন্যাসের অভিপ্রায় সম্পর্কে কিছু বক্তব্য পাওয়া গেছে। ওয়ালীউল্লাহ্‌র জিজ্ঞাসার স্বরূপ বুঝতে তা আমাদের সাহায্য করে : The central theme is the knowledge of a Crime—the

evil act—of which the young teacher becomes the possessor and which frightens him because of the responsibility attached with it : the evil act, as it were, passes on to the teacher as well. What I want to say is that the most important thing is not so much an evil act, nor its perpetrator but the attitude of the man outside such an act. From a coward the young teacher rises to a brave man and a martyr as well. 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের মুহাম্মদ মুস্তফা, যে নিজে বিচারক, বাহ্যত প্রায়-অকারণে নিজের জন্য যুবক শিক্ষকের মতো শহীদের ভূমিকা বেছে নেয়। তারই মতো আরও এক বিচারককে আমরা উদ্বন্ধনরজ্জুতে দুল্যমান দেখি, সে 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকের জজসাহেব। খোদেজার নীরবে গভীর সংগোপনে আত্মবিলোপ ও জনরোষে নির্বাক প্রতিবাদহীন আমেনার আত্মবিসর্জন জীবনের ওপর মৃত্যুকে জিতিয়ে দেয়। লক্ষ করবার বিষয়, ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনায় মৃত্যু এক প্রিয় প্রসঙ্গ, গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে ঘুরেফিরে হাজির হয়। আসলে, জীবন ও মৃত্যুর দ্বৈরথে ক্লান্ত মনুষ্যভাগ্য তাঁর পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যবস্তু।

নাটক তাঁর মাত্র তিনটি, একাঙ্কিকাটি বিবেচনায় গণ্য না-করলে। কিন্তু তিনটিই বিভিন্ন গোত্রের। আমাদের নাট্যসাহিত্যে এ্যাবসার্ড নাটকের জন্মদাতা সম্ভবত তিনিই। 'তরঙ্গভঙ্গ' ও 'উজানে মৃত্যু'-কে অন্য কোনো ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব। 'সুড়ঙ্গ' নাটিকাটি ঘোষিতভাবেই "কিশোর-কিশোরীদের জন্যে লেখা" যার লক্ষ্য ঐ বয়সী পাঠক-দর্শককে "আমোদ" যোগানো। আর 'বহিপীর' রঙ্গব্যঙ্গপ্রবণ কমেডি। সন্দেহ জাগে, বক্তব্য হয়তো-বা তাঁর প্রধান বিবেচনার বিষয় হিসেবে গণ্য হয় নি এসব ক্ষেত্রে যেমনটি দেখা গেছে সাহিত্যের অন্য দুটি শাখায়। এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হলে সম্ভবত কাউকে দোষ দেওয়া যাবে না যে তুলনামূলকভাবে তাঁর নাট্যপ্রচেষ্টা দুর্বল। কিন্তু সেইসঙ্গে এও মানতে হবে যে তাঁর বয়ানকৌশল ও ভাষাশৈলী তাদের প্রাণ যেমনটি ঘটিয়ে তোলেন তিনি অন্য দুই শাখায়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাষা, দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন যে, আমাদের সাহিত্যে একেবারেই দোসরহীন। নৈতিক বা দার্শনিক যে-সব প্রশ্ন তিনি নির্মাণ করেন তার অবলম্বন এমন এক ভাষা যা সর্বদাই বহুমাত্রিক, অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট। তাঁর উপন্যাসে সৃজিত চরিত্রাবলি সর্বদাই সংশয়গ্রস্ত ও অবলম্বনচ্যুত; পাঠককেও তিনি অবলম্বনহীন, প্রত্যয়হীন ও প্রশ্নদীর্ণ অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখেন কেবল ভাষারই কৌশলে। একটি বিষয় কোনোক্রমেই আকস্মিক বা আপতিক বলে মনে হয় না আমার, তা এই যে—তিনটি উপন্যাসেরই অন্তস্তলে পাপের উপস্থিতি আছে, তা সে মননে বা কর্মে যেমনই হোক-না-কেন। অগত্যা না মেনে উপায় নেই, তাঁর অন্বেষার কেন্দ্রীয় থীম মনুষ্যহৃদয়ের মৌলিক বা অর্জিত কালিমা। অথচ মনুষ্যজন্মের দায় কালিমালিপ্তির ভিতরে শেষ হতে পারে না বলে তাঁর সুগভীর প্রত্যয় ছিল; তাই তাঁর চরিত্রেরা কোনো কিছুরই শেষ বা চরম উত্তর পায় না, কারণ তারা কখনোই একসঙ্গে সমগ্রতা দেখতে পায় না—যদিও দেখার জন্য তৃষ্ণার কমতি নেই। শ্রীমতী আন্-মারি তাঁর স্বামীর শিল্পজিজ্ঞাসা বিষয়ে যখন বলেন 'He often said

he wanted to write about a clean man', তখন দিবালোকে বিন্যাসটি আমাদের মনে স্বচ্ছ হয়ে যায়—তাই তো, মজিদ তাহের-মোস্তফা কেউই 'clean' নয়। অথচ মানুষকে পরিশুদ্ধ হতেই হবে, তাই পরিশোধনের গবেষণাগার কলুষিত হৃদয়েরই ভিতরে তৈরি হতে থাকে ক্রমশ—বাস্তব থেকে ধীরে ধীরে বাস্তবাতিরেকের পানে যাত্রা ক'রে। এই যাত্রাপথই নির্মাণ করে দেয় তাঁর ভাষার সাংকেতিকতা।

কাহিনী মানেই শুধু ঘটনার আড়ম্বর নয় এবং ঘটনাহীন জীবনেরও কাহিনী থাকে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সেই জীবনকাহিনীরই স্থপতি।

হায়াৎ মামুদ

১০২/ক, দীননাথ সেন রোড
গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
বিজয়দিবস, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৬

নয়নচারা

নয়নচারা

ঘনায়মান কালো রাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে। কিন্তু মনের চরে যখন ঘুমের বন্যা আসে, তখন মনে হয় ওটা সত্যিই ময়ূরাক্ষী : রাতের নিস্তব্ধতায় তার কালো স্রোত কল-কল করে, দূরে আঁধারে ঢাকা তীররেখা নজরে পড়ে একটু-একটু, মধ্যজলে ভাসন্ত জেলেডিঙিগুলোর বিন্দু-বিন্দু লালচে আলো ঘন আঁধারেও সর্বংসহা আশার মতো মৃদু-মৃদু জ্বলে।

তবে, ঘুমের স্রোত সরে গেলে মনের চর শুষ্কতায় হাসে : ময়ূরাক্ষী! কোথায় ময়ূরাক্ষী! এখানে-তো কেমন ঝাপসা গরম হাওয়া। যে-হাওয়া নদীর বুক বেয়ে ভেসে আসে সে-হাওয়া কি কখনো অত গরম হতে পারে?

ফুটপাথে ওরা সব এলিয়ে পড়ে রয়েছে। ছড়ানো খড় যেন। কিন্তু দুপুরের দিকে লঙ্গরখানায় দুটি খেতে পেয়েছিল বলে তবু তাদের ঘুম এসেছে—মৃত্যুর মতো নিঃসাড় নিশ্চল ঘুম। তবে আমুর চোখে ঘুম নেই, শুধু কখনো-কখনো কুয়াশা নাবে তন্দ্রার, এবং যদি-বা ঘুম এসে থাকে, সে-ঘুম মনে নয়—দেহে : মন তার জেগে রয়েছে চেনা নদীর ধারে, কখনো কল্পনায় কখনো নিশ্চিত বিশ্বাসে, এবং শুনছে তার অবিশ্রান্ত মৃদু কলস্বন, আর দূরে জেলেডিঙিগুলোর পানে চেয়ে ভাবছে। ভাবছে যে এরই মধ্যে হয়তো-বা ডিঙির খোদল ভরে উঠেছে বড়-বড় চকচকে মাছে—যে-চকচকে মাছ আগামীকাল চকচকে পয়সা হয়ে ফিরে ভারি করে তুলবে জেলেদের ট্যাক। আর হয়তো-বা—কী হয়তো-বা?

কিন্তু ভুতনিটা বড় কাশে। খক্কক খক্কক খ খ খ। একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না, কেবল কাশে আর কাশে, শুনে মনে হয় দম বন্ধ না হলে ও কাশি আর থামছে না; তবু থামে আশ্চর্যভাবে, তারপর সে হাঁপায়। কাশে, কখনো-বা ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে, অথচ ঘুম লেগে থাকে জোঁকের মতো। ভুতনির ভাই ভুতো কাশে না বটে তবে তার গলায় কেমন ঘড়-ঘড় আওয়াজ হয় একটানা, যেন ঘুমের গাড়িতে চেপে স্বপ্ন-চাকায় শব্দ তুলে সে কোথায় চলেছে যে চলেছে-ই। তাছাড়া সব শান্ত, নীরবতা পাখা গুটিয়ে নিশ্চল হয়ে রয়েছে, আর জমাট বাঁধা ঘনায়মান কালো রাত্রি পর্বতের মতো দীর্ঘ, বৃহৎ ও দুর্লঙ্ঘ্য।

ভুতনিটা এবার জোর আওয়াজে কেশে উঠল বলে আমুর মনের কুয়াশা কাটল। সে ভরা চোখে তাকাল ওপরের পানে—তারার পানে, এবং অকস্মাৎ অবাক হয়ে ভাবল, ওই তারাগুলিই কি সে বাড়ি থেকে চেয়ে-চেয়ে দেখত? কিন্তু সে-তারাগুলোর নিচে ছিল ঢালা মাঠ, ভাঙা মাটি, ঘাস, শস্য, আর ময়ূরাক্ষী। আর এ-তারাগুলোর নিচে খাদ্য নেই, দয়ামায়া নেই, রয়েছে শুধু হিংসাবিদ্বেষ নিষ্ঠুরতা, অসহ্য বৈরিতা।

কিন্তু তবু ওরা তারা। তাদের ভালো লাগে। আর তাদের পানে চাইলে কী যেন হঠাৎ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বিপুল বাহু মেলে আসে, আসে—। কিন্তু যা এসেছিল, মুহূর্তে তা সব শূন্য

রিক্ত করে দিয়ে গেল। কিছু নেই...। শুধু ঘুম নেই। কিন্তু তাই যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে। নদীতে জোয়ার না ভাটা? মনে হচ্ছে ভাটা, এবং এ-ভাটাতে ভেসে যাবার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে তার। সে ভেসে যাবে, যাবে, প্রশস্ত নদী তাকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, দূরে বহুদূরে—কোথায় গো? যেখানে শান্তি—সেইখানে? কিন্তু সেই শান্তি কি বিস্তৃত বালুচরের শান্তি?

তবে এখানে মানুষের পায়ের আওয়াজ হয়। আর এখানে শহর। মন্থরগতিতে চলা একজোড়া পায়ের আওয়াজ ঘুরে আসছে গলি দিয়ে, এবং নদীর মতো প্রশস্ত এ-রাস্তায় সে যখন এল তখন আমু বিস্মিত হয়ে দেখল যে লোকটির মধ্যে শয়তানের চোখ জ্বলছে, আর সে-চোখ হীনতায় ক্ষুদ্রতম ও ক্রোধে রক্তবর্ণ। হয়তো-বা সেটা শয়তানের চোখ নয়, হয়তো শুধুমাত্র একটা বিড়ি। তাহলে অদৃশ্যপ্রায় কালো শয়তানের হাতে বিড়ি, যেটা দুলছে কেবল তার হাতের দোলার সাথে। শয়তানকে দেখে বিস্ময় লাগে, বিস্ময়ে চোখ ঠিকরে যায়, ঘন অন্ধকারে তাতে আগুন ওঠে জ্বলে। তবে শুধু এই বিস্ময়-ই : ভয় করে না একটু-ও : বরঞ্চ সে যেন শয়তানের সাথে মুখোমুখি দেখা করবার জন্যে অপেক্ষমাণ। তাছাড়া, রাস্তার অপর পাশের বাড়িটার একটি বন্ধ জানালা থেকে যে উজ্জ্বল ও সরু একটা আলোরেখা দীর্ঘ হয়ে রয়েছে, সে-আলোরেখায় যখন গতিরুদ্ধ স্তব্ধতা, তখন শয়তানের হাতে আগুন জ্বলতে দেখলে আরো ক্রোধ হয় মানুষের। আগুনটা দুলছে না তো যেন হাসছে : আমুরা যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কঁকায়—তখন পথচলতি লোকেরা যেমন আলাদা অপরিচিত দুনিয়ার কোনো অজানা কথা নিয়ে হাসে, এ-ও যেন তেমনি হাসছে। কিন্তু কেন হাসবে? দীর্ঘ-উজ্জ্বল সে-রেখাকে তার ভয় নেই? জানে না সে যে ওটা খোদার দৃষ্টি—অকম্পিত দ্বিধাশূন্য ঋজু দৃষ্টি? তবু আলো-কণা হাসে, হাসে কেবল, পেছনে কালো শয়তান কালো রঙে হাসে। তা হাসুক, আলাদা দুনিয়ায় হাসুক, কারো কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এ-দুনিয়ায়—যে-দুনিয়ায় ঘর ছেড়ে লোকেরা কালো নদীর ধারে-ধারে পড়ে রয়েছে ভাটির টানে ভেসে যাবে বলে, সে-দুনিয়ায় তাকে সে হাসতে দেবে না—দেবে না।

তবু কালো শয়তান রহস্যময়ভাবে এগিয়ে আসছে, শূন্য ভাসতে-ভাসতে যেন এগিয়ে আসছে ক্রমশ, এসে, কী আশ্চর্য, আলোরেখাটাও পেরিয়ে গেল নির্ভয়ে, এবং গতিরুদ্ধ দীর্ঘ সে-রেখা বাধা দিল না তাকে। মৃতগতির পানে চেয়ে নদীর বুকে তারপর নাবল কুয়াশা : আমুর চোখে পরাজয় ঘুম হয়ে নাবল। পরাজয় মেনে নেয়াতে-ও যেন শান্তি।

রোদদগ্ধ দিন খরখর করে। আশ্চর্য কিন্তু একটা কথা : শহরের কুকুরের চোখে বৈরিতা নেই। (এখানে মানুষের চোখে, এবং দেশে কুকুরের চোখে বৈরিতা।) তবু ভালো।

ময়রার দোকানে মাছি বোঁ-বোঁ করে। ময়রার চোখে কিন্তু নেই ননী-কোমলতা, সে-চোখময় পাশবিক হিংস্রতা। এত হিংস্রতা যে মনে হয় চারধারে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দুটো ভয়ঙ্কর চোখ ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। ওধারে একটা দোকানে যে ক-কাঁড়ি কলা ঝুলছে, সেদিক পানে চেয়ে তবু চোখ জুড়ায়। ওগুলো কলা নয়তো, যেন হলুদ-রঙা স্বপ্ন ঝুলছে। ঝুলছে দেখে ভয় করে—নিচে কাদায় ছিঁড়ে পড়বে কি হঠাৎ? তবু, শঙ্কা ছাপিয়ে আমুর মন ঊর্ধ্বপানে মুখ করে কেঁদে ওঠে, কোথায় গো, কোথায় গো নয়নচারা গাঁ?

লালপেড়ে শাড়ি ঝলকাচ্ছে : রক্ত ছুটছে। যেমন করিম মিঞার মুখ দিয়ে সেদিন ফিনকি দিয়ে ছুটেছিল রক্ত। তবে মেয়েটার গলার নিচেটা সাদা, এত সাদা যে মনটা হঠাৎ স্নেহের ছায়ায় ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়বার জন্যে খাঁখাঁ করে ওঠে। মেয়েটি হঠাৎ দুটি পয়সা দিয়ে চলে গেল রক্ত ঝলকিয়ে। কিন্তু একটা কথা : ও কি ভেবেছে যে তার মাথায় সাজানো চুল তারই? আমু কি জানে না—আসলে ও চুল কার। ও-চুল নয়নচারা গাঁয়ের মেয়ে ঝিরার মাথার ঘন কালো চুল।

কিন্তু পথে কত কালো গো। অদ্ভুত চাঞ্চল্যময় অসংখ্য অ-গুনতি মাথা; কোন-সে অজ্ঞাত হাওয়ায় দোলায়িত এ-কালো রঙের সাগর। এমন সে দেখেছে শুধু ধানক্ষেতে, হাওয়ায়

দোলানো ধানের ক্ষেতের সাথে এর তুলনা করা চলে। তবু তাতে আর এতে কত তফাত। মাথা কালো, জমি কালো, মন কালো। আর দেহের সাথে জমির কোনো যোগাযোগ নেই, যে-হাওয়ায় তারা চঞ্চল কম্প্রমান, সে-হাওয়াও দিগন্ত থেকে উঠে-আসা সবুজ শস্য কাঁপানো সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গ হাওয়া নয় : এ-হাওয়াকে সে চেনে না।

অসহ্য রোদ। গাছ নেই। ছায়া নেই নিচে, কোমল ঘাস নেই। এটা কী রকম কথা : ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে আসছে অথচ ছায়া নেই ঘাস নেই। আরো বিরক্তিকর—এ-কথা যে কাউকে বলবে, এমন কোনো লোক নেই। এখানে ইটের দেশে-তো কেউ নেই-ই, তার দেশের যারা-বা আছে তারাও মন হারিয়েছে, শুধু গোঙানো পেট তাদের হা করে রয়েছে। অন্ধ চোখে চেয়ে।

তবু যাক, ভুতনি আসছে দেখা গেল। কী রে ভুতনি? ভুতনি উত্তর দিলে না, তার চোখ শুধু ড্যাব-ড্যাব করছে, আর গরম হাওয়ায় জট-পড়া চুল উড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু কী রে ভুতনি? ভুতনি এবার নাক ওপরের দিকে তুলে কম্পমান জিহ্বা দেখিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেললে ভ্যাঁ করে। কেউ দিল না বুঝি, পেট বুঝি ছিঁড়ে যাচ্ছে? কিন্তু একটা মজা হয়েছে কী জানিস, কোত্থেকে একটা মেয়ে রক্ত ছিটাতে-ছিটাতে এসে আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে চলে গেল, তার মাথায় আমাদের সেই ঝিরার মাথার চুল—তেমনি ঘন, তেমনি কালো...। আর তার গলার নিচেটা—। ভুতনির গলার তলে ময়লা শুকনো কাদার মতো লেগে রয়েছে। থাক সে কথা। কিন্তু তুই কাঁদছিস ভুতনি? ভুতনি, ওরে ভুতনি?

কী একটা বলে ফেলে ভুতনি চোখ মুখ লাল করে কাশতে শুরু করল। তার ভাই ভুতো মারা গেছে। কোনো নতুন কথা নয়, পুরোনো কথা শুধু আবার বলা হল। সে মরেছে, ও মরেছে; কে মরেছে বা কে মরছে সেটা কোনো প্রশ্ন নয়, আর মরছে মরেছে কথা দু-রঙা দানায় গাঁথা মালা, অথবা রাস্তায় দু-ধারের সারি-সারি বাড়ি—যে-বাড়িগুলো অদ্ভুতভাবে অচেনা অপরিচিত, মনে হয় নেই অথচ কেমন আলগোছে অবশ্য রয়েছে।

ভুতনির কান্না কাশির মধ্যে হারিয়ে গেল। কাশি থামলে ভুতনি হঠাৎ বললে, পয়সা? তার পয়সার কথাই যেন শুধোচ্ছে। হ্যাঁ, দুটো পয়সা আমুর কাছে আছে বটে কিন্তু আমু তা দেবে কেন? ভুতনির চোখ কান্নায় প্যাক-প্যাক করছে, আর কিছু-কিছু জ্বলছে। কিন্তু আমু কেন দেবে? ভুতনি আরো কাঁদল, আগের চেয়ে এবার আরো তীব্রভাবে। তাই দেখে আমুর চোখ জ্বলে উঠল। চোখ যখন জ্বলে উঠল তখন দেহ জ্বলতে আর কতক্ষণ : একটা বিদ্রোহ—একটা ক্ষুরধার অভিমান ধাঁধাঁ করে জ্বলে উঠল সারা দেহময়। তাতে তবু কেমন যেন প্রতিহিংসার উজ্জ্বলন্ত উপশম।

সন্ধে হয়ে উঠছে। বহু অচেনা পথে ঘুরে-ঘুরে আমু জানলে যে ও-পথগুলো পরের জন্যে, তার জন্যে নয়। রূপকথার দানবের মতো শহরের মানুষরা সায়ন্তন ঘরাভিমুখ চাঞ্চল্যে থরথর করে কাঁপছে। কোন-সে গুহায় ফিরে যাবার জন্যে তাদের এ-উদগ্র ব্যস্ততা? সে-গুহা কি ক্ষুধার? এবং সে-গুহায় কি স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে মাংসের টিলা, ভাতের পাহাড়, মাছের স্তূপ? কত বৃহৎ সে-গুহা?

অচেনা আকাশের তলে অচেনা সন্ধ্যায় আমুর অন্তরে একটা অচেনা মন ধীরে-ধীরে কথা কয়ে উঠছে। ক্ষীণ তার আওয়াজ, তবু মনে হয় গুহার পানে প্রবাহিত এ-বিপুল জলস্রোতকে ছাপিয়ে উঠছে তা। কী কইছে সে? অস্পষ্ট তার কথা অথচ সে-অস্পষ্টতা অতি উগ্র : মানুষের ভাষা নয়, জন্তুর হিংস্র আর্তনাদ। কী? এই সন্ধ্যা না হয় অচেনা সন্ধ্যা হল : রূপকথার সন্ধ্যা-ও তো সন্ধ্যা, কিন্তু তবু সন্ধ্যা, আর এ-সন্ধ্যায় তুমি আমাকে নির্মমভাবে কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ? কে তুমি, তুমি কে? জানো, সারা আকাশ আমি বিষাক্ত রুক্ষ জিহ্বা দিয়ে চাটব, চেটে-চেটে তেমনি নির্মমভাবে রক্ত ঝরাব সে-আকাশ দিয়ে—কে তুমি, তুমি কে?

আমুর সমস্ত মন স্তব্ধ, এবং নুয়ে রয়েছে অনুতপ্ত অপরাধীর মতো। সে ক্ষমা চায় : শক্তিশালীর কাছে সে ক্ষমা চায়। যেহেতু শক্তিশালীর অন্যায়ও ন্যায়, সে-ন্যায়ের প্রতি অন্যায় করা গুরুতর পাপ। সে পাপ করেছে, এবং তাই সে ক্ষমা চায় : দুটি ভাত দিয়ে শক্তিশালী তাকে ক্ষমা করুক। চারধারে-তো রাত্রির ঘন অন্ধকার, শক্তিশালীর ক্ষমা করার কথা জানবে না কেউ, শুনবে না কেউ।

ওধারে কুকুরে-কুকুরে কামড়াকামড়ি লেগেছে। মনের এ-পবিত্র সান্ত্বনায় সে-কোলাহলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ অসহনীয় মনে হল বলে হঠাৎ আমু দূর-দূর বলে চেঁচিয়ে উঠল, তারপর জানল যে ওরা মানুষ, কুকুর নয়! অথবা ভেতরে কুকুর, বাইরে কুকুর নয়।

কিন্তু আমু মানুষ, ভেতরে-বাইরে মানুষ। সে মাপ চায়। কিছুক্ষণ পর সে হঠাৎ উঠে পড়ল, তারপর অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিসের সন্ধানে যেন তাকাল রাস্তার ক্ষীণ আলো এবং দুপাশের স্বল্পালোকিত জানালাগুলোর পানে। একতলা দোতলা তেতলা—আরো উঁচুতে স্বল্পালোকিত জানালা ধরাছোঁয়ার বাইরে! তুমি কি ওখানে থাক?

তারপর কখন মাথায় ধোঁয়া উড়তে লাগল। এবং কথাগুলো মাথায় ধোঁয়া হয়ে উড়ছে : উদরের অসহ্য তাপে জমাট কথাগুলো ধোঁয়া হয়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর গলাটা যেন সুড়ঙ্গ, আমু শুনতে পারছে বেশ যে, কেমন একটি অতি ক্ষীণ আওয়াজ সে-গভীর ও ফাঁকা সুড়ঙ্গ বেয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠে আসছে ওপরের পানে এবং অবশেষে বাইরে যখন মুক্তি পেল তখন তার আঘাতে অন্ধকারে ঢেউ জাগল, ঢেউগুলো দু-ধারের খোলা-চোখে—ঘুমন্ত বাড়িগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল তার কানে। মা-গো, চাট্টি খেতে দাও—

এই পথ, ওই পথ : এখানে পথের শেষ নেই। এখানে ঘরে পৌঁছানো যায় না। ঘর দেখা গেলে-ও কিছুতেই পৌঁছানো যাবে না সেখানে। ময়রার দোকানে আলো জ্বলে, কারা খেতে আসে, কারা খায়, আর পয়সা ঝনঝন করে : কিন্তু এধারে কাচ। কাচের এপাশে মাছি, আর পথ আর আমু। তবু দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভেতর থেকে কে একটি লোক বাজের মতো খাঁইখাঁই করে তেড়ে এল। আরে, লোকটি অন্ধ নাকি? মনে-মনে আমু হঠাৎ হাসল একচোট, অন্ধ না হলে অমন করবে কেন? দেখতে পেত না যে সে মানুষ?

পথে নেবে আমু ভাবলে, একবার সে শুনেছিল শহরের লোকেরা অন্ধ হলে নাকি শোভার জন্যে নকল চোখ পরে। দোকানের লোকটি অন্ধ-ই, আর তার চোখে সে-নকল চোখ। কিছু একটা আওয়াজ শুনে হয়তো ভেবেছে বাইরে কুকুর, তাই তেড়ে উঠেছিল অমন করে। কিন্তু সে-কথা যাক, আশ্চর্য হতে হয় কাণ্ড দেখে, নকল চোখে আর আসল চোখে তফাত নেই কিছু।

তারপর মাথায় আবার ধোঁয়া উড়তে লাগল। ময়ূরাক্ষীর তীরে কুয়াশা নেবেছে। স্তব্ধ দুপুর : শান্ত নদী। দূরে একটি নৌকায় খরতাল ঝনঝন করছে, আর এধারে শ্মশানঘাটে মৃতদেহ পুড়ছে। ভয় নেই। মৃত্যু কোথায়? মৃত্যুকে সে পেরিয়ে এসেছে, আর অলিগলি দিয়ে ঘুরে মৃত্যুহীনতার উন্মুক্ত সদর রাস্তায় সে এসে পড়েছে।

কড়া একটা গন্ধ নাকে লাগছে। কী কোলাহল। লোকেরা আসছে, যাচ্ছে। হোটেল। দাঁড়াবে কি এখানে? দাঁড়ালেও দাঁড়াতে পারে, তবে নকল-চোখপরা কোনো অন্ধ-তো নেই এখানে, আওয়াজ পেয়ে তেড়ে আসবে না-তো খাঁইখাঁই করে? কিন্তু গন্ধটা চমৎকার। তারপর বোশেখ মাসে শূন্য আকাশ হঠাৎ যেমন মেঘে ছেয়ে যায়, তেমনি দেখতে না দেখতে একটা ভীষণ কালো ক্রোধে তার ভেতরটা করাল হয়ে উঠল, আর কাঁপতে থাকল সে থরথর করে : সিঁড়ির ধারে একটা প্রতিবাদী ভঙ্গিতে সে রইল দাঁড়িয়ে। অবশেষে ভেতর থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল, আরেকজন দ্রুত পায়ে এল এগিয়ে, এসে হীন ভাষায় কর্কশ গলায় তাকে গালাগাল দিয়ে উঠল। এইজন্যেই আমু প্রস্তুত হয়ে ছিল। হঠাৎ সে ক্ষিপ্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর, এবং তারপর চকিতেঘটিত বহু ঝড়-ঝাপ্‌টার পর দেহে অসহ্য বেদনা নিয়ে আবার যখন সে

পথ ধরল, তখন হঠাৎ কেমন হয়ে একবার ভাবলে : যে-লোকটা তাড়া করে এসেছিল সে-ও যদি ময়রার দোকানের লোকটার মতো অন্ধ হয়ে থাকে? হয়তো সে-ও অন্ধ, তার-ও চোখ নকল। শহরে এত-এত লোক কি অন্ধ? বিচিত্র জায়গা এই শহর।

চাঞ্চল্যকর ঘটনাটির পর উত্তেজিত মাথা ঠাণ্ডা হতে সময় নিল এবং সে উত্তেজনার মধ্যে কোন রাস্তা হতে কোন কোন রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে হঠাৎ এক সময়ে সে থমকে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে ভাবল : যে-পথের শেষ নেই, সে-পথে চলে লাভ নেই, বরঞ্চ ওই যে ওখানে কে কঁকাচ্ছে সেখানে গিয়ে দেখা যাক কী হয়েছে তার। ফুটপাথের ধারে গ্যাসপোস্ট, তার তলে আবছা অন্ধকারে কে একটা লোক শুয়ে রয়েছে, আর পেটে হাত চেপে দুরন্ত বেদনায় গোঙাচ্ছে। তার একটু তফাতে যে কটা লোক উবু হয়ে বসে রয়েছে তাদের মুখে কোনো সাড়া নেই, শুধু তারা নিঃশব্দে ধুঁকছে। আমু কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আপন মনে থমকে ভাবল, ওদের সঙ্গে তার চেনা নেই, ওদের বেদনার সঙ্গে তার পরিচয় নেই, সে কেন যাবে তাদের কাছে। যাবে না। তারপর কেমন একটা চাপা ভয়ে সে যেন ভাঙা পা নিয়ে পালিয়ে চলল। কী যে সে-ভয় সে-কথা সে স্পষ্ট বলতে পারবে না, এবং সে-কথা জানবারও কোনো তাগিদ নেই, শুধু যে কেমন একটা ভয় কালো ছায়াচ্ছন্ন করে তুলেছে তার সারা অন্তর, সে ভয় হতে মুক্তি পাবার জন্যে সে পালিয়ে যাবে সে-রাস্তা দিয়েই, যে-রাস্তার কোনো শেষ নেই। যে-ছায়া ঘনিয়েছে মনে, তারও কি শেষ নেই? আর, সে-ছায়া কি মৃত্যুর?

অনেকক্ষণ পর তার খেয়াল হল যে একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, আর তার গলার সুড়ঙ্গ দিয়ে একটা আর্তনাদ বেয়ে-বেয়ে উঠছে ওপরের পানে, এবং যখন সে-আর্তনাদ শূন্যতায় মুক্তি পেল, রাত্রির বিপুল অন্ধকারে মুক্তি পেল, অত্যন্ত বীভৎস ও ভয়ঙ্কর শোনাল তা। এ কি তার গলা—তার আর্তনাদ? সে কি উন্মাদ হয়ে উঠেছে? অথবা কোনো দানো কি ঘর নিয়েছে তার মধ্যে? তবু, তবু, তার মনের প্রশ্নকে উপেক্ষা করে সুড়ঙ্গের মতো গলা বেয়ে তীক্ষ্ণ তীব্র বীভৎস আর্তনাদের পর আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে লাগল, আর সে থরথর করে কাঁপতে লাগল আপাদমস্তক। অবশেষে দরজার প্রাণ কাঁপল, কে একটা মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল, এসে অতি আস্তে-আস্তে অতি শান্তগলায় শুধু বললে : নাও ।

কী? কী সে নেবে? ভাত নেবে। ভাতই কি সে চায়? সে ভাতই চায় : এ-দুনিয়ায় চাইবার হয়তো আরো অনেক কিছু আছে, কিন্তু তাদের নাম সে জানে না। ত্রস্তভঙ্গিতে ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে সে ভাতটুকু নিলে, নিয়ে মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল মেয়েটির পানে। মনে হচ্ছে যেন চেনা-চেনা। না হলে সে চোখ ফেরাতে পারবে না কেন।

—নয়নচারা গাঁয়ে কি মায়ের বাড়ি?

মেয়েটি কোনো উত্তর দিলে না। শুধু একটু বিস্ময় নিয়ে কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

জাহাজী

এঞ্জিন মৃদু-মৃদু আওয়াজ করতে শুরু করেছে। ষ্টোকহোল্ডে কয়লাওয়ালাদের মুখ লাল হয়ে উঠেছে : তাদের সামনে যে-বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠেছে—তারই তাপে ঝলসাচ্ছে ওদের মুখ। ভোর নাগাদ জাহাজ ছাড়বে। কিন্তু মাল তোলা এখনো শেষ হয় নি; কার্গো-উইঞ্চে একঘেয়ে আওয়াজ হচ্ছে : ঘর ঘর ঘর। ওধারে ডকের আবরণ দেয়া-আলোর মধ্যে রহস্য, অস্পষ্ট কোলাহল, আর ধোঁয়া।

রাতের শেষাশেষি। বৃদ্ধ করিম সারেঙ্গ কেবিন হতে বেরিয়ে এল—তার ক্ষুদ্র চোখে ঘুমাবসানের ঔজ্জ্বল্য ও স্বচ্ছতা। জাহাজ কাঁপছে মৃদু-মৃদু। ওপরে ফানেল দুটো দিয়ে ধোঁয়ার শীর্ণ রেখা নিষ্কম্পভাবে ঋজু হয়ে উঠে হাওয়াশূন্য কালো আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। করিম সারেঙ্গ ঘুরে এল এদিকে, দেখলে গ্যাঙ্গওয়ে এখনো তোলা হয় নি। কোণে আবছা অন্ধকার; সে-অন্ধকারে গ্যাঙ্গওয়ের পাহারায় একটা মূর্তি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক মুহূর্ত থম্‌কে দাঁড়াল সারেঙ্গ, তারপর তীব্র গলায় প্রশ্ন করলে :

—ইবা কন?

সুখানি মজিদের চোখ হয়তো তন্দ্রায় ভরে উঠেছিল, সারেঙ্গের প্রশ্নে সে সচকিত হয়ে উঠল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে উত্তর দিলে :

—আঁই, মজিদ।

আকাশে তারাগুলো ম্লান হয়ে উঠেছে, কেবল শুকতারা দপদপ করছে উজ্জ্বলভাবে। ওধারে ডকে এখনো প্রচুর মাল। মরচেধরা পুরোনো কার্গো-উইঞ্চটা ঘরঘর করছে অবিরাম : ডক থেকে মাল তুলে ঘুরে এসে হ্যাচওয়ের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে একটু পরে আবার শূন্য অবস্থায় লকলক করে বেরিয়ে আসছে।

জাহাজটা মালবাহী। তাই খোলা-খোলা। গলি দিয়ে স্টারবোর্ডে গিয়ে আরেক জায়গায় থম্‌কে দাঁড়াল সারেঙ্গ। ওপরে চার্টরুমের আবৃত উজ্জ্বল আলো নজরে পড়ল। বন্ধ জানালার শার্সিতে কার ছায়া বিকৃত হয়ে পড়েছে। চোখ ছোট করে তাকাল সারেঙ্গ : হয়তো থার্ডমেটের ছায়া।

তারপর সারেঙ্গ আবার ফিরে এল কেবিনে। সেটি একধারে বলে তাতে একটি পোর্টহোল রয়েছে। কেবিনে আলো, বাইরে তখনো রাত্রির অন্ধকার বলে তাতে ঘরের ছায়া, সারেঙ্গের প্রতিমূর্তি। তবু ক্ষুদ্র উজ্জ্বল চোখে বাইরে তাকাল সে : আকাশ যেন স্বচ্ছ হয়ে আসছে ক্রমে-ক্রমে, অতি নম্র নির্মল পবিত্রতা প্রকাশ পাচ্ছে বাইরের জগতে। এ-সময়ে করিম সারেঙ্গ বরাবর স্তব্ধ হয়ে থাকে। দিন শুরু হবে শীঘ্র, জাহাজী জীবনের অনির্দিষ্ট দিনগুলোর একটি দিন হবে শুরু : এবং রাত ও দিনের এ-সন্ধিক্ষণে শুদ্ধচিত্তে সে স্তব্ধ হয়ে থাকে, আর কেবিনের নির্জনতা ও নীরবতার মধ্যে কেমন কোমল হয়ে ওঠে তার ভেতরটা। লস্করদের কাছে তার ব্যক্তিত্ব বড় জমকালো। তারা তাকে শ্রদ্ধা করে ভয় করে। সারেঙ্গও অনুভব করে কর্তৃত্বের ভারিত্ব। কিন্তু এ-সময়ে তার সে-মন সহজ হয়ে পড়ে, দিনের মৃদু অথচ বিস্ময়কর বিকাশের কাছে অতি ক্ষুদ্র মনে হয় নিজেকে। খোদা আছেন : সর্বশক্তিময় খোদা। তাঁর অস্তিত্ব নিঃসঙ্গ করিম সারেঙ্গ অনন্ত আকাশের তলে ও অকূল সমুদ্রের মধ্যে বিচিত্রভাবে অনুভব করেছে, এবং এ-অনুভূতিতে কখনো-কখনো তার ব্যক্তিত্বে-ভারি মন-ও কেমন বেদনার আনন্দে কেঁদে ওঠে। রাত্রির শেষ। প্রখর সূর্যালোকের তলে বাস্তব জগতের সাথে এখনো দেখা হয় নি : নির্মল প্রশান্তিতে সারেঙ্গ ফজরের নামায পড়ে। শুভ্র দাড়িতে আবৃত গৌর মুখ পবিত্রতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এবং গভীর এবাদতী নিবিষ্টতায় তার ক্ষুদ্র চোখ—যে-চোখের তীক্ষ্ণতায় লস্কররা ভীত চমকিত হয়—সে-চোখ বুজে থাকে নিবিড়ভাবে। খোদা আছেন : সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ামক খোদা।

ধ্যানমগ্ন মুহূর্ত পিছলে-পিছলে যায়, ক্রমে-ক্রমে ওধারে জানালা গলে এবার আলো আসে ভেতরে। যে-পবিত্রতা একসময় সূর্যালোকের কুৎসিত প্রখরতায় নিঃশেষ হয়ে যাবে, সে-পবিত্রতা এবার ঘোষণায় পরিণত হচ্ছে। সারেঙ্গের চোখ ছলছল করে, নিমীলিত চোখের প্রান্তে তার আভাস স্তিমিত-হয়ে-ওঠা বৈদ্যুতিক আলোতে চকচক করে। মানুষ জানে না—অনুভব করে না খোদাতালার অস্তিত্ব। সূর্যালোকে মানুষ দুনিয়া দেখে, দেখে পরস্পরের পাপ-পঙ্কিলতা, এবং খোদার দান সূর্যালোক হয়ে ওঠে কদর্য। যে-অশ্রু নিমীলিত চোখের প্রান্ত শুধু চকচক করছিল, ছুরা ফাতেহা পড়তে গিয়ে এবার তা ছাপিয়ে ওঠে। জাহাজী জীবনই সারেঙ্গের

অস্তিত্ব, আর সমগ্র দুনিয়ায় ঘুরে সে সত্যিকার জীবনকে জেনেছে। কোটি-কোটি মানব যে-পথে চলে তোমার অপার রহমান লাভ করেছে—সেই পথে আমাকে পরিচালিত করো : আমার জীবন-পথ তোমার কৃপায় সিক্ত করো। কিন্তু সারেঙ্গ একটা কথা ভাবে। সে বৃদ্ধ হয়েছে, বাঙলার বন্দরে পৌঁছে এবার সে এ-জাহাজী জীবন থেকে চিরতরে বিদায় নেবে। এবং খোদা তো তার এ-দীর্ঘ সামুদ্রিক জীবন-পথ তাঁর কৃপা ও করুণায় সিক্ত করেছেন, তাই জীবন-পথ করুণায় সিক্ত করবার জন্যে আর কেন প্রার্থনা?

দীর্ঘ মোনাজাত শেষ হতেই তার হাত দুটো যেন হঠাৎ অবশ হয়ে কোলের ওপর পড়ে গেল, ঈষৎ মুখ ফিরিয়ে পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সারেঙ্গ স্তব্ধ হয়ে গেল। কেবিনের আলো ইতিমধ্যে ম্লান হয়ে উঠেছে, আর বাইরের আলো হয়ে উঠেছে স্পষ্ট। ঘর ও বাইরের আলোর মধ্যে এবার দ্বন্দ্ব চলছে। ঠিক যেন এ-রকম দ্বন্দ্ব অন্য কোথাও চলছে। কোথায়? খোদার অস্তিত্ব বিশ্বময় বিরাজমান, সারেঙ্গের অন্তরে-ও এক অস্তিত্ব : এ-দুই অস্তিত্বে কি দ্বন্দ চলছে? সারেঙ্গ স্তব্ধ। কিন্তু ঘরের আলো শীঘ্র ম্লান ও নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। তা উঠুক, তবে কী-একটা প্রশ্ন—অতি অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য-প্রায় কী-একটা প্রশ্ন থেকে-থেকে মাথানাড়া দিয়ে উঠছে। দীর্ঘ জীবন-তো অতিক্রান্ত হল প্রায়, কর্মজীবনের অবসান ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু তুমি আমাকে কী দিলে, আর আমি তোমাকে কী দিলাম? সারেঙ্গ কিছু চঞ্চল হয়ে উঠল : পবিত্র প্রভাত—এ-সময়ে বেদনার মতো অবসাদ ঘনিয়ে উঠছে কেন মনে। সে-অবসন্ন মনের কোণে দুর্বোধ্য-প্রায় প্রশ্নটি বারে-বারে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল, আর তার প্রতিটি ধ্বনি শূন্য গহ্বরে যেন আওয়াজ করছে—অর্থহীন শূন্যতায় যার কোনো উত্তর মিলছে না। অতিক্রান্ত দীর্ঘ জীবন অদ্ভুতভাবে শূন্য ও ব্যর্থ ঠেকছে কঙ্কালের চোখের মতো।

সারেঙ্গ নিশ্চল। অন্তরে কান্নাও স্তব্ধ।

কার্গো-উইঞ্চ নীরব হয়েছে। পোশাক পরে করিম সারেঙ্গকে বেরুতে হল। গলির মুখে পৌঁছতেই দেখলে ভেতরে দুটি অস্পষ্ট মূর্তি; এদিকেই তারা আসছিল—সারেঙ্গকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। সারেঙ্গ এগিয়ে গিয়ে দেখলে নতুন লস্করটা দাঁড়িয়ে; পেছনে মতিন কাসাব-ও রয়েছে।

—কী অ'ডা ছাত্তার?

ছাত্তার কী যেন বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তার ঠোঁট কেঁপে থেমে গেল। সারেঙ্গ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তার পানে, তাকিয়ে বুঝলে কিছু গোলযোগ ঘটেছে। তারপর সারেঙ্গ মতিনের পানে তাকাতেই সে দ্রুতভঙ্গিতে এগিয়ে এল দু পা, যেন সারেঙ্গের প্রশ্নসূচক দৃষ্টির অপেক্ষাতেই সে ছিল।

মতিন চট্টগ্রাম অধিবাসী, সারেঙ্গ-ও। স্ব জিলার ভাষায় দ্রুতভাবে চাপা উত্তেজনায় সে যা বললে তার সারাংশ এই : প্রায় গত সন্ধ্যা থেকে ছাত্তার কার্গো-উইঞ্চে কাজ করছিল। চিফ অফিসারের হুকুম ছিল যে শেষরাতের মধ্যেই মাল তোলা শেষ করতে হবে, কিন্তু অত মাল কি এত তাড়াতাড়ি তোলা যায়? উইঞ্চটা দুর্বল, তবু তার ক্ষমতার অধিক মাল এক-একবার নিয়ে অবিশ্রান্ত মাল তোলা হয়েছে। উইঞ্চম্যান ও লস্কররা এক মুহূর্ত বিরাম দেয় নি, ক্রমাগত খেটেছে। ছাত্তারের শরীরটা কিছুদিন যাবৎ ভালো যাচ্ছে না, তাই সারারাত একটানা খেটে সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তখন ভোর হয়েছে। উইঞ্চের আংটা ডকে মাল তুলছে—এই ফাঁকে হ্যাচওয়ের পাশে বসে ছাত্তার একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে চিফ অফিসার রুক্ষ মেজাজে তদারক করতে এসে দেখলে সে বসে রয়েছে। অমনি কোনো কথা নেই—এগিয়ে এসে তীব্রভাবে ক-টা লাথি দিয়ে দাঁড় করাল তাকে।

সারেঙ্গ শুনলে। শুনে কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইল। তার চোখে আগুন জ্বলে উঠছিল, কিন্তু সংযত হয়ে আস্তে শুধু বললে :

—যা, আঁই দেইক্যুম।

তার কণ্ঠে হয়তো একটু স্নেহের কোমলতা ছিল, এবং তারই আভাস পেয়ে ছাত্তার হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সারেঙ্গ চমকিত হয়ে তাকাল তার পানে, কিন্তু পরমুহূর্তে আবার দৃষ্টি সরিয়ে নিল। কিন্তু কান্নায় মানুষ বিচলিত না হয়ে পারে না, তার ওপর সময়টা এমন : শান্ত প্রভাত, সূর্যালোক এখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি, জাহাজের এখনো-জ্বলন্ত আলোগুলোতে রাত্রির আভাস। তাছাড়া ছাত্তারকে দেখেও মায়া হয়। অল্প বয়স, লস্কর-জীবনের এই তার প্রথম অভিজ্ঞতা : এ-জীবনের অনাত্মীয় নিঃসঙ্গতা ও নীরস নির্মম কাঠিন্যে এখনো হয়তো সে নিজেকে খাপ খাইয়ে উঠতে পারে নি, হয়তো বাড়ির জন্যে ও স্নেহমমতার জন্যে মন তার এখনো কাঁদে।

কয়েক মুহূর্ত করিম সারেঙ্গ কোনো ভাষা পেল না। সে কি ইদানীং দুর্বল হয়ে উঠেছে : কিন্তু হঠাৎ সে কঠিন হয়ে উঠল, দ্রুতভাবে বললে : যা যা—দেইক্যুম আঁই। একটু থেমে কেমন গভীর তিক্ততায় শুধু বললে : হেতেরা কি মানুষ?

তীর রেখার মতো হয়ে অবশেষে মিলিয়ে গেল। দিনটা আজ ঝকঝকে শান্ত। আকাশ নিবিড় নীল; বীর্যহীন সাদা-সাদা হালকা মেঘ দূরে-দূরে নির্জীব হয়ে রয়েছে। এমন দিনে হয়তো সারেঙ্গের মন স্নিগ্ধতায় ভরে উঠতে পারত, কিন্তু কেমন একটা চাপা ক্রোধে তার মনটা থেকে-থেকে জ্বালা করে উঠছে। লস্করদের ওপর এমনি অত্যাচার সময়-সময় হয়ে থাকে বটে, কিন্তু ছাত্তারের ব্যাপারটা তাকে বিচলিত করল। ছাত্তারের বয়সই-বা কী : এ-বয়সেও ছেলেরা স্বপ্নে মায়ের কোল দেখে। তাছাড়া এ-পর্যন্ত দুনিয়ায় সে কেবল স্নেহ-মমতাই দেখেছে, মানুষে-মানুষে হিংসা-বিদ্বেষের অভিজ্ঞতা তার এখনো হয় নি, এবং এ-পর্যন্ত যা বা দেখেছে—তা ব্যতিক্রম ভেবে নিশ্চিন্ত রয়েছে, জানে নি যে এটাই দুনিয়ার রীতি। সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে বলে এখনো তার ধারণা—সব মানুষ সমান : মানুষে-মানুষে পদ ও সামাজিক স্তরের জন্যে যে ঢের প্রভেদ আছে—এ-জ্ঞান আজো তেমন স্পষ্ট হয় নি। করিম সারেঙ্গের প্রতি তার যে-ভয় ও শ্রদ্ধা রয়েছে, তা পদের জন্যে নয়—পিতৃসুলভ মর্যাদার জন্যে।

স্নেহ-বেদনায় সারেঙ্গের অন্তর কেমন করে ওঠে। কিন্তু সে কি ইদানীং দুর্বল হয়ে উঠেছে? শক্ত হয়ে ওঠে সারেঙ্গ। সে-সময়ে ছাত্তারের সামনে অসাবধানতায় একটু তিক্ততা প্রকাশ পেয়েছিল—সে প্রশ্ন করেছিল : তারা কি মানুষ?—এটা অনুচিত হয়েছে। বৃহত্তর দুনিয়ার পঙ্কিলতায় সে যখন এসে নেবেছে তাকে শিখতে ও জানতে হবে সবকিছু : অন্তরের দয়ামায়ার কোমলতা-দৌর্বল্য দূর করে তীক্ষ্ণ ধারালো কাঠিন্যে সে-অন্তর শক্ত ও প্রতিঘাতী করে তুলতে হবে, নইলে বাঁচতে পারবে কি সে এ-দুনিয়ায়? তাকে মানুষ হতে হলে প্রথমে মানুষের লাথি খেতে হবে।

সরু লোহার সিঁড়ির গোড়ায় করিম সারেঙ্গের দেখা হল এঞ্জিন-ঘরের সারেঙ্গের সাথে, কিন্তু কোনো কথা হল না। আড়চোখে তাকাল লোকটি, কিন্তু অন্যমনস্কভাবে করিম সারেঙ্গ ওপরে উঠে গেল। ওদিকে আকাশে আর নিস্তরঙ্গ সাগর ছুঁয়ে-ছুঁয়ে সাদা পাখি উড়ছে : উড়ছে না তো যেন শান্তিতে ভাসছে। আর ব্রিজের রেলিং ধরে দণ্ডায়মান চিফ অফিসারের দাঁতগুলোও সাদা : ধোপদুরস্ত সাদা পোশাকের মধ্যেও তার দাঁতের সে-শুভ্রতা নজরে পড়ে। কাপ্তানের গালদুটো গাঢ় লাল্‌চে, ফুলো-ফুলো, মদের সঞ্চিত রসে চকচকে। আর চোখ সাগরের মতো নীল। ওই যে দেখছ তীর-রেখাশূন্য অকূল সমুদ্র—এ-সমুদ্র আমার : কথা বোলো না, লাথি খাবে। আর জাহাজের কোনো প্রান্তে ছাত্তার হয়তো ম্রিয়মাণ হয়ে রয়েছে। কিন্তু তাকে এ-কথা কে বোঝাবে যে মান সবার জন্যে নয়, জুতোকে জুতো ভাবলে চলবে না এ-পৃথিবীতে, আর পৃথিবীর প্রাণ গোলামির রক্তে। কাপ্তানের চোখ চিকমিক করে : ভ্রূ কুঁচিয়ে সে তাকিয়ে রয়েছে দূরে—সমুদ্র দেখছে, এবং প্রত্যয়ে নিষ্কম্প সে-দৃষ্টি। ওদিকে পাখি উড়ছে, উড়ছে, ঘুমের পাখা মেলে প্রশান্তিতে ভাসছে।

চারটে লস্কর ওধারে ডেক-ধোয়ামোছায় লিপ্ত। আরেক স্থানে আরো কয়েকজন গোল হয়ে বসে জীর্ণ ক্যানভাসে মোটা মোটা ছুঁচ ফুড়ছে। জাহাজের কোনো অংশে হয়তো রং চটেছে, তাই দুটো কাসাব বড় একটা গামলায় রং গোলাচ্ছে উবু হয়ে।

ডেক ধোয়ায় লিপ্ত লস্কররা একটা অশ্লীল ইয়ার্কি করে হাসিতে ফেটে পড়ছিল—প্রায় হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে নীরব হয়ে গেল। করিম সারেঙ্গ পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

আঁই দেইক্যুম। করিম সারেঙ্গ আশ্বাস দিয়েছিল, এবং তার সে-আশ্বাসে ও কণ্ঠে ঈষৎ-স্পষ্ট স্নেহের আভাস পেয়ে ছাত্তার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। সে দেখবে। অর্থাৎ দেখে নেবে। কিন্তু কী আশ্চর্য—দুনিয়াতে যেন এমন কোনো শক্তি নেই যে-শক্তি চিফ অফিসারের হাসিতে বিস্ফারিত ঠোঁটে অনুতাপের ছায়া ঘনাতে পারে। অথচ সারেঙ্গের সাড়া পেয়ে লস্কররা উচ্ছ্বসিত হাসি-ও এক নিমেষে দমিয়ে ফেলতে পারে। কিছু দূর থেকে সারেঙ্গ আবার আড়চোখে তাকাল : ওরা তো মাথা নিচু করে রয় নি, নিকৃষ্টতম দৈন্য হেঁট হয়ে রয়েছে লজ্জাকর হীনতায়।

হেতেরা কি মানুষ? কিন্তু কারা মানুষ?

দীর্ঘ সামুদ্রিক জীবন অতিক্রান্ত হয়ে এল। পথের শেষে পৌঁছে পথের প্রারম্ভের কথা মনে পড়ে। তখন জাহাজগুলো ছিল হাঁদা-হাঁদা। বৈদ্যুতিক আলো তখন সব জাহাজে হয় নি। মনে পড়ে বড়-বড় লণ্ঠনগুলোর কথা—যার অস্পষ্ট আলো আজ স্মৃতির অস্পষ্টতার মধ্যে মিলিয়ে উঠেছে প্রায়। কিন্তু সে-কথাটি অতি স্পষ্টভাবে মনে পড়ে : স্নেহ-মমতার বন্ধনযুক্ত একটি এতিম ছেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল সাতসাগর পাড়ি দিয়ে প্রচুর অর্থ করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায়। তবে অর্থলোভের চেয়ে-ও প্রবল ছিল একটা কৌতূহল : সাতটি তো সাগর, সাগরে-সাগরে তফাতটা কেমন? কিন্তু প্রথম যাত্রায় বুঝতে পারলে যে চোখের পানির মতো ঐ অকূল সাগর লবণাক্ত—যে-লবণাক্ত সাগর সর্বত্র এক : সাগরে-সাগরে কোনো প্রভেদ নেই। প্রথম-যাত্রা দ্বিতীয়-যাত্রা তৃতীয়-যাত্রা—অথচ সামুদ্রিক জীবনের প্রারম্ভে প্রত্যেকবার-ই সে ভেবেছে, আর নয়, এই যাত্রাই শেষ, আবার যাত্রাশেষে ভেবেছে জীবনের আসল কিছুই-তো দেখা হল না, এত সাধারণ হতে পারে না মানুষের জীবন। তারপর ক্রমে-ক্রমে আশা-আকাঙ্ক্ষাশূন্য শান্ততা এল মনে।

স্মৃতিমন্থনে অদ্ভুত বেদনা। যে-দিন কেটে গেছে, সে-দিন আর কখনো ফিরবে না। এবং জীবন যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে, তবে ব্যর্থই হল। করিম সারেঙ্গের ভেতরটা যেন ফাঁপা, শূন্য, প্রচণ্ড ব্যর্থতায় রিক্ত। এবার সে-অন্তরে আবার সে-প্রশ্নটি অবুঝ গোঁয়ার ছেলের মতো গুমরে গুমরে উঠতে লাগল। তুমি কী দিলে আমাকে, আর আমি কী দিলাম তোমাকে। স্বীকার করি, কিছু অর্থ মিলেছে। কিন্তু সে-থেকে বঞ্চিত হলেই কি অধর্মের বন্যা ছুটবে, আর মিললেই কি ধর্মের বজ্র ঘোষণা হবে? দীর্ঘ জীবন-তো অতিক্রম করে এলাম, জীবনের এ-পিঠ ও-পিঠ উলটে-পালটে দেখলাম, তবু যৌবনে কল্পনায় যে-স্বপ্ন দেখেছিলাম, সে-স্বপ্নের বাস্তব রূপান্তর দেখলাম না। কিন্তু, তোমার রাহ্‌মানিয়তের সীমা নেই, তুমি-ই বলেছ। তবে অর্থ প্রাপ্তিতে তৃপ্ত মন তোমার সে-কল্পনাতীত অনন্ত করুণাসাগরে ভেসে তৃপ্তি পাবে কি?

আঁই দেইক্যুম। আমি দেখব। আশ্চর্য, এখন সে-কথা উলঙ্গ পঙ্গুর মতো ঠেকছে। কিন্তু যদিও স্বপ্নের বাস্তব রূপান্তর ঘটে নি, বাস্তবে-বাস্তবে সংঘর্ষ-তো ঘটতে পারে। লস্কররা হাসছে নিচে, এখানে-ও তার কিছু আওয়াজ ভেসে আসছে। করিম সারেঙ্গের মুখ গাম্ভীর্যে নিশ্চল। মাথা কাত করে আড়চোখে চিফ অফিসার তাকাল। কী হয়েছে? লস্কররা ক্ষেপে গেছে? কয়েক মুহূর্ত নির্বাক থেকে হঠাৎ সে হেসে উঠল উচ্ছ্বসিত গলায়। বটে, ক্ষেপেছে তারা, তাই তো তাদের উচ্চ হাসির আওয়াজ এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে বৃদ্ধ করিম সারেঙ্গ সরে এল। ছাত্তারকে আরেক অমূল্য জ্ঞান জানাতে হবে : অন্যায় করো, অথচ সে-অন্যায় সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়ো না; হলেও কখনো তা স্বীকার করো না;

আর, কারো অন্যায়ে কেউ যদি ক্ষেপে থাকে তবে এ-কথা ভেবো না যে সবাই ক্ষেপেছে। এমন ভাবা সুস্থ-মস্তিষ্কের পরিচায়ক নয়।

মানুষ বিয়ে করে কিছুটা জৈবিক কারণে, কিছুটা স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত দেখবার জন্যে। তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সে যৌবনক্ষয়ের রিক্ততা ও অসহায়তায় মানুষ ক্ষেপে ওঠে, তবু সন্তানের মধ্যে তা সঞ্চিত হতে দেখলে শান্তি পায়। করিম সারেঙ্গ নিঃসঙ্গ। তার ক্ষয় ক্ষয়ই : তার ভাঙা তীর অন্য কোথাও আর তীর গড়ছে না।

মন কাঁদে কি? কিন্তু শূন্যতায় মন কাঁদে না। অন্তর শূন্য, জীবন-তো তাকে কিছু দিল না; আর সামনেও শূন্যতার আনন্ত্য। অতিক্রান্ত দীর্ঘ জীবন শূন্য কলসের মতো শুধু ঠনঠন করছে।

কিছু নেই, তাই ছাত্তারের কথা বড় হয়ে মনে জাগছে। ছাত্তার হয়তো সে-লাথি হজম করতে পেরেছে, অন্তত তাই তো মনে হচ্ছে তার প্রশ্ন ও কৌতূহলশূন্য নির্বাকতায়। দুনিয়ার নিষ্ঠুরতায় শক্ত-কঠিন হয়ে ওঠা অভিজ্ঞ লস্করর‍া হয়তো তাকে বুঝিয়েছে, তার ভুল ভাঙিয়েছে। করিম সারেঙ্গের মনে কিন্তু গভীর যন্ত্রণা। দেখাবে বলে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত কী সে দেখাল—এ-কথা জানবার জন্যে-ও ছাত্তার একবার তার কাছে এসে কৌতূহল জানাল না। তার ক্ষমতা হয়তো বুঝতে পেরেছে; অথচ তাকে দেখলে সে-ই আবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে।

দিন তেমনি ঝকমকে, শান্ত। শুকনো ডেক খটখট করে জুতোর আওয়াজে। করিম সারেঙ্গ নিঃশব্দে হাঁটতে চাইছে, তবু জোরালো আওয়াজ হচ্ছে মেঝেতে। মাটির জন্যে—ঘাসভরা নরম মাটির জন্যে তার মনটা হঠাৎ কেমন করে উঠল। সাগর নেই : শক্ত মাটি, দোলা নেই : অর্থপূর্ণতায় স্থির জীবন। শতসহস্র ঢেউয়ের মাথায় নেচে সারাজীবন অবিরাম যাত্রা করে সে দেখলে, পৃথিবী শুধু গোল, আবার ঘুরে এসেছে যেখান থেকে রওনা হয়েছে। যাত্রার পর যাত্রা, এবং জীবন পূর্ণ না হয়ে উঠে বরঞ্চ ক্ষয়ে-ক্ষয়ে গেল, ফাঁপা হয়ে উঠল বিরাট শূন্যতায়।

অথচ চার্টরুম ঝকমক করে, আর ওধারে সে বিশ্ববিজয়ের গর্বে মাথা উন্নত করে সুখানি কামাল স্টিয়ারিং ধরে ঋজুদেহে মূর্তিবৎ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে—চোখে তার সন্ধানী দৃষ্টি : সমুদ্রে সে পথ দেখছে।

হামেদ লস্কর সোজা হয়ে দাঁড়াল। করিম সারেঙ্গ তার পানে না তাকিয়ে শুধু দ্রুতভাবে বললে :

—ছাত্তারগারে ফাডাই দিয়ো তো—

তারপর সে কেবিনে গেল। বিছানার চাদর ধবধব করছে, অথচ ওধারে পোর্টহোলের কাচে ধুলো, দাগ।

অল্পক্ষণ পরে ছাত্তারের সামনে বহুদিন বাদে আজ করিম সারেঙ্গ হাসল। দাড়ি শুভ্র, কিন্তু তার চেয়ে-ও শুভ্র হাসি সে হাসল, তারপর কী যেন ভাবতে-ভাবতে তার সে-হাসি আস্তে মিলিয়ে এল। কয়েক মুহূর্ত পর সে সচেতন হল, আবার সে হাসল, হেসে অক্ষম স্নেহে দুর্বল গলায় বললে :

—অ'ডা, খালি লাথি এনা খাইয়ছ দে—

কিন্তু সে-কথা বলার কথা নয়, অন্য কথা ছিল সারেঙ্গের মনে। তার জীবনে যদি গ্রন্থি পড়ত তবে ছাত্তারের মতো এমনি একটি ছেলে এমনিভাবে দাঁড়াতে পারত তার সামনে। একটু পরে সে শুধু প্রশ্ন করল :

—বারিৎ কন আছে তোর ?

ছাত্তারের মা আছে, বাপ আছে, তাছাড়া তিনটি বোন দুটি ভাই-ও আছে। শুনল সারেঙ্গ—ক্ষুধার্তের মতো গোগ্রাসে শুনল। তারপর আবার আশ্চর্যভাবে স্তব্ধ হয়ে রইল।

অবশেষে আস্তে বললে :

—যা; এ'নে ডাক্যিলাম দে।

সবাই রয়েছে ছাত্তারের, এবং এ-সংবাদ শোনার পর আর কোনো কথা বলবার নেই যেন করিম সারেঙ্গের। যেহেতু তার নেই কেউ।

বিছানার চাদর ধবধব করে, দরজার ঝকঝকে পেতলের নবে গোল-হয়ে-পড়া ঘরের ছায়া, আর পোর্টহোলের কাচে ধুলো, দাগ। এই তার ঘর। পৃথিবী-ও।

সন্ধ্যার পর সারেঙ্গ যখন কেবিনে, ছাত্তার তখন আরেকবার এল।

—কী রে?

লজ্জিত নত মুখে ছাত্তার কেবল বললে :

—না, এনে আস্যি দে।

কোনো প্রয়োজনে সে আসে নি, এমনি এসেছে। এবং এমনি এসেছে বলেই আস্তে-আস্তে এমনি কত কথা উঠল, আর তার মধ্যে সারেঙ্গের স্নেহ-ক্ষুধার্ত মন জোঁকের মতো ওর অন্তরের স্নেহমমতা শুষতে লাগল। ছাত্তারের অন্তর খুলে গেল, এবং একসময়ে সে কেমন করে কেঁদে উঠল। হঠাৎ, তারপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে সে কাঁদতেই থাকল। সারেঙ্গ স্তব্ধ—ভাবনার অতলে স্তব্ধ। ঝিকঝিকঝিক—জাহাজ চলছে, অথবা হয়তো মানুষের জীবনকে উপেক্ষা করে কাল চলছে সমাপ্তিহীন যাত্রায় অনন্ত তমিস্রার পানে।

ছাত্তারের কান্না কখন আস্তে থেমে গেল। এবার সে মুখ তুললে, তুলে সারেঙ্গের পানে না তাকিয়ে বললে :

—বারির লাই মন কাঁদে।

স্বাভাবিক। সারেঙ্গ কোনো কথা বললে না।

একটু নীরব থেকে ছাত্তার আবার বললে :

—আর, বারির তুন পলাই আস্যি আঁই-ইয়ল্লাই মন আরো ব্যাশ কাঁদে জে। পালিয়ে আসার জন্যে মন আরো বেশি কাঁদে—তাও স্বাভাবিক। কিন্তু আবার না পালিয়ে বাপ-মায়ের চোখের সামনে দিয়ে কোনো ছেলে এ-নির্মম নিষ্করুণ জীবনে আসতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ কী হল, সারেঙ্গ অপ্রত্যাশিতভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল : হয়তো একটা বিকৃত হিংসা ঝল্‌কে উঠেছে মনে। পালিয়ে এসেছে সে, পালিয়ে? জাহাজী-জীবনকে কি খেলা ভেবেছে? পালিয়ে আসবার সময় কি এ-কথা ভেবেছে যে স্নেহের সমুদ্রে ভাসতে চলেছে?—অসহ্য ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে লাগল সারেঙ্গের ঠোঁট।

ছাত্তার হতবুদ্ধি, নিশ্চল।

নদীর মোহানায় জাহাজ এক ঘণ্টা পরে, আর সন্ধ্যায় পৌঁছবে কলকাতা-বন্দরে। তাই করিম সারেঙ্গের সারা অন্তর কেমন তিক্ত বেদনায় জ্বালা করে উঠছে। সাগর আজ কিছু তরঙ্গায়িত। সমান দ্রুতিতে মালে-ভারি জাহাজটা অবিশ্রান্ত চলছে করিম সারেঙ্গকে তার শূন্য কর্মজীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে দিতে। এবার শেষ হবে তার সামুদ্রিক জীবন, এবার এ-অশান্ত জীবন থেকে সে মুক্তি পাবে। কিন্তু তারপরে কি শান্তি?

লস্করদের মধ্যে চাপা চাঞ্চল্য। বন্দরে কাল জাহাজ পৌঁছবে। উইঞ্চম্যান কার্গো-উইঞ্চ নিয়ে ব্যস্ত : মরচে-ধরা পুরোনো উইঞ্চটার এখানে-সেখানে তেল ঢালছে; কিন্তু তেমন কাজ নেই বলে করিম সারেঙ্গ তার কেবিনে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। পোর্টহোল দিয়ে ঈষৎ তরঙ্গায়িত সাগর নজরে পড়ে। কিন্তু তীর দেখা যায় কি? কেমন একটা ভীতি সারাদেহে শীতলতা আনছে : তীর দেখার ভয় মৃত্যু-ভয়ের মতো ঠেকছে। সারেঙ্গ তীর দেখতে ভয় পাচ্ছে, তীর দেখতে সে চায় না আজ। এবং সে-তীরই তার মনে ভীতি সঞ্চার করছে, যে-তীরে কোটি-কোটি মানবের স্থবির জীবন স্নেহমমতার শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে মাটির মধ্যে শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে।

ডান ধারের দেয়ালে ডিম্বাকৃতি স্বচ্ছ আয়না। সে-আয়নায় সারেঙ্গের দৃষ্টি পড়ল, এবং সে-দেখল, এক বৃদ্ধ অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে তারই পানে। বৃদ্ধের মুখে দাড়ি, সে-দাড়িতে বর্ণহীন নিষ্ফল শুভ্রতা।

সন্ধ্যার সময় জাহাজ বন্দরে পৌঁছল। লস্কররা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে লাইন নিয়ে; চাপা চাঞ্চল্যে তারা তাকাচ্ছে নিষ্প্রদীপ্তপ্রায় স্বল্পালোকিত রহস্যময় বন্দরের পানে।

করিম সারেঙ্গ ছাত্তারকে খুঁজে নিল।

—অ'ডা গেয়া, খতা হুনি যা। তারপর অদ্ভুত মমতায় বললে, তুই বারিৎ যা গই, আর ন আইছ্।

উইন্ডল্যাস ঘরঘর করছে : নোঙর পড়ছে। তার সামুদ্রিক জীবনেও কি নোঙর পড়ছে?

কিন্তু এ-জীবন ছেড়ে কোথায় সে যাবে? দেশে আপনার বলতে কেউ নেই : সেখানে মমতাশূন্য শুষ্কতা। আত্মীয় যারা আছে তারা নামে আত্মীয়, দীর্ঘ বিচ্ছেদের জন্যে তার জীবনের সঙ্গে তাদের কোনো সংযোগ নেই। ছাত্তারের যেমন সবাই আছে, তেমনি তার কেউ-ই নেই। অতএব ছাত্তার যাবে, সে থাকবে। আবার সে জাহাজে চুক্তি নেবে, এবং যদি পারে আমৃত্যু সমুদ্রের বুকেই বাস করবে।

কিন্তু অন্তরের শূন্যতা কাটবে কি? তুমি কী দিলে আমাকে, আর আমি কী দিলাম তোমাকে : তার অন্তরে আর সমুদ্রের প্রতি তরঙ্গে সে-প্রশ্ন অবিরাম ধ্বনিত হবে হোক। সব কথার উত্তর মেলে না সব সময়, প্রশ্নের কাঁটার মধ্যেই-তো মানুষের জীবনের অবসান ঘটে।

গ্যাঙ্গওয়ের পাহারায় ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক সুখানি—করিম সারেঙ্গ তার নাম জানে না। কয়েকজন লস্কর নাবছে মৃদুগুঞ্জন করে। সে-দলে ছাত্তারও রয়েছে। তার মুখে হয়তো মুক্তির ঔজ্জ্বল্য, তবে সে নত মাথায় নাবছে বলে ওপর থেকে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ওপরের পানে মুখ তুলে একবার সে তাকাবে কি? রেলিং ধরে ঝুঁকে করিম সারেঙ্গ দাঁড়িয়ে রইল প্রেতের মতো আবছা হয়ে—চোখ দুটো তার দীনতায় বীভৎস হয়ে উঠেছে।

ও তাকাল না।

পরাজয়

দূরে যেখানে ধলেশ্বরীর সাথে এই রাঙাধারের ঢালা এক হয়ে মিশেছে, সে-সঙ্গমস্থানের বিস্তীর্ণ জলরাশি হঠাৎ ঝলমল করে উঠল : মেঘের ফাঁকে সকালবেলার সূর্যালোক ঝলকে পড়েছে সেখানে। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে ক্ষুদ্র কোটরগত অথচ উজ্জ্বল চোখ দুটি দূরে নিবদ্ধ করে মজনু ঠোঁটের প্রান্তে একটু হাসল, তারপর সবল হাতে লগি দিয়ে তীর হতে গভীর জলে নৌকা ঠেলে সে বলে উঠল :

—হেই গো, মোদের নাও ভাসল।

মাথায় তার জড়ানো লাল গামছা, সাদার ওপরে নীল চেকের আধময়লা লুঙ্গিটি কোঁচামেরে পরা, এবং দেহের বাকি সমস্ত অংশ অনাবৃত। লগি ছেড়ে হাল ধরে বাইতে শুরু করলে তার সুগঠিত পেশিবহুল কঠিন-কালো দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চঞ্চল হয়ে উঠল, যেন তার সমগ্র দেহ উল্লাসে ঝলমল করে উঠল ওই রৌদ্রকরোজ্জ্বল বিস্তৃত জলরাশির মতো।

ছইয়ের ভেতর থেকে কালু কথা কয়ে উঠল :

—তার নাও তো ভাসল, মোর কল্লেয় আগুন ধরে কই?

মজনু উত্তর দিলে না। ওপাশ দিয়ে হল্‌দে রঙের তালি-দেয়া ছোট পাল উড়িয়ে একটা নৌকা যাচ্ছিল; তার হালের কাছে উবু হয়ে বসে রয়েছে কুঁজোমতো একটি বুড়ো মাঝি, তাকে উদ্দেশ করে ঘাড় হেলিয়ে মজনু চিৎকার করে প্রশ্ন করলে :

—কই যায় গো তোমার নাও, অ কেব্‌তাঘাটের মাঝি?

বুড়ো তার পানে তাকাল না, শুধু একটু নড়ে বসে গলা উঁচিয়ে জবাব দিলে :

—মামুদপুর।

আড়চোখে সে-নৌকার ছইয়ের ভেতরে তাকাল মজনু : কাঁচা সোনার মতো রঙের কে এক মেয়ে বসে রয়েছে সেখানে। মুখে তার ঘোমটা নেই, পরনে কালো শাড়ি।

নৌকাটি তখন দূরে চলে গেছে, হলদে রঙের পালের তালিগুলো আর নজরে পড়ে না, কালুকে মজনু আস্তে বললে,

—একটা সোনা-মুখ দেখলাম।

—জলকন্যা দেখ্‌লা নাকি?

পুব থেকে হাওয়া বইছে, নদীর জলে তাই মৃদু ঢেউ, আর অস্পষ্ট কলকল আওয়াজ। ওধারে আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, নীল স্বচ্ছ আকাশে পরিপূর্ণ রোদ ঝলমল করছে, আর তারই ছটা লেগেছে অদূরে কাশের বনে। মৃদু হাওয়ায় দুলছে কাশবন, তার ডগাগুলো চিকচিক করছে। নৌকা যখন রাঙাধারের ঢালা থেকে বেরিয়ে ধলেশ্বরীর মাঝামাঝি এসে পড়ল তখন স্রোতের ধারে নৌকা দুলে উঠল। তাছাড়া নৌকা চলছে ঈষৎ কোনাকুনি-ভাবে। স্রোতের অনুকূলে ওদিক হতে একটা দৈত্যের মতো গোপালপুরী নৌকা আসছে, পালের রং তার সাদা। পেছনে মাচার ওপর লাল ডোরাকাটা নিশানার তলে বসে রয়েছে নেড়া হিন্দুস্থানি মাঝি, তাছাড়া বাইরে কেউ নেই। মাঝির পানে চেয়ে মজনু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল,

—হেইগো, বাঁয়ে বাঁয়ে।

নৌকা না তো, সত্যিই যেন দৈত্য। তাছাড়া পেতলে বাঁধানো গলুইর পানে তাকালে কিছু শ্রদ্ধাও হয়, আর মনে পড়ে কবে একবার সে দেখেছিল এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীকে, যার সামনের দুটো দাঁত ছিল সোনায় বাঁধা।

—অ কালু, হুক্কার পানি কদ্দূর গো? একবার বার হয়ে আস দেখিন্, নায়ে জবর টান ধরছে।

হুক্কার গুড়গুড় আওয়াজ হঠাৎ থেমে গেল, ছইয়ের গর্ত দিয়ে সশব্দে নদীতে থুতু ফেলে লোকটি বলে উঠল :

—পানিটা কেমুন বোঁদা-বোঁদা, গলায় ধরল না।

একটু পরে ছইয়ের পেছন দিয়ে বেরিয়ে এল কালু, হাতে তার হুঁকা। সেটি মজনুর হাতে দিয়ে সে চলে গেল সামনে। দাঁড় বাইতে হবে।

সূর্য তখন অনেকটা উঠে পড়েছে। যেখানে তারা এসে পৌঁছল সেটা নদীর তীর নয়, নদীর মাঝখানে জলে ডোবা বিস্তীর্ণ চর। ওপাশে ছমিরের মাচাটা নজরে পড়ে, নিচে বাঁধা ছোট ডিঙিটার কিছু অংশও দেখা যাচ্ছে। ছমির তাহলে মাচাতেই রয়েছে। এধারে ধান নেই, শুধু জলের ওপর মাথা উঁচু করে রয়েছে দীর্ঘ ধারালো ছন ও ভাতসোলা। গলুইতে বসে রয়েছে বলে কালুর পিঠ ছড়ে যেতে লাগল ছনের ধারে। জলে ভারি গন্ধ, আর চারধারে কেমন ভাপসা গরম, যেন ওপরে অত বড় বিস্তৃত অনন্ত আকাশ নেই, স্থানটা দেয়ালে আর ছাতে ঘেরা।

উঠে দাঁড়িয়ে কালু লগি টেনে নিল, তারপর কয়েকবার লগি ঠেলে অদূরে মাচাটার পানে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল :

—কই গো ছমির মিঞার বউ, বার হইয়া দেখ দেখিন্ আইছে কে।

কোনো উত্তর এল না সেখান থেকে। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে কালু হাসল, ঈষৎ ঝুঁকে লগিটা সম্পূর্ণ ঠেলে আবার বললে :

—বউয়ের না হয় লজ্জা হইছে, তোমার মুখে রা নাই ক্যান্ ছমির মিঞা?

—মোরা রাজপুত্তুর গো, এবার মজনুর কৌতুকোচ্ছল গলার আওয়াজ শোনা গেল, সাত-সমুদ্দুরের পার হইতে আসতাছি রাজকইন্যারে দেখবার লাইগা।

কাছাকাছি গেলে স্পষ্ট দেখা গেল, মাচার মাঝখানের একমাত্র দরজার সামনে দুই হাঁটু উঁচু করে বসে ছমিরের বউ কুলসুম স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। নিচে নৌকা বেঁধে ওরা দুজন যখন ওপরে উঠে এল, তখনো সে নড়ল না। মাচার কোণে অন্ধকার, সে-অন্ধকারে খড়ের বিছনায় ছমির গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মজনু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল কুলসুমের পানে, তার মুখে ঘোমটা নেই, স্থির চোখে অদ্ভুত স্তব্ধতা। কালো-কালো ডাগর চোখের ছায়ায় ওর মুখটি ভারি স্নিগ্ধ ও কোমল দেখায় বলে মজনু বলে যে, সে কোন অচিন দেশের রাজকন্যা, যার রূপ নীল আকাশের পরীর মতো, চুল মেঘের মতো, আর দেহের রং সোনার মতো। কিন্তু সে-চোখে কী স্তব্ধতা এখন। তবু কৌতুক বোধ করল সে। মাথাটা একটু হেলিয়ে কিছু আড়চোখে কুলসুমের পানে তাকিয়ে এবার সে হাসল, নিচু গলায় সঙ্গোপনে বললে :

—অমন থির হইয়া বইসা ক্যান্ গো রাজকইন্যা, ছোট্ট নাকের ছোট্ট নথটাও যে নড়তাছে না। দুই জনে বুঝি খুব হইছে একচোট?

এবার কুলসুমের স্থির স্তব্ধ চোখ একটু নড়ে উঠল, সে মুখ ফিরিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাষাশূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মজনুর পানে, তারপর ঝরা শুকনো পাতার মতো অস্পষ্ট শুষ্ককণ্ঠে বলে উঠল :

—কাটি ঘায়ে মরছে সে।

মজনু স্তম্ভিত হয়ে গেল। ওধারে বেড়া ঘেঁষে বসে কালু একটা বিড়ি ধরিয়েছে, এ-আকস্মিক সংবাদে সে-ও হঠাৎ থ হয়ে গেল। সে সামনে ঝুঁকে এল, আর নিচের ঠোঁটটা পড়ল ঝুলে।

ছমিরের দেহ নিশ্চল ও কাঠ-কাঠ। কোণটা অন্ধকার হলেও এবার তার দেহটা বিবর্ণ ও নীল দেখাল। অতি ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে মজনু এগিয়ে গেল সে মৃতদেহের কাছে, কয়েক মুহূর্ত নির্বাক থেকে রুদ্ধ অস্পষ্টকণ্ঠে বললে :

—কী সাপ গো? দেখছিলা?

একটু নড়ে বসে কুলসুম শুধু মাথা নাড়ল : সে দেখে নি। মজনু ফিরে তাকাল কুলসুমের পানে, তারপর চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল বিচিত্রভাবে-স্তব্ধ তার কোমল-কচি মুখটি, শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে গিয়ে তার চোখ হঠাৎ সজল হয়ে উঠল।

চরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তটা অপেক্ষাকৃত উঁচু বলে সে-স্থানটা তেমন জলে ডোবা নয়, কিন্তু অত্যন্ত নরম। সেখানে মাচা বাঁধলে কেমন হয়—তাই ছমির দেখতে গিয়েছিল গতকাল। তখন সন্ধ্যা লেগেছে, নদীর নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত বুকে রক্তাভা, আর ওপারের তীররেখা আবছা হয়ে উঠেছে। ডাঙাটা দেখে ছমির ফিরে আসছিল, সাঁঝের ম্লান আলোয় হঠাৎ তাকে সাপে কাটল। প্রথমে ভেবেছিল ঢোঁড়া, মাচায় ফিরতে না ফিরতে তার মুখ দিয়ে উঠল ফেনা, আর দেহ এল অবশ হয়ে। চরের দক্ষিণে ছেরাদের মাচায় আলো মিটমিট করছিল, কিন্তু এ-মাচা আর সে-মাচায় দূরত্ব-তো কম নয়, তাই কুলসুমের ক্ষীণকণ্ঠের আপ্রাণ চিৎকারও ব্যর্থ হল, সে-মাচা থেকে কোনো সাড়া এল না বা কেউ এল না ডিঙি বেয়ে। মাঝরাতে ছমির মারা গেল।

—কিন্তুক এত বেলা তক তুই কোন আশায় বইসা রইছস্ কুলসুম? ক্ষণকাল কুলসুম হয়তো কোনো উত্তর পেল না, তারপর বললে :

—আইতা, তোমরা আইতা। একটু থেমে আবার বললে, কিন্তুক বেলার কথা কি মোর খেয়াল আছিল?

তারপর ওরা নীরব হয়ে রইল। দুঃখী ও গরিব বলে তাদের কাছে মৃত্যু তত অস্বাভাবিক, মর্মান্তিক ও দুঃখজনক নয়; তাদের জীবন মর্মবিলাসে ও সুখের মোলায়েম সুবেদী আবরণে

পেরা নয় বলে মৃত্যুকে তারা বড় করে দেখে না, বরঞ্চ সেটা যেন তাদের কাছে মুক্তি, অর্থশূন্য একটানা নিষ্ফল শ্রমের অবসান। তাছাড়া ওদের ব্যথার ভাষাও সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত বলে ওরা নীরব হয়েই রইল, এবং এত নীরব হয়ে রইল যে মনে হল মৃত ছমির আবার অস্তিত্ব লাভ করছে, আর জীবনের শেষে যে-অনন্ত অজ্ঞাত রহস্য, সে-রহস্যের স্পর্শে তার প্রাণশূন্য নিশ্চল দেহ। ঘরে স্তব্ধ হাওয়ার মাঝে একটা অস্পষ্ট বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে।

কিন্তু অনেকক্ষণ পর কুলসুম হঠাৎ কথা কইল। তবে তার কণ্ঠ শোনাল হাওয়ার মতো :

—কলা গাছের ভেলা কইরা অরে তোমরা ভাসাইয়া দেও, আর আমি যামু লগে। বেহুলার কাহিনী কুলসুমের মনের প্রান্তে তুলোর মতো, হালকা সাদা মেঘের মতো নিঃশব্দে উদয় হয়েছে। বেহুলার মতো মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে ভেলায় ভেসে সেও যাবে। কিন্তু কোথায়? বেহুলা কোন এক অজ্ঞাত স্থানে গিয়েছিল এবং তার মনস্কামনা সার্থক হয়েছিল এ-কথা সে জানে, কিন্তু তার পথ-তো কুলসুমের জানা নেই। তাই মেঘটা যেমনি ভেসে এল, কথার হাওয়ায় তেমনি আবার মিলিয়ে গেল তার মনের আকাশ হতে। শূন্যতা ও স্তব্ধতা আবার ঘন হয়ে উঠল কুলসুমের দেহ ও চোখে।

ওরা ছমিরের দেহ নিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাবে। ওদিকে রোদ খরখর করছে, নদীর বিস্তৃত বুক ঝকঝক করছে : সেদিকে তাকানো যায় না। কিন্তু হঠাৎ দিগন্তরেখা পেরিয়ে মেঘ জাগতে লাগল, এবং তারই ছায়ায় নদীর সে-প্রান্ত উঠল ধূসর হয়ে। এধারে এখনো শান্তি আর নীরবতা : নদীর জল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে একটা মাছরাঙা উড়ে আসছে এদিকে, আর আকাশে ঘুরে-ঘুরে উড়ছে শঙ্খচিল।

বিড়িতে শেষ টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে কালু বাইরে তাকাল, তারপর নিচের ফাঁক দিয়ে থুতু ফেলে একবার আড়চোখে তাকাল কুলসুমের পানে। চেয়ে কী যেন হল হঠাৎ—তার চোখে ঘোলাটে ছোঁয়া লাগল, এমন বিস্তীর্ণ জনশূন্যতার মধ্যে কুলসুমের কোমল সুঠাম দেহটি তার কাছে কেমন-কেমন ঠেকল। আরেকবার সে থুতু ফেলল, নিচের দিকে আরেকটু ঝুঁকে আবার সে তাকাল তার পানে।

কোনো কথা নেই, মজনু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললে, মাথা হতে লাল গামছাটা খুলে একবার মুখটা মুছলে। কেমন ভাপসা গরম : নিচে জলে স্রোত নেই বলে যেন হাওয়ায়ও স্রোত নেই। মজনু ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করলে, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে হঠাৎ বললে,—নেও, বেবস্থা কইরা ফেলি। অমন কইরা বইসা থাকার কোনো ফায়দা নাই গো রাজকইন্যা।

রাজকন্যা বলেই মজনুর মনে হঠাৎ খচ্ করে উঠল, অন্তরটা এল আর্দ্র হয়ে, কুলসুমের স্থির নখের পানে চেয়ে আবার তার চোখ সজল হয়ে উঠল। কিন্তু কুলসুমের যেন কী হয়েছে। দুই হাঁটু উঁচু করে বসে রৌদ্রোজ্জ্বল দিগন্তের পানে চেয়ে সে যেন অবিরাম স্বপ্ন দেখছে : তার ডাগর টানা চোখ স্বপ্নাবিষ্ট। থেকে-থেকে ঈষৎ নড়ে-চড়ে সে যে কথা কয়ে উঠছে তাতে মনে হচ্ছে গুম-হয়ে-থাকা হাওয়া যেন গুমট ভেঙে বইছে, আর স্বপ্ন দেখার ফাঁকে সে স্বপ্নের কথা কয়ে উঠছে। দূর নীল আকাশে উড়ন্ত শঙ্খচিলটার মতো তার মনের মধ্যে স্বপ্ন কেবলি ঘুরে-ঘুরে উড়ছে, অতি মন্থর নিঃশব্দ তার গতি।

মজনুর মনে-ও অবসাদ নাবছে যেন, তাই আবার সে বললে,—নেও, ওঠ, বেলার খেয়াল নাই?

কালু এবার কথা কইল। অনেকক্ষণ নীরব হয়ে ছিল বলে বলার আগে সে একবার কেশে নিল, তারপর নিষ্প্রভ চোখে চেয়ে বললে :

—আগে কুলসুমেরে কিছু খাইবার দেও। অর্ ভুক লাগছে না বুঝি?

ঠিক বলেছে কালু, কুলসুমের নিশ্চয় খুব ক্ষিধে পেয়েছে। নদী পাড়ি দিতে সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়বে, রাঙাধারের ঢালায় সূর্য অস্ত যাবে, আর গাঁয়ে পৌঁছতে-পৌঁছতে সেই রাত—

অতক্ষণ কি কুলসুম অনাহারে থাকতে পারবে?

কালু নেবে গেল নিচে তাদের নৌকায়, খানিক পরে আবার উঠে এল সামান্য চিঁড়া ও গুড় নিয়ে।

ঘুম হতে কুলসুম যেন জেগে উঠল, কালুর কথায় তার হাতের পানে চেয়ে বললে :

—তোমরাই খাও গো।

—কস্ কী? আমরা খামু ক্যান্? দ্যাখ্, কাল রাইত থিকা তুই নিরংবু উপাস। নে, খা।

—মোর ভুক নাই।

মজনু এবার নরম গলায় বললে :

—তর্ পাও ধরি রে রাজকইন্যা, দুইডা মুখে দে।

কুলসুমের চোখে যেন বিরক্তির ছায়া, স্বপ্ন দেখার ব্যাঘাত ঘটেছে বলেই সে-বিরক্তি। তবু এবার মজনুর হাত হতে চারটে চিঁড়া নিয়ে মুখটা ওদিকে আড়াল করে আলগোছে তা মুখে দিয়ে হাত ঝেড়ে ফেলল।

মজনু উঠে পড়ল। তারপর মাচার সামান্য জিনিসপত্র গোছাতে আরম্ভ করলে। দুটো হাঁড়ি, একটি কাঁথা, হুঁকো, কুলসুমের ঘাস-রঙা কিছু ছেঁড়া ময়লা শাড়িটা, আর এটা ওটা। কালু নৌকায় নেবে গেল। সেটা এধারে এনে বাঁধতে হবে যাতে ছমিরের দেহটা নাবাতে সহজ হয়। তাছাড়া ডিঙিটাও নৌকার পাশে বেঁধে নিতে হবে। কিন্তু ওধারে মেঘটা বাড়ছে ক্রমশ। ঝড় হবে নাকি? চোখ ছোট করে কপালে হাত দিয়ে রোদ ঢেকে সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলে মেঘের ঘন কালো রং। ওধারের জলটা এরই মধ্যে আঁধার হয়ে উঠেছে, আর দিগন্তরেখা যেন মুছে গেছে। আবার উঠে এল কালু, হাতে তার থেলো হুঁকো।

—হুক্কাটা আনলা যে? উবু হয়ে বসে মজনু কী যেন করছিল, একবার মুখ তুলে প্রশ্ন করলে। বেড়া ঘেঁষে বসে কেমনতর দৃষ্টিতে কুলসুমের দেহের পানে তাকিয়ে কল্কে সাজাতে শুরু করে কালু বললে :

—ওদিকে একবার চোখ তুইলা চাও। ঝড় আসতাছে।

দূর হতে অস্পষ্ট শোঁ-শোঁ আওয়াজ আসছে। দিগন্তে কোন দৈত্য যেন সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে, তারই দ্রুত ও ঘন শ্বসনের শব্দ আসছে ভেসে। সেখানে নদীতে ঢেউ জেগেছে, মাঝিরা গুটিয়েছে পাল, আর এধারের স্বচ্ছ নীল-রোদ-ঝলসানো আকাশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে ক্রমশ।

—ঝড় তো আসলই দেখি। মজনু হতাশ হয়ে বললে।

এসে গেল ঝড়। যে-হাওয়া কুলসুমের চোখের মতো স্তব্ধ হয়ে ছিল, সে-হাওয়াই হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠল আর নিচে নৌকার পেছনটা ঘুরে গেল শাঁ করে।

কালুর কল্কেয় আগুন ধরেছে, বেড়াতে ঠেস দিয়ে সে নীরবে হুঁকা টানছে। ধুঁয়োর সাথে তার চোখও যেন ধূমাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, এবং বসার ভঙ্গিতে আর নির্বাক নিশ্চলতায় কেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা। কতক্ষণ ওপারের ঝাপসা-হয়ে-ওঠা রেখার মতো তীরের পানে তাকিয়ে থেকে মজনু গামছা আবার মাথায় জড়িয়ে মুখে একটা বিকৃত শব্দ করে হঠাৎ রেগে বলে উঠল :

—শালার মেঘ।

তারপর বৃষ্টি নাবল প্রচুর। বর্ষণের চোটে মাচা যেন ভেঙে পড়বে। তার চারপাশে উন্মত্ত হাওয়ার শব্দ হচ্ছে খুব, থেকে-থেকে এক-একবার দুলে উঠছে সমস্ত মাচাটা। ওপর থেকে একটু পরে জল পড়তে আরম্ভ করল—কিছুটা কোণের দিকটায় আর কিছু কুলসুমের পিঠে। তাই লক্ষ করে মজনু বলে উঠল :

—একটু সইরা আয় রে কুলসুম, পানি পড়ে।

কুলসুমের স্বপ্ন দেখা সাঙ্গ হয় নি এখনো; সেইজন্যে আর বর্ষণের শব্দের জন্যে মজনুর

কথা তার কানে পৌঁছল না। তাই মজনু ওর একটা হাত ধরে তাকে এদিকে আকর্ষণ করলে, এবং হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে কুলসুম তাকাল তার পানে, তারপর আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু ওধারে সরে বসল, হাতের চুড়িতে উঠল মৃদু ঝংকার। কালু একবার কাশল, একটু ঝুঁকে নিচে থুতু ফেলে আবার কাশল, এবার উঁচু গলায়। তারপর বিশ্রীকণ্ঠে বললে,

—টান্‌বা নাকি, অ মজনু মিঞা?

হাত বাড়িয়ে হুঁকো নিতে গিয়ে মজনু দেখলে যে কালু আড়চোখে তাকিয়ে রয়েছে কুলসুমের পানে। অমন ঘোলাটে ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে কেন তার দৃষ্টি, আর ঠোঁটের পাশে যে কৌতূহলের রেখা জেগেছে, সে কিসের কৌতূহল? কালু যেখানে বসে রয়েছে সেখানে কিছু আঁধার, কিন্তু তা যেন আঁধার নয়, কী একটা অপবিত্র ছায়া।

মাথা নত করে মজনু ঘন-ঘন হুঁকায় টান দিচ্ছে, এমন সময় কুলসুম হঠাৎ মুখ তুলে তার পানে চেয়ে শুধাল :

—মইরা মানুষ কই যায়, কইবার পার মজনু ভাই?

—ওই আকাশে যায়। চোখ উল্টে ওপরের পানে ইঙ্গিত করে উত্তর দিলে মজনু।

—জান্‌ডা নিবার কালে আজরাইল কি জবর কষ্ট দেয়?

—দেয়। একটু থেমে ওর চোখের পানে চেয়ে মজনু আবার বললে, কিন্তুক তরে দিব না।

হাওয়া কমে এসেছে, বর্ষণের প্রাবল্য-ও কমল কিছু। এবং সে-নম্র বর্ষণের আওয়াজের মধ্যে কেমন এক কণ্ঠে কালু হঠাৎ হেসে উঠল, কিছুটা টেনে-টেনে আর কর্কশ সুরে। হাসি থামলে আড়চোখে কুলসুমের পানে চেয়ে সে বললে :

—তর যা রূপ, আজরাইলে পর্যন্ত দেইখা পাগল হইব রে। হগ্‌গলেই তর লাইগা পাগল। আম্‌গো মজনু মিঞা—

থেমে গিয়ে তেমনি কণ্ঠে আবার সে হাসতে লাগল। তার যেন নেশা পেয়েছে, ছোট ঘোলাটে চোখে ঘোর লেগেছে।

কেউ কিছু আর বললে না, শুধু মুখ ফিরিয়ে কুলসুম একবার কালুর পানে তাকাল : তার শান্ত স্তব্ধ ডাগর চোখে কিছুটা বিস্ময়ের ছায়া। মজনু মুখ তুলল না, নীরবে ধুঁয়ো ছাড়তে থাকল। তবু থেকে-থেকে গলায় বিকৃত আওয়াজ করে কালু হেসে উঠতে লাগল, আর বারে-বারে কুলসুমের পানে তাকাতে-তাকাতে একবার জিহ্বা দিয়ে ঠোঁটটা চেটে নিল। শেষে একসময়ে বললে :

—তরে—বুঝলি—তরে মজনু এইবার বিয়া করব। সেই আশাতেই তো সে আছিল এ্যাদ্দিন—

—কী বক্‌বক্ শুরু করছস তুই কালু? এবার চাপা ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জে উঠল মজনু, তারপর হুঁকাটা নাবিয়ে কুল্‌সুমের পানে একবার চেয়ে সে আবার বললে : ভালো হইব না কিন্তুক কইয়া দিলাম—

কালু আর কথা কইল না বটে, তবে নাকে শব্দ করে খিকখিক শব্দ করে পরম পুলকে হাসতে লাগল, এবং তাইতে তার নোংরা কদর্য দাঁতগুলো আরো বিশ্রী দেখাল।

কমে আসা হাওয়া আবার প্রবল হয়ে উঠল হঠাৎ, মেঘ ডেকে উঠল কবার, তারপর জোর বৃষ্টি নাবল। কালুর কথায় আর হাসিতে মাচার মধ্যে যে-বিসদৃশ অস্বচ্ছন্দ হাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে মজনুর সুগঠিত কঠিন দেহ যেন সংকুচিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কুলসুমের স্বপ্নাবিষ্ট স্থির চোখে এখনো কোনো ভাবান্তর ঘটে নি। একটু পরে মাথাটা ঈষৎ হেলিয়ে সে মজনুর পানে তাকাল, তাকিয়ে বললে :

—তোম্‌গো দুইজন রে খোদা আমার কাছে পাঠাইছে, নইলে আইবা ক্যান?

হাওয়ায় যেন হঠাৎ মেঘ উড়ে গেল : কিসের ভারে মজনুর মনটা যে ভারি হয়েছিল এতক্ষণ, সে-ভার যেন সরে গেল, মাথা সোজা করে সে সোজা হয়ে বসল, চোখ স্বচ্ছ হয়ে

এল সারল্যে। কুলসুমের পানে সে শুধু তাকালই, কোনো কথা এল না মুখে : সে যে তাকাতে পেরেছে এটাই তার কাছে বড় বলে মনে হল, সে যে দেখল কুলসুমের চোখে কৃতজ্ঞতার নম্রতা—এতেই সে মুগ্ধ হল। তার মুখ ঝলমল করে উঠল, ঠোঁটের প্রান্তে ফুটল হাসি, তবু হাসি চেপে মুখটাকে বিকৃত করে আকাশের পানে তাকাল, তারপর তিক্তগলায় বললে :

—শালার মেঘ! শালা কমু না তো কমু কী?

—ক্যান, শালীও তো কইবার পার, মুচকে হেসে কালু বললে, শালীর মাথার চুলে ভারি তুফান লাগছে গো।

কিছুক্ষণ পর কী হল, সোজা দৃষ্টিতে না তাকিয়ে মজনু আড়চোখে তাকাল কুলসুমের পানে, তারপর বুকের কোনো এক নিভৃত অংশ একটু কেঁপে উঠল, চোখে সরলতার স্থানে আবছা কুয়াশা জমে উঠল যেন, আর তাইতে জড়িয়ে এল দৃষ্টি : সে শুধু তাকালই, চোখের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে কুলসুমের মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল না। সে জোর করে, চোখ নত করলে তবু তার অজ্ঞাতে আবার কখন তাকিয়ে ফেললে তার পানে। কিন্তু তাকালে চোখের প্রান্ত দিয়ে, মুখ তুলবার সাহস নেই। কী সে দেখলে কে জানে, তবে তার ভেতরটা একটু-একটু জ্বালা করে উঠল, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হল। তারপর অন্তরে এক রঙের ছোঁয়া লাগল, একটা শিহরন বয়ে গেল সারা দেহে, কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টি হঠাৎ স্বচ্ছ হয়ে এল, এবং স্পষ্ট হয়ে ওঠা কুলসুমের মুখ কেমন বিচিত্রভাবে আকর্ষণীয় ঠেকল বলে অব্যক্ত উত্তেজনার ঢেউ জাগল অন্তরে—যার কোমল আঘাতে আগের সে-জ্বালা আর কম্পন ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কালুর পানে তাকিয়ে সে অতি নির্ভয়ে এবং অকারণে চোখ টিপে মুচকে হাসল।

বাইরে ঝরঝর করে অবিশ্রান্ত যে-বর্ষণ হচ্ছে, তারই অবিরাম একটানা সুর এই জনহীন স্থানে বিচিত্র শোনাচ্ছে কানে : এ যেন কোনো অভিমানী সুন্দরীর সজলকণ্ঠের কোমল গান নির্মক্ষিক নির্জনতায় কে যেন মনের কামনার বল্গা ছেড়ে কার অপেক্ষায় নাচছে নূপুরের বিলম্বিত ঝংকার তুলে, আর দেহের ঘর্ষণে তার শাড়ি খসখস করছে।

বেড়া হতে কালু সরে এল কুলসুমের কাছে। এবং মজনুর মন নূপুরের ঝংকারে মত্ত বলে তার এ-সরে-আসাটা খারাপ ঠেকল না, বরঞ্চ ওর-ও অদম্য বাসনা হল কালুর মতো সরে গিয়ে কুলসুমের অনাবৃত বাহুটা চেয়ে-চেয়ে দেখতে।

কিন্তু কুলসুম তার স্তব্ধ স্বপ্নাবিষ্ট চোখদুটি মজনুর মুখের ওপর ন্যস্ত করে অতি আশ্চর্য প্রশান্ততায় তাকাল, তাকিয়ে একটু নড়ল-চড়ল বলে চুড়ি বাজল মৃদু ঠুনঠুন আওয়াজ করে। তারপর নিঃশব্দতা। নতুন প্রশ্ন নিয়ে মজনু তাকাল কালুর পানে। কালু গলায় কেমন আওয়াজ করে উঠল।

—কী হইল তোমাগো?

কোনো উত্তর নেই। এবং এ-নিরুত্তর নীরবতার মধ্যে কুলসুমের চোখে হঠাৎ বন্যার মতো এল জাগতিক চাঞ্চল্য, তারপর ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল তার দৃষ্টি।

—তোমরা এমন কইরা চাও ক্যান? না, না, মোর ভয় করে—

কোনো উত্তর নেই, ওরা শুধু নীরবে চোখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু কুলসুমের চোখে এখনো উদ্‌ভ্রান্তি, অদ্ভুত আশঙ্কা। তারপর কী হল, কুলসুম হঠাৎ ভয়চকিত কণ্ঠে আচমকা কেঁদে উঠে ঝুঁকে সরে এসে মজনুর পা ছুঁতে লাগল ঘন-ঘন।

কখন বৃষ্টি হঠাৎ ধরে গেছে। ধানের শিষ কাঁপিয়ে নদীতে ঢেউ তুলে জোর শীতল হাওয়া বইতে শুরু করেছে—যে-মেঘগুলো এখনো জমাট হয়ে রয়েছে সেগুলো নিয়ে যাবে ঝেঁটিয়ে, আর এধারে আবার ঝলমল করে উঠবে সূর্যালোক।

মজনু নেবে গেল নিচে, কালুও উঠে পড়ল। দুজনার মুখই কাঠের মতো নিস্পন্দ।

মৃত্যু-যাত্রা

অন্ধকার নিবিড় হলেও তবু আবছা-আবছা নজরে পড়ে ঘাটে বাঁধা ছইশূন্য ভারি খেয়া নৌকাটা। ভাঙা পাড়টা খাড়া ও উঁচু, শুধু এক জায়গায় পথটা নেবে গেছে ঢালু হয়ে, এবং তার প্রান্ত থেকে জোড়া লাগানো দুটো শক্ত কাঠ নৌকার গলুইর কাছাকাছি নদীর জলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এধারে তীরে, বুড়ো বটগাছের তলে গুটি চারেক ছনের ছোট-ছোট ঘর। তিনটিতে এখন ঝাঁপ দেয়া; শেষটির দুপাশে দেয়াল নেই। একটি ময়রার দোকান, একটি হোটেল, এবং তৃতীয়টিতে থাকে খেয়ার মালিক শুকুল কাহার। খোলা ঘরটাতে মাঝিরা ঘুমোচ্ছে। অন্ধকারে সেখানে দৃষ্টি চলে না, শুধু রাতের স্তব্ধতায় সে-অন্ধকার থেকে নাকডাকার ভারি একটানা আওয়াজ ভেসে আসছে এদিকে—যেখানে একদল মেয়ে-পুরুষ জড়োসড়ো হয়ে বসে রয়েছে নিশ্চলভাবে। তারা ঘাটে এসে পৌঁছেছে ঘণ্টাখানেক আগে। খেয়া এখন বন্ধ, ভোর না হলে তাদের পার হবার উপায় নেই। বসে থেকে-থেকে কারো চোখ ভরে উঠেছে ঘুমে, কারো চোখ অবসাদে বোজা, আর যাদের চোখ খোলা—রাতের অন্ধকারে তাদের সে-চোখের পানে তাকালে মনে হবে, মৃত্যু যেন তাকিয়ে রয়েছে কালো জীবনের পানে।

উবু-হাঁটুতে মুখ গুঁজে তিনু হয়তো ঘুমিয়ে ছিল—ওদের মধ্যে কার কচি ছেলে একটা, হঠাৎ কঁকিয়ে কেঁদে উঠল বলে সে চমকে জেগে প্রথমে ভাবল, বুঝি পাখি ডাকল—প্রভাত হল, কিন্তু পর-মুহূর্তে চারপাশের অন্ধকারের দিকে চেয়ে মনটা তার কালো হয়ে উঠল, এবং সে-কালো মনের কাছে আকাশের নিবিড় স্তব্ধতার মধ্যে শিশুর এ-কান্না বিস্ময়কর, বিচিত্র লাগল তার।

শিশুর কান্না থামল। আবার নিস্তব্ধতা, এবং এ-নিস্তব্ধতার মধ্যে নদীর ছলছল আওয়াজ মুখর হয়ে উঠতে তিনু ভালো করে চোখ মেলে তাকাল বাঁধা নৌকাটার দিকে। কিন্তু নিরাশা সেখানে থম্‌কে আছে। ওপারের দিকে সে তাকাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সেখানেও পথশূন্য নিরাশার কালো ঘন বিস্তৃতি। অবশেষে তিনু তাকাল মাঝিদের খোলা ঘরের পানে। সেখান থেকে এখনো নাকডাকার আওয়াজ ভেসে আসছে—তেমনি ভারি ও একটানা। নিরাশা সেখানে যেন আরো দুর্বোধ্য ভাষায় কথা কইছে। নৌকার দিকে আবার তাকিয়ে তিনুর হঠাৎ মনে হল, ঘাটের কিনারে দেহ ছেড়ে এসে নৌকার প্রাণ ঘুমোচ্ছে ওই ঘরে—ওই অন্ধকারে।

পাশে বসে করিম। তিনুর সাড়া পেয়ে মুখ তুলে সে একবার গলা সাফ করলে, তারপর আকাশের পানে চেয়ে তারা লক্ষ্য করে রাত ঠাহর করবার চেষ্টা করে নিশ্চিত গলায় বললে,—কল্‌মন পরীর চুলে কাঁপন লেগেছে গো—রাত পোয়ায়ে এল বলি।

তিনু কিছু বললে না। হঠাৎ কী হয়েছে তার—নদীর অপর তীর দেখবার জন্যে তার মনটা আকুল হয়ে উঠেছে। তার আশঙ্কা হচ্ছে—মহাসাগরের তীরে যেন বসে রয়েছে। পথ ভুল করে কি তারা সীমাহীন মহাসাগরের তীরে এসে বসেছে মরণের পারে যাবে বলে?

—কত বড় নদী গো? এক সময় তিনু আস্তে-আস্তে জিজ্ঞেস করল।

করিম হয়তো তন্দ্রায় ঝিমিয়ে পড়েছিল, চমকে উঠে এমনভাবে কথা কইলে—যেন সে জেগেই ছিল,

—তা ওপারে বড় গাঁ, চাল পাওয়া যাবি নেশ্চয়—

তিনু নীরব হয়ে রইল।

হঠাৎ কে যেন গোঙিয়ে উঠল। কিছু দূরে মতি নাপিতের বউ কমলি বাঁকা হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। বয়স তার অল্প, আর দেহটা রুগ্‌ণ। ক-দিন হল মতি উধাও হয়ে গেছে গাঁ থেকে, এবং তার খোঁজে সে এদের সঙ্গ নিয়েছে। তা ছাড়া গাঁয়ে যে-রকম বীভৎস আকাল

লেগেছে, সেখানে থাকলে মৃত্যু নিশ্চিত। কমলির রুগ্ণ দেহ এ-ধাক্কায় আরো নেতিয়ে পড়েছে, এবং ঘুমটা একটু পাতলা হয়ে এলে অমনি করে সে গোঙাতে থাকে। বিশ্রী সে-গোঙানোর আওয়াজ, তার বুকে যেন নোংরা কুৎসিত যত জীব বাসা বেঁধেছে—থেকে-থেকে আর্তনাদ করে ওঠে।

রাত্রি এত নিস্পন্দ যে, সে-গোঙানির আওয়াজে তিনুর মনটা শিরশির করে কাঁটা দিয়ে উঠল, কিন্তু মনটাকে সে জমাট করে ভাবল, নদী শিরশির করছে—তীর ঘেঁষে নদী শিরশির করে বয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণে আরেকটা কথা জাগল তার মনে, কিন্তু অত সন্তর্পণে কেন? যেন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নদী পালিয়ে যাচ্ছে—তাদের ব্যর্থতার শুষ্কতীরে রেখে পালিয়ে যাচ্ছে। আর যাচ্ছে সেই দেশে—যে-দেশে নদী চওড়া হয়ে দু-তীরের মাঠভরা দিগন্তবিস্তৃত ফলন্ত ফসল ছোঁয়-ছোঁয় করে নিবিড় আহলাদে। নদীর ওপর নীল আকাশ আর সোনালি সূর্য ঝক্‌ঝক্ করে, তার টলমল জলে নানা রঙের পাল উড়িয়ে বড়-বড় ধানের নৌকা ভাসে, আর পশ্চিমা মাঝিরা ঝিমোয়—শুধু ঝিমোয় পরম সুখে। তা ছাড়া হালের মাথায় ডোরাকাটা নিশান পত্‌পত্ করে, আর মাঝিদের দেহাতি গান ঢেউয়ের মাথায় ভাঙে, ভাঙতে-ভাঙতে ভেসে চলে দূরে...

কিন্তু এখানে অন্ধকার, মরা নদীর খোলস, আর স্তব্ধতা। অবশেষে হাঁপিয়ে উঠে তিনু শুধাল—

—ঘুমোয় পড়লি?

সশব্দে করিম জেগে উঠল। তারপর ওপারের পানে চেয়ে কিছু দেখল কি না কে জানে, কিন্তু খুশিতে উছলে উঠে বললে,

—কলমন পরী এবার গা মোড়ামুড়ি দিতে নেগেছে গো—

আবার চুপচাপ। একটু পরে কান খাড়া করে কী যেন শুনে তিনু বললে,

—নাও যায় নাকি উতি দিয়ে?

—নাও-ই বটে। একটু থেমে করিম আবার বললে, বিনেবাতিতে কেমন ভূতের মতোন চলেছে—

—তেল কুতি যে বাতি দিবে?

শুধু যে তাদের গাঁয়ে নয়, সর্বত্র আকাল ও অনটন লেগেছে—এ-কথা খেয়াল হয় না।

একটু পরে ঘরগুলোর পাশে হঠাৎ পাতা-মাড়ানো পায়ের আওয়াজ জাগল, এবং কয়েক মুহূর্ত পর একটা অস্পষ্টপ্রায় দীর্ঘকায় দেহ আড়াল থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এসে এদের মধ্যে চুপ করে নিঃশব্দে বসে পড়ল। তিনু তাকাল সেদিকে, হাঁকল 'কে' বলে, কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। তবু সে আন্দাজ করলে, আসগর বোধহয়।

—আসগর যেন কুতি গিয়েছিল—

—রেখে দেও তার কথা! তাচ্ছিল্যভরে অথচ ফিসফিসিয়ে বললে করিম।

তবু তার কথা সহজে রেখে দেয়া যায় না, কারণ বিচিত্র ছেলে এই আসগর। চেহারা তার রুক্ষ এবং স্বভাবটাও রুক্ষ। সর্বক্ষণ চোখ দুটো জ্বলে ধক্‌ধক্ করে এবং এমন একটা অমঙ্গল তার সে-চাহনিতে যে, মানুষের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। ঝাঁকড়া চুল নেড়ে জ্বলন্ত চোখ ঘুরিয়ে সে বলে যে, খোদাদ্রোহী ইবলিশ শয়তানের চেলা সে, তাই খোদার চেলারা সব তার আজন্ম শত্রু। মানুষের বন্ধুত্বে প্রীতিতে সে যেন মরে যায়, জীবন্ত হয়ে ওঠে শুধুমাত্র হিংস্র শত্রুতায়।

একটু থেমে করিম আবার বললে,

—ওর নাম নিলি পরে দশবার তওবা কাটতি হয়—মৌলবী সাহেব কয়েছেন।

কিন্তু এ-দুর্ভিক্ষের নির্মম ঝড়ে তার সে-জ্বলন্ত দৃষ্টি কেমন দুর্বলভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, শাণিত শত্রুতা ভাঙা-তলোয়ারের মতো পঙ্গু হয়ে উঠেছে। তাই এখন তার সান্নিধ্যে ভেতরটা তেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে না। হয়তো খোদার গজব নাজেল হয়েছে তার ওপর এবং

এবার সে ধ্বংস হবে, নিশ্চিহ্ন হবে, খোদার দুনিয়ায় লোকেরা আবার শান্তিতে বাঁচবে।

—শালার ব্যাটা এবার কুত্তার মতো লেজ গুটোয়েছে—আবার বললে করিম।

কিন্তু গতকাল সন্ধ্যায় লাল পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে সে হিংস্রভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিল, বলেছিল যে, তাদের খোদাও নাকি শয়তান, তবে নকল শয়তান। আর শয়তানের সঙ্গে নাকি কখনো শয়তানি চলে না। শুনে করিমের কিন্তু ভয় করেছিল : তার সে কী কথা, আর সে কী বিদ্যুৎ ঝল্‌কানো উদ্ধত হাসি। আশ্চর্য কিন্তু, খোদার সৃষ্টির সঙ্গে মিশে থাকে শয়তান, যাতে শয়তানকে ধ্বংস করতে গেলে খোদার সৃষ্টিও ধ্বংস হয়। ওর জন্যে কি ওরাও ধ্বংস হবে, নিশ্চিহ্ন হবে? তাহলে বাঁচবে কারা খোদার দুনিয়ায়?

এরপর অনেকক্ষণ নীরবতা জমাট হয়ে থাকল বলে তিনুর মনে হালকা কুয়াশার মতো—দূর থেকে শোনা কথার মতো তন্দ্রা নাবল, আর সে-তন্দ্রার মধ্যে ময়নার নিটোল হাসির কথা তার মনে জাগতে লাগল। ময়নার সে-হাসি যেন সাবলীল স্রোত, এবং তিনুর মন মাছরাঙা হয়ে থেকে-থেকে তাতে ডুব দিচ্ছে। ময়না প্রথমে জানতে পারে নি। কিন্তু যখন টের পেল, তখন সে রাগ করল বলে সে-স্রোত হঠাৎ জমাট বেঁধে মেঘ হয়ে গেল—কী থম্‌থমে কালো রং তার। তিনুর অন্তর শুকিয়ে গেল ভয়ে, ভাঙা গলায় সে বলতে লাগল, রাগ করেছিস ময়না? কিন্তুক মোর যে বড্ড ক্ষিদে নেগেছে, কদ্দিন মুই পেট ভরি খাতি পাই না ....

তারপর তিনু কাঁদল, স্বপ্নে কাঁদল। তাতে ময়নার রাগ পড়ল কি? হয়তো। চোখ মুছে সে তাকিয়ে দেখল যে, মেঘ কেটেছে, ওধারে আলো। ওধারে, আকাশে আলো—অতি ক্ষীণ হালকা দূর পথের আলো।

প্রভাত হল।

মৃত্যু-যাত্রা শুরু হয়েছে। তাদের সে-যাত্রা আশায় দোলায়িত, অথচ নিরাশায় জর্জরিত। চলার পথ ধূলিধূসর, নিষ্ঠুরতায় রুক্ষ, আর যেন অন্তহীন; প্রতিটি মুহূর্ত বেরিয়ে আসছে অজানার কালো গহ্বর হতে, এবং বেরিয়ে আসছে একঘেয়ে বৈরিতায়। তবু নিঃশব্দ পথগুলো নীরবে চলছে ধ্বংসের পানে।

এ-মৃত্যু-যাত্রায়ও বাধা রয়েছে। তিনুদের দলে হাজুর বাপ ও মা নামে দুটি অতি বুড়ো-বুড়ি সঙ্গ নিয়েছিল। সেদিন দুপুরের দিকে বুড়িটা কেমন-কেমন করতে লাগল বলে ওরা থামল, থেমে প্রান্তরের শেষে একটি বিস্তৃতশাখা পল্লবঘন বৃহৎ বৃক্ষের তলে বসলে। বুড়িকে শোয়ানো হল, আর বুড়ো গিয়ে বসলে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে, বসে চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে রইল। তারপর শুরু হল অপেক্ষা, নির্বাক অপেক্ষা।

ওদের মধ্যে ধীরে-ধীরে অধৈর্য যখন চাপা অস্থিরতায় প্রকাশ পেতে লাগল—এমন সময় একটা কান্নার রোল উঠল মেয়েদের মধ্যে। বুড়ি মরল অবশেষে। মেয়েরা কাঁদল, আর পুরুষরা কিছু খাঁটি কিছু ভান-করা দুঃখে নীরব হয়ে রইল। তারপর এক-সময়ে তিনুরা আস্তে উঠে পড়ে কাছাকাছি একটা জায়গা খুঁজে নিলে। কিন্তু খুঁড়বে কী দিয়ে?

—দা দিয়ে হবি না? হালুর মা তার ঝুলি থেকে একটা দা বের করলে।

হবে হয়তো : মাটিটা ঝুরো।

হাত ভরে মুঠো-মুঠো যখন কোপানো মাটি তুলে ফেলছে, তখন করিম একবার আড়চোখে তাকাল তিনুর পানে। হাত ভরা মাটি—হাত ভরা ভাতের মতো মাটি, অথচ ভাত নয়। তিনু একবার মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলে করিমের পানে, দেখলে তার চোখে লালাঝরা লোলুপতা, দেখে হয়তো আহত হয়ে চোখ সরিয়ে আবার কোপাতে লাগল।

করিম লজ্জা পেল, তাই ঈষৎ দুর্বল গলায় হঠাৎ শুধাল :

—কী জায়গায় গো ওই গাঁ?

—সোনাভাঙ্গা বোধায়।

—মতিগঞ্জ কি খুব দূর হবি?

তিনু একটু ভাবল, ভেবে বললে, তা এখন রওনা দিলি পরে সন্দের পর পৌছন যেত—

একটি মুশকিল হল! ওপরটার মাটিটা ঝুরো, কিন্তু ভেতরে শক্ত, ভাগ্যের মতো কঠিন।

—কী হবি তালে।

তিনু কোনো উত্তর না দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। করিমের বুকের পাঁজরের পানে একবার চেয়ে, আরেকবার ধু-ধু করা প্রান্তরের পানে চেয়ে সে ভাবল, কিন্তু উপায় খুঁজে পেল না। অবশেষে গাছের তলে বুড়োর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে ডাকলে,

—অ হাজুর বাপ্। শুনতিছ গো—হেই!

বুড়ো চোখ মেলে তাকাল একবার, কিন্তু গলা দিয়ে কোনো সাড়া এল না। এখনো তার দেহে প্রাণ-কম্পন রয়েছে বটে, তবে তার মনের মৃত্যু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

শেষে একজন বললে গাঁয়ে যেতে, গিয়ে কারো কাছে চেয়ে একটি কোদাল নিয়ে আসতে।

—তা দিলি তো কোদাল?

কিন্তু দেবে-ই না বা কেন। প্রত্যেকের-তো মৃত্যু আছে—ধনী-দরিদ্র কেউ-তো একে এড়াতে পারবে না। ঠিক কথা। তিনু ও করিম যাবে গ্রামে। বাকি লোকদের যাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকা অর্ধমৃত লোকদের মধ্যে অনেকেই যাবার জন্যে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল : একটা তীব্র আশায় তাদের চোখ চক্‌চক্ করে উঠেছে।—তোরা যাবি কী কত্তি? তিনু ঝংকার দিয়ে উঠল। কোনো উত্তর এল না। যে-জন্যে তারা যাবার জন্যে উন্মুখ, তা মুখ ফুটে বলবার মতো নয়। একটু ইতস্তত করে অভুক্ত লকলকে দেহগুলো আবার হেলে পড়ে মিশে গেল মাটিতে।

প্রান্তরে রোদ ঝরছে। ধুলো আর ধুলো। কখনো হঠাৎ দমকা হাওয়া বয়ে এসে নাক জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আর ধুলোয় আঁধার করে তুলছে সব। তারপর একটা প্রগাঢ় নীরবতা। এবং, অনেকক্ষণ পর এ-জমাট নীরবতার মধ্যে কালু গোয়ালার দশ বছরের মেয়েটা হঠাৎ—হঠাৎ এই স্তব্ধ প্রান্তরের প্রান্তে কেমন করে কেঁদে উঠল। আশ্চর্য। ফুসফুস যেন হাপর, আর কান্না যেন হাপরে-বাজনা।

কাঁদিস কেনে লা, কাঁদিস কেনে? তার মা খনখন করে উঠল, চোখ দুটো জ্বলছে হিংস্রভাবে। অন্যকে কাঁদতে দেখ্‌লে হিংসে হয়, বুকটা জ্বলে ওঠে। কান্না হল অন্তরজ্বালার উপশম, পরের এ-আরামটুকুও সয় না যেন।

দলছাড়া হয়ে একটু দূরে আনুটা হাঁটুতে মুখ গুঁজে নীরবে বসে রয়েছে। তাকে দেখে বোঝবার উপায় নেই যে, ও কি ঘুমিয়ে না জেগে। সে জেগেই রয়েছে বৈকি, তবে তার সে-জাগ্রতচেতনা একটু বিচিত্র ধরনের। মেয়েরা যে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ছে থেকে-থেকে—তা-ও তার কানে যাচ্ছে, অথচ কেমন একটা ধুমোল স্বপ্নে তার মনের ভেতরটা সমাচ্ছন্ন। কখনো হয়তো সে-মনে কথা নেই, শধু মেঘের মতো কালো-কালো ছায়া ঘুরে-ঘুরে ফিরছে, আবার কখনো শুধুমাত্র একটা ডাক বা কথা বা ছবি ঘনায়মান সে-ছায়া কাটিয়ে জেগে উঠছে বারে-বারে। গত কয়েক মুহূর্ত ধরে একটা অত্যুজ্জ্বল অথচ কোমল দুপুর সমস্ত ছায়া অপসারিত করে ভেসে-ভেসে উঠছে কেবল। সারা আকাশ মেঘশূন্য সূর্যালোকে প্রদীপ্ত, স্বচ্ছ-নির্মল নীলিমায় উজ্জ্বল। আর সে-আকাশ বেয়ে প্রখর রোদ ঝরছে অবিরাম, অথচ কোনো তাপ নেই তাতে। কী একটা যেন ঝিকমিক করছে, কী ওটা? একটা সজনে গাছ। এবং তার তলে সে-ই শুয়ে রয়েছে দেহ এলিয়ে। ভরা পেট, তাছাড়া মৃদু-মৃদু হাওয়া; ছায়ায় শুয়ে জাবর-কাটতে-থাকা গরুটার চোখে যেমন আরামসিক্ত ঘুম আসছে, তার চোখ ভরে-ও আসছে তেমনি ঘুম। তারপর কে যেন আসছে। হ্যাঁ, লকলকে সাঁকো বেয়ে কে একটি মেয়ে এদিক পানে আসছে—সারা পিঠময় তার ছড়ানো ভেজা চুল ঝিকমিক করছে প্রখর সূর্যালোকে। এবং পেট ভরে

প্রচুর—প্রচুর খেয়ে এসেছে কিনা, তাই ঝলমল করছে তার সারা দেহ....

কিন্তু ওধারে হালুর মা জোরে-জোরে কথা কইতে শুরু করেছে। বলতে-বলতে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল। প্রথমে আনু কিছু বুঝলে না। কাঁদবার কী আছে : সজনে গাছের ছায়া, মৃদু-মৃদু হাওয়া, আর ওই মেয়েটি—কিন্তু আহা, হালুর মা যে হালুকে হারিয়েছে আজ মোটে চার দিন হল। হঠাৎ কী হল, ভেদবমি হয়ে মারা গেল সে—অমন বড়সড় ছেলে। তা এধারে হালু মারা গেল, ওধারে রব্বি মিঞার বউ ও দুটো ছেলে মারা গেল পরপর, তাছাড়া সারা গাঁয়ে আরো কত লোক—কে রাখে তার হিসাব। আনুর হিসাবের বুদ্ধি নেই। যার পেটে যত ভাত তার পেটে তত হিসাবের বুদ্ধি .....

একটু পরে আনু আবার সজাগ হয়ে উঠল। কারা যেন খেই-খেই করছে। কিছু না। কালু গোয়ালার বউ ও হালুর মায়ের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে।

—পেত্নী বললি?

—বলব না? পেত্নীর মতো কাঁদ্‌তি লেগিছো, বলব না পেত্নী?

ভালো হবি না, ভালো হবি না—

কিন্তু কালুর বউয়ের গলা বড় খনখনে, হালুর মায়ের কান্নায় ভেজা নরম গলা ডুবিয়ে তার সে-গলা যেন খাঁই-খাঁই করছে। তবে হালুর মায়ের দেহে শক্তি বেশি, তাই তখুনি লেগে গেল হাতাহাতি, চুল-টানাটানি, এবং তা দেখে নিস্তেজ অর্ধমৃত লোকদের মধ্যে চাঞ্চল্য এল, তাদের স্রোতোহীন রক্ত উঠল টগবগিয়ে।

আনুর ছায়াময় মন কিন্তু হঠাৎ কাঁটা-কাঁটা হয়ে উঠল। মুখ তুলে সে আস্তে একবার ধু-ধু-করা প্রান্তরের পানে তাকাল। সেখানে দেখবার কিছু নেই, শুধু বহুদূরে একটা ঘূর্ণি উঠেছে দীর্ঘ হয়ে। হাওয়া যেন ধরণীর বুকে কী খুঁজে-খুঁজে ব্যর্থ হয়ে হঠাৎ ঊর্ধ্বে উঠে উন্মত্ত হয়ে বলছে : নেই নেই, কিছু নেই গো কোথাও।

কালো মনে সে হাঁটুতে আবার মাথা গুঁজল।

কিন্তু তিনুদের এত দেরি হচ্ছে কেন? এবার আনুর মনে একটা সন্দেহ পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠতে লাগল। যে-গাঁয়ে তিনুরা গেছে সে-গাঁয়ে কি এমন দুয়েকটা ঘর নেই যাদের কাছে একান্তভাবে চাইলে চারটে ভাত মিলবে না?

একটু পরে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল তোতা। বললে—যত সব কুত্তা। আমাদিগ কেলা দেখায়ে খুব মারতিছে শালারা—

তাহলে সন্দেহটা শুধু একা আনুর মনেই পেঁচিয়ে ওঠে নি। তোতার কথায় এবার সবার মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল—বিষাক্ত গুঞ্জন। আনু মুখ গুঁজেই পড়ে থাকল, কোনো কথা কইল না। কইবার-ও নেই কিছু, অন্তরময় যে-একটা আলোড়ন হচ্ছে তা ভাষাতীত, এবং তার চোখ বেয়ে যে হঠাৎ অশ্রু ঝরতে শুরু করেছে, সে-অশ্রুসিক্ত মুখটিও কাউকে দেখানো যায় না।

অবশেষে দেখা গেল, দূরে বাঁশঝাড় ও তেঁতুলগাছের আড়াল হতে তিনটে মূর্তি বেরিয়ে এল—কড়া রোদে ঝলকাচ্ছে তাদের দেহ। কালুর বউ এবার হঠাৎ কেমন একটা বিকৃত ফুল্লতায় নোংরা দাঁত বের করে অদ্ভুত হাসি হেসে উঠল। মেয়ের গা ঠেলে শুধাল,

–তেঁতুল খাবি লা?

আসল কথা, একটা আশা হঠাৎ ঝিলিক মেরে উঠেছে তার মনে। শুধু তার মনে কেন, চাপা স্তব্ধতা থেকে বোঝা যাচ্ছে এদের সবার মনেই একটা জোরালো আশা অন্ধ সাপের মতো কিলবিল করে উঠেছে। তবু সব চুপ। কথাটা এত স্পষ্ট যে ঘোষণা নিরর্থক। অথবা, হয়তো সবুরে মেওয়া ফলবে।

ওরা এল, শ্রান্ত দেহ তাদের খড়ের মতো হয়ে উঠেছে। কিন্তু হাতে তাদের কিছুই নেই। এতগুলো কনীনিকা চোখের কোণ দিয়ে ঠিকরে-ঠিকরে ব্যর্থই হল : না, কিছুই আনে নি তারা। আবার একটা গুঞ্জন উঠল ওদের মাঝে, এ তাকায় ওর পানে, ও এর পানে। তোতা

প্রথমে অস্পষ্টভাবে কী যেন বিড়বিড় করে বললে, তারপর হঠাৎ মুখটাকে ভয়াবহ করে তুলে ক্যানেস্তারার জোর আওয়াজের মতো ঝনঝন করে উঠল,

—শালা সব বেইমান, সব বেইমান!

তিনুর মুখ রোদে ও ঘামে এমনিতে কালো দেখাচ্ছে, সে-কালো মুখ আরো কালো হয়ে উঠল। ব্যাপারটা সে বুঝলে না কিছুই। মাটি খুঁড়বার অস্ত্র আনতে গেছিল তারা, কিন্তু তাদের যাওয়া যে এদের মনে অন্য একটা আশা সৃষ্টি করেছে—তা কী করে সে বুঝবে? তাই সে গর্জে উঠল,

—কেনে মোরা বেইমান?

কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত স্তব্ধতা। কেউ কোনো উত্তর দিলে না। মনের দীনতা কে-ই বা প্রকাশ করতে চায়? কিন্তু তিনু ছাড়বে কেন, উত্তর না পেয়ে লাফিয়ে এসে তোতার ঘাড় ধরে ফেটে পড়ে জিজ্ঞেস করল,

—বল্, বল্ কেনে বেইমান মোরা?

উত্তরে এবার তোতা-ও হয়তো মনের দীনতা ঢাকবার জন্যেই লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনুর ওপর, এবং তাইতে লেগে গেল ভয়ঙ্কর হাতাহাতি। প্রথমে সবাই অতি আগ্রহে উপভোগ করলে এ-দৃশ্য, কিন্তু তোতার নাক বেয়ে যখন ম্লান রক্ত ঝরতে শুরু করল, তখন কেউ-কেউ এগিয়ে এল, এসে অতিকষ্টে ছাড়িয়ে দিল তাদের। অবস্থাটা যখন কিছু শান্ত হয়েছে তখন কার যেন দৃষ্টি পড়ল বুড়ির বীভৎস মুখের ওপর।

—কোদাল পেলা না?

তিনু তখনো ফুঁসছে, তাই কোনো উত্তর দিল না। শুধু নিরীহ করিম নত মাথায় ক্ষীণগলায় বললে,

—কুতি পাব? কেউ দিলি না—বলে সে ব্যগ্র হয়ে হাঁটুর ধুলো ঝাড়তে লাগল।

—তো কী হবি?

—কী আবার হবি, মাথা হবি, মুণ্ডু হবি। তিনু এবার গর্জে উঠল। এবং হয়তো তার সে-জ্বলন্ত ক্রোধকে চাপা দেবার জন্যেই করিম উঠে গিয়ে বুড়ির ছিন্ন ময়লা আঁচল দিয়ে তার বীভৎস মুখটা ঢাকা দিয়ে এল। তারপর কে যেন রসিকতা-ও করলে,

—সবুর কর্, বুড়োটা মরলি পরে দুটোকে এক সাথ গোর দেয়া যাবি—

গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে এখনো বুড়ো তেমনিভাবে চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে রয়েছে।

ক্রমে-ক্রমে একটি অধৈর্যের চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়তে লাগল সবার মধ্যে। একটি মাত্র মৃতদেহের জন্যে তাদের এই আগ্রহাতিশয্যময় যাত্রা ঠেকে থাকছে, অথচ এদিকে শূন্য পেট করাত-কাটা হচ্ছে। মন তাদের ছুটছে গঞ্জে-গঞ্জে, না-দেখা শহরের আনাচে-কানাচে, কল্পিত খাদ্যে রসালো হয়ে উঠেছে জিহ্বা। বেঁচে থেকে-ও ঝুনো বুড়ি তাদের পদে-পদে জ্বালিয়েছে, মরে-ও যেন মুক্তি দিচ্ছে না।

হঠাৎ হাঁটু থেকে মুখ তুলে উজ্জ্বল-আলোয় সংকুচিত চোখে আনু বুড়ির ঢাকা-দেয়া মুখের পানে তাকাল, তাকিয়ে কেমন একটা আকস্মিক ভয়ে শীতল হয়ে উঠল তার ভেতরটা। সে-আবৃত মুখে কী যেন একটা ভীষণ সংকল্প। যেহেতু মহাবুভুক্ষা নিয়ে সে মরেছে, সে-জন্যেই কি সে তাদের খেতে দেবে না, তাদের-ও কি মরতে হবে তেমনি করালভীষণতায়? ভয়ে ভেতরে কুঁকড়ে গিয়ে সে ত্রস্তদৃষ্টিতে তাকাল বুড়োর পানে। সেখানে-ও সে-ই একই কথা। তার নিশ্চল-নিথর দেহে দৃঢ় কঠিন সংকল্প, সেখানে সমবেদনার কোনো কম্পন নেই। এবার আনু হঠাৎ কী যেন চাইতে লাগল, সারা অন্তর দিয়ে মনের ঘন অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে-হাতড়ে কী যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল। সে কি মায়ের বুক খুঁজছে? ছেলেবেলায় ভয় পেয়ে যেমন আকুলভাবে মায়ের বুক খুঁজত—আজ এতদিন পরে তেমনিভাবে সে কি খুঁজছে মায়ের বুক? কিন্তু ওধারে উলঙ্গ প্রান্তর ধু-ধু করছে খররোদে, আর এধারে এদের মনে

বিষ, বৈরিতা। জীবন কি জীবন্ত-কবর, জীবন কি এতই ভয়াবহ?

অসহ্য হয়ে উঠছে ক্রমশ। ওদের দেহের মন এখন সমাজের কথা ভুলেছে, অথচ মনের দেহ এখনো সমাজের শৃঙ্খলে বন্দি। মহাবুভুক্ষার অভিযানের পথে সামান্য তুচ্ছ মৃতকের বাধা কাটিয়ে যাবার সাহস তাদের নেই। এবং এ-ভীরুতায় তারা যে-মাহাত্ম্য প্রকাশ করছে, তা অতি আশ্চর্য ও বিস্ময়কর।

তবু সবকিছুরই একটা সীমা রয়েছে। তোতা এবার বসা-গলায় বললে,

—থাক্ বুড়ি, থাক্ বুড়ি পড়ি এখানটিতি, মোরা চল যাই—

কেউ কোনো সাড়া দিলে না।

এমন সময় দেখা গেল দূরে বাঁশঝাড় ও তেঁতুলগাছের আড়াল হতে কারা যেন হঠাৎ বেরিয়ে এল—কাঁধে তাদের খাটের মতো কী। এবং আশ্চর্য, তারা এদিক পানেই আসতে লাগল। অবশেষে তারা এদের কাছে এসে বললে যে, গাঁ থেকে খবর পেয়ে ওরা কাফন ও মুর্দার খাট নিয়ে এসেছে, মুর্দাকে গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে দাফন করবে। তারা ক-জন উৎসাহী দরদী যুবক, মানুষের এ-দুঃসময়ে পরের সেবা করে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু ওদের কাছে নেই কিছু। কাফন ও মুর্দার খাট ছাড়া কিছুই তারা আনে নি। তা, মৃতের সেবার-ও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এরা কি জানে কারা জীবিতের সেবা করছে, কোথায় গেলে পাওয়া যাবে তাদের?

—জানাজা হবি না? তিনু আস্তে শুধাল।

ওদের মধ্যে কে একজন হাসল। কাফনে—যা আসলে একটা ছেঁড়া অথচ ধোয়া কাপড়—বুড়ির দেহ জড়াতে-জড়াতে বললে যে, না, জানাজা হবে না, খোদা মাপ করে দেবেন সব। একটু থেমে সে এবার একটা বিস্ময়কর কথা বললে। বললে যে, এরা শহীদ : যারা দুর্ভিক্ষের সাথে সংগ্রাম করে প্রাণ দিচ্ছে তারা শহীদ গো, শহীদ।

তিনুরা তাদের সাথে আবার চললে গাঁয়ের দিকে। এবার পুরুষদের মধ্যে দু-একজন ছাড়া সবাই গেল : তাদের প্রাণে আশা আবার জ্বলতে শুরু করেছে ধিকিধিকি। এদিকে মেয়েরা পা ছড়িয়ে বসল, আর শুষ্ক মরাগলায় বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে লাগল মরাকান্না।

তাদের কান্নার আওয়াজে হাওয়া—ঘুমন্ত হাওয়া হঠাৎ জেগে উঠল কি? হয়তো। কোত্থেকে হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে ধুলো উড়িয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল প্রান্তরময়। ঐ কথাই কি সে-হাওয়া বললে, নেই, নেই নেই?

ওরা ফিরে আসতে-আসতে প্রায় সন্ধে—দিগন্তরেখার কাছাকাছি তখন রক্তাক্ত নীরব সূর্য। তারা এসে পৌঁছুতে মেয়েদের মধ্যে আরেকবার কান্নাটা উঠল : দুঃখ ছাড়িয়ে তাদের মধ্যে এখনো সামাজিক রীতি অটুট। কিন্তু কান্না থামতে দেরি হল না, এবং থামতে-ই এবার একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল তাদের মধ্যে। অভিযানের পথে বাধা তাহলে সত্যি-সত্যি কাটল।

যাত্রার আয়োজনে সবাই সতেজ ও শতমুখ হয়ে উঠেছে—এমন সময় তিনু হঠাৎ গলা ঝেড়ে বললে,

—কুতি যাবা আজ? সন্দি নাগে-নাগে, গঞ্জে পৌঁছুতি অনেক রাত হয়ি যাবে। তার চাইতি চল মোরা গাঁয়ে যাই। এক চৌধুরী সায়েবের কথা শোনলাম, পায়ে ধরি পড়লি পরে দুটি খাতি দেবেন না কি?

গাছের তলাটা আবার তীব্র কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল। কে একজন দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল বুড়োর কাছে, এসে অস্থির গলায় বললে,

—হেই গো হাজুর বাপ, ওটো ওটো—

তারপর অনেকেই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল,

—অ হাজুর বাপ!

—উটবা না গো হাজুর বাপ, যাবা না গো খাতি?

ওদের মধ্যে আশাটা এরই মধ্যে এত দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে তা নির্ভুল সত্যে পরিণত হয়ে গেছে। গাঁয়ের চৌধুরী সাহেবের বাড়ি থেকে যেন দাওয়াত এসেছে।

—কই গো বাপু, নাহ্। বুড়িটা তো জ্বালায়ে-জ্বালায়ে অবশিষি মরে বাঁচালে মোদিগ, কিন্তুক বুড়োটা হাড়ে-মাসে জ্বালাবি—

করিম একটু ঝুঁকল। কী হয়েছে?

বুড়োর ধড়ে প্রাণ নেই।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতা। তারপর সবাই অসহ্য বিরক্তিতে একসাথে কথা কয়ে উঠল : এত অপেক্ষার পর সদ্যমুক্তিলাভেই আবার নতুন বাধার সৃষ্টিতে ওরা এবার যেন ক্ষেপে উঠেছে।

—থাক পড়ি বুড়োর লাশ—। রেগে তোতা বললে। কিন্তু হালুর মা বললে,

—আহা, মোরা তো গাঁয়েই যাচ্ছি—ওই যে কারা সেবা করতি এসেছিল, তাদিগ খবর দেয়া যাবিনি খন।

এ-প্রস্তাবে কেউ কোনো আপত্তি তুলল না। এবং কলরব চরমে তুলে ওরা চলল গাঁয়ের পানে।

তারপর সন্ধ্যা হল, হাওয়া থামল, ক্রমে-ক্রমে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল। এবং প্রান্তরের ধারে বৃহৎ বৃক্ষের তলে তার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বুড়োর মৃতদেহ বসে রইল অনন্ত তমিস্রার দার্শনিকের মতো।

খুনী

চর আলেকজান্দ্রার সোনাভাঙা গ্রামের ঘাটে এখনো নৌকার ভিড়। কত নৌকা আসছে, যাচ্ছে : বালাম, সাম্পান, কিছু সোরঙ্গ-ও। চালের মরসুম এখনো সরগরম। অথচ এদিকে চৈত্রের শেষাশেষি। গাঁয়ের পশ্চিমে নারকেল-বন পেরিয়ে দিগন্ত বিস্তৃত খোলা প্রান্তরের ধারে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যাবে : উদ্দাম হাওয়ায় সে-প্রান্তরময় ধুলো উড়ছে। পেছনে নারকেল-বনে অশান্ত মর্মরধ্বনি, আর সামনের জনশূন্য প্রান্তরে কেবল ধুলো উড়ছে আর উড়ছে, কখনো ঘূর্ণি হয়ে উর্ধ্বে উঠে, কখনো আকাশের বুক থেকে তির্যক গতিতে নিচে নেবে আসে, আবার কখনো মাটি ছুঁয়ে তীরবেগে দূরান্তে মিলিয়ে গিয়ে। আর, যে-পথটা গ্রাম থেকে বেরিয়ে কিছু এঁকেবেঁকে সোজা পশ্চিমে চলে গেছে, সে-পথ স্থানে-স্থানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সে-ধুলোর মধ্যে : যেন শূন্যে মিলিয়ে গেছে উদ্দাম হাওয়ার তীব্র মায়ায়।

এমনি এক সময়ে এক ভরা দিনে রোদ খরখর করছে, তার মধ্যে ফজু মিঞাদের বাড়ির ও মৌলবীদের বাড়ির দু ছেলের মধ্যে কী একটা সামান্য বিষয় নিয়ে হঠাৎ খুনোখুনি হয়ে গেল; ফজু মিঞাদের ছেলের প্রাণ গেল, আর মৌলবীদের ছেলে তারপর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, সোনাভাঙা গ্রামের কেউ আর তার কোনো সন্ধান পেল না। চর অঞ্চলে খুনোখুনি লেগে-ই থাকে, তাই চরবাসীদের জন্যে এটা এমন নতুন কিছু নয়। এবং মাস কাটতেই তারা প্রায় ভুলে গেল সে-কথা।

উত্তরবঙ্গের কোনো এক মহকুমা-শহর। আবেদ মিঞার দর্জির দোকানটা ফৌজদারি আদালতের পাশে এক বিরাট পঞ্চবটি গাছের তলে। ওধারে ট্রেজারি। কাঁটাতারের বেড়ার দু কোণে উজ্জ্বল আলো; সে-আলোর খানিকটা এসে পড়ে তার দোকানের সামনে। কেউ-বা

কখনো ভুল করে, বা পথ সংক্ষিপ্ত করবার জন্যে ট্রেজারির সামনে দিয়ে যেতে-ই পাহারাদার তীক্ষ্ণ ও কর্কশ গলায় হেঁকে ওঠে, তাছাড়া এ-স্থান ভরে প্রগাঢ় অবিচ্ছেদ্য নীরবতা। সারাটা দিন ভরে এ-স্থান জনতার কোলাহলে তীব্রভাবে মুখর হয়ে থাকে বলে সন্ধ্যার পর এ-নির্জনতার নীরবতা অত্যন্ত জমাট মনে হয়, আর পাথরের মতো ভারি ঠেকে যেন। এবং পঞ্চবটির তলে ঘাসশূন্য পরিষ্কার স্থানে থেকে-থেকে যে-শুকনো ঝরা পাতা দমকা হাওয়ায় মর্মরিয়ে ওঠে, সে-মর্মরকে মনে হয় দিনের কোলাহলের আবছা, অস্পষ্ট স্মৃতির মতো।

আবেদ দর্জি বৃদ্ধ। তার সেলাইয়ের কলটিও ঝুনো, চলতে গিয়ে সেটা আওয়াজ করে বেশি, আর কেমন থরথরিয়ে কাঁপে। অনেকক্ষণ তার ওপর হাত রেখে কাজ করলে হাতে ঝিঁঝি ধরে যায়, মনে হয় সেখানে-ও কল চলছে।

সে-কলটা এখন নীরব। নাকে চশমা দিয়ে ওপরে টাঙানো লণ্ঠনের আলোয় আবেদ রিফু করছে। সহকারী দর্জি দু-জন সন্ধ্যার পরেই বাড়ি চলে গেছে। এক সময়ে হাতের কাজ নাবিয়ে সে বিড়ি ধরাল, তারপর চশমার ফাঁক দিয়ে ওধারে তাকিয়ে দেখলে যে সিধু ময়রার দোকান এখনো খোলা, আর তার পাশে টিউবওয়েলে পানি তোলার ঘসঘস আওয়াজ হচ্ছে। সে চোখ নাবালে। তারপর দমকা হাওয়ায় হঠাৎ সামনের পাতা মর্মরিয়ে উঠল শুনে আবার সে চোখ তুলল, তুলে সামনের পানে তাকাল। ট্রেজারির আলো : শুকনো পাতা নড়ছে : আর ওদিকে কিছু-ভাঙা টুলটা। কিন্তু সে-টুলে কে যেন বসে রয়েছে না?

কয়েক মুহূর্ত চেয়ে-চেয়ে দেখল আবেদ, তারপর শুধাল,

—কেডা বাহে?

কোনো উত্তর এল না। ওদিকে চেয়ে লোকটি মূর্তির মতো নিশ্চল।

আবেদ আবার ডাকলে, এবারো কোনো সাড়া এল না। এবং তাই একটা অদম্য কৌতূহল জাগল দর্জির মনে। সে দ্রুতভঙ্গিতে উঠে পড়ল, উঠে হুক থেকে লণ্ঠনটা নাবিয়ে খড়ম পায়ে দিলে, তারপর টুলটির কাছে গিয়ে লোকটার মুখের সামনে আলো তুলে ধরল। দেখল, অপরিচিত এক লোক, বয়স বেশি নয়। তার চুল উস্কখুস্ক, পরনের জামা ময়লা ও ছেঁড়া; দেহে প্রাণহীনতার স্তব্ধতা, আর চোখে শূন্যতার বীভৎসতা।

—কেডা তুমি?

লোকটি এবার চোখ ফিরিয়ে তাকাল তার পানে, কিন্তু তার চোখের সে-বীভৎসতা চোখে ঠেকাল বলে দর্জি চোখ সরিয়ে নিল, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে দৃঢ় গলায় বললে,

—তুমি কেমন কাগো, কথা কও না ক্যা?

অল্পক্ষণ লোকটি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল দর্জির পানে, এবং দেখলে এক বৃদ্ধ যার মুখে সাদা দাড়ি, মাথায় আধা ময়লা কিস্তি টুপি, আর মুখের নিচের চামড়া ঝুলে পড়েছে। এবং হাতে তার লণ্ঠন, পেছনে অন্ধকার। যেন অন্ধকার থেকে বৃদ্ধ হঠাৎ উঠে এসেছে, এবং এসেছে নির্ভরশীল নিঃসঙ্গতায়। এধারে কেউ নেই, আর তার ম্লান চোখে কৌতূহল থাকলেও তাতে সন্দেহ নেই, হিংস্রতা-ও নেই। সে কি এমনি অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জনতায় এমনি একটি লোককে-ই খুঁজছিল না, যার কাছে মনের বোঝা নাবিয়ে হালকা হতে পারে, তারপর বাঁচতে পারে মনের সে-দুরারোগ্য ক্ষত থেকে, যে-ক্ষত তাকে দিনের পর দিন অসহ্য যন্ত্রণা দিচ্ছে, আর স্থান হতে স্থানান্তরে কেবল তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে?

হঠাৎ লোকটি উঠে দাঁড়াল। তারপর অস্পষ্টপ্রায় কণ্ঠে দ্রুতভাবে বললে,

—আঁর নাম রাজ্জাক। আঁই আলেকজন্ডর চরের সোনাভাঙা গেরামের মৌলবীর বাড়ির ফোলা। চৈত্ মাসে একদিন দুফর ওক্তে ফজুমিঞা'গর বাড়ির ফইন্যার মাথা ফাডাইলাম, ফাডাই জানের ডরে দেশ ছাড়ি ফলাইলাম। তারপর তুন—এই বলে হঠাৎ সে কী একটা নিদারুণ ভয়ে থেমে গেল, তার চোখ দুর্জয় ভয় ও শংকায় কেমন হয়ে উঠল; তারপর তার দেহ দুর্বল হয়ে উঠে এক সময়ে সে ঝুপ্ করে পড়ে গেল দর্জির পায়ের কাছে।

এখানে মাটি : এখানে ভয় নেই; বরঞ্চ এখানে মিশে গেলে দেহে গলগলিয়ে শান্তি আসবে, এবং সে-দুরারোগ্য ক্ষত ভেসে যাবে তাতে। কিন্তু তবু রাজ্জাক মাথাটাকে টেনে নিয়ে বুড়োর পায়ের ওপর রাখলে, আর দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে তার দু-পা। যাকে সে একবার ক্ষতের কথা বলেছে, তাকে আর ছাড়া যায় না। তারপর তার সারা অন্তর আকুল হয়ে উঠল কাঁদবার জন্যে, কিন্তু আশ্চর্য, কান্না এল না। সারা অন্তরে ঝড় উঠল কান্নার, কিন্তু চোখে অশ্রু ছুটল না, সে-চোখ শুষ্কই রইল : এবং সে-শুষ্কতা থেকে তার দেহ ক্রমে-ক্রমে কাঠের মতো হয়ে উঠল। তারপর কাঠ-হয়ে-ওঠা শক্ত দেহ হতে মন হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, শূন্যতায় ভেসে গেল শূন্য হয়ে, যে-শূন্যতায় কোনো কথা নেই। শূন্যতার শেষে সে দেখলে সোনাভাঙা, যে-সোনাভাঙায় আর কোনো শংকা নেই; তার ঘাটে বালাম ও সাম্পান নৌকা নিরুপদ্রব শান্তিতে বাঁধা, কেবল নারকেল-বনের পেছনে সে-প্রান্তরে ধুলো উড়ছে। ধনু গাইকে-ও দেখল। গাইয়ের চোখে স্নেহ, এবং স্নেহের শান্তিতে সে বাছুরের গা চাট্‌ছে।

দর্জি স্তম্ভিত। লোকটি শুধু পায়ে মুখ গুঁজে রয় নি, জিহ্বা দিয়ে তার পা-ও চাট্‌ছে। ভীত হয়ে সে তার পা দুটো ছাড়াতে চাইল, কিন্তু লোকটার বাহুবদ্ধ সে-পা ছাড়াতে পারল না। পাশে চেয়ে দেখল যে, সিধু ও তার দোকানের ছোকরা-টা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কেডা—দর্জি মিঞা?

দর্জি সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলে না। কিন্তু তারপর বললে,

—মোর ছেইলা।

সিধু ময়রা প্রথমে বিস্মিত হল, তারপর মনে পড়ল, প্রায় এক যুগ আগে দর্জির বার বছরের এক ছেলে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, এবং তারপর থেকে তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি।

বুড়োর ছেলে এতকাল পরে ফিরেছে—আনন্দের কথা। সে-সম্পর্কে সিধু দুয়েক কথা বলছিল, এমন সময় লোকটি হঠাৎ উঠে বসল, উঠে তীব্র সন্দেহে তাকাল ময়রার পানে, এবং দর্জি লক্ষ করলে যে আবার তার চোখ দুর্জয় শংকায় কেমন হয়ে উঠছে। সিধু তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল, হঠাৎ শুধাল,

—ওর নাম কী মিঞা?

—মোমেন।

রাজ্জাক প্রথমে কিছু বললে না, তারপর এধার-ওধার চেয়ে দেখলে, মনে হল, এখানে রাজ্জাক নামে কেউ নেই।

আবেদ দর্জির বাড়িতে রাজ্জাক আশ্রয় পেল। তবে রাজ্জাক নামে নয়, মোমেন। নামে বাড়ির লোক ছাড়া সবাই প্রথমে জানলে যে এক যুগ আগে পালিয়ে যাওয়া দর্জির ছেলেটি আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু সত্যটা সূর্যালোকের মতো স্বচ্ছ বলে তা মিথ্যায় ঢাকা গেল না, একে-একে সবাই জেনে ফেললে : ছড়ানো কথা সত্য নয়, এ-ছেলে আসলে মোমেন নয়; তবে পরকে ঘরে ডেকে আপন ছেলে বলে প্রচার করার মিথ্যায় লোকে অন্যায় কিছু দেখলে না, বরঞ্চ দর্জির প্রতি শ্রদ্ধায় তাদের অন্তর ভরে গেল।

কিন্তু সে যে খুনী—এ কথা দর্জি তার বিবিকে পর্যন্ত বললে না।

দর্জির বিবি ক-দিন রাজ্জাকের সামনে পর্দা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলে যে, ছেলেটি শান্ত, ধীর ও স্বল্পভাষী স্বভাবের; আর তাছাড়া, ছেলে নয় জেনে-ও যাকে আপন ছেলের নামে ঘরে ডেকে আনা হয়েছে, তার সামনে পর্দা করা চলে না বলে তারপর থেকে তাকে দেখা দিতে লাগল।

রাজ্জাক আবেদ দর্জির কাছে সেলাই শিখতে লাগল। চর আলেকজান্দ্রা ত্যাগ করার পর থেকে যে-ভীতি তার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত করছিল, সে-ভীতি থেকে অনেকটা মুক্তি পেয়ে শীঘ্র

পুষ্ট হয়ে উঠল বটে, কিন্তু তার পূর্বের চরিত্র আর ফিরে এল না : সে যেন আবার নবজীবন লাভ করল, ভিন্ন দেশে এক নতুন পরিবারের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে রইল, কেবল চর আলেকজান্দ্রার স্মৃতি অতি অস্পষ্টভাবে রয়ে গেল মনের দূর প্রান্তে।

এখন চৈত্র মাস।

রাজ্জাক মাথা নিচু করে এক মনে কাজ করছিল। ওধারে কাছারি-প্রাঙ্গণ ভরে লোক; তাদের কোলাহল কখনো মনের অস্পষ্টতায় অস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একসময়ে সে হঠাৎ চোখ তুলে ওধারে তাকাল। আদালতের সামনে নদী; সে-নদীর এক অংশ নজরে পড়ে দোকান থেকে। এধারে উঁচু খাড়া পাড়, কিন্তু ওপারে বিস্তৃত বালুর চর ধু-ধু করে, চিকচিক করে সূর্যালোকে। সে-চরের পানে তাকিয়ে সে দেখলে, সেখানে হাওয়ায় ধুলো উড়ছে, দেখে তার মন হঠাৎ ছুটতে শুরু করলে। যে-মন বহুদিন ধরে স্তব্ধ হয়ে ছিল, অদ্ভুতভাবে স্থবির হয়ে ছিল, সে-মন আজ হঠাৎ আবার দিশেহারা হয়ে ছুটতে লাগল, এবং ছুটতে-ছুটতে এক স্থানে বালির বাঁধে আছড়ে পড়ল : এবং গভীর নীল পানির জন্যে মন তৃষ্ণায় আকুল হয়ে উঠলেও সে-বাঁধের ওধারে যেতে পারল না। শুষ্ক বালুর চরে স্নেহমমতা নেই।

দর্জি আর তার বিবি তাকে ভালোবাসে, কিন্তু সে-ভালোবাসা তার অন্তর স্পর্শ করে নি, যদিও স্তব্ধ-স্থবির মন সে-সম্বন্ধে নিস্পৃহভাবে সজ্ঞান। কিন্তু আজ ওপারে বালুর চরে ধুলো উড়তে দেখে হঠাৎ চর আলেকজান্দ্রার কথা মনে হল, এবং সে আকস্মিকভাবে অনুভব করল যে, দূরে কোথাও স্নেহমমতার জোয়ার বইছে, কিন্তু এখানে কেবল কালো মাটি, যে-কালো মাটির বুকে বাস করছে এক নকল রাজ্জাক এবং বাস করছে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে, আর তার মন আবদ্ধ হয়ে রয়েছে অর্থহীন স্থবিরতায়।

তারপর থেকে অদ্ভুত শূন্যতা তাকে পেয়ে বসল, এবং থেকে-থেকে কালো মাটির দুঃসহ পেষণ অনুভব করতে লাগল। এমন সময়ে হঠাৎ সামান্য এক ঘটনা ঘটল। সামান্য বটে সে-ঘটনা, কিন্তু সে-ঘটনা থেকে তার অন্তরে প্রাণের জোয়ার এল, হঠাৎ মনের সে-শূন্যতা কাটল।

জরিনা বিবির সঙ্গে কখনো তার কথা হয় নি; তাকে ভালো করে কোনোদিন চেয়ে-ও দেখে নি। কেবল জানে যে, সে বিধবা, এবং তার স্বামী ছিল আবেদ দর্জির বড় ছেলে, যে মারা গেছে আজ দু-বছর হল। তাছাড়া, দর্জির বিবি যে তাকে অত্যন্ত স্নেহ করে, সে-কথাও কখনো-কখনো অনুভব করেছে।

সে-দিন দোকানে যাবার আগে বাড়ির ভেতর কুয়োটার ধারে রাজ্জাক জামা কাচছে, এমন সময় দক্ষিণ ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জরিনা তাকে ডাকলে, ডেকে বললে,

—একটা কথা আছে—এখান হয়া যাইয়ো ভাই।

কাপড় কাচা সাঙ্গ করে সে দক্ষিণ ঘরে গেল। ঘরের কোণে বড় জালার মুখে উবু হয়ে জরিনা কী যেন করছিল, সাড়া পেয়ে সরে এসে বিছানা থেকে একটা সাদা কাপড়ের টুকরো তুলে তার হাতে এনে দিলে। বললে,

—ওটা দিয়ে একটা জামা বানায়া দেও।

রাজ্জাক নীরবে কাপড়টি পরীক্ষা করে দেখলে, তারপর বললে,

—মাপ? একটু থেমে আবার বললে, আপনার একটা জামা দেন।

জরিনা হঠাৎ হেসে উঠল চাপা গলায়, এবং হাসির ফাঁকে-ই বললে,

—মাপ ছাড়া জামা হয় না—এই বুঝি খইল্‌ফ্যাগিরি?

কিন্তু তক্ষুনি সে গম্ভীর হয়ে উঠল, তারপর কেমন গলায় শুধাল,

—গোস্বা করল্যা ভাই? কিন্তু আমার যে জামা নেই।

রাজ্জাক একবার চোখ তুলে তাকাল তার পানে। ওর দৃষ্টিটা যেন কেমন। কিন্তু চোখ

নাবিয়ে কাপড়ের টুকরোটা ভাঁজ করে আস্তে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

তৈরি জামা যে-দিন তাকে দিলে, সে-দিন সে জরিনাকে আরো ভালো করে চেয়ে দেখল। দেখল, ওর মুখটা কেমন চপলতায় টলমল, দেখে তার অন্তরে কী যেন টলমল করে উঠল।

হঠাৎ জরিনা শংকিত হয়ে উঠল, রুদ্ধনিশ্বাসে প্রশ্ন করলে,

—এটি বাপজান কি দেখেছে ভাই?

হ্যাঁ, দেখেছে বৈকি। এবং এ-সম্বন্ধে আবেদ দর্জি তাকে প্রশ্নও করেছিল। সে ক্ষীণ গলায় উত্তর দিলে,

—হ্যাঁ

কিন্তু তার বুকের ভেতরটা অনুশোচনায় কেমন করে উঠল।

চৈত্র শেষ হলে গেল, বৈশাখ এল, কালবোশেখি ঝড় শুরু হল। এবং রাজ্জাকের মনে যে-ঝড় শুরু হল, সে-ঝড়ের উদ্দামতা কালবোশেখির চেয়ে কম নয়। কখনো সে তাকিয়ে দেখে, তীব্র হাওয়ায় গাছের পাতা ছিন্ন হয়ে উড়ে গেল, মিলিয়ে গেল কোথায়, দেখে তারও মনে প্রবল বাসনা জাগে—কাকে ঠিক এমনিভাবে ছিন্ন করে নিয়ে আসে নিজের কাছে, তারপর ভেসে পড়ে দু-জনে। চৈত্র মাসে একদিন নদীর ওপারে বালুর চরে ধুলো উড়তে দেখে হঠাৎ তার মনে পড়েছিল চর আলেকজান্দ্রার কথা, এবং তার মন নিষ্করুণ শুষ্কতার মধ্যে জেগে উঠে দিশাহারা হয়ে ছুটতে-ছুটতে বালির বাঁধে আছড়ে পড়েছিল, আর আকুল হয়ে উঠেছিল গভীর নীল পানির তৃষ্ণায়। কিন্তু আজ বালির বাঁধ যেন ভেঙে গেছে সে-নীল পানিরই বন্যায়। সে-নীল পানি বয়ে যাচ্ছে তার অন্তরের ওপর দিয়ে, অথচ এখনো তৃষ্ণা মেটে নি। সে-তৃষ্ণা মেটাতে হবে।

অবশেষে ঠিক করলে, কাউকে দিয়ে দর্জির বিবির কাছে কথা পাড়াতে হবে, যে, সে জরিনাকে বিয়ে করতে চায়। এই তো তার বাড়ি, তার ঘর : তবু এতে তার মন ভরছে না, জীবন পূর্ণাঙ্গ ঠেকছে না।

কিন্তু কথাটি পাড়াবার আগে-ই একটা চিন্তা তাকে ভাবিয়ে তুললে। বারে-বারে সে ভাবলে, তবু মীমাংসায় পৌঁছতে পারলে না। সে খুনী : তার কি বিয়ে করবার অধিকার আছে?

সেদিন দোকানের ঝাঁপ যখন দিলে, তখন বেশ রাত। সহকারী দর্জিরা অন্যপথে বাড়ি চলে গেল; আবেদ ও রাজ্জাক ফিরে চলল নদীর ধার দিয়ে। আগে আবেদ, পেছনে লণ্ঠন হাতে রাজ্জাক। মফস্বল শহর এর মধ্যে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, এবং সে-নিস্তব্ধতার মধ্যে রাজ্জাকের সারা অন্তর একটি বেদনার্ত প্রশ্নে দোলায়িত। আজ সে স্পষ্টভাবে জানতে চাইছে : খোদা তার গুনা কখনো মাপ করবেন কি না। নিজের অন্তরে এ-প্রশ্নের উত্তর যখন মিলল না, তখন একবার ভাবলে বৃদ্ধ দর্জির কাছে জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু দর্জির নীরবতায় এমন কাঠিন্য যে আওয়াজ করতে সাহস হল না।

নদীর পাড়টি খাড়া; বর্ষায় সেটি ভাঙে। একস্থানে নিচে ক-টা নৌকা বাঁধা, এবং তারই একটির মধ্যে থেকে একতারার আওয়াজ ভেসে আসছে। কিছু স্বপ্নের মতো কিছু রহস্যের মতো সে-আওয়াজ ঠেকল রাজ্জাকের কানে, এবং তারই মধ্যে হঠাৎ মনটা দূরে আবছা হয়ে গেল বলে একসময়ে সে কাশল, তারপর আস্তে বললে,

—বাপজান, একটি কথা।

দর্জি কোনো কথা কইল না, কেবল মুখটা একটু ফেরাল।

কিন্তু রাজ্জাক বলে-ও বলতে পারলে না কথাটা। এবং বলতে পারল না এই ভয়ে যে : যদি উত্তর আসে, তার গুনার কখনো মাপ হবে না।

আস্তে সে বললে,

—না, কিছু না বাপজান। খালি মনটা থাকি-থাকি কেমন করে।

আবেদ দর্জি কিছু কইল না।

তারা বাড়ির প্রাঙ্গণে পা দিতেই মনে হল ঘরের মধ্যে একটা গোলমাল যেন চলছে। কে সরু গলায় কাঁদছে, আর কে যেন মোটা গলায় কথা কইছে। দর্জি থমকে দাঁড়িয়ে রাজ্জাকের পানে তাকিয়ে কতক্ষণ শুধু স্তম্ভিত হয়ে রইল, তারপর দ্রুতভাবে ভেতরে প্রবেশ করল। পেছনে-পেছনে রাজ্জাক-ও গেল। ভেতরে গিয়ে দেখলে, বাইরে রোয়াকে একটা কুপি; অল্প দূরে থাম ধরে দাঁড়িয়ে-থাকা জরিনার হাতে একটা লণ্ঠন। আর এদিকে পিঠ দিয়ে মাদুরে বসে একটি অপরিচিত লোক ভারি গলায় কথা কইছে, এবং পাশে বসে দর্জির বিবি কাঁদছে।

একটু পরে বৃদ্ধ দর্জি এক বিস্ময়কর গলায় চেঁচিয়ে উঠল,

—কে?

শুনে দর্জির বিবির গলা একটু চড়ল, আর সে-অপরিচিত লোকটি নির্বাক হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে রইল। একটু দূরে দর্জির ভাইস্তা মকেম যে উবু হয়ে বসে ছিল, সে কেবল অনুচ্চ গলায় বললে,

—মোমেন ভাই গো চাচা।

রাজ্জাক শুনলে। তবে ঐ লোকটা মোমেন, যে-মোমেনের মিথ্যা অভিনয় সে করছে এখানে। এবং এবার তার অভিনয়ের পালা শেষ হল। তারপর অকস্মাৎ রাত্রির কালো আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তার অন্তরময় ঝলকে উঠল তীক্ষ্ণ বেদনা : এবং সে-বেদনা হঠাৎ-ঘটিত সব-শূন্যতার বেদনা। গাইয়ের বাছুর মরলে গাইয়ের দুধের জন্যে সে-মরা বাছুরের খোলে খড় ভরে একটি প্রাণশূন্য মূর্তি তৈরি করা হয় : এবং এ-বাড়িতে যেন সে-খড়-ভরা বাছুরের মতো ছিল সে। এবং এ-জ্ঞান থেকে সে যেন সে-প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেল, যে-প্রশ্ন আজ সারাটি সন্ধ্যা তাকে ভাবিয়েছে। না, খোদা তাকে ক্ষমা করেন নি, এবং এ-জীবনে কখনো করবেন না। নীল পানি সে শুধু কল্পনাই করতে পারবে, বাস্তবে তার সন্ধান পাবে না।

সকলের অলক্ষ্যে সে আস্তে বেরিয়ে এল। ঘুরতে-ঘুরতে নদীর ধারে এসে তার শূন্য তীরে সে শূন্য হয়ে বসে রইল। হঠাৎ মনের প্রান্তরে ধুলো উড়তে শুরু করেছিল, নীল পানির বন্যা বইতে শুরু করেছিল, কিন্তু এখন সেখানে শূন্যতা। তবু একটা মেঘলা দিনের কথা মনে পড়ে। তখন সন্ধ্যা। ঘাট ছেড়ে একটি বালাম নৌকা চলে গেল পুব অভিমুখে : কোথায় সে জানে না। সে-কথা মনে পড়ল, আর শূন্য অন্তর কেঁদে উঠল। কেঁদে উঠল কার জন্যে? কেঁদে উঠল তার-ই জন্যে, যার কথা এক মুহূর্তের জন্যেও মনের কোণে সে স্থান দেয় না, যার কথা স্মরণ হলে-ই তার সারা দেহ মুষড়ে ওঠে ভীত হতাশায়। সেই ফজু মিঞাদের বাড়ির ফইন্যার জন্যে আজ তার অন্তর কাঁদল, এবং আশ্চর্য, রাত্রির অন্ধকারে চোখ দিয়ে অশ্রু ছুটল। অপরাধী সে, কিন্তু অপরাধীর কি অন্তর থাকে না? খোদা তাকে কখনো মাপ করবেন না-এ-কথা সে জেনেছে, তবু ওর জন্যে তার হৃদয় ব্যথায় গুমরে-গুমরে উঠবে না কেন? ফইন্যাকে কি সে ভালোবাসত না? বাসত, কিন্তু মানুষের শরীরে যে ক্রোধের আগুন রয়েছে : সে আগুন একবার দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলে তখন সবকিছুই সম্ভব, প্রিয়তম কারো আস্ত হৃদয় যদি কেউ এনে দেয় তবে সে-হৃদয়ও তখন মানুষ কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলতে পারে। এবং কারো-কারো দেহে সে-ক্রোধের আগুন একটু বেশি মাত্রায় থাকে বৈকি।

শেষে একটি কথা ভেবে শান্তিতে তার কান্না শান্ত হল। যে-লোক খুন হয়, সে বেহেশতে যায়। ফইন্যা বেহেশতে যাবে। খোদা কখনো তাকে ক্ষমা না করুন, কিন্তু ফইন্যার বেহেশত-লাভের কথা তাকে চিরদিন শান্তি দেবে।

সকালবেলায় মোমেনের সঙ্গে রাজ্জাকের দেখা হল। উজ্জ্বল সূর্যালোক, তার মধ্যে চেয়ে দেখলে : সবল ও দীর্ঘ তার দেহ; বড় চোখ বড় চেহারা, আর বাঁকা গোঁফ। গায়ে শৌখিন পোশাক : দেহের ভঙ্গিতে কিছু ঔদ্ধত্য। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে রাজ্জাককে আপাদমস্তক চেয়ে

দেখলে, তারপর বললে,

—তুমি বুঝি মোমেন সেজেছ?

তার প্রথম কথাই ভালো লাগল না, তাই কোনো উত্তর দিলে না। মোমেন আবার প্রশ্ন করল,

—নাম কী?

—রাজ্জাক। বলে থামতেই কী একটি উত্তেজনায় তার ঠোঁট কেঁপে উঠল, কয়েক মুর্হূত চুপ থেকে অদ্ভুত কঠিন গলায় বললে,

—আমার নাম আবদুর রাজ্জাক। আলেকজন্ডর চরের সোনাভাঙা গেরামের ফজুমিঞাদের বাড়ির ফইন্যারে আমি খুন করছি—গত চৈত্ মাসে।

মোমেন কয়েক মুহূর্ত বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকে দ্রুত পায়ে চলে গেল, গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে হইচই বাধিয়ে তুলল চিৎকার করে।

কিন্তু তার আগে-ই রাজ্জাক বাইরে চলে এল—এবং এল চিরদিনের জন্যে। বেরোবার আগে একবার সে দক্ষিণ দিকের ঘরের পানে তাকাল, দেখলে, দরজার কাছে পা মেলে জরিনা কাঁথা সেলাই করতে-করতে হঠাৎ মোমেনের চেঁচামেচি শুনে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার পানে।

রক্ত

সন্ধ্যা থেকে পানের দোকানটার সামনে একটা টুলে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে আবদুল। মনে অদ্ভুত শূন্যতা, এবং সে-শূন্য মনে পাশের হোটেলের কোলাহল অতি বিচিত্র ও রহস্যময় ঠেকছে। কখনো পানওয়ালাটা হঠাৎ ছাড়া-গলায় তীক্ষ্ণস্বরে হেসে উঠলে সে চমকে উঠছে, বিস্তৃত শূন্যতার মধ্য থেকে তার মন বিহ্বল হয়ে বেরিয়ে আসছে, তারপর কী যেন খুঁজে-খুঁজে না পেয়ে আবার শূন্য হয়ে উঠছে।

রাস্তার ওপাশে গুদামের মতো একটা বন্ধ ঘর; তার এধারে গ্যাসপোস্টের তলে ধোঁয়ার মতো রহস্যময় ক্ষীণ আলো। সেদিকেই আবদুলের ভাষাশূন্য চোখ নিবদ্ধ হয়ে ছিল। এবার হঠাৎ তার সে চোখ কেঁপে উঠল—কিছুটা ভয়ে কিছুটা বিস্ময়ে। ওধারের ফুটপাথ দিয়ে একটি কালো ছায়া আবছা অন্ধকারে মিশে নিঃশব্দে গড়িয়ে-গড়িয়ে যাচ্ছে, আর তাকে ঘিরে রয়েছে প্রেতাত্মার মতো বীভৎস সংগোপনতা। শীতল ভয়ে স্তব্ধ হয়ে এল তার দেহ, এবং তাই প্রাণের উষ্ণতার সন্ধানে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল ওধারে, দেখলে উজ্জ্বল আলো, চকচকে আয়না, আর সঙ্গীর সাথে কথা কইতে-কইতে হাসতে থাকা পানওয়ালাকে।

শান্ত হয়ে আবদুল আবার ওধারে তাকাল, তাকিয়ে এবার বুঝলে যে, নুলোটা গেল। ওদিকে কোথাও হয়তো নুলো লোকটার মাথা গুঁজবার আস্তানা রয়েছে, দিনান্তে সেখানেই সে ফিরে গেল। রোজই এমনি সময়ে সে যায় এদিক দিয়ে।

হঠাৎ বিড়ির কড়া গন্ধ নাকে লাগল। মুখ ফিরিয়ে আবদুল চেয়ে দেখলে একটি লোক তার পাশে টুলের ওপর বসে ঝুঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার পানে। ও তাকাতেই সে শুধাল :

—খালাসি?

আবদুল মাথা নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

—চুক্তি মিল্‌তিছে না?

কয়েক মুহূর্ত আবদুল কিছু উত্তর দিলে না, তারপর আস্তে-আস্তে বললে, না। এ কথা

বললে না যে চুক্তি সে এখন পাবে না, খারাপ স্বাস্থ্যের জন্যে তাকে বরখাস্ত করে দিয়েছে। এবং এ-জন্যেই কেমন একটি ব্যর্থতা তার বুকে এসে বিঁধছে, আর সে-ব্যর্থতা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে শূন্যতা। হঠাৎ সামনে যেন পথের সন্ধান মিলছে না, ধূসর মরুর মতো শূন্যতা ধু-ধু করছে।

কিন্তু এবার হঠাৎ মনের সে-শূন্যতা কাটতে লাগল। একটু আগে পঙ্গুকে যেতে দেখছে সামনে দিয়ে, তাই বিশ্বাস জমতে লাগল ধীরে-ধীরে। এবং একটু পরে হাওয়ায় ভেসে শামি কাবাবের গন্ধ নাকে এসে লাগলে সে স্বচ্ছন্দ মনে উঠে পড়ল, তারপর হোটেলে ঢুকে ভিড়ের মধ্যে এক ফাঁকে বসে পড়ে শীঘ্র জীবনের কোলাহল ও প্রাণের স্পন্দনের মধ্যে ডুবে গিয়ে অদূরে তার জীবনের তীর দেখতে পেলে।

খাওয়া শেষ করে আবার বাইরে এল সে, দেখল, তখনো সেই লোকটি তেমনিভাবে টুলের ওপর বসে। আবদুল যখন এখানে বসেছিল, তখন শূন্যতার দীনতা তাকে ঘিরে ছিল বলে লোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার পানে, কিন্তু এখন নীরব উপেক্ষায় সে আত্মকেন্দ্রিক বলে লোকটা তার পানে চেয়ে সন্দিগ্ধ ও দুর্বলভাবে হাসল। উত্তরে আবদুল না-হাসার মতো হাসলে, অথচ তাকে পান খাওয়াল, বিড়ি দিল।

—নাম কী?

—আক্কাস।

মনে পড়ে জাহাজের কাপ্তানের উদ্ধত দৃষ্টি। এবার তাকাতে গিয়ে আবদুল সে-রকম দৃষ্টি অনুভব করলে নিজের চোখের মধ্যে, এবং আক্কাসের চোখে দেখল স্পষ্ট অসহায়তা। তাকে অনুসরণ করতে বলে দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করলে।

সে আস্তানায় গেল না। হোটেল থেকে কিছু দূরে একটি খোলা জায়গার ধারে এসে রাস্তা থেকে নেবে ঘাসের ওপর বসলে, আক্কাসকেও বসতে বললে। ওর দ্রুতগতির রেশ ধরে চলে-চলে আরো দুর্বল হয়ে উঠেছে লোকটা, পাশে সে বসল বটে কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দীর্ঘ সাত বছর বিশাল সমুদ্রের বুকে বাস করেছে আবদুল, এবং জাহাজের ক্ষুদ্র দুনিয়ায় নিবিড়ভাবে অনুভব করেছে সর্বশক্তিমান কাপ্তানের ব্যক্তিত্ব আর শক্তিত্ব, জেনেছে সারেঙ্গ-টেণ্ডলের পদস্থ-ক্ষমতা। এবং জাহাজের ক্ষুদ্র জগতে লস্কর হিসেবে তা অনুভব করেছে ও জেনেছে বলে স্পষ্ট-হয়ে-ওঠা একটি বাসনা অতৃপ্ত রয়ে গেছে। কিন্তু আক্কাসের দুর্বলতায় তার সে-বাসনা যেন রক্তের স্বাদ পেল।

হঠাৎ আবদুল হাসল। বললে :

—আমাদের সেখানে মান্‌ষে নাকি টেকা লুভ্‌তেছে—

সে শুনেছে সাদা মানুষ ও খাকি পোশাকে তাদের দেশ ভরে গেছে, আর অর্থোপার্জনের অসংখ্য পথ খুলে গেছে, এবং মানুষ অজস্র টাকা লুটছে। অন্যের অর্থ লাভের কথায় শাণিত ঈর্ষায় হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে থাকে, কিন্তু দেশে গিয়ে সে-ও টাকা লুটতে পারে বলে অক্ষম আক্কাসের কাছে সহজে সে-কথা শোনাতে পারছে, এবং নির্মল হাসিও হাসতে পারছে। তাছাড়া বঞ্চিতের কাছে সাফল্যের কথা শোনানোতে যে এক লোনা স্বাদ, সে-স্বাদও লাগছে ভালো।

—টেকা পেলেই আমি দেশে চলে যাব—

তার শরীর ভেঙে গেছে বলে তাকে বরখাস্ত করে দিয়েছে বটে, কিন্তু জাহাজী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আগাম মায়না পাবে কিছু। পেতে তা নিয়ে সে দেশে যাবে, গিয়ে—আবদুল একটু থামল। গিয়ে টাকা লুটবে? কিন্তু বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা কথা মনে হল। এ-কথাও সে শুনেছে যে দেশের খামার শূন্য, দেশে মানুষ মরছে, মুহূর্তে-মুহূর্তে কুকুরের মতো মরছে, আর মৃতের স্তূপের ওপর বাকি লোক অর্থের স্তূপ গড়ছে। কিন্তু আবার তার মনে উষ্ণ রক্তের ঝলক এল, তীক্ষ্ণ গলায় হেসে সে যেন নিজেকে নিরপরাধ ঘোষণা করলে :

—গিয়ে আমিও টাকা লুডব আর কী—

আক্কাস নীরব। বিড়ির তৃষ্ণায় তার ভেতরটা খাঁখাঁ করে উঠলেও মুখ ফুটে আবদুলের কাছে বিড়ি চাইতে সাহস হচ্ছে না। কিন্তু আবদুল হঠাৎ কাশতে শুরু করলে তার দৈহিক দুর্বলতার মধ্যে আক্কাসের মুখে কথা এল, আস্তে সে বিড়ি চাইল।

আবদুল তাকে বিড়ি দিলে, নিজেও একটা ধরাল। তারপর অনুভব করলে, মনে উষ্ণতা থাকলেও দেহে কেমন শীত-শীত লাগছে, হঠাৎ একটু দুর্বলতাও ঠেকছে। গ্রীষ্মের শেষ, হয়তো হিম পড়তে শুরু করেছে।

—চা খাবে?

বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে আবদুল উঠে দাঁড়াল।

চায়ের দোকানে আলোয় এবার ওরা পরস্পরের পানে তাকাল। আক্কাসের চোখের দীনতা, আবদুলের চোখে ঈষৎ ক্লান্তির ছায়া থাকলেও আত্মবিশ্বাসের স্থিরতা, কিছু ঔদ্ধত্য। আক্কাস দৃষ্টি সরিয়ে নিলে আস্তে। কিন্তু ওর চোখের দীনতা থেকে নিজের মনে কেমন দৃঢ়তা বোধ হয় বলে আবদুল তার পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। তারপর শুধাল :

—আর কিছু খাবে?

শুনে আক্কাস চোখ তুলে চেয়ে কিছু ইতস্তত করলে, তারপর হঠাৎ ক্ষুধার তীক্ষ্ণতায় তার চোখ ধারালো হয়ে উঠল। সে আস্তে বললে :

—আজ রাতে কিছু খাই নি—

কিছু খাবার দিতে বললে আবদুল। কিন্তু তার ভেতরটা কেমন শক্ত হয়ে উঠল। মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করতে আত্মপ্রসাদ রয়েছে, কিন্তু নিঃস্বর ঘনিষ্ঠতায় অন্তরে কালো ছায়া পড়ে। একটু পরে, হাসিতে সে সহজ হতে চেষ্টা করলে, করে বললে,

—আমি উপাস থাকতে পারি, কিন্তু চা না খেয়ে থাকতে পারি না।

খাবার নিয়ে আসছে। আক্কাসও সহজভাবে হাসতে পারল না।

ও যখন খেতে শুরু করলে তখন তার মুখে কেমন একটা কুৎসিত আওয়াজ হতে লাগল। সে-আওয়াজ ঢাকতে গিয়ে আবার হাসল আবদুল, হেসে বললে :

—শুনেছি, ষোল টেকায় মুরগি বিকা যাচ্ছে আমাদের দেশে। তাজ্জব কথা!

কুকুর হিংস্র স্বার্থপরতায় খেতে-খেতে পাশের বঞ্চিতরাখা কুকুরের ওপর হঠাৎ খেঁকিয়ে না উঠে হেসে উঠল। যেহেতু আবদুল তাকে খাওয়াচ্ছে, সেহেতু খেঁকিয়ে না উঠে হাসলে আক্কাস। আবদুল এবার নীরব হয়ে রইল।

কিন্তু চায়ে চুমুক দিতে-দিতে সে সহজ হয়ে উঠল। একবার আস্তে শুধাল :

—বউ আছে? ছেলেপুলে?

—না।

ছোট সংক্ষিপ্ত উত্তর। আবদুল কি অসন্তুষ্ট হল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সেই ভালো গো—বলে আক্কাস হাসল। আবদুল আড়চোখে তাকাল তার পানে, দেখলে যে তার হাসিতে বিস্ফারিত মুখের মধ্যে চোখ দুটি হাসিশূন্য নিষ্কম্প : অন্তরঙ্গতার তলে বৈরিতা যেন দৃঢ় হয়ে রয়েছে।

আবার তারা পথে নাবল। নেবেই আবদুলের সর্বপ্রথম চোখে পড়ল বাইরের অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। তার মনে ছায়া ঘনিয়েছে, আর বাইরে অন্ধকার কিছু কেটেছে, আকাশে কৃষ্ণপক্ষের ভগ্ন চাঁদ উঠেছে। কিছু পরিবর্তন, আর সে-পরিবর্তন আকাশময় বলে মন ঘনায়মান ছায়া থেকে দূরান্তের অন্য কোনো ছায়ায় উড়ে গেল। দীর্ঘদেহ আক্কাস দীর্ঘ পদক্ষেপে পাশে হাঁটছে, আর অর্থহীন কথা কইছে অনবরত। তবে ডান ধারে যে তাদের মিলিত ছায়া পড়েছে, সে-ছায়ার পানে আড়চোখে চেয়ে আবদুল ভাবতে লাগল অন্য কথা। একটা স্মৃতি যেন পাশে-পাশে ছায়া ফেলে চলতে শুরু করেছে, আর আবদুলের মনের চোখের

দৃষ্টি সেদিকে। চলা থেকে চলার কথা মনে পড়ছে। সাত বছর আগে সে যখন লস্কর হবে বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, তখন তার মা চুল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিয়েছিল—যাতে কোনো বিপদ তাকে স্পর্শ না করতে পারে।

না, কোনো বিপদ তাকে স্পর্শ করে নি, শুধু আজ তার দেহে ব্যাধির ক্লান্তি। কিন্তু তার মা আজ বেঁচে নেই বলে বাঁচার কথা নূতনভাবে মনে জাগল। সে বাঁচবে? কাকে এই প্রশ্ন করবে, কে দেবে এর উত্তর? পাশে তো হাঁটছে আক্কাস, কিন্তু এখন সে নীরব হয়ে রয়েছে বলে পদধ্বনি ছাড়া তার আর অন্য কোনো অস্তিত্ব অনুভূত হচ্ছে না, আর সে পদধ্বনিও বিগত দিনের অস্পষ্ট পদধ্বনির মতো ঠেকছে। তবু ভালো, মানুষের হৃদয়ে স্মৃতি আঁকা থাকে। আর তবু ভালো, সে-স্মৃতির কথায় শীতলতা না এসে বরঞ্চ বেদনায় ভরে গেল মন। কিন্তু এ-বেদনাও কেমন অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে, আর নিঃশব্দ : হয়তো এ-বেদনার প্রতিকার নেই বলে তা কাছে আসছে না, স্পষ্টতায় ধরা দিচ্ছে না, দূর দিগন্তে আবছা হয়ে উড়ছে।

নিঃস্ব শূন্যতায় আবদুলের মন ভরে উঠছে এমন সময় আক্কাসের গলা শোনা গেল।

—ওই যে—ওটা আমার ঘর। আবছা অন্ধকারে ঢাকা বস্তিগুলোর পানে আঙ্গুল দেখিয়ে সে আবার বললে, বিবি নিয়ে থাকি সে-ঘরে। ছেলেপুলে নেই।

হঠাৎ অন্য জগৎ থেকে একটা নতুন কথা কানে এসে লাগল যেন। আবদুল থমকে দাঁড়াল।

—বসবে? একটু থেমে আক্কাস গলা ক্ষীণ করে আবার বললে, ঘর মোটে একটি, তাই ঘরে বসাতি পারব না। একটা দড়ির খাটিয়া আছে, সেইটে বার করে দিচ্ছি—। গরমির রাত, আর জোছনাও উঠেছে—বসবে গো?

আবদুল দেহে ক্লান্তি বোধ করল আবার। তাই রাজি হল, আস্তে বললে, আচ্ছা।

খাটিয়া বের করলে আক্কাস। বসতে গিয়ে আবদুল শুয়েই পড়ল, দেখে আক্কাসের মন আরো সহজ হয়ে উঠল। সেও আস্তে শুয়ে পড়ল পাশে।

—জানো গো দোস্ত, এই খাটিয়া আমাকে পেরাই বার করতি হয়। বিবির সঙ্গে ভাব থাকলি তো ভালো, নইলে এটি নিয়ে এসে আমি এখানেই শুই। তা, বিবির মেজাজ আজকাল চালের বাজার হয়ে উঠেছে, ছোঁয়া যায় না গো। একটু থেমে এবার কেমন পিচ্ছিল পুলকে ফিসফিস করে বললে, বিবির মেজাজ আজকে কিন্তুক বড্ড মিঠে। তা মিছিমিছি কি খাট্টা হয় দোস্ত, খেতে না পেলি পরে—বলে হঠাৎ এমনভাবে থেমে গেল যেন ব্যথা উপচে পড়ল।

আবদুল নীরব হয়েই রইল। তবে তার ভালো লাগল, আর আক্কাসের গায়ের স্পর্শের উষ্ণতা থেকে ধীরে-ধীরে অন্তরঙ্গতা জমতে লাগল। আক্কাস নিঃস্ব নয়, তার সংসার রয়েছে জীবনে।

রাত্রি অনেক হয়েছে। দূরে কোথায় এত রাতেও কী একটা কল চলছে, তার একটানা আওয়াজ ছাড়া চারধারে প্রগাঢ় নীরবতা। এবং এ-নীরবতার মধ্যে আবদুলের সারা অন্তর ভরে এল, ভরে এল রাত্রির মতো। থেকে-থেকে আক্কাস কথা কইছে, তার কিছুটা কানে আসছে, কিছুটা আসছে না, আবার কিছুটা তার মনের বিস্তৃত শান্তিতে ভেসে যাচ্ছে।

—বিবিকে ঠেঙ্গাই বটে, কিন্তুক বল দেখিনি দোস্ত, বুকে কি লাগে না?

আবদুল এবারো নীরব। তবে এবার শান্তির বুক থেকে জেগে উঠে সারা অন্তর বিদ্রোহীর মতো কইতে চাইল, যে, একদিন তার মমতার হৃদয় ক্ষত হয়ে সে-ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরেছিল—রক্ত। কিন্তু এখন—যেন সারা আকাশ বেয়ে স্নেহ ঝরছে, স্নেহ।

অবশেষে আক্কাসও পূর্ণ নীরবতায় ডুবে গেল, এবং তারপর হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া বইল বলে আবদুলের মনে হল সে-হাওয়ায় আক্কাস ভেসে গেল, রইল শুধু বিস্ময়কর নির্বাক চাঁদ।

অনেকক্ষণ পর আক্কাস আবদুলের দেহে কনুই দিয়ে ঈষৎ ঠেলা দিলে, প্রথমে আস্তে, সাড়া না পেয়ে তারপর জোরে।

—কী?

একটা কথা।

—কী কথা?

—আচ্ছা গো দোস্ত, তুমি তো গোটা দুনিয়া ঘুরেছ। বল দেখিনি, কোন্ দেশের মেয়েছেলে সবচেয়ে খোবসুরত?

আবদুল ভাবল। কিন্তু তার অন্তরে ভাষাশূন্যশান্তি সাগরের মতো বিশাল বলে তা অতিক্রম করে বন্দরে-বন্দরে পৌঁছতে মনের সময় লাগল। তারপর অনেক বন্দর সে খুঁজলে, কিন্তু সঠিক উত্তর পেল না। কামনায় অন্ধ হয়ে সে বন্দরে নেবেছে, তখন রূপ নজরে পড়ে নি। অবশেষে কার মুখে শোনা কথা চালিয়ে দিলে :

—মিছরের।

—কেমন দেখতে?

আবার আবদুল ভাবল, কিন্তু এবারো সঠিক উত্তর পেল না। তাই বললে :

—হুরের মতোন।

হুরের রূপ আক্কাসের জানার কথা। তাই না জানা সত্ত্বেও আর কিছু বললে না এ-সম্বন্ধে, কেবল রসগ্রহণের প্রমাণস্বরূপ দাঁতের ফাঁকে একবার আওয়াজ করে নীরব হয়ে গেল। তারপর দুজনেই নির্বাক।

কিন্তু আক্কাসের কথা আবদুলের ভেতরটা হঠাৎ ঝলকিয়ে দিয়ে গেল। প্রথমে তার মনে ধূসরতা ঠেকল, আর তা তীররেখাশূন্য সাগরের বুকে জাহাজীদের মধ্যে শুষ্ক নীরস অথচ কামনাকাতর দিনগুলোর ধূসরতার মতো, তারপর মনে যে-ধোঁয়া লাগল, সে-ধোঁয়ার মধ্যে গাঢ় হয়ে জমতে লাগল উত্তেজনা। পূর্বের কথা মনে পড়ে। জাহাজ পুরুষ : সাগরে নারী নেই। কিন্তু এখানে সাগর নেই : এখানে নারী রয়েছে। আড়চোখে সে একবার আক্কাসের আবছা বন্ধ ঘরের পানে তাকাল। সে-ঘরে অন্ধকারে একটা নারী হয়তো পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে।

—এই, আবদুল ওর গায়ে ঠেলা দিলে। কিন্তু আক্কাস হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। ওই ঘরে তার স্ত্রী রয়েছে, তাই সে ঘুমোতে পারে।

আবদুল তাকে আর ডাকলে না, একাকী বিড়ি ধরাল। কিন্তু তার মনে দুঃস্বপ্নের মতো কথা ঘুরতে লাগল, নিবিড়ভাবে অথচ দ্রুতভাবে, আর ঝাঁঝালো অনুভূতিতে দেহ উষ্ণ হতে উষ্ণতর হতে লাগল।

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আর আবহাওয়া কেমন শীতল হয়ে উঠেছে। আবদুল ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ কাশতে-কাশতে জেগে উঠল। প্রথমে সে কাশির মধ্যে হঠাৎ জোরে কেশে উঠে ধমকটা থামাতে চাইল, কিন্তু তা অদম্য হয়ে উঠল, সে কাশতে থাকল প্রচণ্ডভাবে। কাশতে-কাশতে গলা শুকিয়ে এল, আওয়াজটা কর্কশ ও কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে উঠল, আর কেমন চেতনাশূন্য হয়ে উঠল দেহের ওপরের অংশ। অবশেষে কাশির ধমক যখন থামল তখন দেহভাঙা অপরিসীম ক্লান্তির মধ্যে সে হঠাৎ অনুভব করলে, উষ্ণ তরল পদার্থ গলা বেয়ে মুখে উঠে গালের দু পাশ দিয়ে নীরবে ঝরছে। কী? রক্ত? ক্লান্তির ওপর একটা চরম অসহায়তার শীতলতায় শ্রান্ত বুক জমে গেল। সভয়ে সে চোখ খুললে, দেখলে মুখের ওপর কী একটা অস্পষ্ট আলো উপুড় হয়ে রয়েছে। তারপর বুঝলে, চাঁদ, আকাশের বুকে এখনো নীরবে ভাসছে চাঁদ।

অনেকক্ষণ সে অসাড় হয়ে রইল। বিরাট সৌধ কোথায় যেন গড়ে উঠেছিল, হঠাৎ ধূলিসাৎ হয়ে ব্যর্থ-রক্তে গড়িয়ে পড়ল : এরপর আর কিছু নেই। এমন সময় আক্কাস একটু নড়ল, হয়তো পাশ ফিরতে চায়। আবদুল তাকে ক্ষীণ গলায় ডাকলে।

—কেন গো দোস্ত?

জীবনের প্রাযুর্যে উচ্ছলকণ্ঠের সে-প্রশ্নের উত্তর আবদুল সঙ্গে-সঙ্গে দিতে পারলে না। কয়েক মুহূর্ত পরে অচেনা এক গলায় আস্তে বললে,

খুন, খুন!

প্রথমে আক্কাস কিছু বুঝলে না, তারপর ধড়মড়িয়ে উঠে দেশলাই জ্বালালে, জ্বালিয়ে তার আলোতে দেখলে মানুষের মৃত্যু হয়েছে, শুধু নীরব সাফল্যে চকচক করছে কাঁচা রক্ত। কিন্তু মানুষের চোখে এখনো পাণ্ডুর প্রাণের বীভৎসতা দেখে দ্বিতীয়বার সে ধড়মড়িয়ে উঠল, উঠে হাঁকাহাঁকি করে ঘরের দরজা খোলালে, কুপি জ্বালালে, পানি নিয়ে আবার বাইরে এসে তার মুখ ধুইয়ে দিলে, তারপর তাকে ঘরে নিয়ে গেল ধরাধরি করে।

বহুক্ষণ চেতনাহীনের মতো পড়ে থেকে একসময়ে আবদুল চোখ মেলে তাকাল, দেখলে বিস্মৃতির মতো আবছা অন্ধকার ঘন হয়ে রয়েছে চারধারে, আর ওপরে কী যেন ঝুলছে।

—আমার বিবি। তোমাকে হাওয়া করছে।

একটা ক্ষীণ আওয়াজ এল বহুদূর থেকে। তবু সে সেদিকে তাকাল, তাকিয়ে দেখলে পরিচয়ের পাথরে গড়া একটা মুখ, আর সে-মুখে একজোড়া চোখ তীক্ষ্ণ গতিতে কালের মধ্যে দিয়ে স্নেহের উৎসের সন্ধানে ছুটছে।

আবদুল চোখ বুজলে। কিন্তু কোথায় স্নেহের উৎস? শ্রান্তপায়ে মস্তিষ্কের অলিগলিতে মন হাঁটছে খুঁজতে-খুঁজতে, কোথাও দেখলে, নদী রয়েছে বটে তবে নিষ্করুণ শুষ্কতায় ধু-ধু করছে দিগন্তব্যাপী, কোথাও-বা অনাত্মীয় নিঃসঙ্গতা তীররেখাশূন্য নীল সাগরের মতো বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। আবার কেউ কোথাও মাকে ডাকলে, কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, ওপারে ঘন অন্ধকার নেবেছে, আর এধারে খেয়াঘাটে লোকও নেই নৌকাও নেই। ওধারে একদল লোক ঝুড়ি-ঝুড়ি অর্থ নিয়ে গেল—তাই দিয়ে নাকি তারা সাতমহলা বাড়ি তুলবে। শেষে এক জায়গায় দেখলে একটি মিছরের মেয়ে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে চোখ বুজে হাসছে, অথচ একটা ক্ষ্যাপা কুকুর মানুষের মতো ছুটে আসছে তাকে কামড়াবার জন্যে, এবং দেহের কোন্ অংশে কামড়ায় সে—তা দেখবার জন্যে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে একদল খালাসি ঝুঁকে তাকিয়ে রয়েছে ফেনায়িত ঢেউয়ের পানে। কিন্তু কোথাও বিবিকে দেখতে পেলে না সে।

আবার আবদুল চোখ খুললে, দেখলে তেমনি কী যেন ঝুলছে ওপরে।

—কেমন লাগছে দোস্ত?

—বিবি—তোমার বিবি কই?

কোনো উত্তর এল না। দূরে নীরবতা।

এখানেও তাহলে বিবি নেই। কিন্তু কোথায়? আবার মনের যাত্রা শুরু হল : ক্লান্তিতে ও ব্যর্থতায় ভেঙে-ভেঙে পড়ছে, তবু, চলছে, চলছে। একবার শুনেছে যে সে আছে, তাই এত ক্লান্তিতেও দৃঢ় আশা যে মিলবে, শুধু পরিশ্রম করে আরেকটু পথ চলতে হবে। কিন্তু এবার চলতে গিয়ে দেখলে সারেঙ্গের চোখ রোষায়িত, আর খররোদের তলে ডেক ধুতে-ধুতে তার পিঠ কন-কন করছে ব্যথায়।

আবার চোখ মেলে তাকাল আবদুল, এবার তার চোখে হিংস্র ক্রোধ।

—কই, কই?

—কী দোস্ত?

—বিবি?

সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর এল না। তারপর শোনা গেল :

—দেখতি পাচ্ছ না? ওই যে সে শিয়রেতে বসি হাওয়া দিচ্ছে!

সমস্ত শক্তি দিয়ে এবার আবদুল তাকাল ওপরের ঝুলন্ত ছায়ার পানে, দেখলে, কী একটা কালো মতো ঘোড়ার ক্ষুরের ঢঙে পেঁচিয়ে রয়েছে, আর পাখা নড়ছে। তারপর দেখলে কালো অর্ধবৃত্তের মধ্যে একটা মুখ, চোখ, ঠোঁট। নাক-ও, আর সে-নাকে নাকছাবি।

কিন্তু সেখানে সে বিবিকে পেলে না। না পেয়ে এবার সে মৃতের মতো চোখ বুজলে, আর একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে যেন প্রাণের মতো কেঁপে-কেঁপে বেরিয়ে গেল জীবনের শেষ আশা : শুধু জমাট হতাশায় সে স্তব্ধ হয়ে রইল। কিন্তু তীক্ষ্ণতম ব্যর্থতায় এবার তার হৃদয়ে যে-ক্ষত

হল, সে-ক্ষত দিয়ে ঝরতে লাগল রক্ত, ঝরতে লাগল গলগলিয়ে, এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তর তার চেয়ে আরো অন্ধকার ভবিষ্যৎকে প্রদীপের শেষ-কম্পনের মতো শুধাল : এমন দিন কি কখনো আসবে যখন নিবিড় স্নেহমমতায় ডুবে গিয়ে সে বলতে পারবে যে, বিগত কোনো একদা স্নেহভালোবাসাশূন্য শুষ্ক প্রান্তরে তার নিঃস্ব রিক্ত হৃদয় দিয়ে গলগলিয়ে রক্ত ঝরেছিল, রক্ত?

খণ্ড চাঁদের বক্রতায়

শেখ জব্বারকে ধনী বলতেই হবে। তার দুটি গাড়ি, দুটি ঘোড়া, জন আটেক চাকর, আর চিকে-ঘেরা অন্দরমহলে চারটি বিবি। আয়-ব্যয় যদি ধনীর লক্ষণ হয়ে থাকে, তবে সে-ধারণা যথার্থ : আয়ের দিকে রয়েছে দুটি ঘোড়ার গাড়ি, এবং ব্যয়ের দিকে রয়েছে চার জন বিবি।

যে-পাড়ায় শেখ জব্বারের বাস, সে-পাড়ায় শুধু গাড়োয়ান আর ঘোড়া। ঘোড়ার নাদে পরিপূর্ণ রাস্তাটির ধারে একটি লম্বা আস্তাবল : আস্তাবলের প্রান্তে ক'টা স্যাঁতস্যাঁতে চায়ের দোকান ও হোটেল, তারপর কতগুলো বস্তি। সর্বশেষ বস্তিটি শেখ জব্বারের।

যদিও এখন রাত দুটো, তবু আজ বস্তিতে কারো চোখে ঘুম নেই। সমস্ত বস্তিময় তীব্র উল্লাস চলছে। চারিধারে কোলাহল, বিচিত্র সম্মিলিত জনরব; কেউ-বা ভারি কর্কশ গলায় উর্দু কালোয়াতি টানছে, কোথাও একদল হৈ-হট্টগোল বাধিয়ে নোংরা আলাপ করছে, আবার কোথাও তাসের উনত্রিশের সভা বসেছে। তবে ভিড় জমেছে সবচেয়ে বেশি শেখ জব্বারের বস্তির সামনে। সেখানে একটা চোঙওয়ালা জীর্ণ গ্রামোফোনে দ্রুত ও নাকী চিকন গলায় কোন্ অজ্ঞাত অখ্যাত বাইজীর খ্যাম্‌টা নাচের গান চলছে। রাস্তার ওপর এক-পা-ভাঙা তিন পায়ে দণ্ডায়মান একটি ছোট কেরোসিন কাঠের টেবিলের ওপর গ্রামোফোনটা রাখা হয়েছে; ওপরে বস্তির নিচু ছাদ হতে বেরিয়ে-থাকা কাঠের বিমে একটা ডে-লাইট ঝুলছে, আর সে-আলোতে গ্রামোফোন হতে অল্প দূরে সেই ছেলেটা—যে-ছেলেটা রোজ ঘোড়াদের ঘাস ভুসি ইত্যাদি দেয় সে ঘাগরা ও ওড়না পরে পায়ে ঘুঙুর দিয়ে তোফা নাচ জমিয়ে তুলেছে। পায়ের ঘুঙুরে অতি আওয়াজ করে সে কেবল শীর্ণ কোমর ভেঙে-ভেঙে নাচছে আর নাচছে, এবং অর্ধচক্রাকারে দণ্ডায়মান যত দর্শক সব থেকে-থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে অশ্লীল কথা বলে উঠছে। রেকর্ডে গান ফুরাল তো নাচ ফুরাল না, শেখ জব্বার মুচকে হেসে মোটা গোঁফের সরু আগায় আলগোছে একটা চাড়া দিয়ে ফের রেকর্ডটা ঘুরিয়ে সাউন্ডবক্স চাপিয়ে দম কষতে লাগল,—বাইজীর গলা আবার কন্‌কনিয়ে উঠল।

এ-বস্তিতে আজ এই যে এত আনন্দ ও কোলাহল, এর মূলে রয়েছে শেখ জব্বারের চতুর্থ বিবির আগমন। আজ সকালে জব্বার নিজে তাকে নিয়ে এসেছে। বিয়ে হয়েছে দু বছর বটে, তবে বিবি বয়সে কচি ছিল বলে এতদিন তাকে বাপের বাড়িতেই রাখা হয়েছে।

জব্বারের আজ আনন্দের সীমা নেই। রাত এগারটায় সে বস্তির সবাইকে বিরানি খাইয়েছে, এবং তার আনন্দের আগুন সারা বস্তিতে যেন ছড়িয়ে পড়েছে। আজ সে সেজেছেও ভালো,—পরনে লাল টকটকে বর্মি লুঙি, গায়ে মুর্শিদাবাদি সিল্কের সাদা পাতলা পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির বুকপকেটে ফুলতোলা ঝালরওয়ালা রুমাল, তাতে দিশী সেন্টের কড়া গন্ধ। মাথায় বাবরি চুলে সুগন্ধ তেল জবজব করছে, কিন্তু ঘাড়ে একগাদা পাউডার। আর পায়ে চীনাবাজারের পেটেন্ট চামড়ার চকচকে পাম্প-সু। শেখ জব্বারের মুখটি বিরাট, বড়-বড় লালচে চোখ, মোটা নিচু জুলপি, আর কালো ঠোঁটের ওপর বুঁনেদী মার্কা গোঁফ।

ছোকরাটির নাচ দ্রুত তালে উঠেছে, বাইজীর নাচও দুলে উঠেছে, আর এদিকে জমায়েতের মুখ ইতরভাষায় মুখর হয়ে উঠেছে, কিন্তু শেখ জব্বারের গোঁফের তলায়

শুধু মুচকি হাসি। ছোকরাটির মুখভরা ঘাম হলেও বিড়ি-টানা-কালো ঠোঁটে সে কী হাসি, আর ঈষৎ টেরা ঘোলাটে চোখে সে কী চাহনি; কোমরে বাঁ হাত রেখে ডান হাতে মুখের ওড়না টেনে ঘুরে-ঘুরে নেচে সে সবাইকে জবর মাত করে ফেলেছে।

এবার জব্বারের মুখ খুলল; বললে :

—ওয়াহওয়া, কেয়া নাচনা। এই ভাই জামাল, এইসা নাচ দেখা কভি?...জামাল মিঞা! কাঁহা জামাল মিঞা?..

শেখ জব্বারের অন্তরঙ্গ বন্ধু জামাল মিঞা তখন এক কোণে অন্ধকারে বুঁদ হয়ে পড়ে রয়েছে, পেটে ক'বোতল পড়ে রয়েছে কে জানে!

এদিকে চিকে-ঘেরা অন্দরমহলে তিন বিবির মুখে তিন রকম কথা। নতুন বিবির বয়স অতি অল্প; হয়তো বার। ছোট মুখ, আর ছোট দেহ। অলঙ্কার ও জামাকাপড়ের তলে দেহ আছে কি না সন্দেহ। তার নাকে নোলক, চুলে রুপোর সিঁথি, কপালের একপাশে সে-সিঁথির মিনে করা রুপোর চক্র। হাতে চুড়ির বোঝা, পায়ে মল, কোমরে চন্দ্রহার। ছয়টি ঘোড়া আর ছয়টি মানুষ প্রতিদিন রোদে ঘেমে পানিতে ভিজে যে-অর্থ এনেছে, তার অনেকটাই হয়তো এ-ক্ষুদ মেয়েটির দেহে অলঙ্কাররূপে গিয়ে চড়েছে।

মেয়েটির ঠোঁট অদ্ভুতভাবে নিষ্কম্প, কিন্তু তার চোখের আর বিশ্রাম নেই, শুধু সারা ঘরময় ক্ষণে-ক্ষণে দশদিকে ঘুরছে। এবারে বড় বিবির মুখের পানে, ওবারে মেজো বিবির হাতনাড়ার পানে, অন্যবার সেজো বিবির ঠোঁট-বাঁকানোর পানে, আবার তিন বিবির কুটিল চোখের ঝকমকির পানে। বেচারির ঠোঁটে কোনো কথা নেই, কিন্তু চোখ কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে, এক মুহূর্ত স্থির নেই।

তিন বিবির মুখই তার সম্বন্ধে মুখর; এবং তাদের প্রতিটি অক্ষর এবং প্রত্যেকটি দেহভঙ্গি সে নীরবে হজম করে ফেলছে; ওর পাশে গা ঘেঁষে বসেছে তৃতীয় বিবি। মনে তার রূপের অহঙ্কার, তাই নবাগতার পাশে বসে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে তাকে, দেখছে আর থেকে-থেকে মুখ ফিরিয়ে আর-আর বিবিদের পানে চেয়ে চোখ টিপে কিছু-একটা মন্তব্য করছে। এবার ভালো মানুষের মতো তার পানে চেয়ে সে দেহ দিয়ে তার দেহ ঠেলে প্রশ্ন করল :

—এ্যাদ্দিন যে তোর সোহরকে ছেড়ে ছিলি, মনে কষ্ট হয় নি?

মেয়েটি শুধু চোখ ফিরিয়ে চাইলে তার পানে, কিছু বললে না। কিন্তু তাতে কিছু এসে গেল না, কারণ যথাসময়ে যথা-উত্তর দিল দ্বিতীয়া।

—মনে করিয়ে দিয়ে আর ওকে বেচায়েন করিস্ না; এখন-তো ওর সুখের দিন। একটু পরে তৃতীয়া বিবি ফের তার দেহে ঠেলা দিয়ে শুধাল :

—ও নয়া বিবি; জেরা হা কর তো দেখি?

—কেন, দাঁত দেখবি?

—না জিব।

কয়েক মুহূর্ত পরে হাসির হুল্লোড় পড়ল তাদের মধ্যে। শেষে প্রথম বিবি বললে : তাই তো, বোবা লাচার নাকি নয়া বিবি? দেখি, জেরা হা কর তো? মেয়েটির নিষ্কম্প ঠোঁট তেমনি রইল, চোখ কেবল ঘুরছে।

প্রথম বিবি কিছুটা আশ্বস্ত হল, কিন্তু কিসে কে জানে। চোখ টেনে বললে :

—নয়া বিবির বড় খাওফ মালুম হচ্ছে। তাই না বিল্‌কিচ বহিন?

—বিবি! বিবি কেয়া, বোল্‌না বেগম! দ্বিতীয়া হঠাৎ সবাইকে ধমকে উঠল।

—হাঁ ভাই, বেগম! বাদশাকা বেগম!

—ঘোড়েকা বাদশা—ইয়ে ভী এয়াদ রাখ্‌না!

—আহ্, তৃতীয়া বিরক্ত হবার ভান করল, আদব্‌সে বাত কর্‌না!

—হাঁ হাঁ, আদব্‌সে বাত কর্‌না। ঘোড়েকা বাদশা, উনকা পেয়ারা বেগম, উনকী সাথ আদব্‌সে বেয়াদবি কর্‌না ঠিক হ্যায়। হ্যায় না গুলবহিন?—আর গুলবহিনের! গুলবহিনের মুখে তখন হাসির পেশোয়ারি-গুল ফুটেছে।

বাইরে আনন্দের আগুন জ্বলছে, এখানে জ্বলছে হিংসার আগুন। হিংসা বিদ্বেষ এদের ধর্ম, এবং এরই উত্তাপে তারা বেঁচে থাকে : তাদের দেহে-তো সূর্যের আলো পৌঁছয় না। প্রত্যেকের ঠোঁটে কুটিল হাসি, সে-হাসির তলে জ্বালা, এবং এ-জ্বালা সঞ্জীবনী। পয়লা বিবি আস্তে বললে :

—বিবি কী খুবসুরৎ, যেন আসমানের তারা!

—হাঁ বহিন, বেহেশতকা হুরী, বিলকুল সাচ্চ বাত।

দ্বিতীয়া আবার তার দেহে ঠেলা দিলে। বললে :

—বাতচিৎ কিছু কর তো.... ঘোড়েকা বাদশাকে খুউব পছন্‌ হয়েছে কি?

তৃতীয়া হঠাৎ যেন বিরক্ত হয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল :

—আহ্‌, ওকে দিক করিস্‌ না বহিন। ঘোড়েকা বাদশার জন্যে দিলের মধ্যে সব মহব্বতের বয়েত বাৎলে নিতে দে....

এরা মেয়েটিকে তেমন তীক্ষ্ণ কিছু বলছে না, কিন্তু বলছে অনেকক্ষণ ধরে, আর বলছে তিন জন মিলে। তাই হঠাৎ এবার দপ করে আগুন জ্বলে উঠল—ক্রোধের আগুন। মেয়েটির চোখ জ্বলে উঠল, মুখও খুলে গেল। সে হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে তৃতীয়া বিবির অনাবৃত বাহুতে সজোরে তার ইঁদুরের মতো দাঁত বসিয়ে দিলে।

এ-জন্যেই এরা হয়তো এতক্ষণ ধরে উন্মুখ হয়েছিল। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল বস্ত্রসার ক্ষুদ্র মেয়েটির দেহের ওপর, তারপর চুল টানাটানি হাতাহাতি এবং তার সঙ্গে কুৎসিত অশ্রাব্য গালাগাল অবিরাম চলতে থাকল : তাদের দাঁত ও চোখ বাঘিনীর মতো ধারালো ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আকাশে মহারাত্রি; দূর তারকার দেশে মহানীরবতা ও নিষ্কলঙ্ক ম্লান দীপ্তি। সেখানের হাওয়াশূন্য পবিত্রতায় এই ধরণীর কলঙ্ককালিমা পৌঁছয় না, এবং সেখানের অকলঙ্ক নির্মলতাও এ-ধরণীকে স্পর্শ করে না। এ-দুটি পরস্পরের পানে হয়তো-বা কখনো চোখ তুলে চেয়ে দেখে, কিন্তু সে তাকানো নিষ্ফল হয় এই কারণে যে, তাদের মাঝে মহাদূরত্বের ব্যবধান। এবং হয়তো এই ব্যবধানই সৃষ্টির রহস্য ও অর্থ।

তাই এরা জিঞ্জির চায়, মুক্তি চায় না।

বাইরে তখনো উদ্দাম উল্লাস চলছে। সবার বাহবা পেয়ে ছোকরাটির মনে ও দেহে জোশ এসে গেছে, সে নাচছে আর নাচছে। লোকদের চোখ ঘোলাটে; কখনো-বা সে-ঘোলা চোখ গান ও ঘুঙুরের আওয়াজের মাদকতায় ও রাতের অন্ধকারের স্পর্শে যে-কামনা মানুষের হৃদয়ে প্রবলতম হয়ে ওঠে—তার ছোঁয়ায় জ্বলজ্বল করে উঠছে,—পাতালের না দেখা নারীরা কল্পনা হয়ে এসে তাদের রক্তদীপ্ত বুকে তৃপ্তিহীন বাসনা জাগিয়ে তুলছে,—এ-রাতকে তারা শেষ হতে দেবে না। শেখ জব্বারের চোখ কিসের নেশায় এমন ঢুলছে? কে জানে। তার চোখ হয়তো অন্ধকারে ঘনিয়ে উঠেছে, যে-অন্ধকারে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম বেদনাকে হেসে উপেক্ষা করা যায়। তারপর এক সময়ে সে সবার অজ্ঞাতে উঠে ধীরে-ধীরে চলে গেল অন্দরমহলের দিকে—হয়তো অন্ধকারের পথ পিচ্ছিল ও সুগম করতে; আর তার পেছনে চোঙওয়ালা গ্রামোফোনে মোহনগলায় মোহনসুরে অজ্ঞাত নারীর কণ্ঠ কন্‌কনিয়ে বাজতে থাকল। বাজুক—যত গান আছে যত রূপসীদের সোনালি ঠোঁটে সব আজ বাজুক, ওধারে আস্তাবলে ঘোড়াগুলো লাথালাথি করুক, সেদিকে কারো কান দিয়ে কাজ নেই। ঘোড়ার গায়ের ও নাকের গন্ধ এখানে নেই : এখানে ছড়িয়ে রয়েছে শেখ জব্বারের সেন্টের কড়া ঝাঁঝালো গন্ধ। কে কোথায় খেতে পাচ্ছে

না, কার ঋণের বোঝা দ্বিগুণ হয়েছে, কার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে দারুণ যন্ত্রণায়, এখন তা স্মরণ করে লাভ নেই : সে-সব স্মরণাতীত। এই মুহূর্তে ক্ষমা কর সেই সওয়ারীকে, যে ভাড়া দিতে গিয়ে জোচ্চুরি করেছে, ভুলে যাও কে কবে তোমাকে কুষ্ঠ পায়ে লাথি মেরেছিল : এখানে এখন মোহনকণ্ঠে গান ও উত্তাল ঘুঙুরের শব্দের প্রভুত্ব।

অন্দরমহলে ঢুকবার আগে শেখ জব্বার একবার ভাঙা টুলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে গুম-হয়ে-বসা জামালের নিস্তব্ধ দেহের কাছে ঘেঁষে এসে তাকে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিলে, অস্ফুটগলায় তাজ্জব হয়ে বললে :

—এ ভাই জামাল মিঞা, দুনিয়াদারি কেয়া চিজ হ্যায়...

জামাল মিঞা নাক দিয়ে গোঁ-গোঁ করে উঠল, তারপর অতিকষ্টে আবেশাচ্ছন্ন চোখ কিছুটা ফাঁক করে শেখ জব্বারের কাঁধে বাঘা-থাবা মেরে গোঙিয়ে বলে উঠল :

—আরে বিবি কী গায় আর কী নাচে...দিল কতল্-ল্-ল্...সহসা সে চমকে জেগে উঠে চোখ মেলে চাইল, নেশা-জড়ানো গলায় এক গাল হেসে বললে :

—আমার মুমে ঘোড়ার লাথ্থি! এ তো বিবি নয়, বিবির বাপ!

ওধারে কারা তাসের জুয়া খেলতে বসে হঠাৎ দাঙ্গা বাধিয়েছে। লাগুক, আজ দাঙ্গা লাগুক শতবার, রক্ত ফেনিয়ে উঠুক রাত্রির তমিস্রায়, এ-রাতকে হেলা করা চলে না : উষ্ণ রক্তের সম্ভাষণ তাকে জানাতে হবে। শেখ জব্বারের চোখে শিখা, সে-শিখায় চেঙ্গিস খাঁর দুর্বার লোলুপতা,—ধু-ধু-করা মরুভূমি পদানত করবার—প্রাসাদাকীর্ণ রাজধানী জ্বালিয়ে ছারখার করবার উদ্দাম লোলুপতা। সে দুনিয়াকে ডরায় না, এ মিট্টিকা পৃথিবীর মুখে শত ঘোড়া চার শ লাথি মারুক, তাহলে সে প্রাণ খুলে হাসতে পারে।

মহাকলরবের পর একি মহানীরবতা! চিকে-ঘেরা অন্দরমহলে প্রগাঢ় স্তব্ধতা—মহারাত্রির মতো বিরাট শূন্য নীরবতা।

সে-স্তব্ধতা নয়া বিবির চেতনাহীনতার স্তব্ধতা।

নতুন বিবির আগমনোপলক্ষে যে-আনন্দোল্লাস জেগে উঠছে এ-বস্তিতে, সে-আনন্দোল্লাস তার চেতনাহীনতায় ম্লান হল না। সামান্য দেশলাইর কাঠি যে-বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তোলে, দেশলাইর কাঠি পুড়ে ছাই হলে সে-অগ্নিকুণ্ড কি কখনো ম্রিয়মাণ কিংবা সমবেদনায় দীপ্তিহীন হয়?

নয়া বিবির অলঙ্কার ছিঁড়ে গেছে, কিছু খসে গেছে; তার দাঁতে দাঁত লেগেছে, এবং যে-চোখ অবিরত সেকেণ্ডের কাঁটার মতো দ্রুত নড়ছিল কেবল, সে-চোখ এখন নিমীলিত। তার দেহ হিংসার অনলে বিধ্বস্ত।

পয়লা বিবি কেঁদে উঠল :

—এয়া খোদা, মেরি বেটিকী ক্যা হাল হুয়া?

সেই বহু বছরের কথা, হয়তো দশ, হয়তো চৌদ্দ,—পয়লা বিবির তখন প্রথম মেয়েটি জন্মেছিল। সে মেয়ে আর নেই, এখন শুধু তার স্মৃতি আঁকা রয়েছে মায়ের বুকে। তার ঠোঁটটা কি এমনি ছিল, এই নয়া বিবির ঠোঁটের মতো? আর চিবুকটা, কপালটা ঠিক যেন তেমনি। ঝাউবনে অকস্মাৎ ঝড় উঠল, হু-হু করে বইতে থাকল হাওয়া। পয়লা বিবির অন্তর ঝিরঝির করে উঠল—অসার্থক ও অপূর্ণ মাতৃত্বের বেদনা ও স্মৃতির ভারে।

—এ খোদা, তুনে কেয়া কিয়া....।

খোদা কী করবে?

বাইরে গ্রামোফোনে এবার একটি পুরুষের ভারি গলা গোঙিয়ে উঠল। ঘুঙুরের আওয়াজ

থেমেছে; লোকদের হল্লা বেড়েছে দ্বিগুণ। গনি মিঞা গ্রামোফোনকে উপেক্ষা করে মহব্বতের গান ধরেছে। কিসের রসে তার অন্তর টলমল? হয়তো সারা আকাশে গুচ্ছ-গুচ্ছ আঙ্গুরের মহব্বৎ ঝুলছে।....

চিকে-ঘেরা অন্দরমহল, ভরা স্তব্ধতা সেখানে এবং সে-স্তব্ধতার বিপুলকণ্ঠে এবার শেখ জব্বার—ঘোড়েকা বাদশা শাহি-গলায় বজ্রনিনাদ করে উঠল। সে-আওয়াজে ভাষা নেই, শুধু তাতে টাটকা গরম খুন টগবগ করছে।

সে-রক্তমাতানো আওয়াজ বাইরেও ভেসে এল। আওয়াজ ভেসে এল বটে তবে কোলাহলের ঘূর্ণিপাকে তলিয়ে গিয়ে কথা হয়ে ভেসে এল ওপরে। কবে কোথায় ফয়েজ মিঞা থিয়েটার দেখেছিল, তারই একটা কথা হয়তো তার মনে পড়ে গেল। শরাবের খরস্রোত বইছে তার ধমনিতে, তা-ই নেশায় ঝুঁকে-থাকা দেহটা হঠাৎ টান করে কঠিন ও দরাজগলায় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : শম্‌শীর! সব শম্‌শীর লেকে খাড়া হো যাও ভাই!...

আকাশে হয়তো গুচ্ছ-গুচ্ছ আঙ্গুর ফল ঝুলছে, তার প্রত্যেকটি মহব্বতের রসে ভরা। কেন অত আঙ্গুর, কেনই-বা ঝুলছে?—ঝুলছে শুধু নারীর দেহে ঝরঝর করে ঝরে পড়বার জন্যে। জয় হোক নারীর দেহের আর গুচ্ছ-গুচ্ছ আঙ্গুর ফলের, গনি মিঞাকে তোমরা সবাই বাহবা দাও, হাততালি দাও।

আকাশে অন্ধকার, বস্তিতে পৃথিবীর মানুষের প্রাণের কোলাহল : মানুষের প্রাণ যেন বেলে মাছের মতো কালো ধরণীর বুকে কিলবিল করছে। কোলাহলের মাঝে আবার একটি কণ্ঠ আর্তনাদ করে উঠল : শম্‌শীর, নাঙ্গা শম্‌শীর লেকে খাড়া হো যাও!

কিন্তু আকাশে খণ্ড চাঁদ এরা দেখেছে, তলোয়ার দেখে নি। ওপরে আকাশময় গুচ্ছ-গুচ্ছ আঙ্গুর ঝুলবে, ঝুলবে চিরকাল, ঝুলবে ওই খণ্ড চাঁদের বক্রতায়।

সেই পৃথিবী

দেখতে লোকটা বেঁটেখাটো। চওড়া শক্ত হাড়, ছোট ঘাড়, টান পিঠ, আর লোমশ দেহ। রঙটা এমন যে মনে হয় কালোর ওপরে-ও কালোর একটা পোঁচ, অথচ সেটা আবলুশ কালো নয়। রঙটায় একটা বৈশিষ্ট্য আছে; এবং আরেক বৈশিষ্ট্য তার বড়, ভাসন্ত ও টেরা চোখ দুটিতে। তার চোখের পানে চেয়ে কখনো মনে হয় কী সোজা কী বোকা সে, আবার কখনো মনে হয় সমস্ত কুটিলতা ঘোলাটে হয়ে পাক খাচ্ছে সেখানে। দারোগার সামনে স্থির হয়ে বসে নিথর দৃষ্টিতে যখন চেয়ে থাকে, তখন বাইরের কেউ তাকে গদাইলস্কর ছাড়া আর কিছু ভাববে না, আবার বন্ধুদের আড্ডায় কিছু না কইতে-ই চোখে যে-সব কথা ভাসে, তার তুলনা মেলা ভার।

তবু, লোকটার অন্তর আছে। মানুষের নাকি অন্তর আছে, এর-ও আছে তা। ওর লোমশ নোংরা কালো দেহের অন্তরালে কোথায়, কে জানে, একটা নরম কোমল অন্তর লুক্কায়িত, এবং এর পরিচয়ে অবাক হবার-ই কথা।

কিন্তু এ-ও সত্যি কথা যে, তার পরিচয় পাওয়াও ভার। কালো মুখে আরো কালো ছায়া ঘনিয়ে ওঠা-ই স্বাভাবিক। তার পরিবেশ তার কর্ম বলে : আরো ঘোলাটে হও, কাদায় আবর্তিত হও, দেহ থেকে আরো কুটিল কালো করে তোলো তোমার ভেতরটা—নইলে জীবনের অর্থ কী?

কিন্তু বহুকাল পৃথিবীর ভাঙা জংলা ঘাটে নোংরা জল খেয়ে-খেয়ে ইদানীং আশ্চর্যভাবে নতুন ভোল এসেছে তার জীবনে। বর্তমানে জনকল্যাণের জন্যে যে-সব চাকরি পথে-ঘাটে

লুটোচ্ছে, তারই একটা কী করে তার কপালে এসে লেগেছে : সে খাকি-প্যান্ট-শার্ট, মোজা-জুতো পরতে শুরু করেছে। একটা চাকরি : মাসে-মাসে মাইনে আসবে হাতে,—এর অনুভূতি ওর পক্ষে অনাস্বাদিতপূর্ব, তাই বিচিত্র। চাকরি পাওয়ার প্রথম ঝোঁকটা তাকে চোখের জলে ও বিকৃত আনন্দে (তার জীবনে সুস্থ অনাবিল আনন্দ আবার কোথায়? রক্ত গলানো কাশির উপশমের মতো-ই নয় কি তার আনন্দ?) সামলাতে হয়েছে। চাকরি যেন একটা দুনিয়ার পরম বিস্ময় : মাসে-মাসে, নিয়মমতো নির্দিষ্ট কটা টাকা আসবে হাতে, এতে শঙ্কা-ভয় নেই, রাতের আঁধারে হৃৎপিণ্ডের কম্পন নেই, পাশবিক ক্রোধে মাথা ফাটাফাটি নেই। কী অদ্ভুত কথা : এ-টাকা সে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়েও বুক টান করে গুনতে পারে, চলতে-চলতে রেজ্‌কি বাজাতে পারে ঝুনঝুন করে, সূর্যালোকের তলে সদর রাস্তায় কেনাকাটা করতে পারে নির্বিবাদে।

যেদিন সে প্রথম মাইনে পেল, সেদিন তার ভাসন্ত টেরা চোখদুটি কেমন কোমল হয়ে উঠল, শুধু কোমলই হয়ে উঠল। তীব্র আনন্দে আত্মহারা না হয়ে সে যে শান্ত—আবার এত শান্ত হয়ে উঠবে এ-কথা কল্পনাও করতে পারে নি। শুধু শান্তই নয়, মনে হল ভার দেওয়া জালের মতো সে নদীর বুকে বিস্তৃত, তাকে ধুয়ে-ধুয়ে স্রোত বয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে, আর কখনো-কখনো চকচকে মাছের মতো নানারকম কথা এসে আটকাচ্ছে সে-জালে। ভারি মনে হচ্ছে নিজেকে, এবং ভারিত্ব দামের। কে যেন তাকে দাম দিল। এ-বিশাল পৃথিবীতে অগণিত মানুষের মাঝে আর মুক্ত আকাশের তলে তারও দাম আছে, এবং এ-কথা সে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে পারে, এ নিয়ে শিশুর মতো ধুলোয় লুটিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে মাতামাতি করতে পারে। কিন্তু কিছুই সে করবে না, কারণ তার দাম আছে।

তবু আড্ডায় না গিয়ে উপায় নেই। ইয়ার-বন্ধুদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল, রঙিন আশায় ওদের চোখে রক্ত টগবগ করে উঠল : টাকার লোভে শত হাত যেন লিকলিক করছে ফণার মতো। কালু রসালো গলায় শুধু ডাকলে : সাদু!

সাদেক একবার হাসলে কোনো কথা না কয়ে, তারপর ঝাঁপ-মুক্ত জানালা দিয়ে অর্থহীনভাবে বাইরের পানে তাকাল। সেখানে আঁধার; আরো ওপরে আকাশে তারা। কী একটা কথা মনে জাগছে বারে-বারে, এবং বাইরে অন্ধকারের পানে তাকাতে আস্তে মনের মধ্যে একটা ছবি খেলে উঠল। বহুদিন আগের কথা। খেলার মাঠের প্রান্তে শিমুল গাছটার ধারে যে বাংলো ধাঁচের বাড়ি—সে-বাড়িতে একবার সে চুরি করতে গিয়েছিল। দেয়ালের ফুটো দিয়ে যে-ঘরে উঁকি মারলে, সেটা ছিল শোবার ঘর। ঘরের এক কোণে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল নিস্তেজ আলো ছড়িয়ে। সে-আলোয় নজরে পড়ল খাটের ওপর ঘুমন্ত একটি মেয়ে, মিষ্টি তার মুখ, আর তার পাশে একটি শিশু, সে-ও ঘুমন্ত।

কিছুক্ষণ সাদেক চেয়ে-ই ছিল। ঘুমন্ত মেয়েটির মাধুর্য যে তাকে আকৃষ্ট করছিল তা নয়; যে-জন্যে সে ফুটো থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছিল না—সেটি হল মেয়েটির একটি স্তন। একটু আগেও হয়তো শিশুকে মাই দিয়েছিল, এখনো সেটি অনাবৃত।

তারপর শিশুটি হঠাৎ কেঁদে উঠল। মেয়েটিও উঠল জেগে, আর ক্ষণেকের জন্যে সদ্য ঘুম-ভাঙা মুখে বিরক্তির ছায়া ঘনিয়ে উঠে মুহূর্তে তা আবার স্নেহে কোমল ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। তারপর সে শিশুর মুখে মাই দিলে, দিয়ে ঘুম-জড়ানো গলায় মৃদুস্বরে সুর করে কী যেন গাইতে লাগল, এবং গাইতে-ই থাকল...

আজ এতদিন পরে মেয়েটির ঘুম-জড়ানো কণ্ঠের কেমন সে-সুর থেকে-থেকে সাদেকের কানে ভেসে উঠতে লাগল। সেদিনের মতো অত গভীর না হলেও এখন রাত তো বটে, এবং ওই অন্ধকার থেকে আর বহু দূর থেকে সেই মৃদু গান যেন ভেসে আসছে...

কিন্তু এধারে ইয়ার-বন্ধুদের চোখ জ্বলছে। রক্তলোলুপ তাদের রক্ত; রক্ত তাদের রক্ত চায়। এস্পার কি ওস্পার—এমনি একটা তীক্ষ্ণতা তাদের চোখে। দুপাশে ধার-দেয়া ছুরির

মতো তাদের দৃষ্টি।

—এই শালা লবেজান! (লবেজানটা সাদেকের পেয়ারা নাম)

লবেজানের চোখে এখনো তন্দ্রা। ধীরে-ধীরে এতদিন পরে অনুতাপ জাগছে, তাকে বিঁধতে শুরু করেছে কাঁটার মতো। আহা, ঘুমে ও সন্তানস্নেহে কোমল-স্নিগ্ধ মুখে কেন সে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল?

কালুর কথা ঠাস্-ঠাস্ ছোটে। এবার সে সাদেকের কাঁধ ঝেঁকে বললে :

—কোথায় মাল মেরেছিস শালা?

—দ্যাখ্, কেমন ঢেঁকি উল্টে আছে, দ্যাখ্! আরে এই লবেজান! ছুনু মিঞা আদর করে ডাকল, বাতটাত তো কুছ কর্—

সাদেক নিঃশব্দে নোটের তাড়া বের করে দিল—লাল সুতোয় বাঁধা কটা এক টাকার নোট। ওদের চোখ চকচক করে উঠল, বিশ্বাসও হয় না যেন। চমরু মিঞা কসাই-দৃষ্টি হেনে কেড়ে নিল তাড়াটা। স্বভাবগত ভয় তাদের, গেল বুঝি গেল বুঝি—কেড়ে নে ধা করে। টাকা করায়ত্ত করে দাঁতের ফাঁকে কেমন করে হাসল চমরু, তারপর বললে :

—সব দিলি সাদু?

হঠাৎ কোনো কথা নেই, সাদেকের চোখ ছলছল করে উঠল। সে-ছলছল চোখে কী এক জোশের মাথায় চেঁচিয়ে উঠল সে :

—নে শালা, দিলাম। আমার কি আর দিল্ নাই?

হ্যাঁ, তার অন্তর আছে বৈকি। অন্য মানুষের যদি অন্তর থাকে তবে তোর লোমশকালো দেহেরও অন্তরালে অন্তর আছে বৈকি। এবং সে-অন্তর এখন কতদিন আগেকার একটা অপরাধের অনুতাপে নীল-নীল হয়ে উঠছে। সে-রাত কি কোনোদিন আসবে না, কোনোদিন সে দেখা পাবে না সে-মেয়ের? যদি দেখা পেত সে-মেয়ের, তবে তার পায়ে মাথা গুঁজে সে কাঁদতে পারত, অন্তরের যত অপরাধ যত গ্লানি যত বেদনা—সব ঢেলে কাঁদতে পারত প্রবল প্রচুর, এমন-কি বুক চিরে রক্ত বের করে ঢেলে দিতে পারত তার শুভ্র-কোমল পা-দুটিতে। ওর মন হঠাৎ ডাকল আস্তে : মাগো। তারপর আকুল হয়ে ডাকল : মাগো, ওমা। মাগো, ওমা....

ওরা বলে যে দিল্ নেই! বলে দিল্ নেই। বলে যে, দিল্ নেই ওর। সাদেক মাথা ঝেঁকে সোজা হয়ে বসে হঠাৎ বুকে এক বিরাট চাপড় বসিয়ে বুকের মধ্যেই যেন গোঙিয়ে বললে :

—কোন্ শালা বলে দিল্ নেই, কোন্ শালা বলে...? ওর ভাসন্ত চোখ আরো ভাসছে, আর মানবতা যেন অমানুষিকতার বিরুদ্ধে হিংস্রকুটিল হয়ে উঠেছে; প্রতিহিংসার জ্বালায় পাক খাচ্ছে অবিরত।

তার সে-চোখ দেখে কারো ভয় হল না। কে হাসল যেন। চমরু হাসল চোখ টিপে। ঠোঁটের প্রান্তটা হঠাৎ সরিয়ে হাওয়ায় কেমন আওয়াজ করল, করে আবার চোখ টিপে বললে :

—পেটে মাল ওগলাচ্ছে—কিন্তু তক্ষুনি সে জিভ কেটে নরম গলায় শুধু বললে : ছিঃ—

ওদের ফেউ নবাব ততক্ষণে টাকা টেঁকে উধাও হয়েছে মদের সন্ধানে। আজ আর তাড়ি নয়, দিশী মদ মারা যাবে। মদ আসছে, আসছে—এতেই তারা এত চাঙা হয়ে উঠেছে যে সবার মুখ দিয়ে অবিরত খই ফুটছে। হঠাৎ সবার গলা ছাড়িয়ে কালু হাঁকল :

—শোন্ শালারা—

সব চুপ।

—রতনবিবি বাদ পড়ে কোন্ কারণে?

কোনো কারণেই বাদ পড়ে না। কথার মতো কথা বলেছে বটে কালু। আসর আরো দ্বিগুণ গরম হয়ে উঠল; এত গরম হয়ে উঠল যে, কে একজন নিজের উরুতে বিকট চড় বসিয়ে চেঁচিয়ে উঠল : আগুন, শালা আগুন! তারপর সে কী হাসি—

কিন্তু সাদেক এখনো নীরব, শান্ত। কোন্ মাল পেটে ওগলাচ্ছে যে ঢেঁকি উল্টে সে বুঁদ হয়ে আছে? নিজেকে তার ভারি-ভারি ঠেকছে এখনো, তবে তলায় অনেক নোংরা জমেছে। জীবনে যে সে নোংরাই ঘেঁটেছে তা নয়, তার মধ্যেও নোংরা জমে উঠেছে ঢের, আজ তাই চেতনায় জেগে নিজেকে ভারি বোধ হচ্ছে। পৃথিবীতে এখন না আর আঁধার জমেছে? এই আঁধারে কত নিষ্পাপ মায়েদের মন শিশুদের কল্যাণ-কামনায় মুখর হয়ে উঠেছে, বাইরে আকাশের তারাদের কাছে কি তার আভাস পাওয়া যাবে? ওমা, মাগো...। আবার যদি আসত সেদিন, অথবা যদি সে-মেয়েটির দেখা পেত সে শুধু এক মুহূর্তের জন্যে—শুধু এক মুহূর্তের জন্যে, কছম করে বলছি আমি মুছলমানের বাচ্চা, যদি এক মুহূর্তের জন্যে পেতাম তাকে তবে বুক চিরে শুধু রক্ত ঢেলে দিতাম তার পায়ে, কইতাম না কিছু। এ-মুখে আবার কথা কী?—এবার হাসল সাদেক, হাসল আস্তে।

মধুমারা গা ঠেলে দিল চমরুর। চমরু সায় দিল।

—শালা কম নয়! ফিসফিস করে কথা কইবার চেষ্টা করল কালু, কিন্তু তার যা গলা। ঘরে সামান্য আলো; সে-আলোতে সাদেকের ভাসন্ত চোখ চকচক করছে যেন। ওতে জল। কিন্তু তাতে ওদের কিছু আসে-যায় না, নেশার উৎকট রূপও তাদের নিত্যকার ব্যাপার। তাই অন্য এক বিষয়ে আসর সরগরম হয়ে উঠল। বিষয়টি হচ্ছে : সেই লম্বাপানা মেলেটারিটা খাসা মাল চাইছে, দিতে পারলে পকেটটা..। কিন্তু মুশ্‌কিল হল এই যে, কোথায় বাবা খাসা মাল?

—রতনাকে একবার সাজিয়ে-গুছিয়ে—?

—চোপ্ শালা, বকিসনে মিছিমিছি। ওটা কুত্তা আছে, শুঁকে ধরে ফেললে শালা বুটের গুঁতোয়—। আর তাছাড়া রতনা নিজের ব্যবসা নিজে জানে, ওদের ট্যাকে তা হলে আসবে কানাকড়ি।

কিন্তু, সাদেকের চোখে একটা আঁকাবাঁকা পথ ভাসছে যেন থেকে-থেকে, তারপর ক্রমশ সেটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। রোদ খাঁখাঁ করছে; মাসটা বোশেখ কি জ্যৈষ্ঠ। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় ধুলো উড়ছে। একটু আগে-আগে যাচ্ছে একটা গরুর গাড়ি, আর ধুলো খেতে-খেতে রোদ-মাথায় পেছনে-পেছনে চলছে সাদেক; চোখে তখন এমন ভাব যে আস্ত একটা গদাইলস্কর সে। কিন্তু খেয়াল তার গাড়ির ভেতরের পানে। ছইয়ের তলে একটি ছোট পরিবার : স্বামী-স্ত্রী আর দুটি ছেলে। স্বামী-স্ত্রী কথা কইছে অনবরত; কোলের বাচ্চাটা থেকে-থেকে আধো-আধো কী সব বকছে, বড়টি উপুড় হয়ে শুয়ে ওর হাত নিয়ে খেলা করছে আপন মনে। আশা নেই কিছু—এ-কথা জানে সাদেক, তবু অভ্যাসমতো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নিল কটা চুড়ি হাতে, আংটি আছে কি না, গলার হার কী রকম—কিন্তু আসলে কী যে দেখেছিল, সে-কথা সে তখন বোঝে নি, এতদিন পরে এমন অদ্ভুত পরিবেশে সে-কথা বুঝতে পারছে যেন—অস্পষ্ট ছায়ার মতো বুঝতে পারছে যেন, এবং তাতেই থেকে-থেকে তার সারা অন্তর উদ্বেলিত তরঙ্গিত হয়ে উঠছে।

ওপরে তো আকাশ, যেখানে ওঠে সূর্য, ওঠে তারা, কিন্তু নিচে এই ধরণীর বুকে শান্তি আছে, স্নেহ-ভালোবাসা আছে। এই ধরণীর বুকে। কিন্তু কোথায়? পৃথিবীর মধ্যেও যেন কোথায় আবার রূপকথার দেশ—

তারপর সে রূপকথার দেশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল। ঈষৎ আলোকিত দুর্গন্ধময় ঘরে ইয়ার-বন্ধুদের হইচই ওর কানে কিছু ঢুকছে, কিছু ঢুকছে না। যেটুকু-বা ঢুকছে সেটুকু বহু নিচু থেকে, অতল থেকে আসছে যেন ভেসে, সে রয়েছে ঊর্ধ্বে, উঁচু স্তরে। ভাপসা গরমে ওর দেহ-মুখ ঘামে ভরে উঠেছে, তাই অনাবৃত অংশ চকচক করছে আলোয়, আর ওর ভাসন্ত চোখ আরো ভাসন্ত হয়ে উঠেছে। কোন্ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছে সে? সে-পৃথিবী কি বেহেশত? যে-পৃথিবী ভরা সূর্যালোক-ও মুক্তি, যে-পৃথিবীতে শিশুরা কাঁদে ও দম্পতিরা হাসে, যে-পৃথিবীময় শুধু টলমল স্নেহ, সে-পৃথিবীই বেহেশত?

কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে যদি সে-মেয়েটির দেখা পেত সে—শুধু এক মুহূর্তের জন্যে....তারপর ইয়ার-বন্ধুদের চিৎকারে সে চমকে উঠল, কল্পনায় ঘন-বিস্তৃত জাল গেল ছিঁড়ে। মদ এসেছে, ওদের কোটরাগত চোখ জ্বলজ্বল করছে ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতায়। ঝাঁপমুক্ত জানালা দিয়ে সাদেক আস্তে বাইরের পানে তাকাল।

কিন্তু চমরু এল লাফিয়ে : ওঠ্ শালা, বোতল আ গ্যয়া, আর রতনাশালী বোলাচ্ছে।

সাদেক নিস্পন্দ।

কালুও একবার হেঁকে উঠল কর্কশ-তীক্ষ্ণ গলায়, তবু সে নিঃসাড়, স্থির। হঠাৎ, কেন কে জানে, একটা প্রচণ্ড ভীতি তার টুঁটি টিপে ধরেছে। ইয়ার-বন্ধুদের ভয় করবে না, কিন্তু তাদের সঙ্গে কোথাও যেতে ভয় করছে তার। কোন্ অন্ধকার পিচ্ছিল সুড়ঙ্গ দিয়ে তারা যাবে, যাবে পিছলে-পিছলে গড়াতে-গড়াতে আর হাসবে উঁচু তীক্ষ্ণ গলায়; কুৎসিত কথা কয়ে-কয়ে বিকটভাবে হেসে-হেসে আরো নেবে যাবে, যাবে আর যাবে....সাদেক স্তব্ধ।

কালু আবার ফিসফিস করে কথা কইবার চেষ্টা করল :

—থাক্, ব্যাটা থাক্, থাক্ বুঁদ হয়ে। শালা বেইমান, চুপি-চুপি পেটে মাল ঢুকিয়ে—এবং একটু পরে ঘরময় অসম্ভব শান্তি। সেই পৃথিবীর শান্তি যেন। সাদেক তাকাল চারধারে : নিষ্প্রভ আলোয় বীভৎস ঘরটা আশ্চর্যভাবে শূন্য, কেউ নেই।

সাদেকও রাস্তায় এসে দাঁড়াল। বাইরে রাতের অন্ধকারে স্তব্ধ নীরবতা, আর সে-নীরবতায় দূরে কোথায় একটা শিশু কঁকিয়ে-কঁকিয়ে কাঁদছে। আহা, শিশু কাঁদছে, রাতের বিপুল অন্ধকারে আর গভীর নীরবতায় শিশু কাঁদছে, সেই পৃথিবীর শিশু....

দুই তীর ও অন্যান্য গল্প

এ-সঙ্কলনের গল্পগুলির কয়েকটি নতুন কয়েকটি পুরাতন, কয়েকটি প্রকাশিত কয়েকটি অপ্রকাশিত। দুটি আবার প্রথমে ইংরাজী ভাষায় লেখা এবং ছাপা হয়।

পূর্ব-প্রকাশিত গল্পগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সে-গুলি এ-সঙ্কলনের জন্যে ঘষামাজা করেছি, নাম বদলেছি, স্থানে-স্থানে লেখকের অধিকারসূত্রে বেশ অদল-বদলও করেছি।

১০৬ কে লুই ব্লেরিও
প্যারিস
আগস্ট, ১৯৬৪

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

দুই তীর

প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে বারান্দায় ক্যানভাসের ডেকচেয়ারে বসলে পায়ের সামনে আবদুল ঝুঁকে পড়ে তার জুতা-মোজা খোলে। ভৃত্যের এ-সেবায় আফসারউদ্দিন যে আনন্দ বোধ করে, তা নয়। বরঞ্চ জুতা বাড়াতে গিয়ে প্রতিদিন কেমন জড়তা বোধ করে, তার পা-দুটি পাথরের মতো ভারি হয়ে ওঠে। সে আশা করেছিল নিত্যকার এ-সাহেবিয়ানা অনুষ্ঠানে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, কিন্তু এখনো হয় নাই। ভাবে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটাবে। তা-ও হয়ে ওঠে না।

আজও চাকরটি তার পাথরের মতো ভারি পা-দুটি থেকে প্রথমে জুতা খোলে, তারপর মোজা। অন্য দিনের মতো আজও আফসারউদ্দিনের দৃষ্টি পড়শীর বাড়ির ছাদে নতুন করে চুন-দেয়া সিঁড়িঘরে নিবদ্ধ হলেও তার সমগ্র সত্তা ব্যস্ত-সমস্ত চাকরটি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে থাকে। আবদুলের তেল জবজবে চুলে যত্ন করে কাটা সিঁতি। চট্‌পটে স্বল্পভাষী ছেলেটি নিত্যকার এই অনুষ্ঠানে অসাধারণ কিছু দেখতে পায় বলে মনে হয় না। বরঞ্চ যেমন নিপুণভাবে সে কাজটি সম্পন্ন করে তাতে মনে হয় কাজটি করে সে তৃপ্তি বোধ করে, হয়তো গৌরবও।

এবার আফসারউদ্দিনের পায়ের পাশে কালো চামড়ার চটি রেখে জুতা-মোজা হাতে আবদুল ক্ষিপ্রগতিতে ভেতরে চলে যায়। আফসারউদ্দিন জানে, জুতাজোড়াটি তুলে রাখার আগে তাতে সে একবার বুরুশ দিবে, মোজাজোড়াটা আলগোছে শুঁকে দেখে পেছনের বারান্দায় ক্লিপ দিয়ে ঝুলিয়ে দেবে। রোজ মোজা বদলাবার মতো আর্থিক অবস্থা আফসারউদ্দিনের এখনো হয় নাই।

দু-বছর আগে কেউ আফসারউদ্দিনের জুতা খুলত না। বস্তুত একটি মানুষের দিকে পা বাড়িয়ে দেবে এমন কথা তখন সে কল্পনাও করতে পারত না। তখন সে মেসবাড়ির হাওয়াবদ্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে বাস করত। তার ঘরের দেয়ালে আর্দ্রতাজাত মানচিত্রের মতো নকশাটি এখনো সে স্পষ্ট দেখতে পায়। এমন কি মনে হয়, হাত বাড়ালেই সে যেন দেয়ালটা ছুঁতে পারবে। তারপর নড়বড়ে চৌকিটা, ডালে তেলেপোকা, খিতখিতে ঠাণ্ডা ভাত, আনোনা তরকারি, পচা মাছ, ঘোলাটে গ্লাসে পানি—কিছুই তার বর্তমান খোলামেলা উজ্জ্বল জীবনে ম্লান হয়ে যায় নাই। আমাশা রোগগ্রস্ত সঙ্গীটি আজ কোথায় সে জানে না। যে-জীবন আফসারউদ্দিন পশ্চাতে ফেলে এসেছে, হয়তো তার দৃঢ় আলিঙ্গনে এখনো সে আবদ্ধ। কিন্তু মেসবাড়ির জীবনের মতো আজ সে অদৃশ্য হয়ে গেলেও আফসারউদ্দিনের মন থেকে সে অদৃশ্য হয়ে যায় নাই। মেসঘরের দেয়ালের আর্দ্রতাজাত নকশাটির মতো তার মুখমণ্ডলের প্রতিটি রেখা, তার প্রতি ভাবভঙ্গি বা মুদ্রাদোষ নিয়ে সে-মানুষটি তার মানসপটে প্রখর সুস্পষ্টতায় বিদ্যমান। যে-মানুষের সঙ্গে হয়তো সে আর কখনো একই ঘরে রাত্রিযাপন করবে না, সে-মানুষ স্বভাবগত ক্ষুদ্র পদক্ষেপে এখনো তার পদানুসরণ করে চলেছে, আত্মীয়তা

বন্ধুত্বের দাবি না করেও তার সঙ্গ সে ছাড়ে নাই। তবু মানুষটির যে একটি নিজস্ব অস্তিত্ব আছে তা নয়। সে মেসবাড়ির জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। আসবাবপত্রের তুলনায় তার স্মৃতিটা যদি উজ্জ্বলতর মনে হয়, তার কারণ সে মানুষ, প্রাণহীন বস্তু নয়।

আফসারউদ্দিন জানে, যে-জীবন সে ছেড়ে এসেছে, সে-জীবনের প্রতি তার কোনো মমতা নাই। থাকার কথা নয়। দারিদ্র্য-জর্জরিত সে-জীবনে লোভনীয় আদরণীয় কিছু নাই। তবু বিগত জীবন এখনো ঘনিষ্ঠ মনে হয়। হয়তো সে-জন্যেই দু-বছরব্যাপী প্রচেষ্টার পরেও সে তার নতুন জীবনকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে নাই। তার আবরণই কেবল গ্রহণ করেছে, তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় নাই। তার নকশা অবলম্বন করেছে, আইনকানুনও অম্লানবদনে মেনে চলছে, কিন্তু সে-জীবন তার রক্তে মাংসে এখনো বাসা বাঁধে নাই। সে যখন শ্রান্তিতে ডেকচেয়ারে গা এলিয়ে দেয় তখন সে সত্যি শ্রান্তিবোধ করে না; তখন সে তার বর্তমান জীবনের আচার-ব্যবহারের একটা নির্দেশই কেবল পালন করে।

তবু এ-সব কথা তাকে বিচলিত করে না। সে জানে জীবনের ধারা পরিবর্তন করা সহজসাধ্য নয়। তার বর্তমান জীবন সম্পর্কে সে যে তার সচেতনতা এখনো হারায় নাই, তাও বোধগম্য। কিন্তু একটি ব্যাপার তাকে গভীরভাবে বিচলিত করে। তার মনে হয়, তার যে-সুদিন এসেছে সে-সুদিন তার মনের গভীর কোন অঞ্চলে কেমন একটা ভয়-শঙ্কার সৃষ্টি করে। সে বোঝে না, তার যথার্থতাও দেখে না। এ-বিষয়ে তার সন্দেহ নাই যে, তার দারিদ্র্যের সত্যিই অবসান ঘটেছে। ভাগ্যবশে এবং যোগ্যতা-অধ্যবসায়ের সাহায্যে যে-জীবনে সে প্রবেশ করেছে সে-জীবন সমস্যা-উৎকণ্ঠা-উদ্বেগশূন্য না হলেও তাতে আর্থিক অভাব-অনটন দুঃখ-কষ্টের ছায়া নাই। তবে সে অস্ফুট ভয়-শঙ্কার কারণ কী?

আফসারউদ্দিন লম্বা-চওড়া লোক। এবার সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়েই শার্ট-গেঞ্জি খোলে। নিদারুণ গ্রীষ্মের দিনে যেমন রোজ হয়, তার গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে একাকার।

—আবদুল। সে গম্ভীর ভারিক্কি গলায় ডাকে। এ-গলাও যেন তার নতুন জীবনের নকশামাফিক।

ধূসর রঙের মোজাজোড়া ততক্ষণে বারান্দায় ঝোলানো হয়েছে। তাই আবদুল ছুটে আসে। আসবার সময় নিত্যকার মতো আলনা থেকে মোটা তোয়ালেটা নিয়ে আসে। সেটা দিয়ে এবার সে তার মনিবের দেহের নগ্ন উপরাংশ সজোরে ঘষতে থাকে। দেহের সে-অংশে অশেষ লোমরাশি। তাতে টান পড়লে মাঝে-মাঝে আফসারউদ্দিন নাক দিয়ে আওয়াজ করে।

দেহ শুকালে সে চাকরের দিকে না তাকিয়ে প্রশ্ন করে,

বিবি সাহেব উঠেছেন?

জি না।

আফসারউদ্দিন গোসলখানার দিকে রওনা হয়। বারান্দা অতিক্রম করবার সময় শূন্য আকাশে অকস্মাৎ মেঘের আবির্ভাবের মতো তার মনে একটা ছায়া জেগে ওঠে। তার মনে হয়, তার স্ত্রী হাসিনাই যেন তার সে অস্ফুট ভয়-শঙ্কা এবং তার বর্তমান জীবন সম্পর্কে সচেতনতার কারণ। দুই জীবনের মধ্যে যে-পুল, সে-পুলের মধ্যখানে হাত বাড়িয়ে পথরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী।

এমন কথা কখনো সে ভাবে নাই। তাই সে কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে থাকে।

আফসারউদ্দিনের শ্বশুর আরশাদ আলী এবং তাঁর মরহুম ওয়ালেদ আরবাব আলী উভয়ই উচ্চপদস্থ চাকুরে ছিলেন। অবশ্য চাকরির কথা তাঁদের জন্যে একটি বড় কথা নয়। তাঁদের বংশ পূর্ববঙ্গে সুপরিচিত খানদানি বংশ। সে-খানদানি আবার অর্থসম্পদে পোস্তাবন্দি, যে-অর্থসম্পদ ইদানীং চা-বাগান কলকারখানায় টাকা খাটানোর ফলে বিশেষভাবে বৃদ্ধিলাভই করেছে।

আরশাদ আলী সাহেবের কখনো আর্থিক দৈন্য না থাকলেও জীবনের বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি সুখী হতে পারেন নাই। সে-ক্ষেত্র তাঁর পারিবারিক জীবন। তাঁর স্ত্রী মরিয়ম খানম নিজেরই খালাতো বোন; বঙ্গদেশে খানদানি মুসলমানদের মধ্যে পারিবারিক বিবাহটা অত্যন্ত সাধারণ। তাঁরা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলেই হোক বা মরিয়ম খানমের মেজাজ অতিশয় রুক্ষ ধরনের বলেই হোক, তাদের মধ্যে কখনো বনিবনা হয় নাই। তাঁদের একমাত্র ছেলেটির মৃত্যু ঘটলে মরিয়ম সাহেবা আলাদা হয়ে গিয়ে তাঁর বাপের বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। আরশাদ আলী তখনো চাকরিতে নিযুক্ত বলে তাঁর মফস্বল ভ্রমণ শেষ হয় নাই। তাসবাজি করে, কালোয়াতি গানের আসর বসিয়ে এবং শিকার-পিকনিক করেও যখন তাঁর জীবনের নিঃসঙ্গতা কাটল না তখন তাঁর মরুভূমির মতো জীবনে একটা মরূদ্যান সৃষ্টির প্রয়াসে তিনি ছয় বছরের মেয়ে হাসিনাকে তাঁর কার্যস্থলে নিয়ে যান। বলাবাহুল্য, এ-বিষয়ে মরিয়ম খানমের মত পাওয়া সহজ হয় নাই; তাঁকে অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হয়।

ফিরতে পথে ট্রেনের নির্জন কামরায় বসে কতক্ষণ তিনি মেয়ের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকেন। তারপর একটা অকস্মাৎ উদ্বেলিত স্নেহে তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে। নিজেকে সংযত করে তিনি বলেন,

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসতে নাই। ইঞ্জিনের ছাই চোখে এসে পড়তে পারে।

মেয়েটি নড়ে না; তাঁর কথা শোনে বলেও মনে হয় না। একটু অপেক্ষা করে সজোরে কেশে তিনি বলেন,

এখানে আয়। ইঙ্গিতে তাঁর পাশে একটি স্থান তিনি দেখান।

মেয়েটি জানালায় থুতনি রেখে তেমনি বসে থাকে, নড়ে না, উত্তর দেয় না। তবে তিনি লক্ষ্য করেন, ছয় বছরের মেয়েটির চোখে কেমন একটা ভাব যেন। একটু উদ্ধত ভাব, কিসের ধারও তাতে।

আরশাদ আলী এবার একটা বই খুলে পড়তে শুরু করেন। হাসিনা জানালাতে মুখ রেখেই ঘুমিয়ে পড়ে।

হাসিনা তাঁর সঙ্গে বেশিদিন থাকে নাই। আরশাদ আলী ভেবেছিলেন, পাথুরে পাহাড়ে দণ্ডায়মান বৃক্ষ যেমন পাকে-প্রকারে রসগ্রহণ করে, তেমনি তিনিও তার শূন্য জীবন হতে একটু স্নেহরস আদায় করবেন। তাঁর সে-বাসনা পূর্ণ হয় না। ক-দিন যেতেই তিনি বুঝলেন, মেয়েটির মধ্যে তার মায়ের রক্ত যেন। একটুতে সে রেগে খুন হয়ে যায়, একটা গোঁ ধরলে কারো সাধ্য নাই সে গোঁ ছাড়ায়। চাকরানি-আয়া হদ্দ হয়ে যায়, তিনিও যে তাকে শাসন করতে বিশেষ সক্ষম তা নয়। তারপর একদিন একটি অব্যক্তব্য কারণে হাসিনা সকাল থেকে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে উৎকট কান্না শুরু করে। সন্ত্রস্ত হয়ে আয়া তাঁকে আপিসে খবর দেয়। তিনি ছুটে আসেন, অসুখ-বিসুখ হয়েছে ভয় করে ডাক্তার ডাকেন, রূপকথার বাদশাহের মতো মেয়েকে সমগ্র রাজ্য প্রতিজ্ঞা করেন, কিন্তু কিছুতেই হাসিনার কান্না ধরে না। গভীর রাত পর্যন্ত সে থেকে-থেকে কাঁদতেই থাকে।

পরদিনই মেয়েকে নিয়ে ট্রেন ধরেন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছলে তাঁর স্ত্রী মরিয়ম খানমের মুখে বিজয়িনীর ধারালো হাসি জেগে ওঠে। সে-হাসি উপেক্ষা করে আরশাদ আলী বলেন,

আমার অনেক কাজ। হাসিনাকে দেখার সময় হয় না।

মরিয়ম খানম একটা অবিশ্বাসের আওয়াজ করেন। তারপর ক্ষিপ্রগতিতে মাথায় কাপড় তুলে মেয়েকে প্রশ্ন করেন,

এত রোগা হয়েছিস্ কেন? তোর বাপ তোকে খেতে দেয় নি?

আরশাদ মেয়ের উত্তরের জন্যে সামান্য উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করেন। আশা করেন, মেয়েটি তাঁর অশেষ আদর-যত্নের কথা বলবে। কিন্তু এ-সময়ে কী একটা কথা তার মনে পড়ায় সে হঠাৎ একটা নাচন দিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। হয়তো প্রশ্নটির উত্তর দিতে

চায় না সে।

একটু নীরব থেকে আরশাদ আলী নিম্ন গলায় বলেন,

মায়ের মেজাজ পেয়েছে মেয়ে।

সব মায়েরই দোষ। বলে মরিয়ম খানম আবার ঘোমটা টানেন। দোষ যারই হোক, আশা করি বড় হলে তার স্বভাব বদলাবে।

মরিয়ম খানম অত্যাশ্চর্য ধৈর্যের পরিচয় দেন। অনুত্তেজিত কণ্ঠে কেবল বলেন, আপনার ট্রেন কটায়?

স্বামী সহসা উত্তর দেন না। মনে হয় তাঁর মুখে একটা ছায়া নাবে। তারপর ঈষৎ চমকে উঠে বলেন,

সাড়ে পাঁচটায়।

তবে চায়ের কথা বলি।

ফিরতি ট্রেনের সময়-যে বেশি দূর নয়, তা দু-জনের কাছেই নিঃসন্দেহে সুখবর বলে মনে হয়।

হাসিনা মায়ের কাছে থেকেই বড় হয়। সে দীর্ঘ স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী যুবতীতে রূপান্তরিত হয়। তবে তার স্বভাবের উগ্রতা-রুক্ষতা কমে না, নব-যৌবনের লাবণ্য-কোমলতাও একটি উদ্ধত ভাবে ঢাকা পড়ে থাকে। ততদিনে আরশাদ আলী পেনশন নিয়ে দেশের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এ-সময়ে তাঁর স্ত্রী মরিয়ম খানমের মধ্যেও একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। সারাজীবন যে-সংগ্রামে তিনি লিপ্ত ছিলেন তা হয়তো অকস্মাৎ অর্থহীন মনে হয় বলেই তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে বসবাস শুরু করেন। তবে তাঁদের মধ্যে এবার-যে একটা স্বচ্ছন্দ অনাবিল দাম্পত্যজীবন প্রবাহিত হতে থাকে, তা নয়। একত্রে বসবাস করেও তাঁরা কেমন আলাদা হয়ে থাকেন। সংঘর্ষের হেতু যেমন তাঁরা দেখতে পান না, তেমনি মিলনের প্রয়োজনও তাঁরা বোধ করেন না। একই বাড়িতে থেকে কীভাবে পরস্পরকে এড়ানো যায় বা কীভাবে পরস্পরের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকা যায় সে-কলাকৌশল ততদিনে তাঁরা দু-জনেই রপ্ত করেছেন। তাঁদের শোবার ঘর যে আলাদা, শুধু তাই নয়। আরশাদ আলী দিনের অধিকাংশ সময় আপন ঘরে বা প্রশস্ত বারান্দায় হুঁকার নল হাতে আপন ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকেন; অভ্যন্তরে মরিয়ম খানমও তাঁর নিজস্ব জীবনে ডুবে থাকেন।

অবসর জীবনের এই অলস, সময়বহুল দিনে আরশাদ আলীর মনে অর্থশালী খানদানি বংশের প্রতি বিতৃষ্ণা, অবজ্ঞা এবং অনাস্থার সৃষ্টি হয়। তিনি ভাবেন, জীবন থেকে তিনি কোনোই তৃপ্তি লাভ করেন নাই; জীবন তাঁকে শূন্যপাত্রই ফিরিয়ে দিয়েছে। তার জন্যে তিনি তাঁর পরিবারকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান। তাঁর এই দৃঢ়বিশ্বাস হয় যে, যাদের জীবনসংগ্রামের কোনো অভিজ্ঞতা নাই, প্রভূত অর্থসম্পদ আয়েশ-বিলাসের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা অন্তঃসারশূন্য। যারা মনুষ্যত্ব-বিবর্জিত, জীবনের সুধাপান করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এ-সময়ে নানা খানদান পরিবার থেকে হাসিনার শাদির প্রস্তাব আসতে থাকে। তাঁর পরিবার সম্বন্ধে নতুন ধারণায় বদ্ধমূল হয়ে সে-প্রস্তাবে কান না দিয়ে আরশাদ আলী অন্য কোথাও হাসিনার জন্য দুলা খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে তিনি একদিন আফসারউদ্দিনকে আবিষ্কার করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হয়, তিনি যেন একটি অমূল্য রত্ন খুঁজে পেয়েছেন। ছেলে দেখতে শুনতে ভালো, ভালো চাকরিও করে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, জীবনযুদ্ধে একাই লড়াই করে সে বড় হয়েছে, শত বাধাবিপত্তি ঠেলে সে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। জীবনের মর্ম যদি কেউ বুঝে থাকে, তা এমন মানুষই বোঝে এবং তাদের সামনেই জীবন তার গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত করে। অনতিবিলম্বে তিনি স্থির করেন, আফসারউদ্দিনের হাতেই হাসিনাকে সমর্পণ করবেন। বলাবাহুল্য, মরিয়ম খানম এ-বিয়েতে তাঁর মত দেন নাই। তবে তিনি যতই বিরোধিতা করেন ততই আরশাদ আলীর সংকল্প বজ্রকঠিন হয়।

বিরোধিতা বাকবিতণ্ডে হয়রান হয়ে মরিয়ম খানম অবশেষে নীরব হলে তাঁর নীরবতাকে সম্মতি বলে গ্রহণ করে আরশাদ আলী শীঘ্র তার সংকল্পকে কার্যে রূপান্তরিত করেন।

বিয়ের দু-দিন পরে আরশাদ আলী নতুন জামাইকে ডেকে পাঠান। আতরের সুগন্ধ ছড়িয়ে যুবক তাঁর পাশে একটি চেয়ারে বসলে তিনি অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকেন। মনে হয়, যে-কথা তিনি বলবার জন্যে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তার বলার অনেক কিছুই আছে। কিন্তু সবটা বলা সম্ভব নয়। কী বলবেন তিনি?

অবশেষে গলা সাফ করে তিনি বললেন,

হাসিনার সম্বন্ধে একটা কথা তোমাকে বলা কর্তব্য।

ঔৎসুক্য না দেখিয়ে ধীর-স্থির দৃষ্টিতে নতুন জামাই শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমার মেয়েটি আদরের মধ্যে বড় হয়েছে। স্নেহ-মমতা বা অর্থের কোনোই অভাব সে কখনো বোধ করে নাই। তাই জীবন সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নাই। সে-কথাটা মনে রেখো।

নতুন জামাই চলে গেলে আরশাদ আলী ভাবেন, তিনি পৈতৃক কর্তব্য সম্পূর্ণ করেছেন। তিনি অসীম তৃপ্তি বোধ করেন। জামাইকে যা তিনি বলেছেন তা অতিশয় সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর সন্দেহ থাকে না যে, তার মর্ম আফসারউদ্দিন বুঝবে।

বাইরে সান্ধ্য হাওয়া জেগেছে। পেছনের বারান্দায় দড়িতে ধূসর রঙের মোজাজোড়া সে-হাওয়ায় দোলে। গোসলের পর হাওয়াটি অতি স্নিগ্ধ মধুর মনে হয়। নিমীলিত চোখে ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে, বসে আফসারউদ্দিন ভাবে।

হাসিনাকে ভালোবাসতে তার সময় লাগে নাই। বরঞ্চ কেমন ঝড়ের মতোই সে-ভালোবাসাটা জাগে। জাগে কিছুটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে, কিছুটা তার অন্তরের প্রেমক্ষুধাতুর গভীর হাহাকারের মধ্যে দিয়ে। তার মনে হয়, সে যেন অকস্মাৎ একটি বিস্ময়কর সুন্দর জগৎ আবিষ্কার করেছে। তবে প্রথম ভাবোচ্ছ্বাসটা কাটলে আফসারউদ্দিন ক্রমশ একটি বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে, যে-ভাবোচ্ছ্বাসটা পৃথিবীগ্রাসী মনে হয়েছিল, আসলে তা তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। শুধু তাই নয়। সে-ভাবোচ্ছ্বাস কেমন একটা শীতল উঠানে সশব্দে আছড়ে পড়ে যেন। কোনো প্রতিধ্বনি জাগে-তো তা তার কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি। হাসিনা উদাসীন, কেমন শক্ত শীতলও। গভীরভাবে লজ্জিত হয়ে আফসারউদ্দিন নিজেকে সংযত করে। তারপর থেকে সে-সংযম তাদের মধ্যে একটি প্রাচীরেই পরিণত হয়।

বারান্দায় ছায়া অগ্রসর হতে শুরু করেছে। সামনের মাঠে সূর্যের ম্লান আলো; ঘাসের রং গাঢ় হয়ে উঠেছে। আফসারউদ্দিন একটি সিগারেট ধরায়। তারপর ডাকে,

আবদুল।

আবদুল যেন দেয়ালের মধ্যে মিলিয়ে ছিল; তাকে কেবল দৃশ্যমান হতে হয়।

বিবি সাহেব ওঠেন নাই?

চাকরটি উত্তর না দিলে সে বুঝতে পারে, হাসিনার ঘুম এখনো ভাঙে নাই।

আফসারউদ্দিন ঘন-ঘন কয়েক বার সিগারেট টানে। তারপর অন্তরের কোথাও ক্রোধের উষ্ণতা বোধ করে।

একটু পরে সে উঠে দাঁড়ায়। সশব্দে বারান্দা অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করে। হয়তো আশা করে যে তার পায়ের শব্দেই হাসিনা জেগে উঠবে, তাকে তুলতে হবে না। খাটের সামনে পৌঁছে একটু ইতস্তত করে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। হাসিনার চুল বালিশে-বিছানায় ছড়িয়ে আছে; গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তার মুখের তৃতীয়াংশ বালিশে ডুবে আছে। যে-অংশটি দেখা যায়, সে-অংশে তার স্বাভাবিক উগ্রতাটি চোখে পড়ে না। শুরুতে বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে হাসিনার উগ্রতার বিষয়ে সে কেমন একটা গর্বই বোধ করত।

হাসিনাকে ডাকতে হয়।

কত ঘুমাবে? সন্ধ্যা উতরে গেল। চা খাবে না?

প্রথমে হাসিনার মধ্যে কোনো সাড়া দেখা যায় না। কিন্তু একটু পরে তার চোখে যেন একটু কম্পন জাগে। পরমুহূর্তে হঠাৎ সোজা হয়ে ওপরের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে চোখ খোলে। আফসারউদ্দিন আশা করে, হাসিনা একবার তার দিকে তাকাবে। কিন্তু তার দৃষ্টি তুলে-রাখা মশারির ওপরই নিবদ্ধ থাকে। তার চোখে একটু অসন্তুষ্টির ভাব।

কেবল রাতদিন ঘুমাও। কথাটি বলে বিরক্তির শব্দ করে পূর্ববৎ সশব্দে আফসারউদ্দিন বেরিয়ে যায়। বারান্দায় পৌঁছে হেঁকে বলে,

চা দাও।

অদৃশ্য আবদুল চা আনতে যায়।

চা-পানের সময় আড়চোখে একবার হাসিনার ভাবভঙ্গি দেখে আফসারউদ্দিন সকালের সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে মনোনিবেশ করে। চা-পান শেষ হলে ভেতরে গিয়ে মোকাসিন জুতা পরে নেয়। বারান্দায় আবার বেরিয়ে হাসিনার দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করে,

ক্লাবে যাবে?

না। শরীরটা কেমন মেজ-মেজ করছে।

অত ঘুমালে করবে না?

হাসিনা উত্তর দেয় না। আফসারউদ্দিন অবশ্য কোনো উত্তর আশা করে নাই। এবার সে একাকী ক্লাবের দিকে রওনা হয়।

মফস্বল-শহরের ক্লাব; সেখানে তাসের চেয়ে আড্ডাই বেশি জমে। আজ আফসারউদ্দিন কথা বলার কোনো ইচ্ছা বোধ করে না বলে তিন জন তাসবাজি সভ্য পেয়ে খুশিই হয়। বাইরে কেমন মেঘ করে উঠেছে। সে ভাবে, তাসটা আজ জমবে। মাসের শুরু বলে পকেটে টাকার থলেটাও মন্দ ভারি নয়।

ক্বচিৎ-কখনো আফসারউদ্দিন একাকী তাস খেলে বটে তবে বেশি রাত করে না। আজ তার ব্যতিক্রম হয়। আজ তাসে তার নেশা ধরে। এক সময় উঠবে বলে মনস্থির করলেও শেষ পর্যন্ত ওঠা হয় না, কারণ আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নাবে। যখন বৃষ্টি ধরে, তখন তারা নতুন রাবারে মশগুল।

অনেক রাতে খেলা শেষ করে অন্ধকারাচ্ছন্ন কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে টর্চের আলো ফেলে আফসারউদ্দিন অবশেষে যখন ঘরমুখো হয়, তখন সহসা একটি প্রশ্ন তার মনে জাগে। সে কি এত রাত পর্যন্ত খেলার নেশাতেই এমন মত্ত হয়ে ছিল।

প্রশ্নটি ঘাঁটিয়ে দেখবার সাহস হয় না বলে তার উত্তর সে পায় না। পিচ্ছিল পথে সে মনোনিবেশ করে।

ক্লাবে দুই দফা চা-কাটলেট হয়েছে। তাই অন্ধকারের মধ্যে থেকে ছায়ার মতো আবদুল দেখা দিলেও সে না খেয়ে কাপড় বদলে সন্তর্পণে মশারি তুলে বিছানায় প্রবেশ করে। ঘরের কোণে মৃদুভাবে একটি লণ্ঠন জ্বলে। তার স্তিমিত আলোয় সে একবার হাসিনার দিকে তাকায়। তার মুখ সে দেখতে পায় না। কিন্তু অন্যদিনের মতো তার চুল আজ বালিশ-বিছানায় ছড়িয়ে নাই। মনে হয় সে যেন ঘুমিয়ে নাই। ঘুমিয়ে থাকলেও সবেমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। সে কি আফসারউদ্দিনের জন্যে অপেক্ষা করছিল? অবশ্য প্রশ্নটি মনে জাগতেই সে বোঝে, তা সত্য হতে পারে না। তবু একটা আশা তার মনের প্রান্তে ভাসা-ভাসাভাবে জেগে থাকে।

আশাটা ভেঙে চুরমার হতে বেশি দেরি হয় না। শীঘ্র নীরব ঘরে হাসিনার কণ্ঠ শোনা যায়। তার মুখ থেকে যে-শব্দগুলি বের হয়, সে-শব্দগুলি পাথরের মতো ভারি, পাথরের মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ। সে বলে,

আমার ঘুম নিয়ে কথা বলেন তা আমার ভালো লাগে না।

আফসারউদ্দিন সহসা উত্তর দেয় না। প্রথমে সে মনের নীরবতার মধ্যে অস্পষ্ট আশাটি কাচের পাত্রের মতো ভেঙে পড়তে শোনে, তারপর হয়তো এক খণ্ড কাচের ধারালো অংশে খোঁচা লাগলে সে একটু আহতও হয়। একটু পরে সে বলে,

কেন বলি, তা তুমি জান।

হাসিনা এবার কোনো উত্তর দেয় না। আফসারউদ্দিন বোঝে, সে যে-উক্তিটা করে তার মর্ম হাসিনা ভালো করে বোঝে বলেই নীরব হয়ে থাকা সে সমীচীন মনে করে। বস্তুত, হাসিনা এসব কথার ফাঁকে কখনো ধরা পড়তে চায় না। কলহের অবকাশ নাই তাদের এই নিরলম্ব দাম্পত্যজীবনে।

হাসিনা উত্তর দেবে না জেনেও আফসারউদ্দিন অপেক্ষা করে। নীরবতা অখণ্ড থাকলে তার অন্তরে একটা ক্রোধের সঞ্চার হয়। পাশে সামান্য শব্দ হয়, হাসিনার হাতের চুড়িতে ঝঙ্কার ওঠে। তার দিকে না তাকিয়েও আফসারউদ্দিন বুঝতে পারে, হাসিনা একটু নড়েচড়ে একটা আরামদায়ক অবস্থান আবিষ্কার করে নিদ্রার জন্যে তৈরি হচ্ছে। নিঃসন্দেহে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়বে। তার মনে ক্রোধ জাগলেও সে-ক্রোধ তার ঘুমের পথে বাধা সৃষ্টি করে না। সে-ক্রোধের পশ্চাতে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা মান অভিমান নাই। তাই তার নিদ্রা সম্পর্কে আফসারউদ্দিনের উক্তিটি তার মনে ক্রোধের সৃষ্টি করলেও সংকোচ আনে না।

অকস্মাৎ আফসারউদ্দিন মনস্থির করে, হাসিনা ঘুমিয়ে পড়ার আগেই আজ তাকে কিছু কথা মন খুলে বলবে। কতদিন আর তাদের দাম্পত্যজীবনের এই প্রহসন চলবে?

এক সময়ে আফসারউদ্দিন বিশ্বাস করত, সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত নরনারীর মধ্যে বিয়ের পর একটু প্রেমভালোবাসার সঞ্চার না হওয়াটা প্রকৃতির রীতিবিরুদ্ধ। আজ তার সে-বিশ্বাস আর অবিচল নয়। তার প্রতি যে হাসিনার মনে স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার উদয় হবে, সে-আশা নেহাতই ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। তার ভাবাবেগ হাসিনার মনে কোনো রেখাপাত করে নাই; ভবিষ্যতে যে করবে সে-কথায় আর ভরসা পায় না। আফসারউদ্দিনের মনেও হাসিনার প্রতি ভাবাবেগে ভাটি পড়েছে, তার স্নেহ-মমতার উৎস কেমন শুকিয়ে উঠেছে। হয়তো শীঘ্র এমন একদিন আসবে যখন সে-উৎস সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যাবে। তখন সে-শুষ্কস্থানে ঘৃণা-বিদ্বেষই কি জন্মাবে না?

বিয়ের পর আফসারউদ্দিন অনেক কিছু আশা করেছিল। যতটা আশা করেছিল ততটা যুক্তিসঙ্গত নয় তা সে নিজেই বোঝে। সে-আশায় রঙিন কল্পনার বিন্যাস ছিল। বস্তুত সে জানে যে, আসল দাম্পত্যজীবন নাটক-নভেল নয়; সে-জীবন কেবল ভাবপ্রবণতার ওপরে গড়া যায় না। আদর্শ দাম্পত্যপ্রেম অতিশয় গুরুতর ব্যাপার। সেখানে রঙ্গরস বা প্রকাশ্য ভাবোচ্ছ্বাসের স্থান-তো নাই-ই, সে-সব সত্যিকার দাম্পত্যপ্রেমের মর্যাদা হানিও করে। কিন্তু তাদের দাম্পত্যজীবনে না এসেছে একটু রঙ্গরসের ছিটাফোঁটা, না পড়েছে প্রেমের বন্ধনগ্রন্থি। তাদের এ-দাম্পত্যজীবনের অভ্যন্তরে কিছু নাই। সেখানে ক্ষুদ্রতম বীজও পড়ে নাই যে কেউ এ-আশা পোষণ করতে পারে একদিন সে-বীজ ফুল-ফলে সমৃদ্ধ ছায়াশীতল বৃক্ষে রূপান্তরিত হবে।

এ-সব কথা আফসারউদ্দিনের মনে ক্রমশ একটি গভীর নিরাশার সৃষ্টি করে। তবে যে-কথা তাকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করে সে কথা এই : কেন তার প্রতি হাসিনার মনে সামান্য স্নেহ-মমতার আভাসও দেখা দেয় নাই? এ-প্রশ্নের কোনো বোধগম্য উত্তর সে খুঁজে পায় না। তবে একটা সন্দেহ জাগে কেবল। বিয়ের প্রাক্কালে একটা খবর আকারে-ইঙ্গিতে শুনলেও তা তার কানে পৌঁছেছিল। সে-খবরটি এই যে, তাদের বিয়েতে আরশাদ আলী সাহেব ব্যতীত আর কারো মত ছিল না। এ-ব্যাপারে হাসিনার কী মত তা জানবার প্রয়োজন বাকবিতণ্ডা-বুদ্ধিযুদ্ধে লিপ্ত পরিবার বোধ করে নাই। তবু হাসিনার নিশ্চয় একটা মত ছিল। বিরুদ্ধদলের

শীর্ষে ছিলেন মরিয়ম খানম। তাঁরই হাতে হাসিনার শিক্ষাদীক্ষা, তাঁরই ঘরে সে প্রতিপালিত। অতএব মেয়ে যদি মায়েরই মত পোষণ করে থাকে তাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তার মতটি সে যদি গোপন রাখে তার কারণ এই যে, মায়ের অমতে বিয়েটা ঘটতে পারে তা সে ভাবতে পারে নাই। অসম্ভবটাই অপ্রত্যাশিতভাবে সত্যে পরিণত হলে শেষ মুহূর্তে তার বিরোধিতায় কোনো লাভ হবে না বুঝে সে হয়তো নীরব থাকা যুক্তিসঙ্গত মনে করে। তবে সে-মত এখন তার প্রেমশূন্যতায় প্রকাশ পাচ্ছে। মুখ ফুটে কিছু না বললেও আজ সে এ-কথা জানতে চায়, মরিয়ম খানমের মেয়েরও এ-বিয়েতে মত ছিল না।

আরশাদ আলীর বিপক্ষদলের কেন এ-বিয়েতে মত ছিল না সে-কথাও আফসারউদ্দিন ভাসা-ভাসা শুনতে পেয়েছিল। যা শোনে নাই তা কল্পনা করে নিতে তার অসুবিধা হয় নাই। বিপক্ষদলের আপত্তির কারণ ছিল আফসারউদ্দিনের দারিদ্র্য-জর্জরিত অতি সাধারণ পারিবারিক পটভূমি। সে যে কঠোর জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে সে পটভূমিকে পশ্চাতে ফেলে আসতে সক্ষম হয়েছে, তাতে তাদের আভিজাত্য-সচেতন মন গলে নাই।

তার পূর্বপরিচয়ই কি হাসিনার প্রেমহীনতার কারণ?

আরেকটি কথাও অন্যান্য খবরের মতো অস্পষ্টভাবেই আফসারউদ্দিন শুনতে পেয়েছিল। তা আরশাদ আলী মরিয়ম খানের অসুখী দাম্পত্যজীবনের কথা; তাঁদের দাম্পত্য কলহের বা আজীবন মনোমালিন্যের কারণ সে জানে না। তবে কখনো-কখনো তার মনে হয়, যে-দ্বন্দ্ব তাঁদের জীবনকে বিষাক্ত করেছিল, তার ছায়া তাদের জীবনেও যেন প্রতিফলিত হয়েছে। হাসিনা কি তার মায়ের দ্বন্দ্বই বহন করে চলেছে?

হয়তো এ-সব আফসারউদ্দিনের খেয়াল মাত্র। হয়তো হাসিনার অক্ষমতার কারণ একটি অতি সোজা উত্তরের মধ্যেই পাওয়া যাবে। এমনই তার মানসিক গঠন যে তার পক্ষে কাউকে ভালোবাসা সম্ভব নয়। যে-পরিবারে সে মানুষ হয়েছে সে-পরিবারে কেউ কাউকে ভালোবাসতে শেখায় না, ভালোবাসার প্রয়োজনও কেউ বোধ করে না। হাসিনা হয়তো দাম্পত্যজীবনকে অন্যান্য সামাজিক প্রথার মতোই দেখে; সে-জীবন যে স্নেহ-ভালোবাসা আশা-আকাঙ্ক্ষার সূত্রে বাঁধা দুটি মানুষের যুগ্ম জীবন, তা সে জানে না। ভালোবাসার প্রয়োজন কি সত্যিই আছে? কলহ-বিবাদশূন্য দাম্পত্যজীবনই কি মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আফসারউদ্দিন এ-বিষয়ে কী করে নিশ্চিত হতে পারে যে, স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার জন্যে সে-যে অদম্য তীক্ষ্ণ ক্ষুধা বোধ করে সে-ক্ষুধা স্বাভাবিক নয়? হয়তো অধিকাংশ মানুষ কখনো সে-ক্ষুধা বোধ করে না, দাম্পত্যজীবনে প্রেম-ভালোবাসার প্রয়োজনও কখনো দেখে না। এমন মানুষ সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করে, যশ মান অর্থও অর্জন করে।

আফসারউদ্দিন পিঠে শুয়ে স্থির হয়ে থাকে। সে অনুভব করে, তার পিঠ ঘামে ভিজে সারা। কিন্তু সে নড়ে না। মনে হয়, একটু নড়লে যেন ইট-পাথরের স্তূপের মতো তার ভাবনাচিন্তা সশব্দে ছড়িয়ে পড়বে। গভীর নীরবতার মধ্যে রাত অগ্রসর হয়। কিন্তু তার মনে হয়, রাত্রির কালো-মসৃণ মুহূর্তগুলি কেমন তার ভেতরটা কাঁটার মতো বিদ্ধ করে যাচ্ছে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রাত্রিও সজারুর মতো সুচ খুলে আছে। একটু পরে খোলা জানালা দিয়ে হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে মশারি দুলিয়ে যায়, তার কিছু সিক্তশীতলতা ভেতরেও প্রবেশ করে।

এ-ক্ষণিক চঞ্চলতার মধ্যে আফসারউদ্দিন একবার মুখ ফিরিয়ে হাসিনার দিকে তাকায়। তার চুলে এখনো শৃঙ্খলতা আসে নাই বটে কিন্তু কোমরের কাছে ঝুলে-থাকা হাতটি কেমন অবশ মনে হয়। সে বুঝতে পারে, যে-সব কথা তাকে বলবে বলে মনস্থির করেছিল, তা আর আজ বলা হবে না।

তাতে তার কিন্তু দুঃখ হয় না। কারণ সে বুঝতে পারে যে, সে-সব কথা বলা সহজ নয়। বলতে গেলে তার অন্তরটাকে সম্পূর্ণভাবে উলঙ্গ করতে হবে তাকে। তেমনভাবে মনকে উলঙ্গ করার সাহস তার আর নাই যেন। যে-মানুষ এত কাছে শুয়েও এত দূরে, সে-মানুষকে

সে কী করে তার অন্তর দেখায়? যে-মানুষ তার প্রতি এমন গভীরভাবে উদাসীন, তাকে কী করে তার মনের ক্ষুধার কথা বলে, কী করেই-বা বলে তার ভয়-শঙ্কার কথা।

তাছাড়া তার ক্ষুধার বা তার ভয়-শঙ্কার অর্থও যেন সে নিজেই আর বোঝে না। বুঝতে হলে স্নেহ-মমতা-সমবেদনার প্রয়োজন আছে।

তারপর এক সময়ে কালো রাত্রির অন্ধকার তার অন্তরে প্রবেশ করে, জাগ্রতের সচেতনতা স্বপ্নের সঙ্গে মিশে যায়। বিছানার উষ্ণতা, পিঠের তলে ঘাম, ঘরের হাওয়াশূন্যতা সে অনুভব করে, তবু মনে স্বপ্নের বিচরণ শুরু হয়। বাস্তব যখন অবাস্তবে মিলিয়ে যায়, তখন মনের গুপ্ত হাহাকারও নির্বাধায় নিরাবরণে চলাচল শুরু করে। সে-মুহূর্তকে তার বড় ভয়, তবু তাকে এড়াতে সে পারে না। সে কি ঘুমিয়ে? সে-কথা সে জানে না। সারা দেহ অবশ হয়ে থাকে। তবু চিন্তাস্রোতে মনের দুই কূল ভেসে যায়, সমস্ত সংযম ভেঙে পাশে শায়িতা হাসিনাকে আর দেখতে পায় না বটে, তবু হাসিনা তারই চতুর্দিকে ছড়িয়ে যেন। তার কালো চুলরাশি, তার লাবণ্যময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দীর্ঘকায়া সৌন্দর্য, তার দুর্লভ ক্ষীণ মাধুর্যময় হাসি—সবই সে একই সময় দেখতে পায়, অনুভব করতে সক্ষম হয়। হাসিনা তার দিকে বিশেষভাবে না তাকালেও তার দৃষ্টি পাথরের মতো নিষ্প্রাণ নিরাসক্ত নয়। তারপর কালো রাত্রির বন্যা আরো দুর্বার হয়ে ওঠে, তার অশ্রান্ত প্রবাহ মুখর হয়ে ওঠে সহস্র ভাষায়, তারপর সে-বন্যা মাদকতা আনে, ক্ষমাও আনে। বন্যা অবশেষে নিঃশেষ হলে কেবল একটি সজল ক্ষমাই ভেসে থাকে আফসারউদ্দিনের বিহ্বল মনে। ক্ষমা ছাড়া মানুষের পক্ষে কি বাঁচা সম্ভব?

শীঘ্র আফসারউদ্দিনের একটি হাত নক্ষত্রের মতো ছিটকে পড়ে, তারপর সে-হাত অধীরভাবে আরেকটি হাতের সন্ধান করে। কালো রাত্রির বন্যা থেমেছে কিন্তু মনের নির্মুক্ত হাহাকার অদম্যভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে। এখনো সে হাসিনাকে দেখতে পায়। হাসিনার চোখে নতুন দৃষ্টি। সে-চোখে আর বিদ্রূপ নাই। আফসারউদ্দিনের মনে যে-ক্ষুধা, সে-ক্ষুধার প্রতি আর বিদ্রূপ পাই। যে-অন্ধকারে কালো রাত্রির জন্ম হয়, যেখানে তার দুর্বার বন্যার সৃষ্টি হয়, সে-ক্ষুধাটির জন্ম হয় বলে কেউ তাকে বিদ্রূপ করতে পারে না। তাছাড়া, হাসিনার চোখেও ক্ষমা। ক্ষমা ছাড়া মানুষ কী করে বাঁচে? হাসিনার চুলের স্নিগ্ধ-মধুর গন্ধে তার নাসারন্ধ্র ভরে যায়। দুর্দান্ত হাওয়ায় চুলরাশি ওড়ে তার শিশুর মতো মুখের চতুর্দিকে। তার মুখেও নির্মল সৌরভ। দূরে শত সহস্র তারা ঝকঝক করে। আফসারউদ্দিনের কঠোর জীবনযুদ্ধ, তার প্রশংসনীয় অধ্যবসায়, তার দুঃখকষ্ট অকথ্য শ্রম-ক্লান্তি, এবং অবশেষে তার কৃতিত্বময় জয়-সাফল্য—কিছুই অর্থহীন নয়। সে-সব মরীচিকার মতো শুষ্ক মরুভূমিতে অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয় নাই। তার ভয়-শঙ্কার কারণ নেহাতই ভিত্তিহীন।

কালো রাত্রি আবার বন্যা হয়ে আসে। কিন্তু এবার সে বন্যা ঝরনার মধুর কলতানের মতো শোনায়, অশ্রুর মতো স্নিগ্ধ সজল মনে হয়। হাসিনা জানে, সার্থকতার চেয়েও যা মানুষ প্রাণপণে কামনা করে, তা বাঁচবার পথ। মানুষ বাঁচতে চায় কেবল। সে বড় নিঃসঙ্গ এবং নিঃসঙ্গতায় মানুষ বাঁচতে পারে না। অদম্য আশা নিয়ে মানুষ যে-নিঃসঙ্গতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, সে-সংগ্রামে পরাজিত হলে তারপর তার আর কিছু থাকে না। যখন সে ভাবে পার্থিব বিষয়-সম্পত্তি অবস্থান-প্রতিপত্তির জন্যে সে সংগ্রাম করছে, তখন বস্তুত তার উদ্দেশ্য কেবল পথহীন সীমাহীন নিঃসঙ্গতার হাত হতে মুক্তি পাওয়া। হাসিনার সুন্দর মুখ সহস্র তারার মতো ঝকমক করে। সে-মুখের দিকে তাকাতে আর সঙ্কোচ হয় না আফসারউদ্দিনের।

তারপর গভীর অন্ধকার থেকে একটা কণ্ঠ জাগে। প্রথমে আফসারউদ্দিন কিছু চমকিত হয়। সে চোখ খুলে মশারির ওপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সেখানে জাল নেই বলে অস্বচ্ছ কাপড়ে তার দৃষ্টি থেমে যায়। ঘরে হাওয়া নাই। গভীর রাত পূর্ববৎ স্তব্ধ হয়ে আছে। কেবল দূরে কোথাও একটা রাতপাখি বিষণ্ণকণ্ঠে ডাকে। সে বুঝতে পারে, তার চোখে নিদ্রার লেশমাত্র নাই, তার মনটাও একটা অকস্মাৎ আঘাতে সম্পূর্ণভাবে সজাগ হয়ে উঠেছে।

ততক্ষণে হাসিনা আবার পাশ ফিরে শুয়েছে। সে-যে বিছানা ত্যাগ করে নাই, সেইটাই আশ্চর্য মনে হয়। গ্রীষ্মরাতের উষ্ণতা সম্পর্কে রুক্ষ কণ্ঠে মন্তব্য করে ঝট্‌কা দিয়ে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল। তার রাতের বুকে যে-অদৃশ্য ঢেউ জেগেছিল, সে-ঢেউ এখনো যেন মিলিয়ে যায় নাই।

বড় গরম বৈকি। আপন মনেই হাসিনার মন্তব্যের পুনরুক্তি করে আফসারউদ্দিন। কিন্তু কথাটা অস্বীকার করতে পারে না।

এবার প্রগাঢ় নিঃশব্দতার মধ্যে ঘরের কোণে টেবিলের ওপর স্থাপিত ঘড়িটির টিক্-টিক্ আওয়াজটা কানে আসে। দূরে রাতপাখিটি ডেকেই চলে।

আফসারউদ্দিন বোঝে, সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তবু রাত্রির কালো বন্যার কথা স্মরণ হয় তার। সেটি অসত্য নয়। হয়তো ঘুমটা ছিল মনের এক প্রকারের কৌশল-আচ্ছাদন। হাসিনার কাছে সে ঘুমের দোহাই দেবে কি? না। তা যেন পাপ-স্বীকৃতির মতোই শোনাবে। অবশেষে আফসারউদ্দিন কিছুই বলে না। বরঞ্চ দেহ-প্রাণে সে নিথর হয়ে থাকে। ভেতরে কোথাও লজ্জা, অনুশোচনা এবং ক্রোধের একটি মিশ্রিত অনুভূতি তাকে নিপীড়িত করে। তারপর সে অপ্রীতিকর অনুভূতিও একটি বিচিত্র কাঠিন্যে জমে যায়।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে আফসারউদ্দিন জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে আকাশে স্তরের পর স্তর মেঘ জমে আছে। মশারির জালের মধ্য দিয়ে সে-মেঘসম্ভার বেদনাভরা স্মৃতির মতো মনে হয়। তবু তা যেন অতি দূরে। এত দূরে যে তার দিকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে তাকানো যায়। আজ ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে জেনেও সে বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

ক্রমশ তার চোখে সবকিছু কেমন অবাস্তব হয়ে ওঠে, মনের অতলে যে-কাঠিন্য এখনো সে বোধ করে, সে-কাঠিন্য ভারশূন্য হয়ে পড়ে। মনে হয়, শুধু তার দাম্পত্যজীবনই নয়, সমগ্র জীবনই নিরলম্ব হয়ে উঠেছে।

হাসিনা আজ সকালেই শয্যা ত্যাগ করেছে। আফসারউদ্দিনকে খুশি করার জন্যেই যে হাসিনা আজ সকালে উঠেছে, সে-কথা সে অন্যদিন ভাবতে পারত, আজ আর পারে না। বস্তুত বিছানার পাশে শূন্যতাটি আজ তাকে স্পর্শই করে না। তাদের মধ্যে শেষসূত্রটি যখন ছিন্ন হয়েছে তখন হাসিনার উপস্থিতি-অনুপস্থিতি তার কার্যকলাপ ভাব-অনুভূতির আর কোনো অর্থ নাই।

বিশেষ কলহ-বিবাদ ছাড়া বাকবিতণ্ডা প্রকাশ্য মনোমালিন্য ছাড়া অতি নিঃশব্দে সে-সূত্রটি ছিন্ন হয়েছে।

হাসিনা একটু পরে ভেজা চুল পিঠে ছড়িয়ে শোবার ঘরে প্রবেশ করে। তার পায়ের আওয়াজ শোনে আফসারউদ্দিন কিন্তু তার দিকে তাকায় না। হাসিনা পুরোনো আমলের একটি ক্ষুদ্র ড্রেসিং-টেবিলের সামনে চুল আঁচড়াতে বসে। মেঘের মতোই তাকে অতি দূর মনে হয়।

না, ধরতে গেলে কিছুই হয় নাই। তবু নিঃসন্দেহে সর্বশেষ সূত্রটি কাটা পড়েছে। হাসিনার চরম উদাসীনতার কারণ জানবার কোনো কৌতূহলও সে আর বোধ করে না।

মশারি সরিয়ে উঠে দ্রুতপদে আফসারউদ্দিন পেছনের ছায়াশীতল বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে। আবদুল শীঘ্র এক পেয়ালা চা নিয়ে এসে তার সামনে একটি নড়বড়ে, রঙচটা গোল বেতের টেবিলে রাখে। তাতে এক চুমুক দিয়ে সে নিম্ন গলায় বলে,

আজ দুপুরে টুওরে যাব।

সফরে যাবে তা বারান্দায় এসে বসবার পরেই হঠাৎ সে স্থির করে। হঠাৎ কোথাও যাবার তাগিদ বোধ করে সে। বর্ষার পরে নেয়ামতগঞ্জের বাঁধের মেরামতের কাজটা শুরু করতে হবে। ভেবেছিল দু-সপ্তাহের মধ্যে যাবে। আজই গেলে ক্ষতি কী? ওপরওয়ালার কাছে একটা তার পাঠিয়ে দিলেই চলবে।

মনার মাকে বলে দিও রাতে এসে থাকতে। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা আবদুলকে আবার বলে। সে যখন সফরে যায়, তখন মনার মা তাদের শোবার ঘরের পাশে ছোট ঘরটিতে রাত্রিবাস করে।

অনেক বেলা হয়েছে। এবার ক্ষিপ্রগতিতে উঠে আফসারউদ্দিন গোসলখানার দিকে রওনা হয়।

স্বামী-স্ত্রী একসাথে সকালের নাশতা খায়। আজও চোখাচোখি হয় না, সে-কথা আফসারউদ্দিনের আজ খেয়াল হয় না।

উঠবার আগে সে নিম্ন গলায় বলে,

আজ দুপুরে টুওরে যাচ্ছি। আবদুল মনার মাকে খবর দেবে।

ক-দিনের জন্যে সে যাচ্ছে তা হাসিনা জিজ্ঞাসা করে না। নিজে থেকেই আফসারউদ্দিন বলে,

পরশু ফিরব।

পোস্টম্যান ডাক নিয়ে আসে। দুটি চিঠি হাসিনার জন্যে, তার জন্যে একটি। হাসিনার চিঠি দুটি এগিয়ে দিয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েই সে তার চিঠিটা খোলে। কিন্তু পড়তে শুরু করলে অক্ষরগুলির ওপর দিয়ে দৃষ্টি ভেসে যায়। সে ভাবে, দাম্পত্যজীবনের প্রহসন শেষ হয়েছে কিন্তু এ-কাহিনীর অন্ত কোথায়, কোথায়ই-বা যবনিকা পড়বে?

সে-প্রশ্নের উত্তর সে পায় না। তবে একটি বিষয়ে সে নিশ্চিত বোধ করে। তার জীবন সে মরুভূমির ওপর সৃষ্টি করবে না। মরুভূমিতে প্রবেশ করবার জন্যেই সে কঠোর অধ্যবসায়ের সঙ্গে এত কষ্ট-শ্রম করে মানুষ হয় নাই। কথাটা ভেবে মনে একটি বিচিত্র শান্তিই সে বোধ করে। আশা-আকাঙ্ক্ষার ঝড় অবশেষে থেমেছে, হেঁয়ালি ভাঙার অদম্য কৌতূহলেরও অবসান ঘটেছে। তাছাড়া তার মনে হয়, তার পরাজয় হয় নাই।

সে আপন মনে বলে, আমি আরশাদ আলী সাহেব নই। আমরা একই ধাতুতে তৈরি নই।

কথাটা নিজেরই কাছে একটু বিচিত্র ঠেকে। তবে তা বিশ্লেষণ করে দেখার কোনো তাগিদ বোধ করে না। আজ সে একটি পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গতার মধ্যে আপন অস্তিত্ব ফিরে পেয়েছে। সে-অস্তিত্বটি প্রশ্ন-বিশ্লেষণে ক্ষত-বিক্ষত করতে চায় না সে।

এবার তার হাতের চিঠির অক্ষরগুলি অর্থগম্য রূপ ধারণ করে। চিঠিটা তার মায়ের। মায়ের মানে তাঁর জবানের কথা যা শব্দের আকার নিয়েছে একজন সামান্য শিক্ষিত আত্মীয়ের হাতে। চিঠিতে সুখবর কিছুই নাই। কোনোদিনই থাকে না। শারীরিক অসুস্থতার কথা, সাংসারিক অভাব-অভিযোগের কথা অন্যদিনের মতো আজও সে-চিঠির বিষয়বস্তু।

চিঠিতে দ্রুতভাবে একবার চোখ বুলিয়ে তা টেবিলে রাখতে গিয়ে সে ক্ষিপ্রভাবে তুলে নিয়ে পাতলুনের জেব-এ ঢুকিয়ে দেয়। আজ সে-চিঠি হাসিনার চোখের সামনে ফেলে যেতে সংকোচ হয়। তার হাসিনা আজ সত্যিই পরনারীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

দুপুরে টিফিন ক্যারিয়ারে করে অফিসের খাবার আসে; বেডিং-সুটকেস সোজা স্টেশনে যায়। অফিস থেকেই গাড়ি ধরতে যায় আফসারউদ্দিন।

দু-দিনের জায়গায় তিন দিন পরে প্রত্যাবর্তন করে বাড়িতে পা দেবে, এমন সময় আফসারউদ্দিন হাসিনার উচ্চ হাসির আওয়াজ শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। বারান্দায় উঠলে আবদুল বলে,

বিবি সাহেবের আম্মা এসেছেন।

ভেতরে হাসিনার হাসি তখনো থামে নাই। কয়েক মুহূর্ত সে অত্যাশ্চর্য হাসি শুনে আফসারউদ্দিন প্রশ্ন করে,

কবে এসেছেন?

গত রাতে। একটু থেমে চাপরাশির হাত থেকে সুটকেস-বিছানা নিয়ে আবদুল আলগোছে বলে, বিবি সাহেব তার পাঠিয়েছিলেন।

পরে শাশুড়ি-জামাইতে সাক্ষাৎ হয়। মরিয়ম খানম মাথায় কাপড় তোলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মুখে একটি গাম্ভীর্য নাবে। কেবল হাসিনার মুখে একটা তরল, স্বতঃস্ফূর্ত উজ্জ্বলতা জেগে থাকে। মা-মেয়ের মুখভাব ভিন্ন হলেও এবং তাদের বয়সে যথেষ্ট বিভেদ থাকলেও দু-জনের চেহারায় একটি স্পষ্ট সাদৃশ্য আফসারউদ্দিন আজ লক্ষ্য না করে পারে না। তবে তাতে বিচলিত হবার কোনো কারণ থাকলেও আজ সে বিচলিত হয় না। যে-কাঠিন্য নিঃসঙ্গতাবোধ নিয়ে সেদিন সে সফরে বেরিয়েছিল, সে-কাঠিন্য নিঃসঙ্গতা নিয়েই সে ফিরেছে।

ভদ্রতামাফিক দু-একটা কুশল প্রশ্ন-উত্তরের পরেই সে-সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ শেষ হয়।

রাতে খাবারের সময় মা-মেয়ে দু-জনকে অতিশয় গম্ভীর মনে হয়। মরিয়ম খানমের মাথায় ঘোমটা, হাসিনার মুখে গাম্ভীর্যের আচ্ছাদন। সে-ই যে তাদের গাম্ভীর্যের কারণ সে-কথা বুঝে নত মাথায় সে ক্ষিপ্রভাবে খাওয়ায় মনোনিবেশ করে। তারপর এক সময়ে বিনাড়ম্বরে হাসিনা নিম্নকণ্ঠে হঠাৎ ঘোষণা করে,

কাল দুপুরের ট্রেনে আম্মার সাথে যাচ্ছি।

মুহূর্তের জন্যে খোদাভক্তিতে মরিয়ম খানমের চোখ ঊর্ধ্বপানে নিক্ষিপ্ত হয়। গদগদ কণ্ঠে বলে,

ইন্‌শাআল্লাহ।

সে-রাতে স্বামী-স্ত্রীতে একটি শব্দেরও বিনিময় হয় না। শুধু পরদিন সকালে হাসিনা বিছানা ছেড়ে উঠে যাবে, এমন সময় আফসারউদ্দিন উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেই বলে, একটা কথা বলতে চাই।

বলে অনুমতি প্রার্থনার ভঙ্গিতেই থামে। হাসিনার পিঠ তার দিকে। একবার মাথায় একটু ঝাঁকানি দিয়ে সে তার চুল সিধা করে, তারপর নিঃশব্দে বসে অপেক্ষা করে। যাবার দিনে হয়তো সে একটু বদান্যতার প্রয়োজন বোধ করে।

আমার দোষ কী জানি না। তোমাদের কেউ আমাকে সে-কথা বল নাই।

পিঠ সোজা করে বসে হাসিনা নিশ্চল হয়ে থাকে। আবার একটু অপেক্ষা করে আফসারউদ্দিন বলে,

আমার কোনো দোষ আমি দেখতেই পাই না। সেটা স্বাভাবিক। তবে শোধরাবার মতো দোষঘাট শোধরাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবার জন্যে তৈরি ছিলাম। অবশ্য এখন সে-কথা নিষ্প্রয়োজন। তবু যাবার আগে কথাটা তোমার জেনে যাওয়া উচিত।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর হাসিনা এবার বলে,

সে-কথা আগেও একবার বলেছেন।

সামান্য রক্তিমাভা দেখা দেয় আফসারউদ্দিনের মুখে। তবে সংযত কণ্ঠেই সে উত্তর দেয়, প্রথমবার তুমি উত্তর দেও নাই বলে আবার বললাম।

হাসিনার মন্তব্যে যতটা সে অসন্তুষ্ট না হয় ততটা হয় এই দেখে যে, সে যে অতীত কাল ব্যবহার করেছে তা হাসিনা লক্ষ্য করে নাই।

হাসিনা পিঠ সোজা রেখেই কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে থাকে। তারপর সহসা বলে, কী বলব জানি না।

তার কণ্ঠে কেমন একটা নিঃসহায় ভাব। মনে হয়, সত্যিই সে জানে না। কী রহস্যময় আদেশ-নির্দেশে তাদের চিন্তাধারা কার্যকলাপ পরিচালিত হয়, তা সে জানে না।

এবার আফসারউদ্দিন নীরব হয়ে থাকলে একটু অপেক্ষা করে হাসিনা উঠে চলে যায় অন্য ঘরে। সে-ঘরে মরিয়ম খানম তখন জায়নামাজে বসে ওজিফা পড়ায় মগ্ন।

দুপুরের ট্রেনে নিত্য ভিড় হয়। গাড়ি-প্লাটফর্ম লোকে-লোকারণ্য, তবে প্রথম শ্রেণীর সামনে একটু ফাঁকা-ফাঁকা ভাব। সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া আছে কিন্তু আফসারউদ্দিন ব্যতীত দাঁড়িয়ে নেই কেউ। দরজার পাশে আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে কড়া রৌদ্রের জন্যে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে সে মানুষের সন্ত্রস্ত চলাচল দেখে। তার কানটা সজাগ হয়ে থাকে তৃতীয় ঘণ্টার জন্যে।

প্রথম শ্রেণীতে জানালার দিকে পিঠ দিয়ে মা ও মেয়ে বসে। হাসিনার পরনে উজ্জ্বল লাল শাড়ি। মরিয়ম খানমের দেহ কালো বোরখায় আবৃত। কেবল তাঁর মুখটি উন্মুক্ত। সে-মুখ দিনের আলোয় রক্তহীন, ফ্যাকাসে এবং ভাবশূন্য দেখায়। আড়চোখে আফসারউদ্দিন একবার হাসিনার দিকে তাকায়। তার মুখের পার্শ্বদিকটাই কেবল নজরে পড়ে। মায়ের মুখের মতো তার মুখও ভাবশূন্য। তবে দুপুরবেলার উজ্জ্বল সূর্যালোক তার লাবণ্যময় ত্বকে প্রতিফলিত হয় বলে ভাবশূন্যতা তত চোখে পড়ে না। ট্রেন এখনো ছাড়ে নি, তবু মনে হয় ইতিমধ্যে অতি দূরে কোথাও তারা পৌঁছে গেছে।

হঠাৎ আফসারউদ্দিনের মন বিস্ময়ে ভরে ওঠে। কোথায় যাচ্ছে মরিয়ম খানম এবং হাসিনা, কীই-বা তাদের জীবনের লক্ষ্যস্থান, কোথায়ই-বা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মণিমুক্তা লুকিয়ে?

দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আফসারউদ্দিন আবার লোকচলাচল দেখে।

জনস্রোতের ওপর যখন তার দৃষ্টি নিবদ্ধ তখন সহসা একটি অপ্রত্যাশিত বিষয়ে সে সচেতন হয়ে ওঠে। মরিয়ম খানমের পাশে বসেই হাসিনা হঠাৎ কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে এবং তার নিরাসক্ত মুখে ভীষণ দ্বন্দ্বের উপস্থিত হয়েছে। ক্রমশ সে-চাঞ্চল্য এবং দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার কি মত বদলেছে? সে কি ট্রেন থেকে নেবে আসবে? হাসিনার দিকে তাকাবার একটি প্রবল বাসনা বোধ করে আফসারউদ্দিন, কিন্তু দৃঢ়হস্তে সে-বাসনা সে দমন করে। তাকাবার সময় এখনো আসে নাই। তবে তার বুকে যে-স্পন্দন জাগে সে-স্পন্দন সে থামাতে পারে না। তাদের শেষসূত্রটি কি সত্যিই ছিন্ন হয় নাই? হাসিনা কি সহসা বুঝতে পেরেছে যে, যে-মনোরম দুর্গে সে আবদ্ধ সে-দুর্গে তাদের সযত্নে পালিত জীবনটি পথে-ফেলে-দেওয়া রসশূন্য নারকেলের মতো অন্তঃসারশূন্য, সে-দুর্গে এত আলো থাকলেও আসলে সেখানে ঘন তমিস্রা, যে-বিশ্বাসে একদিন তাদের স্বপ্নসৌধটি নির্মাণ করেছিল সে-বিশ্বাস সামান্য ধোঁয়ার চেয়ে বেশি বাস্তব নয় এবং মানুষের হৃদয়ের চরম ক্ষুধা কেবল চোখের ওপর পর্দা টেনেই জয় করা যায় না?

মনে হয় হাসিনা নেবেই আসবে। তার পাশে কালো বোরখায় আবৃতা মরিয়ম খানমের চোখে ভীতি জেগেছে, তাঁর নিশ্চয়তার ভাব খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়েছে। কিন্তু হাসিনার চোখ তাঁর দিকে নেই। সে নেবেই আসবে। আফসারউদ্দিনের বুকের স্পন্দন আরো দ্রুত হয়ে ওঠে। হাসিনা নেবে এসে তার সামনে দাঁড়ালে সে কী করবে? যখন দেখবে হাসিনার সে-মুখ আর সে-মুখ নাই, সে-চোখ আর সে-চোখ নাই, তখন তাকে সে কী বলবে?

সে জানে না। ভাববার সময় কোথায়? হঠাৎ মনে যে-ঝড় উঠেছে সে-ঝড় সবকিছু শুকনো পাতার মতো উড়ে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে সে আসছে আসুক। তিন ধাপ সিঁড়ি, তারপর কালো কঙ্কর ছড়ানো প্লাটফর্ম। সেখানেই নতুন জীবনের সূত্রপাত হবে।

তারপর তৃতীয় ঘণ্টা পড়ে, গার্ডের সুতীক্ষ্ণ বাঁশিও কাছাকাছি কোথাও শোনা যায়। বিস্মিত হয়ে আফসারউদ্দিন তাকায় ট্রেনের জানালার দিকে। ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে। তারপর কেমন একটা ঘূর্ণিবর্তের মধ্যেই একটি লাল শাড়ি ঝলমল করে ওঠে। একটা মুখও ভেসে ওঠে। সে-মুখ তার দিকে তাকায়, বোধহয় ভাবশূন্যতার মধ্যে নীরস ভদ্রতার একটা ক্ষীণ হাসি জাগে। তারপর হয়তো মরিয়ম খানমের কালো বোরখা ভেসে ওঠে। সেখানেও একটি মুখ ফিরে তাকায়। ঘূর্ণিবর্ত পুচ্ছ নাচায়।

প্লাটফর্মের শেষে রেলপথ হঠাৎ ডান দিকে মোড় নেয়। সে-বাঁকে ট্রেন শীঘ্র অদৃশ্য হয়ে গেলেও আফসারউদ্দিন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে নিস্পন্দভাবে। তার মুখে যেন ঘামের স্রোত বইছে। তার চোখের সামনে লাল ও কালো রঙের ঢেউ তখনো থামে নাই।

অবশেষে আফসারউদ্দিন সুস্থির হলে এবার শান্ত পরিচ্ছন্নতার মধ্যে সে সুস্পষ্টভাবে একটি মুখ দেখতে পায়। সে-মুখ হাসিনার নয়, মরিয়ম খানমেরও নয়। সে-মুখ আরশাদ আলী সাহেবের। তাঁর বয়স-ক্লান্ত মুখে যেন গভীর পরাজয়ের ছায়া।

একটি তুলসীগাছের কাহিনী

ধনুকের মতো বাঁকা কংক্রিটের পুলটির পরেই বাড়িটা। দোতলা, উঁচু এবং প্রকাণ্ড বাড়ি। তবে রাস্তা থেকেই সরাসরি দণ্ডায়মান। এদেশে ফুটপাত নাই বলে বাড়িটারও একটু জমি ছাড়ার ভদ্রতার বালাই নাই। তবে সেটা কিন্তু বাইরের চেহারা। কারণ, পেছনে অনেক জায়গা। প্রথমত প্রশস্ত উঠান। তারপর পায়খানা-গোসলখানার পরে আম-জাম-কাঁঠালগাছে ভরা জঙ্গলের মতো জায়গা। সেখানে কড়া সূর্যালোকেও সূর্যাস্তের ম্লান অন্ধকার এবং আগাছা আবৃত মাটিতে ভাপসা গন্ধ।

অত জায়গা যখন তখন সামনে কিছু ছেড়ে একটা বাগান করলে কী দোষ হত?

সে-কথাই এরা ভাবে। বিশেষ করে মতিন। তার বাগানের বড় শখ, যদিও আজ পর্যন্ত তা কল্পনাতেই পুষ্পিত হয়েছে। সে ভাবে, একটু জমি পেলে সে নিজেই বাগানের মতো করে নিত। যত্ন করে লাগাত মৌসুমি ফুল, গন্ধরাজ-বকুল-হাস্নাহানা, দু-চারটে গোলাপও। তারপর সন্ধ্যার পর আপিস ফিরে সেখানে বসত। একটু আরাম করে বসবার জন্যে হালকা বেতের চেয়ার বা ক্যানভাসের ডেকচেয়ারই কিনে নিত। তারপর গা ঢেলে বসে গল্প-গুজব করত। আমজাদের হুঁকার অভ্যাস। বাগানের সম্মান বজায় রেখে সে না হয় একটা মানানসই নলওয়ালা সুদৃশ্য গুড়গুড়ি কিনে নিত। কাদের গল্পপ্রেমিক। ফুরফুরে হাওয়ায় তার কণ্ঠ কাহিনীময় হয়ে উঠত। কিংবা পুষ্পসৌরভে মদির জ্যোৎস্নারাতে গল্প না করলেই-বা কী এসে যেত? এমনিতে চোখ বুজে বসেই নীরবে সান্ধ্যকালীন স্নিগ্ধতা উপভোগ করত তারা।

আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকেই চড়তে-থাকা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে মতিনের মনে জাগে এসব কথা।

বাড়িটা তারা দখল করেছে। অবশ্য লড়াই না করেই; তাদের সামরিক শক্তি অনুমান করে বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল তা নয়। দেশভঙ্গের হুজুগে এ-শহরে এসে তারা যেমন-তেমন একটা ডেরার সন্ধানে উদয়াস্ত ঘুরছে, তখন একদিন দেখতে পায় বাড়িটা। সদর দরজায় মস্ত তালা, কিন্তু সামান্য পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারে বাড়িতে জনমানব নাই এবং তার মালিক দেশপলাতক। পরিত্যক্ত বাড়ি চিনতে দেরি হয় না। কিন্তু এমন বাড়ি পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা। সৌভাগ্যের আকস্মিক আবির্ভাবে প্রথমে তাদের মনে ভয়ই উপস্থিত হয়। অবশ্য সে-ভয় কাটতে দেরি হয় না। সে-দিন সন্ধ্যায় তারা সদলবলে এসে দরজার তালা ভেঙে রৈ-রৈ আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে তখন বৈশাখের আম-কুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনা বলে ব্যাপারটা তাদের কাছে দিন-দুপুরে ডাকাতির মতো মনে হয় না। কোনো অপরাধের চেতনা যদি-বা মনে জাগার প্রয়াস পায় তা বিজয়ের উল্লাসে নিমেষে তুলোধুনো হয়ে উড়ে যায়।

পরদিন শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়লে অনাথিতদের আগমন শুরু হয়। মাথার ওপর একটা ছাদ পাবার আশায় তারা দলে-দলে আসে।

বিজয়ের উল্লাসটা ঢেকে এরা বলে, কী দেখছেন? জায়গা নাই কোথাও। সব ঘরেই বিছানা পড়েছে। এই যে ছোট্ট ঘরটি, তাতেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখন-তো শুধু বিছানা মাত্র। পরে ছ-ফুট বাই আড়াই-ফুটের চারটি চৌকি এবং দু-একটা চেয়ার-টেবিল এলে পা ফেলার জায়গা থাকবে না।

একজন সমবেদনার কণ্ঠে বলে,

আপনাদের তকলিফ আমরা কি বুঝি না? একদিন আমরা কি কম কষ্ট পেয়েছি? তবে আপনাদের কপাল মন্দ। সে-ই হচ্ছে আসল কথা।

যারা হতাশ হয় তাদের মুখ কালো হয়ে ওঠে সমবেদনা-ভরা উক্তিতে।

ঐ ঘরটা?

নিচের তলায় রাস্তার ধারে ঘরটা অবশ্য খালিই মনে হয়।

খালি দেখালেও খালি নয়। ভালো করে চেয়ে দেখুন। দেয়ালের পাশে সতরঞ্চিতে বাঁধা দুটি বেডিং। শেষ জায়গাটাও দু-ঘণ্টা হল অ্যাকাউন্টস-এর মোটা বদরুদ্দিন নিয়ে নিয়েছে। শালার কাছ থেকে বিছানা-পত্তর আনতে গেছে। শালাও আবার তার এক দোস্তের বাড়ির বারান্দায় আস্তানা গেড়েছে। পরিবার না থাকলে শালাটিও এসে হাজির হত।

নেহাত কপালের কথা। আবার একজনের কণ্ঠ সমবেদনায় খলখল করে ওঠে। যদি ঘণ্টাদুয়েক আগে আসতেন তবে বদরুদ্দিনকে কলা দেখাতে পারতেন। ঘরটায় তেমন আলো নেই বটে কিন্তু দেখুন জানালার পাশেই সরকারি আলো। রাতে কোনোদিন ইলেকট্রিসিটি ফেল করলে সে-আলোতেই দিব্যি চলে যাবে।

বা কিপ্পণতা যদি করতে চায়—

অবশ্য এ-সব পরাহত বাড়ি-সন্ধানীদের কানে বিষবৎ মনে হয়।

যথাসময়ে বে-আইনি বাড়ি দখলের ব্যাপারটা তদারক করবার জন্যে পুলিশ আসে। সেটা স্বাভাবিক। দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন বটে কিন্তু কোথাও যে রীতিমতো মগের মুলুক পড়েছে তা নয়। পুলিশ দেখে তারা ভাবে, পলাতক গৃহকর্তা কি বাড়ি উদ্ধারের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেছে? তবে সে-কথা বিশ্বাস হয় না। দু-দিনের মধ্যে বাড়িটা খালি করে দিয়ে যে দেশ থেকে উধাও হয়ে গেছে, বর্তমানে তার অন্যান্য গভীর সমস্যার কথা ভাববার আছে। সন্দেহ থাকে না যে, পুলিশকে খবর দিয়েছে তারাই যারা সময়মতো এখানে না এসে শহরের অন্য কোনো প্রান্তে নিষ্ফলভাবে বাড়ি দখলের ফিকিরে ছিল। মন্দভাগ্যের কথা মানা যায় কিন্তু সহ্য করা যায় না। ন্যায্য অধিকার-স্বত্ব এক কথা, অন্যায়ের ওপর ভাগ্য লাভ অন্য কথা। হিংসাটা ন্যায়সঙ্গত-তো মনে হয়-ই, কর্তব্য বলেও মনে হয়।

এরা রুখে দাঁড়ায়।

আমরা দরিদ্র কেরানি মানুষ বটে কিন্তু সবাই ভদ্র ঘরের ছেলে। বাড়ি দখল করেছি বটে কিন্তু জানালা-দরজা ভাঙি নাই, ইট-পাথর খসিয়ে চোরাবাজারেও চালান করে দিই নাই।

আমরাও আইনকানুন বুঝি। কে নালিশ করেছে? বাড়িওয়ালা নয়। তবে নালিশটাও যথাযথ নয়।

কাদের কেবল কাতর রব তোলে। যাব কোথায়? শখ করে কি এখানে এসে উঠেছি?

সদলবলে সাব-ইনস্পেক্টর ফিরে গিয়ে না-হক না-বেহক না-ভালো না-মন্দ গোছের ঘোর-ঘোরালো রিপোর্ট দেয় যার মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়েই হয়তো ওপরওয়ালা তা ফাইল চাপা দেয়া শ্রেয় মনে করে। অথবা বুঝতে পারে, এই হুজুগের সময় অন্যায়ভাবে বাড়ি দখলের বিষয়ে সরকারি আইনটা যেন তেমন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

কাদের চোখ টিপে বলে, সত্য কথা বলতে দোষ কী? সাব-ইনস্পেক্টরের দ্বিতীয় বউ আমার এক রকম আত্মীয়া। বোলো না কাউকে কিন্তু।

কথাটা অবশ্য কারোই বিশ্বাস হয় না। তবে অসত্যটি গোড়ায় যে কেবল একটা নির্মল আনন্দের উস্‌কানি, তা বুঝে কাদেরকে ক্ষমা করতে দ্বিধা হয় না।

উৎফুল্ল কণ্ঠে কেউ প্রস্তাব করে, কী হে, চা-মিষ্টিটা হয়ে যাক।

রাতারাতি সরগরম হয়ে ওঠে প্রকাণ্ড বাড়িটা। আস্তানা একটি পেয়েছে এবং সে-আস্তানাটি কেউ হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না—শুধু এ-বিশ্বাসই তার কারণ নয়। খোলামেলা ঝরঝরে তকতকে এ-বাড়ি তাদের মধ্যে একটা নতুন জীবন সঞ্চার করেছে যেন। এদের অনেকেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেন-এ খালাসি পট্টিতে, বৈঠকখানায় দফতরিদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেন-এ তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বা কমরু খানসামা লেন-এ অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটিয়েছে। তুলনায় এ-বাড়ির বড়-বড় কামরা, নীলকুঠি দালানের ফ্যাশনে মস্ত-মস্ত জানালা, খোলামেলা উঠান, আরো পেছনে বনজঙ্গলের মতো আম-জাম-কাঁঠালের বাগান—এসব একটি ভিন্ন দুনিয়া যেন। এরা লাটবেলাটের মতো এক-একখানা ঘর দখল করে নাই সত্য, তবু এত আলো-বাতাস কখনো তারা উপভোগ করে নাই। তাদের জীবনে সবুজ তৃণ গজাবে ধমনিতে সবল সতেজ রক্ত আসবে, হাজার-দু-হাজারওয়ালাদের মতো মুখে ধন-স্বাস্থ্যের জলুস আসবে, দেহও ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-ক্ষয় ব্যাধিমুক্ত হবে। রোগাপট্‌কা ইউনুস ইতিমধ্যে তার স্বাস্থ্যের পরিবর্তন দেখতে পায়। সে থাকত ম্যাকলিওড স্ট্রিটে। গলিটা যেন সকালবেলার আবর্জনাভরা ডাস্টবিন। সে-গলিতেই নড়বড়ে ধরনের একটা কাঠের দোতলা বাড়িতে রান্নাঘরের পাশে স্যাঁতস্যাঁতে একটি কামরায় কচ্ছদেশীয় চামড়া-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চার-বছর সে বাস করেছে। পাড়াটি চামড়ার উৎকট গন্ধে সর্বক্ষণ এমন ভরপুর হয়ে থাকত যে রাস্তার ড্রেনের পচা দুর্গন্ধ নাকে পৌঁছত না, ঘরের কোণে ইঁদুর-বেড়াল মরে-পচে থাকলেও তার খবর পাওয়া দুষ্কর ছিল। ইউনুসের জ্বরজ্বারি লেগেই থাকত, থেকে-থেকে শেষরাতে কাশির ধমক উঠত। তবু পাড়াটি ছাড়ে নি এক কারণে। কে তাকে বলেছিল, চামড়ার গন্ধ নাকি যক্ষার জীবাণু ধ্বংস করে। দুর্গন্ধটা তাই সে অম্লানবদনে সহ্য-তো করতই, সময়-সময় আপিস থেকে ফিরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির নিশ্ছিদ্র দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বুকভরে নিশ্বাস নিত। তাতে অবশ্য তার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি দেখা যায় নাই।

খানাদানা না হলে বাড়ি সরগরম হয় না। তাই এক সপ্তাহ ধরে মোঘলাই কায়দায় তারা খানাদানা করে। রান্নার ব্যাপারে সকলেরই গুপ্ত কেরামতি প্রকাশ পায় সহসা। নানির হাতে শেখা বিশেষ ধরনের পিঠা তৈরির কৌশলটি শেষ পর্যন্ত অখাদ্য বস্তুতে পরিণত হলেও তারিফ-প্রশংসায় তা মুখরোচক হয়ে ওঠে। গানের আসরও বসে কোনো-কোনো সন্ধ্যায়। হাবিবুল্লা কোত্থেকে একটা বেসুরো হারমোনিয়াম নিয়ে এসে তার সাহায্যে নিজের গলার বলিষ্ঠতার ওপর ভর করে নিশীথ রাত পর্যন্ত একটি অব্যক্তব্য সঙ্গীতসমস্যা সৃষ্টি করে।

এ-সময়ে একদিন উঠানের প্রান্তে রান্নাঘরের পেছনে চৌকোণা আধ-হাত উঁচু ইটের তৈরি একটি মঞ্চের উপর তুলসীগাছটি তাদের দৃষ্টিগত হয়।

সেদিন রোববার সকাল। নিমের ডাল দিয়ে মেছোয়াক করতে-করতে মোদাব্বের উঠানে পায়চারি করছিল, হঠাৎ সে তারস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে। লোকটি এমনিতেই হুজুগে মানুষ। সামান্য কথাতেই প্রাণ-শীতল-করা রৈ-রৈ আওয়াজ তোলার অভ্যাস তার। তবু সে-আওয়াজ উপেক্ষা করা সহজ নয়। শীঘ্রই কেউ-কেউ ছুটে আসে উঠানে।

কী ব্যাপার?

চোখ খুলে দেখ!

কী? কী দেখব?

সাপখোপ দেখবে আশা করেছিল বলে প্রথমে তুলসীগাছটা নজরে পড়ে না তাদের। দেখছ না? এমন বেকায়দা আসনাধীন তুলসীগাছটা দেখতে পাচ্ছ না?

উপড়ে ফেলতে হবে ওটা। আমরা যখন এ-বাড়িতে এসে উঠেছি তখন এখানে কোনো হিন্দুয়ানির চিহ্ন আর সহ্য করা হবে না।

একটু হতাশ হয়ে তারা তুলসীগাছটির দিকে তাকায়। গাছটি কেমন যেন মরে আছে। গায় সবুজ রঙের পাতায় খয়েরি রং ধরেছে। নিচে আগাছাও গজিয়েছে। হয়তো বহুদিন তাতে পানি পড়ে নি।

কী দেখছ? মোদাব্বের হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। বলছি না, উপড়ে ফেল!

এরা কেমন স্তব্ধ হয়ে থাকে। আকস্মিক এ-আবিষ্কারে তারা যেন কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়েছে। যে-বাড়ি এত শূন্য মনে হয়েছিল, ছাদে যাওয়ার সিঁড়ির দেয়ালে কাঁচা হাতে লেখা—ক-টা নাম থাকা সত্ত্বেও যে-বাড়িটা এমন বেওয়ারিশ ঠেকেছিল, সে-বাড়ির চেহারা যেন হঠাৎ বদলে গেছে। আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে শুষ্কপ্রায় মৃতপ্রায় নগণ্য তুলসীগাছটি হঠাৎ সে-বাড়ির অন্দরের কথা প্রকাশ করেছে যেন।

এদের অহেতুক স্তব্ধতা লক্ষ্য করে মোদাব্বের আবার হুঙ্কার ছাড়ে।

ভাবছ কী অত? উপড়ে ফেল বলছি!

কেউ নড়ে না। হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভালো করে জানা নাই। তবু কোথাও শুনেছে যে, হিন্দুবাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসীগাছের তলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। আজ যে-তুলসীগাছের তলে ঘাস গজিয়ে উঠেছে, সে-পরিত্যক্ত তুলসীগাছের তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিত। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত-শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠত প্রতিদিন। ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবন-প্রদীপ নিভে গেছে, আবার হাসি-আনন্দের ফোয়ারাও ছুটেছে সুখ সময়ে, কিন্তু এ-প্রদীপ-দেওয়া-অনুষ্ঠান একদিনের জন্যেও বন্ধ থাকে নাই।

যে-গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ-তুলসীগাছের তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়? মতিন একসময়ে রেলওয়েতে কাজ করত। অকারণে তার চোখের সামনে বিভিন্ন রেলওয়ে-পট্টির ছবি ভেসে ওঠে। ভাবে, হয়তো আসানসোল, বৈদ্যবাটি, লিলুয়া বা হাওড়ায় রেলওয়ে-পট্টিতে সে-মহিলা কোনো আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। বিশাল ইয়ার্ডের পাশে রোদে শুকোতে-থাকা লাল পাড়ের একটি মসৃণ কালো শাড়ি সে যেন দেখতে পায়। হয়তো সে-শাড়িটি গৃহকর্ত্রীরই। কেমন বিষণ্ণভাবে সে-শাড়িটি দোলে স্বল্প হাওয়ায়। অথবা মহিলাটি কোনো চলতি ট্রেনের জানালার পাশে যেন বসে। তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। সে-দৃষ্টি খোঁজে কিছু দূরে, দিগন্তের ওপারে। হয়তো তার যাত্রা এখনো শেষ হয় নাই। কিন্তু যেখানেই সে থাকুক এবং তার যাত্রা এখনো শেষ হয়েছে কি হয় নাই, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন প্রতিদিন এ-তুলসীতলার কথা মনে হয় বলে তার চোখ হয়তো ছলছল করে ওঠে।

গতকাল থেকে ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাব। সে বলে,

থাক্‌না ওটা। আমরা-তো তা পূজা করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে তুলসীগাছ থাকা ভালো। সর্দি-কফে তার পাতার রস বড়ই উপকারী।

মোদাব্বের অন্যদের দিকে তাকায়। মনে হয়, সবারই যেন তাই মত। গাছটি উপড়ানোর জন্যে কারো হাত এগিয়ে আসে না। ওদের মধ্যে এনায়েত একটু মৌলবী ধরনের মানুষ। মুখে দাড়ি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও আছে, সকালে নিয়মিতভাবে কোরান-তালাওয়াত করে। সে-পর্যন্ত চুপ। প্রতি সন্ধ্যায় গৃহকর্ত্রীর সজল চোখের দৃশ্যটি তার মনেও জাগে কি?

অক্ষত দেহে তুলসীগাছটি বিরাজ করতে থাকে।

তবে এদের হাত থেকে সেটি রেহাই পেলেও এরা যে তার সম্বন্ধে পর মুহূর্তেই অসচেতনায় নিমজ্জিত হয়, তা নয়। বরঞ্চ কেমন একটা দুর্বলতার ভাব, কর্তব্যের সম্মুখে পিছপা হলে যেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা আসে তেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা তাদের মনে জেগে

থাকে। তারই ফলে সে-দিন সান্ধ্য আড্ডায় তর্ক ওঠে। তারা বাক-বিতণ্ডার স্রোতে মনের সে-দুর্বলতা-অস্বচ্ছন্দতা ভাসিয়ে দিতে চায় যেন। আজ অন্য দিনের মতো রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক আলোচনার বদলে সাম্প্রদায়িকতাই তাদের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

—ওরাই তো সবকিছুর মূলে, মোদাব্বের বলে। উলঙ্গ বাল্‌ব-এর আলোয় তার সযত্নে মেছোয়াক করা দাঁত ঝকঝক করে।—তাদের নীচতা হীনতা গোঁড়ামির জন্যেই তো দেশটা ভাগ হল।

কথাটা নতুন নয়। তবু আজ সে-উক্তিতে নতুন একটা ঝাঁঝ। তার সমর্থনে এবার হিন্দুদের অবিচার-অত্যাচারের অশেষ দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাস সংকীর্ণ হয়ে আসে।

দলের মধ্যে বামপন্থী বলে স্বীকৃত মকসুদ প্রতিবাদ করে। বলে, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি?

মোদাব্বেরের ঝকঝকে দাঁত ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

বাড়াবাড়ি মানে?

বামপন্থী মকসুদ আজ একা। তাই হয়তো তার বিশ্বাসের কাঁটা নড়ে। সংশয়ে দুলে-দুলে কাঁটাটি ডান দিকে হেলে থেমে যায়।

কয়েকদিন পরে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তুলসীগাছটা মোদাব্বেরের নজরে পড়ে। সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না। তার তলে যে-আগাছা জন্মেছিল সে-আগাছা অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। যে-গাঢ় সবুজ পাতাগুলি পানির অভাবে শুকিয়ে খয়েরি রং ধরেছিল, সে-পাতাগুলি কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। সন্দেহ থাকে না যে তুলসীগাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ। খোলাখুলিভাবে না হলেও লুকিয়ে-লুকিয়ে তার গোড়ায় কেউ পানি দিচ্ছে।

মোদাব্বেরের হাতে তখন একটি কঞ্চি। সেটি শাঁ করে কচু-কাটার কায়দায় সে তুলসীগাছের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। কিন্তু ওপর দিয়েই। তুলসীগাছটি অক্ষত দেহেই থাকে।

অবশ্য তুলসীগাছের কথা কেউ উল্লেখ করে না। ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাবটা পরদিন কেটে গিয়েছিল। তুলসীপাতার রসের প্রয়োজন হয় নাই তার।

তারা ভেবেছিল ম্যাকলিওড স্ট্রিট খানসামা লেন ব্লকম্যানের জীবন সত্যিই পেছনে ফেলে এসে প্রচুর আলো-হাওয়ার মধ্যে নতুন জীবন শুরু করেছে। কিন্তু তাদের ভুলটা ভাঙতে দেরি হয় না। তবে শুধু ততখানিই দেরি হয় যতখানি দরকার, সে-বিশ্বাস দৃঢ় পরিণত হবার জন্যে। ফলে আচম্বিত আঘাতটা প্রথমে নিদারুণই মনে হয়।

সেদিন তারা আপিস থেকে সরাসরি বাড়ি ফিরে সকালের পরিকল্পনা মোতাবেক খিচুড়ি রান্নার আয়োজন শুরু করেছে এমন সময় বাইরের সিঁড়িতে ভারি জুতার মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ শোনা যায়। বাইরে একবার উঁকি দিয়ে মোদাব্বের ক্ষিপ্রপদে ভেতরে আসে।

পুলিশ এসেছে আবার। সে ফিসফিস করে বলে।

পুলিশ? আবার কেন পুলিশ? ইউনুস ভাবে, হয়তো রাস্তা থেকে ছ্যাঁচড়া চোর পালিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকেছে এবং তারই সন্ধানে পুলিশের আগমন হয়েছে। কথাটা মনে হতেই নিজের কাছেই তা খরগোশের গল্পের মতো ঠেকে। শিকারির সামনে আর পালাবার পথ না পেয়ে হঠাৎ চোখ বুজে বসে পড়ে খরগোশ ভাবে, কেউ তাকে আর দেখতে পাচ্ছে না। আসলে তারাই কি চোর নয়? সব জেনেও তারাই কি সত্য কথাটা স্বীকার না করে এ-বাড়িতে একটি অবিশ্বাস্য মনোরম জীবন সৃষ্টি করেছে নিজেদের জন্যে?

পুলিশদলের নেতা সাবেকি আমলের মানুষ। হ্যাট বগলে চেপে তখন সে দাগ-পড়া কপাল থেকে ঘাম মুছছে। কেমন একটা নিরীহ ভাব। তার পশ্চাতে বন্দুকধারী কনস্টেবল দুটিকেও মস্ত গোঁফ থাকা সত্ত্বেও নিরীহ মনে হয়। তাদের দৃষ্টি ওপরের দিকে। তারা যেন

কড়িকাঠ গোনে। ওপরের ঝিলিমিলির খোপে একজোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। হয়তো সে কবুতর দুটিকেই দেখে চেয়ে। হাতে বন্দুক থাকলে নিরীহ মানুষেরও দৃষ্টি পড়ে পশু-পক্ষীর দিকে।

সবিনয়ে মতিন প্রশ্ন করে, কাকে দরকার?

আপনাদের সবাইকে। পুলিশদের নেতা একটু খনখনে গলায় ঝট্ করে উত্তর দেয়। আপনারা বে-আইনিভাবে এ-বাড়িটা কব্জা করেছেন।

কথাটা না মেনে উপায় নাই। ওরা প্রতিবাদ না করে সরল চোখে সামান্য কৌতূহল জাগিয়ে পুলিশদের নেতার দিকে চেয়ে থাকে।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হবে। সরকারের হুকুম।

এরা নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। অবশেষে মোদাব্বের গলা সাফ করে প্রশ্ন করে, কেন, বাড়িওয়ালা নালিশ করেছে নাকি?

অ্যাকাউন্টস আপিসের মোটা বদরুদ্দিন গলা বাড়িয়ে কনস্টেবল দুটির পেছনে একবার তাকিয়ে দেখে বাড়িওয়ালার সন্ধানে। সেখানে কেউ নেই। তবে রাস্তায় কিছু লোক জড়ো হয়েছে। অন্যের অপমান দেখার নেশা বড় নেশা।

কোথায় বাড়িওয়ালা? না হেসেই গলায় হাসি তোলে পুলিশদলের নেতা।

এদের একজনও হেসে ওঠে। একটা আশার সঞ্চার হয় যেন।

তবে?

গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে।

এবার আর হাসি জাগে না। বস্তুত অনেকক্ষণ যেন কারো মুখে কোনো কথা সরে না। তারপর মকসুদ গলা বাড়ায়।

আমরা কি গভর্নমেন্টের লোক নই?

এবার কনস্টেবল দুটির দৃষ্টিও কবুতর কড়িকাঠ ছেড়ে মকসুদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। তাদের দৃষ্টিতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব। মানুষের নির্বুদ্ধিতায় এখনো তারা চমকিত হয়।

তারপর প্রকাণ্ড সে-বাড়িতে অপর্যাপ্ত আলো-বাতাস থাকলেও একটা গভীর ছায়া নেবে আসে। প্রথমে অবশ্য তাদের মাথায় খুন চড়ে। নানারকম বিদ্রোহী-ঘোষণা শোনা যায়। তারা যাবে না কোথাও, ঘরের খুঁটি ধরে পড়ে থাকবে; যাবে-তো লাশ হয়ে যাবে। তবে মাথা শীতল হতে দেরি হয় না। তখন গভীর ছায়া নেবে আসে সর্বত্র। কোথায় যাবে তারা?

পরদিন মোদাব্বের যখন এসে বলে তাদের মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টা থেকে সাত দিন হয়েছে তখন তারা একটা গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেও সে-ঘন ছায়াটা নিবিড় হয়েই থাকে। এবার মোদাব্বের পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টরের দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে তার আত্মীয়তার কথা বলে না। তবু না-বলা কথাটা সবাই মেনে নেয়।

তারপর দশম দিনে তারা সদলবলে বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়। যেমনি ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মতোই উধাও হয়ে যায়। শূন্য বাড়িতে তাদের সাময়িক বসবাসের চিহ্নস্বরূপ এখানে-সেখানে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে থাকে খবর কাগজের ছেঁড়া পাতা, কাপড় ঝোলাবার একটা পুরোনো দড়ি, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, একটা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালি।

উঠানের শেষে তুলসীগাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রং। সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে কেউ তার গোড়ায় পানি দেয় নি। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়ে নি।

কেন পড়ে নি সে-কথা তুলসীগাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা।

পাগড়ি

রাস্তার ধারে ধুলোভারাচ্ছন্ন বৈঠকখানায় বসে খানবাহাদুর মোত্তালেব সাহেব ভাবেন। ভাবেন যে সে-কথা তাঁর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। চোখের নিচে মাংসের থলে। বড় গোছের চোখ দুটো তার মধ্যে ভারি দেখায়। অনেকটা মার্বেলের মতো। তাও ড্রেনের কোণে হারিয়ে যাওয়া নিশ্চল মার্বেল।

তিনি তাঁর বয়সের কথা ভাবেন। তাঁর সমগ্র মাথায় আজ পক্বকেশ, কিন্তু তার জন্যে বয়সকে দোষ দেওয়া যায় না। বিস্তারিত ওকালতি ব্যবসা সৃষ্টি করবার জন্যে যে-কঠোর শ্রম করেছেন বছরের পর বছর, সে-শ্রমই পক্বকেশের জন্যে দায়ী। পক্বকেশ মিথ্যার একটি প্রলেপ মাত্র। এ কথা ঠিক যে, যারা তাঁর বয়সের কথা জানে না এবং চুলের অকালপক্বতার খোঁজ রাখে না, তারা তাঁকে বৃদ্ধ বলেই মেনে নেয়। তাঁর বৈঠকখানায় যে মক্কেলের ভিড় তার প্রধান কারণও ঐ শুভ্রতা, চুলের বর্ণহীন রুপালি বিন্যাস। তারপর তাঁর বড়-বড় ছেলেমেয়েদের দেখেও তাঁর বয়স সম্বন্ধে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তবে তার কারণ এই যে, অল্প বয়সে অধ্যয়ন শেষ করে তিনি বিয়ে করতে দু-দণ্ড সবুর করেন নাই। বয়সের বাহ্যিক এ-সব চিহ্ন থাকলেও তাঁর বয়স বেশি নয়। তিনি বয়সের ভার তো বোধ করেনই না, তিনি যুবকের তেজ-বলের অধিকারী বলেই মনে করেন। এখনো তাঁর শরীরের বাঁধন শক্ত, তাঁর মেরুদণ্ড ঋজু। তাঁর দেহে এখনো শক্তি আছে, মনে আশাও আছে। ভবিষ্যৎ তাঁর চোখে এখনো ছায়াময় হয়ে ওঠে নাই।

এ-পর্যন্ত ভেবে মোত্তালেব সাহেব থামেন। তিনি উকিল মানুষ। সারাজীবন দেয়ালের আলমারিতে ঠাসা আইনের কেতাবগুলি কোরানের মতো হেফজ করেছেন। কাজেই কোনো কথা তলিয়ে বা নজির খতিয়ে বিচার না করে দেখলে মনে শান্তি পান না। তাই সত্যসন্ধানীর অদম্য উৎসাহ নিয়ে কথাটা গোড়া থেকে আবার ভেবে দেখেন। অবশেষে তিনি নিঃসন্দেহ হন যে, তাঁর মাথার চুল সাদা হলেও এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা বড়সড় হলেও তাঁর বয়সটা তেমন নয়। এবার তিনি তাঁর চিন্তাধারার পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর হন। একটু সন্তর্পণেই অগ্রসর হন, কিন্তু তাঁর পদস্খলন হয় না।

তিনি ভাবেন, হোক তাঁর চুল সাদা, হোক তাঁর ছেলেমেয়েরা বয়স্থ, তবু তাঁর যখন বয়সটা তেমন নয়, তখন তিনি যদি পুনর্বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে সে-ইচ্ছার বিরোধিতায় বয়সের যুক্তিটি তোলা যায় না। পূর্ববৎ এ-কথাটাও তিনি আবার ভেবে দেখেন। সে-বিষয়ে নিশ্চিত হলে তৃতীয় পর্যায়ে তিনি উপস্থিত হন। সে-পর্যায়ে বিরাজ করে তাঁর সন্তানসন্ততি।

এখানেই খানবাহাদুর মোত্তালেব সাহেব ঠেকে যান। তাঁর ছেলেমেয়েরাই তাঁর চিন্তাধারার পথে বাধা সৃষ্টি করে। একবার নয় বারবার।

বৈঠকখানার নিঃশব্দতার মধ্যে গুড়গুড়ির মিষ্টিমধুর গন্ধ ভুরভুর করে, হালকা নীলাভ ধোঁয়া পাক খেয়ে হঠাৎ পথ খুঁজে পায় না।

তিনি অবশ্য বেশিক্ষণ স্থির হয়ে থাকেন না, শীঘ্র নতুন উদ্যমে তিনি নিজের জীবন পর্যালোচনা করে দেখেন। তিনি দেখতে পান, সারাজীবন তিনি জটিল আইনের অলিগলিতে অশ্রান্ত কীটের মতো ঘোরাঘুরি করেছেন, আদালতে গভীর অনুভূতির সঙ্গে বক্তৃতা দিয়েছেন, কখনো চিৎকার করেছেন, কখনো হেসেছেন, কখনো ব্যঙ্গ করেছেন, অশ্রু ফেলেছেন, সময়-সুযোগ পেলে আপন আত্মমর্যাদা বজায় রেখে খাসকামরায় গিয়ে হাকিমকে সালাম ঠুকতেও দ্বিধা করেন নাই। ফলে পসার করেছেন, পয়সা করেছেন। শহরে দোতলা বাড়ি

তুলেছেন, দেশের কাঁচা বাড়ি পাকা করেছেন, মসজিদ দিয়েছেন ছোয়াবের আশায়, পুকুর কেটেছেন পাড়াপড়শীর অসুবিধার কথা ভেবে। তাঁর বদান্যতা-সততার জন্যে মান-যশও অর্জন করেছেন। অবশ্য নিন্দুকরা বলে, কোনো এক গোরা রেজিমেন্টকে সান্ধ্যভোজ খাইয়ে খানবাহাদুর পদবিটা করায়ত্ত করেছেন। সে-কথা ভিত্তিহীন জনরব, নিছক হিংসাত্মক কুৎসা।

এই তো গেল তাঁর বাইরের জীবন। তাঁর ঘরের কথা কিন্তু অন্য রকম। বাইরে তাঁর কর্মবহুল জীবন তাঁকে যশ-মান-অর্থ দিলেও তার ব্যক্তিগত জীবন তাঁকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করেছে। তাঁর প্রধান কারণ তার স্ত্রীর মস্তিষ্কবিকৃতি। পঞ্চম সন্তানের জন্মের পরেই তাঁর স্ত্রীর এই দশা ঘটে। সে অনেক বছর আগের কথা। কিন্তু তখন থেকে তার সংসারের উৎসাহ যেন শুকিয়ে যায়। বিকৃতমস্তিষ্কা স্ত্রীর অর্থহীন হাসি-কান্নার মধ্যে তিনি নিজেকে যে সুস্থমস্তিষ্ক রাখতে পেরেছেন, সেটাই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি কর্তব্যপরায়ণতায় একটু ঢিলা দেন নাই। সংসারের সমস্ত দায়িত্বভার আপন হাতে নিয়ে তা কৃতিত্বের সঙ্গে পূর্ণ করেছেন, বর্ধিষ্ণু ছেলেমেয়েদের সযত্নে লালন-পালন করেছেন।

কিন্তু আসল কথা, যে-জীবনের উৎস এত শীঘ্রই শুকিয়ে গিয়েছিল, সে-জীবন তাঁকে তৃপ্তি দিয়েছে কি? আজ তিনি এ-কথা বলতে পারেন কি যে তিনি তাঁর জীবনকে পদে-পদে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করেছেন?

গলায় খাঁকারি দিয়ে খানবাহাদুর মোত্তালেব সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তার চোখে-মুখে একটা সিদ্ধান্তের নিশ্চিত ভাব। অন্দরে গিয়ে শোবার ঘরে ছেলেমেয়েদের ডাকলেন। এ-সব রীতিমতো সভা করে তাদের কখনো ডাকেন না বলে তারা অতিশয় বিস্মিত হয়। একে-একে তারা শোবার ঘরে এসে গোল হয়ে যখন বসে, তখন তাদের মুখে ঈষৎ উৎকণ্ঠার ভাব।

খানবাহাদুর সাহেব তাদের দিকে দৃষ্টি দেন না। সামনের দেয়ালে কোথাও সে-দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি ঋজু হয়ে বসেন। তাঁর মার্বেলের মতো ভারি চোখে এখন সে হারিয়ে-যাওয়া ভাবটা নাই।

নীরবতা ভেঙে হঠাৎ মোত্তালেব সাহেব কথা বলতে শুরু করেন। অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে বলেন যে, তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্যে একটি নতুন মা আনবেন বলে স্থির করেছেন। বলবার সময় তাঁর স্বাভাবিক শ্লেষ্মায় গভীরকণ্ঠে একটু কল্পনা জাগে না। কেন জাগবে? কথাটা বলার আগে তিনি কি তা তুলোধুনো করে ভেবে দেখেন নাই? অত করে ভেবে দেখেছেনই-বা কেন? মক্কেল বা প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে তা এমনভাবে দেখেন নাই; ভেবে দেখেছেন তাঁর অতি প্রিয় সন্তানসন্ততির জন্যেই।

তাঁর সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে মোত্তালেব সাহেব আর দেরি করেন না। ক্ষিপ্রভাবে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করবেন এমন সময় ডান পা থেকে তাঁর চটিটা খসে পড়ে। দৃষ্টি সোজা রেখে তিনি পা দিয়ে চটিটা খোঁজেন। তারপর সেটি খুঁজে পেলেও গহ্বরটা খুঁজে পান না। মেজো মেয়েটি ভাবে এগিয়ে এসে উল্টো-হয়ে-থাকা জুতাটা সোজা করে দেয়, কিন্তু সে কেমন জমে থাকে। বড় মেয়েটি আড়চোখে তাকিয়ে দেখে চটির গহ্বর-সন্ধানরত বাপের ডান পাটি। সাদা পা। কতদিন তার ইচ্ছা হয়েছে বাপের পায়ে হাত বুলায়, কিন্তু তাঁর দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্যের জন্যে মনে কখনো সাহস কুলিয়ে উঠাতে পারে নাই। কেবল দূর থেকে দেখেই তার চোখে শ্রদ্ধাভক্তিতে আমেজ লেগেছে। সেও আজ নড়ে না।

মোত্তালেব সাহেব অবশেষে জুতায় পা ঢোকাতে সক্ষম হন। তারপর তিনি ধীরস্থির পদে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

বয়স তেমন না হলেও পাকা চুলের একটা কথা আছে, যার জন্যে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিয়ে করাটা কেমন বিসদৃশ দেখায়। যৌবনের রঙমাখা দীপ্ত উজ্জ্বল দিনে আড়ম্বর করে বিয়ে করাই উচিত। না হলে হঠাৎ জীবনের সংস্পর্শে উষ্ণ-উত্তাল রক্তে যে নগ্ন, মাত্রাহীন উল্লাসের সৃষ্টি হয়, সে-উল্লাস ঢাকবার পথ থাকে না। কিন্তু প্রৌঢ় ব্যক্তির বিয়ে লোকচোখের আড়ালে

অনাড়ম্বরে হওয়াই শ্রেয়।

খানবাহাদুর সাহেব বজরায় বিয়ে করবেন স্থির করলেন। প্রশস্ত যমুনা, ওপারে ধু-ধু চর। মানুষের পদচিহ্ন-খচিত দুনিয়া থেকে দূর জীবনের মতো স্রোতস্বিনী নদীর বুকে বিয়ে করার মধ্যে একটা প্রতীকী বিশেষত্ব যেন আছে।

সমস্ত আয়োজন-সরঞ্জাম সমাপ্ত হয়; সুদিনটিও আসে। সেদিন অপরাহ্ণের দিকে ধবধবে সাদা শেরওয়ানি পরে গোঁফে আতর লাগিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে মোত্তালেব সাহেব বেরিয়ে যান, দরজার কপাট অতিক্রম করার আগে মনে-মনে খোদা রসুলের নামটাও একবার নেন। কিন্তু তাঁর প্রথম বিয়ের দামি মাসহাদি পাগড়িটা—যেটা এত বছর উঁচু আলমারিতে অযত্নে পড়ে ছিল, সেটা লুকিয়ে যায় হাতবাক্সে। প্রথম বিয়ের মতো এটি তেমন বিয়ে না হলেও পাগড়ি না পরে বিয়ে করার কথা তিনি ভাবতে পারেন না। একটা নতুন পাগড়ি কেনার কথা একবার ভেবেছিলেন। কিন্তু অহেতুক সঙ্কোচের জন্যে অবশেষে তা কেনা হয়ে ওঠে নাই। পাগড়িতে আবার কেমন লজ্জাও। আড়ম্বরের চুম্বকশীর্ষ যেন পাগড়ি, নওজোয়ানের উদগ্র নিশানা।

গাড়িতে চড়ে খানবাহাদুর সাহেব এবার পাগড়িটার কথা ভাবেন। নজু মিঞা হাতবাক্স নিয়ে পেছনে একটা টমটম গাড়িতে চড়েছে। তিনি ভাবেন, ছেলেমেয়েরা কি জানে কী ঐ হাতবাক্সে?

তারপর ইট-সুরকি-ঢালা রাস্তায় ঘোড়াগাড়ির লোহার-পাতে-ঘেরা চাকা ঘড়ঘড়িয়ে মচমচিয়ে চলে। পোয়া মাইল গিয়ে আদালত পেরিয়ে নদীর ধারের রাস্তাটি পাওয়া যাবে। ঘড়ঘড় করে চলে গাড়ি, তেজ নাই ঘোড়ার। মোত্তালেব সাহেব সোজা তাকিয়ে থাকেন। ঝিলিক দিয়ে স্মৃতি জাগে তাঁর মনে, প্রথম বিয়ের প্রাণমাতোয়ারা উন্মাদনার কথা স্মরণ হয় আলিঝালি। তখন বিয়েতে গিয়েছিলেন পালকি করে। তাড়ি-পান-করা বাহকদের পেশিতে ছিল শক্তি, চলনে ছিল তেজ। আর তরুণ মোত্তালেবের মাথায় ছিল পাগড়ি—রুপালি তারাখচিত বৃষ্টি-ধোয়া আকাশের মতো স্বচ্ছ নীলাভ রঙের মলমল কাপড়ের পাগড়ি।

তারাখচিত? হঠাৎ খানবাহাদুর সাহেব কেমন চমকে ওঠেন। তারাখচিত? তাই। সে-কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। আজ তাঁর পক্বকেশের ওপর তারাগুলি বিদ্রূপ করবে কি?

তবে একটা ভরসা। সে তারার ঔজ্জ্বল্য নাই এখন, তাছাড়া কিছু-কিছু কালের স্রোতেও গেছে। খানবাহাদুর সাহেব একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

গাড়ি তখন আদালত পেরিয়ে নদীর ধারের পথটা ধরেছে। জানালা দিয়ে যমুনার ওপারে তাকান মোত্তালেব সাহেব। অপরাহ্ণের ঝিমিয়ে-আসা ম্লান হলদে আলোয় সেখানে বিস্তীর্ণ বালুর চর কেমন একটা উদাস অস্পষ্টতার মধ্যে ধু-ধু করে। নিষ্কম্প দৃষ্টিতে সেদিকে তিনি তাকিয়ে থাকেন, মাংসের থলের মধ্যে তাঁর চোখ দুটি আবার মার্বেলের মতো নিশ্চল হয়ে থাকে। মনে হয়, চরে যদি হঠাৎ ঘূর্ণি হাওয়া ওঠে, তবু সে-চোখে একটু কম্পন জাগবে না, একবার পলক পড়বে না। তারপর এক সময়ে মাংসের থলের মধ্যে মার্বেলের মতো ভারি তাঁর সে-চোখ হঠাৎ লালচে হয়ে ওঠে, তাতে একটু আর্দ্রতা দেখা দেয়। কেন, তা তিনি জানেন না। তিনি জানতেও চান না। যিনি অত ভাবেন, যিনি অশ্রান্ত কীটের মতো অত খুঁটে-খুঁটে ওজন করে মেপেজুকে ভেবে দেখেন সব কথা, তিনি একবারও ভেবে দেখেন না, কেন তাঁর চোখ দুটি এমন ছলছল করে ওঠে। ব্যথা-বেদনায় তাঁর কৌতূহল নাই। সামান্য পাগড়ির সঙ্কোচটা কাটাতে না পারলেও তিনি ব্যথা-বেদনাকে বিনা প্রশ্নেই মেনে নেন।

তিনি যখন যমুনার ওপর বজরার দোলায় ঈষৎ দোলেন, তখন তাঁর বাড়িতে একটা গভীর নীরবতা নাবে। ছেলেরা নিশ্চুপ। এমনিতে তারা স্বল্পভাষী; মুখের চেয়ে মনেতেই বেশি কথা

বলে তারা। আজ তারা একেবারেই নির্বাক। কেবল একবার বাইরে তারা নিঃশব্দে পায়চারি করে। ছোট ছেলেটি উঠানে একটা শিমগাছ পুঁতেছিল। তার গোড়ায় বসে সে কিছুক্ষণ একটা কাঠি দিয়ে অকারণে মাটি খোঁড়ে। বড় ছেলেটি হঠাৎ একটি কঠিন অঙ্কের সমস্যা নিয়ে বসে, শেষে মস্ত মানচিত্রের বইটা খুলে একটি মহাদেশের সীমারেখা অনুসরণ করে। তাদের দুটি বোন গভীর মনোযোগ সহকারে সেলাই করে; তৃতীয়টি বালিশে মুখ গুঁজে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। নীরব নিস্তব্ধ বাড়িতে কেবল একটা নামহীন অশরীরী অস্তিত্ব কেমন একটা ছায়া বিস্তারিত করে রাখে।

কখনো-কখনো তাদের পাগলী মা অর্ধসংবিৎ ফিরে পান। তখন তিনি থেকে-থেকে ছেলেমেয়েদের পানে এমনভাবে তাকান যে মনে হয় তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, বহুদিন পরে আবার আপন সন্তানদের দেখছেন চোখ ভরে। আজ বোধহয় এ-অজাগতিক নিঃশব্দতার মধ্যে হঠাৎ তিনি অর্ধসংবিৎ ফিরে পান। প্রথমে তবু চোখে কিছু বিভ্রান্ত ভাব ও অস্থিরতা থেকে যায়। তারপর মেজো মেয়ের দিকে তিনি যখন তাকান, তখন তাঁর চোখে একটি সুস্থ সন্ধানী তীক্ষ্ণতা জেগে ওঠে।

দাঁত দিয়ে সুতা কাটতে গিয়ে মায়ের দৃষ্টি মেজো মেয়ের নজরে পড়ে। পড়তেই সে কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়। কথা বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে সংযত করে। কেবল তার সারা অন্তর ডুকরে কেঁদে ওঠে। মনে-মনে সে বলে : মা, আমাকে তুমি চিনতে পারছ?

মায়ের চোখ নড়ে না; তাতে অবশেষে কেমন আবেশ জমে ওঠে। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়েই থাকেন। মেয়েটি হাতে সেলাইর কাজ নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তবে মনে একটা দুর্দান্ত আশা-আনন্দ ঝড়ের মতো উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তার ইচ্ছা হয়, ছুটে গিয়ে মায়ের কোলে মুখ গুঁজে পুনর্মিলনের আনন্দে অবাধে কাঁদে। কিন্তু সে নড়বার শক্তি পায় না। তবে এই সময়ে তার মা বিস্তীর্ণ নীরবতায় তীক্ষ্ণ দাগ কেটে হেসে ওঠেন। সে-হাসি অতি কর্কশ হলেও তা অচেতন বলে দুনিয়া-ছাড়া মনে হয়। বাইরের লোক হয়তো কানে আঙ্গুল দিত, কিন্তু মেয়ে নির্বাক হয়ে শোনে সে-হাসি। কেবল ঝলকে-ঝলকে তার চোখের রং বদলায়। কান্না আসে না। এলে হয়তো ভালোই হত।

সন্ধ্যার দিকে আকাশে মেঘ ওঠে। তারপর সে-মেঘ শান্ত, ধীর মন্থর গতিতে ক্রমে-ক্রমে পৃথিবীর বুকে গভীর ছায়া ফেলে এগিয়ে মুষলধারে ভেঙে পড়ে, যেন বেদনাভারিযাত্রা আর সইতে পারে না। শিমগাছ ছেড়ে ছোট ছেলেটি ঘরে উঠে আসে, বড় ছেলেটি হয়তো আলোর অভাব বোধ করলে অঙ্কের সমস্যা ও মানচিত্র ছেড়ে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। শুধু মেয়েরা নাছোড়বান্দার মতো আবছায়ার মধ্যেও সেলাই করে চলে। রান্নাঘরে বুড়ি ঝি-এর আজ রাজত্ব। সে গজগজ করে আপন মনে বকে, চাল-ডাল সামলে বোঁচকায় বাঁধে। বড় মেয়ে যে আসলে সংসারের কর্ত্রী—সে আজ রান্নাঘরে যাবার তাগিদ বোধ করে না। অন্ধকারটা আরো ঘনিয়ে এলে মেয়ে দুটি সেলাই ছেড়ে অবশেষে বিছানায় ওঠে। ঘুম পায় না, তবু ঘুমের মতো অবসাদ সারা দেহে। তারপর দ্বিতীয় মেয়েটি বালিশে মুখ গুঁজলে আলগোছে, অতি সন্তর্পণে বালিশের একপ্রান্ত ভিজে ওঠে। অবশ্য তার নিথর নিশ্চলতার জন্যে মনে হয় না যে, বালিশটা তারই চোখের পানিতে ভিজেছে; মনে হয় বাইরের মুষলবৃষ্টির খানিকটা হয়তো কীভাবে সেটি ভিজিয়ে দিয়ে গেছে।

মফস্বল-শহরে তখন গভীর রাত। দরজায় সজোরে করাঘাত শুরু হলে নিস্তব্ধ বাড়িটা হঠাৎ চমকিত হয়ে ওঠে।

খানবাহাদুর সাহেব ভিজে জবজবে হয়ে ফিরেছেন। নজু মিঞা মাথায় ছাতা ধরেছে বটে, কিন্তু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ভিজে সারা। রাস্তায় জানালা-বন্ধ ঘোড়ার গাড়িতে নতুন

বিবি। অন্ধকারেও সে ঘোমটা টেনে নত মাথায় বসে। বাইরে ঘোড়াটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে ভিজতে থাকে।

বাড়িতে কোনো সাড়া জাগে না। ছোট ছেলেটির একটু পাঁচড়ার ভাব। অন্ধকারে সে দেহ চুলকাচ্ছিল, হঠাৎ দরজায় করাঘাত শুনে সে স্তব্ধ হয়ে যায়। বড় ছেলেটি ভাবছিল উঠে লণ্ঠন জ্বালিয়ে অন্য কোনো মহাদেশের সীমারেখা অনুসরণ করবে। সেও এবার হিমশীতল হয়ে গুপটি মেরে থাকে। মেয়েরা মনে দ্রুতগতিশীল বিচিত্র দ্বন্দ্ব বোধ করলেও রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যার মতো নিশ্চল হয়ে থাকে।

অসহিষ্ণুতায় দরজায় করাঘাত উচ্চতর হয়ে ওঠে। তারপর কিছু একটা ভাঙার শব্দ কানে আসে। মনে হয়, মোত্তালেব সাহেবের বাঁধানো সুদৃশ্য লাঠিটা যেন ভাঙল। বড় মেয়েটি শঙ্কিত হয়ে ভাবে, চাকর ছোঁড়াটা বা ঝিটা দরজা খোলে না কেন? কিন্তু চাকর ছোঁড়াটা সত্যিকার ঘুমে মরে আছে, ধাক্কালে সে গড়াবে কিন্তু জাগবে না। ঝির শ্রবণশক্তি নেই বললেই চলে।

তারপর বাড়িতে একটি ছায়া হঠাৎ নড়ে ওঠে। একটি মূর্তি নীরবে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এ-ঘরে পৌঁছে নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে থেকে আবার এগিয়ে যায়। চৌকির পাশে মিটমিট করে রাখা লণ্ঠনের আলোয় দেয়ালে একটা বিরাট মানুষাকৃতির ছায়া জাগে। তারপর সে-ছায়া ছাতে ছড়িয়ে গিয়ে আবার ছোট হয়ে আসে। দরজায় করাঘাত না থামালেও সে-ছায়াটি তাড়াহুড়া বোধ করে না, তার গতি শ্লথও হয় না।

পাগলী মা-ই দরজা খোলেন। তারপর দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে বৃষ্টির দিকে যেন তাকান, তারপর আপন মনে একবার হাসেন। অবশেষে অকারণে মুখ ব্যাদান করে ভেতরে চলে যান, একবার দেখেনও না কে এসেছে না এসেছে।

মেয়েরা ততক্ষণে উঠে পড়েছে। ও-ঘরে ছেলেরাও।

মেয়েরা চোখ মুছতে-মুছতে বাইরের ঘরে ছুটে যায়। লজ্জায় তারা কেমন মুষড়ে পড়েছে। তারা বিড়বিড় করে অনুচ্চকণ্ঠে বলে, ছি ছি কী ঘুম পেয়েছিল! বাদলার দিন কিনা। বারবার করে সে-কথাই বলে চলে দোয়াদরুদের মতো। ছেলেরা কিছু না বলে মাথা চুলকায়। মেজো ছেলেটির পাছার কাছে পাঁচড়ার জন্যে মারাত্মকভাবে চুলবুল করে। কিন্তু তবু সে তার মাথাই চুলকায়। বড় ঢ্যাঙা ছেলেটি গভীর লজ্জায়-অনুশোচনায় নুইয়ে থাকে।

অবশেষে তাদের নতুন মা ঘরে প্রবেশ করে। দরিদ্র ঘরের মেয়ে। বিয়ের ধাক্কায় সে নিতান্তই মুষড়ে পড়েছে। একরাশ কাপড়-অলঙ্কারের মধ্যে সে কাচের মতোই ভেঙেচুরে একাকার হয়ে আছে। দীর্ঘ ঘোমটার জন্যে চিবুকের অংশ ছাড়া তার গোটা মুখ অদৃশ্য হয়ে থাকে। মেয়েরা এবার একরাশ কাপড়ের মধ্যে ভাঙা কাচের স্তূপসম নতুন মাকে একে-একে সালাম করে। প্রথমে চটপটে মেজো মেয়ে। উবু হয়ে বসে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে সম্ভ্রমভরে সে-হাত একবার নিজের বুকে লাগিয়ে পাশে সরে অন্যের জন্যে পথ করে দাঁড়ায়। নতুন বউ কারো দিকে তাকায় না। বিয়ের পরেই অমন ধিঙি ছেলেমেয়ে পেলেও সে নতুন বউ ঘোমটা তুলে চোখ খুলে বেহায়ার মতো তাকাবে তার কোনো মানে নাই।

এ-সময়ে কোথাও একটা চক্কর মেরে মোত্তালেব সাহেবের প্রথম স্ত্রীও তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পরম গাম্ভীর্যের সাথে সালাম অনুষ্ঠানটি পর্যবেক্ষণ করেন। সালাম শেষ করে বড় মেয়েটি নিচের ঠোঁট কাটে দাঁত দিয়ে। তার ভয় হয়, হঠাৎ বুঝি তাদের মা হেসে উঠবেন। তাঁর বিদ্রূপ-ভরা তীক্ষ্ণ কর্কশ হাসির কথা ভাবতেই সে শিউরে ওঠে। মনে-মনে শঙ্কা-ভয়ে অস্থির হয়ে সে খোদার কাছে দোয়া করে : খোদা, খোদা, আম্মা যেন হেসে না ওঠেন।

সবার থেকে একটু আলাদা হয়ে খানবাহাদুর মোত্তালেব সাহেব দীর্ঘ-দেহে ঋজু হয়ে

দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর পোশাক এখানে-সেখানে সিক্ত, পিঠটা আগাগোড়াই ভেজা। মাথার কিস্তি টুপিও বৃষ্টির পানির হাত থেকে একেবারে নিস্তার পায় নাই। অবশ্য ভিজেছে সবাই। নতুন বিবির দামি শাড়িও বাদ পড়ে নাই। নজু মিঞাদের কথা ছেড়েই দেওয়া যায়। তারা সবস্ত্রে গোসল করে এসেছে।

তবে একটি জিনিস ভেজে নাই। সেটা মোত্তালেব সাহেবের দামি মাসহাদি পাগড়ি। যেমনি গিয়েছিল তেমনি সেটি হাতবাক্সে লুকিয়ে ফিরেছে।

কেরায়া

দিগন্ত থেকে বিচিত্রভাবে রাত এসে ধানক্ষেতের ওপর, সমগ্র নদীর ওপর ছড়িয়ে পড়ে।

ওরা দু-জন নৌকাতে বসেছিল। সেখানে বসেই তারা রাত্রির সঞ্চার দেখে : আস্তে-আস্তে নদীর মতোই অতল হয়ে ওঠে অন্ধকার, যে-অন্ধকারে পৃথিবী তলিয়ে যায়; তারপর দিগন্তের কাছাকাছি একটি-দুটি তারা জেগে ওঠে। অন্ধকার ঘনীভূত হলে তারা সে-অন্ধকারে গা-ডুবিয়ে বসে থাকে। তাদের মনে হয়, একবার নয় বারবারই যেন নিঃশব্দ কালো স্রোতের মতো রাতটি আসে, যেন তীরে তরঙ্গ ভেঙে পড়ে বারবার।

অবশ্য তা সম্ভব নয়। তরঙ্গ বারবার ফিরে আসে, রাত আসে একবারই।

তারা বোঝে, আরেকটি দিন শেষ হয়েছে। বনপ্রান্তর নদী-মাঠ-ঘাট ছেয়ে রাত নেবেছে, সূর্য অস্ত গেছে। কেবল অন্যদিনের মতো হাটখোলার পাশে নোঙর-করা নৌকায় তারা বসে আছে শূন্য হাতে, রিক্ত-নিঃস্ব হয়ে। তাদের অপেক্ষার শেষ হয় নাই।

মহাজনটি সেদিন বলে গিয়েছিল আসবে বলে। সে আসে নাই। হয়তো সে আসবেও না। তবু তার গুড়ের কেরায়া নেবে বলে সেই পরশু থেকে তারা নোঙর করে বসে আছে। তাদের দু-ধারে অন্য কেরায়া নৌকা এসেছে, নোঙর ফেলেছে, আবার চলে গেছে। তীরে হাট বসেছে, ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় হয়েছে, কেনা চলেছে, তারপর এক সময়ে সে-হাটও ভেঙেছে। তারপর নিত্যকার মতো শূন্য ভাঙা-হাটে নেড়ি কুত্তাগুলি ঘেউ ঘেউ করে লড়াই করেছে, ঘাসশূন্য মাঠে দমকা বাতাসে ধুলোর ঘূর্ণি উঠেছে, বৃহৎ গাছটি থেকে মরা পাতা ঝরেছে নিঃশব্দে। মহাজন ফিরে আসে নাই, তাদের যাওয়াও হয় নাই।

তাদের নৌকার দোষ নাই। নৌকাটি তাদের বেশ ছিপছিপে এবং মজবুত। গাবের আঠা দিয়ে তার সারা গা মাজা, দু-পাশে দুটো ক্ষুদ্র জানালাও। সে-জানালা দিয়ে তারা ভাতের ফেন ফেলে, পাটাতনের তলে জমে-ওঠা পানি সেচন করে, কখনো-কখনো থুতু ফেলে। নৌকার ভেতরে যা-যা প্রয়োজনীয় তা সব আছে : রান্নার হাঁড়ি-কুড়ি, হুক্কা-তামাক, বৈঠা-লগি, আর হাওয়ার পাল। পালটা অবশ্য ছেঁড়া, কিন্তু নানা রঙের তালিতে তার সৌন্দর্যের বাহার হয়েছে। তারপর নৌকা চালাবার জন্যে তারা দু-জন মাঝি—তাগড়া জোয়ান দু-জন মাঝি। একটি ছেলেও আছে সঙ্গে। ছেলেটি এতিম। সে ফাই-ফরমাশ খাটে।

কিন্তু মহাজনটি আসে নাই, তারা কেরায়াও পায় নাই। মহাজনের পা আছে; কেরায়ার পা নাই। মোটা মহাজনটির মতো নৌকাটিও যেখানে খুশি যেতে পারে, যে-ঘাটে মন চায় সে-ঘাটে, যে-নদীতে দিন পড়ে সে-নদীতে। তার বৈঠা-লগি আছে, পাল আছে, জোয়ান দু-জন মাঝিও আছে। কিন্তু কেরায়া-নৌকা কেরায়া ছাড়া যায় কোথায়? জোয়ান মাঝি দুটির পেটে, এতিম ছেলেটার পেটে ক্ষিদের আগুন জ্বলে। দূর গাঁয়ে তাদের বাড়িতেও সে-আগুন জ্বলে ধিকিধিকি করে।

কেরায়া নাই বটে, কিন্তু নৌকার অভ্যন্তরে শক্ত পাটাতনের ওপর শুয়ে একটি মুমূর্ষু

বুড়ো। সে আপন ব্যথায় গোঙায়, কাতরায়। তার এ-নৌকায় আবির্ভাবের কথায় নদীর মোহানার মাছগুলোর কথা মনে পড়ে। সেখানে মাঝে-মাঝে গভীর পানির কোনো ভীষণাকার জন্তুর তাড়া খেয়ে ছোট-ছোট মাছ সভয়ে জেলেদের নৌকায় লাফিয়ে ওঠে, তারপর ভয়ে কাঁপতে থাকে, তাদের কানকো হাপরের মতো ওঠা-নাবা করে। মাছগুলোর মতো বুড়োমানুষটিও আজ সকালে কোথেকে এসে কোনোমতে নৌকায় চড়ে ছইয়ের তলে ঢুকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। সে মাঝিদের আত্মীয়-কুটুম্ব নয়, এতিম ছেলেটিরও কেউ নয়। মুমূর্ষু মানুষটির মুখের কথা তখন প্রায় শেষ হয়েই এসেছে। তবে বাক্‌শক্তি যারা হারাতে বসে তারা শব্দের অপচয় করে না বলেই তার বক্তব্য সে দুটি কথায়ই পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে পারে। বুড়োটি বলে তার জীবনের শেষ বাসনার কথা। সে পাক-পাগাড়ে তার শেষনিশ্বাস ফেলতে-তো চায়ই না, বিদেশে বিভুঁই-এও মরতে চায় না। মৃত্যুকালে সে নিজের গ্রামে আপনজনের মধ্যেই থাকতে চায়। মাঝিরা তাকে কি নিয়ে যাবে তার দেশের বাড়িতে? বোধহয় মৃত্যুর মতো বিরাট ব্যাপার তার জীবনে কখনো ঘটে নাই। তাই তো তার ইচ্ছা তার আত্মীয়স্বজন সে-ব্যাপারটি দেখবার সুযোগ যেন পায়। অবশ্য মাঝিদের কাছে এমন অনুরোধ করতে তার একটুও বাধে নাই। মুমূর্ষুর জন্যে এমন দ্বিধা নিতান্তই অর্থহীন। বলাবাহুল্য, ভাড়ার কথাও কেউ তোলে নাই। বুড়োর কাছে টাকা-পয়সা এখন নিতান্তই মূল্যহীন।

কিন্তু জোয়ান মাঝি দু-জন এখানে গুড়ের জন্যে অপেক্ষা করে। তিন দিন আগে যে-মোটা মহাজনটি বলেছিল গুড়ের কেরায়া নিয়ে এই এল বলে এবং তারপর নদীর পাড় ভেঙে হাটের ঘাসশূন্য মাঠটি অতিক্রম করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তারই অপেক্ষা করে তারা। গুড় নিয়ে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা যায় কী করে? তারা বুড়ো লোকটির আবির্ভাবে আপত্তি করে নাই, সম্মতিও দেয় নাই।

সারাদিন মুমূর্ষু মানুষটি ছইয়ের তলে মরণ যন্ত্রণায় গোঙায়। কখনো-কখনো মওতের ভারে ভারি চোখ তুলে সে বাইরে জোয়ান মাঝিদের দিকে তাকাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু মাঝিরা তার দিকে একবারও নজর দেয় নাই। জানের ভয়ে মাছ যখন নৌকায় লাফিয়ে ওঠে, তখন জেলে সে-মাছ চুবড়ির মধ্যেই ভরে। ভেবে দেখে না, মাছটা কেন লাফিয়ে উঠল হঠাৎ। তাছাড়া এরা জেলে নয়, কেরায়া নৌকার মাঝি। এবং তারা এক স্থান হতে অন্য স্থানে কেরায়া নিয়ে যায়, মুমূর্ষু মানুষ বা মৃতদেহ নয়। যদি সকালে-সকালে গুড় এসে যেত, তবে অনেক আগেই তারা নৌকা ছেড়ে দিত, বুড়োলোকটিও বাড়িতে গিয়ে মরতে পারত, কারণ পথেই পড়বে তার বাড়ি। কিন্তু গুড় আসে নাই। আর ক-দিন তারা অপেক্ষা করতে পারে? কাল তাদের যেতেই হবে। শুধু আজ রাত; কাল সকালে তাদের বাড়িমুখো রওনা হতে হবে। কাজেই রাত যখন ঘনীভূত হয়ে আসে এবং তারা কালো নিশ্ছিদ্র রাতেরই এক অংশে পরিণত হয়, তখন অদৃশ্য পাখির পাখা-ঝাপটার মতো বুড়োটির গোঙানি ভেসে আসে, আবার অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু তারা ভ্রূক্ষেপ করে না সেদিকে। এবার ছোট এতিম ছেলেটি উঠে নৌকার পাশে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে আসে। মাঝি দু-জন পানিতে থুতু ফেলে আবার অবিচল হয়ে বসে থাকে। প্রাণস্পন্দন চলছে তবু তারা নিস্পন্দ।

তারপর রাত্রির ঘন তমিস্রার মধ্য থেকে আসে ক্রোধ। তারপর সে-ক্রোধ তাদের শক্ত-মজবুত জোয়ান শরীরের আবরণের তলে মোটা মহাজনের বিরুদ্ধে ধিকিধিকি করে জ্বলে। নদীর অন্ধকার শীতল বুকে মাছরা ঘুমোতে যায়। নদীর অতলে ভয় নাই, ক্রোধ নাই।

তারপর তাদের ক্রোধ বাড়তেই থাকে, তার শিখা উঁচু হয়ে ওঠে। কাল তারা খালি হাতে ফিরে যাবে। সে-নৌকায় লগি-বৈঠা আছে, পাল আছে, জোয়ান মাঝি আছে, ফাই-ফরমাশ খাটার জন্যে একটি এতিম ছেলেও আছে, সে-নৌকা খালি হাতে এসেছে খালি হাতেই ফিরে যাবে। নৌকায় যাত্রার শেষে কেউ নেই, তা নয়। সেখানে সংসার আছে, বউ বাচ্চা পুষ্যি

আছে; তারা অপেক্ষা করে তাদেরই জন্যে—যারা দূরে-দূরে নৌকা নিয়ে যায় কেরায়ার সন্ধানে। বাড়িতে যারা থাকে তারা অপেক্ষা করে। পাখির ছানার মতো নীড়ের নিরাপত্তায় গভীর বিশ্বাসে তারা অপেক্ষা করে। বড় পাখির ডানা দীর্ঘ, তাদের শক্তিও অশেষ; যাদের ডানা দীর্ঘ হয় নাই বা তাতে শক্তি নাই তারা অপেক্ষা না করে কী করবে? তারা নীড়ের উষ্ণতায় গা ডুবিয়ে আকাশের দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে থাকে। বড়রা আসবেই। ঠোঁটে খাবার নিয়ে দিগন্ত হতে উড়ে তারা আসবেই, আনন্দে স্নেহ-মমতায় এবং গর্বে গ্রীবা ফুলিয়ে তারা পৌঁছুবেই। সব সময়েই তারা ফিরে আসে এমনি। মাঝিরাও দিগন্তের পানে তাকিয়ে চোখ-ভরা আশা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে খাদ্যের সন্ধানে। কিন্তু প্রতিবার তারা খাদ্য, এক-আধটু উপহার বা পয়সা-কড়ি নিয়ে ফিরে আসে না, কখনো-কখনো শূন্যহাতেই ফিরে আসে। তখন তাদের ভেতর থাকে শুষ্ক-ভীতি, কেমন একটা কম্পনভাব, বুকজুড়ে নিঃসহায় ভাব। হয়তো ভেতরে-বাইরে তখন কিছুই থাকে না। নিঃসীম আকাশের মতো তখন সবই ফাঁকা, শূন্য মনে হয়। এ-সময়ে তারাও হয়তো পাখি-ছানার মতো ছোটই হয়ে পড়ে।

কেন এমন হয়?

জোয়ান মাঝি দুটি সে-কথার উত্তর জানে না।

রাত আরো ঘনীভূত হয়। ক্রোধটাও পড়ে রাত্রি গভীর হবার সাথে-সাথে। কোনো-না-কোনো সময় আগুন নিভেই যায়। ক্রোধেরও তেমনি শেষ আছে।

তবে ক্রোধের অবসান ঘটলে ভেতরের শূন্যতা আবার উৎকট হয়ে ওঠে। ক্রোধটাই যখন তাদের একমাত্র সম্বল, তা-ও চলে গেলে থাকে কী? তাই তারা মোটা মহাজনটি সম্পর্কে নানা রকম নির্দয় কথা ভেবে ক্রোধের আগুনটা আবার চাঙা করার চেষ্টা করে, শীতের দিনে উষ্ণতার জন্যে নিভন্ত আগুন যেমন খুঁচিয়ে চাঙা করে মানুষ। কিন্তু তাদের বুকে আগুন নিভে গেছে।

হঠাৎ তীরে কিসের একটা শব্দ হয়। ক্ষিপ্রভঙ্গিতে তারা সেদিকে তাকায়। মহাজন এল নাকি এত রাত্রে? কত মানুষ কত অসময়ে উটকো এসে হাজির হয়।

অবশ্য কোনো মানুষ তারা দেখতে পায় না। কেউ আসে না। নির্জন তমিস্রাঘন রাতে কেউ নাই। কোথাও কিছু নাই। তাদের মনে ক্রোধও নাই।

পাড়ের কাদামাটিতে টান ধরেছে বৃষ্টিহীন রাতের শুকনো হাওয়ায়। নেড়ি কুকুরগুলো ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে; সাহস করে গর্ত থেকে ইঁদুর বেরিয়ে এসে চলাফেরা করতে শুরু করেছে। দূরে ঘর-বাড়ি চালা। সেখানে অন্য কুকুর রাত জাগে, পাহারা দেয়। মানুষ ঘুমোয়, নদীর অতলে মাছ ঘুমোয়।

তারপর রাতের অন্ধকার ভেদ করে একটি প্যাঁচা বেরিয়ে এসে নৌকাটার চারিদিকে ওড়ে, চক্র কাটে, ভারি পাখার শব্দ তুলে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

অকারণে বা কোনো অদৃশ্য কারণে প্যাঁচার আওয়াজে মাঝি দুটির হঠাৎ দুনিয়াদারি আর আখেরাতের কথা মনে পড়ে। বাপ-দাদার মুখে শোনা হায়াত-মওতের কথাও। তারপর তারাও বিজ্ঞ প্যাঁচায় রূপান্তরিত হয়। পাখা নাই বলে ওড়ে না; কেবল বিজ্ঞতার ভারে নিশ্চল হয়ে বসে থেকেই অবোধ্য রহস্যময় ভাবনার স্রোতে ভেসে-ভেসে কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

নদীর ঈষৎ টানে নৌকাটা সামান্য দুলতে থাকে।

তৃতীয় প্রহরে নৌকার অভ্যন্তরে মুমূর্ষু লোকটি হঠাৎ জেগে ওঠে। মৃত্যু জানে তার পরাজয় নাই। তাই হয়তো কখনো বেড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলে তেমনি সে-ও মানুষের সঙ্গে খেলে। হয়তো বুড়ো লোকটির মৃত্যুটি মানুষের মতোই; কেবল অদৃশ্য। বুড়ো লোকটির সঙ্গে বেড়াল-ইঁদুর খেলায় সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই মুমূর্ষু লোকটিকে একটু রেহাই দিয়ে সে রাত্রির স্নিগ্ধ-সুন্দর বাতাসে নৌকার গলুইতে গিয়ে বসে। ভেতরে বুড়ো-লোকটি চোখ খুলে তাকায়। ডিবের অস্পষ্ট আলোয় কিছুটা বিস্মিত হয়ে দেখে, তার পায়ের কাছে এতিম

ছেলেটা শুয়ে। সে তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর সে তার ছেলেদের কথা ভাবে। বিশেষ করে সেই ছেলেটার কথা যাকে সাপে কেটেছিল। তার বয়সও এতিম ছেলেটির মতোই ছিল। অতি সন্তর্পণে বুড়োটি এবার চারধারে চেয়ে দেখে। অন্ধকারের মধ্যে আজরাইল কোথাও ঘাপটি মেরে বসে নাই-তো? না, তাকে সে কোথাও দেখতে পায় না। এবার বুকে সাহস এনে অতি সাবধানে রক্তশূন্য-প্রায় পা বাড়িয়ে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে অতি আলগোছে সে ঘুমন্ত ছেলেটার অনাবৃত বুকে একটু খোঁচা দেয়। তাতে ছেলেটি জাগে না। একটু অপেক্ষা করে আগের মতোই সাবধানতার সঙ্গে আবার সে খোঁচা দেয়। এবারো ছেলেটি জাগে না। তার ঘুম গভীর।

বুড়ো লোকটির এবার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। হঠাৎ তার মনে হয়, সবই যেন মৃত্যু : রাতটি, নিচে কাঠের পাটাতন, তারপর ছেলেটি। সব মরে ভূত হয়ে আছে। অতএব তার পায়ের কাছে শুয়ে-থাকা ছেলেটি তারই সেই ছেলে যাকে সাপে কেটেছিল। সে ঘুমায়, কারণ ঘুম হল মৃত্যু।

কিন্তু মৃত্যু জীবনের মতো নয়। তার না আছে জীবনের অনুভূতি না রসবোধ। তাই মৃত্যুকে এখানে-সেখানে খোঁচাতে কোনো ভয় নাই, কারণ সে তাতে রাগ-বিরক্তি কিছুই বোধ করে না। অতএব বুড়ো লোকটি এবার নির্ভয়ে সজোরে লাথি মারে এতিম ছেলেটির বুকের পাঁজরে। ফলে ছেলেটির ঘুম ভাঙে। সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বড়-বড় চোখে কয়েক মুহূর্ত বুড়োর দিকে তাকিয়ে থাকে।

বুড়োও তাকিয়ে থাকে তার দিকে। বস্তুত তার দৃষ্টি পড়ে না। কারণ সে পশলা বৃষ্টিতে ভেজা গায় সবুজ রঙের ঝাপটা দেখে। তারই পাশে ছেলেটি মারা গিয়েছিল। শীত তখনো আসে নাই। সে মনস্থির করেছিল শীত পড়লে তাকে লাল ডোরা-কাটা একটি জামা কিনে দিবে। কিন্তু শীতের আগেই সে মারা গিয়েছিল।

ইশারায় বুড়ো লোকটি এতিম ছেলেকে ডাকে। ছেলেটি নড়ে না। তার গায়ে আঙ্গুলের একটু চাপ দিয়ে বুড়ো আবার ডাকে। গলায় তার আওয়াজ হাওয়া বনেছে। সে একটু হাসেও। মানে মুখের দু-একটা পেশি এধার-ওধার হেলে-দুলে। তার মুখগহ্বর বীভৎস দেখায়। সে জানে এতিম ছেলেটি তার ছেলে নয়। ছেলেটি মৃতও নয়। তবু চারিদিকে মৃত্যু। নৌকার ভেতরে কালো ধোঁয়ার মতো যে-অন্ধকার ঢোকে সে-অন্ধকার রাত্রির অন্ধকার নয়। রাত্রি বলে কিছু নাই। দিনের ওপাশে মৃত্যু।

বাপজান! বুড়োর মুখে হাওয়া হঠাৎ শব্দের আকার গ্রহণ করে। তার চোখ চকচক করে। জীবন্ত একটি ছেলের মুখ দেখবার জন্যে একটি তীক্ষ্ণ আকাঙ্ক্ষা তার বুক ফেটে জাগে।

এদিকে এস বাপজান।

ছেলেটির চোখ ভয়ে জমে থাকে। তবু ফাই-ফরমাশের ছেলেটি একটু এগিয়ে আসে।

না, এতিম ছেলেটি তার ছেলে নয়। তার ছেলে সাপে খেয়েছে। ছেলেটিকে তার বলার কিছু নাই। সত্য কথা এই যে, নিজের মৃত ছেলেটির কথাও সে ভাবে না।

বুড়ো লোকটি চোখ বোজে।

বাইরে মাঝি দুটি নীরবে ঘুমায়, অনেকটা শিশুর মতোই। তারা আর প্যাঁচা নয়। আর মৃত্যু যদি গলুইতে-বসা অদৃশ্য মানুষটি, সে-ও এখনো গলুইতেই বসে আছে। বসে-বসে হয়তো নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে দেখে চারিদিকে। চোখ আছে বলে দেখে; কোথাও তার একটু আনন্দ বা ঔৎসুক্য নাই।

বুড়োটি আবার চোখ খুলে তাকায়। ছেলেটি তখন শুয়ে পড়ে ঘুমে বিভোর আচ্ছন্ন। হঠাৎ একটা তীব্র তাগিদ বোধ করে বলে বুড়ো দ্রুত কণ্ঠে ডাকে, বাপজান, বাপজান।

সে জানে না যে তার কণ্ঠে কোনো আওয়াজ হয় না। উত্তর না পেলে এবার সে ভাবে, সে স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নের কখনো শেষ নাই; স্বপ্ন কারো পিছু ছাড়েও না। এতিম ছেলেটা মরে

আছে। যেমন রাতটি, নিচে কাঠের পাটাতন, বাইরে হাওয়া।

এবার চিরদিনের জন্যে বুড়ো চোখ নিমীলিত করে।

কানা বেড়ালের মতো নিঃশব্দ সতর্ক পদক্ষেপে অবশেষে ভোর আসে। আসে নদীর তীরে বাঁধা নৌকার ওপর দিয়ে, ভেতরে ঘুমন্ত মানুষের ওপর দিয়ে, বড়-বড় গাছের নিচে ঝরে থাকা হলদে পাতা, হাটখোলা আর নিঃসীম আকাশের ওপর দিয়ে।

বাইরে মাঝি দু-জন জেগে ওঠে। কিছুক্ষণ তারা নিস্পন্দ হয়ে থাকে; তাদের চোখে বিহ্বলতা। কোনো-কোনো দিন শুরু হতে চায় না। সূর্য ওঠে, অন্ধকার কাটে, তবু দিন আসে না। তবে সূর্যকে কে ধরে রাখতে পারে? তার নিত্যকার পরিক্রমা শুরু হয়েছে, দিন আসুক বা না আসুক, তার পরিক্রমা কেউ রুখতে পারে না। তাই মানুষ পশুপক্ষী জন্তু-জানোয়ার জেগে ওঠে। তারপর দিনও শুরু হয়। দিনকেও কেউ রুখতে পারে না। এবং দিনের আলোয় মাঝি দু-জন বুড়ো লোকটির দিকে তাকিয়ে বোঝে, সে আর জীবিত নাই। তারা হাই তোলে। কারণ দৃষ্টি সরার সঙ্গে-সঙ্গে মন অন্য কোথাও ছিটকে পড়ে। কিন্তু মনটা কোথায়ই-বা ছিটকে পড়বে? ভেতরটা শূন্য হয়ে আছে। সে-শূন্যতায় ভারশূন্য শুষ্ক-পাতার মতো তারা ভাসে। তবে তারা জানে, আর তীরের দিকে তাদের দৃষ্টি দেয়ার কোনো অর্থ নাই। আজ সকালে তাদের নোঙর তুলতে হবে।

তারা নৌকার নোঙর তুলে নেয়। মরা তেলেপোকার গায়ে অসংখ্য পিঁপড়ের মতো অসংখ্য নৌকা নদীর তীরে আঁকড়ে পড়ে আছে। তাদেরই মধ্য থেকে একটা নৌকা তীর হতে খসে পড়ে। দিগন্তের ওপার থেকে পয়গম্বরের এবং মানুষের খোদা যদি সে-সময়ে উঁকি মেরে দেখতেন তখন তাঁরও মনে হত তেলেপোকার মৃতদেহ ছেড়ে একটি পিঁপড়েই বুঝি খসে পড়েছে।

নদীর পানিতে হালকা বাদামি রঙের আভা। এখানে-সেখানে সবুজ পানার দল। থেকে-থেকে শুশুক মাথা তুলে গোল হয়ে ডুবে যায়। মাঝিদের কেরায়ার নৌকা ভাটির টানে ভেসে চলে।

হুঁকা সাজিয়ে আনে এতিম ছেলেটি। মাঝিরা পালা করে হাল ধরে। তারপর ক্রমশ বেলা বাড়ে। চোখ ধাঁধানো রোদ নদীর বুক থেকে প্রতিফলিত হয়। এতিম ছেলেটি আবার নতুন করে হুঁকা ভরে আনে। তারপর ছইয়ের পাশ দিয়ে দড়াবাজিকরের নিশ্চিত নির্ভুল পদক্ষেপে হেঁটে নৌকার গলুইর পাশে গিয়ে বসে বিষণ্ন বড়-বড় চোখে অন্যান্য নৌকার যাতায়াত দেখে। আর করবার কিছু নাই তার। পেটে কেবল প্রচণ্ড ক্ষিধে; কিন্তু সে-কথা সে ভাবে না। মাথাটায় কেমন ঝিম ধরেছে। তার চোখ ঢুলে-ঢুলে আসে!

নৌকার পেছনে বসে মাঝি দু-জন নীরব হয়েই থাকে। যে হাল ধরে, তার মুখ সামনের দিকে তাদের গ্রামের দিকে। কিন্তু গ্রামের কথা সে ভাবে না।

ছইয়ের ভেতরে লাশটা দোলে, কারণ ভাটির টানে ভেসে যেতে-যেতে নৌকা একটু দোলে। মৃতদেহ হলেও মনে হয় যেন একটা গন্তব্যস্থল আছে। অথচ নৌকার চলন সম্বন্ধে সচেতন মাঝি দুটির যেন কোনো গন্তব্যস্থল নাই। তারপর রোদ আরো চড়লে গতকালের ক্ষিধেটা হঠাৎ ফিরে আসে, সঙ্গে-সঙ্গে সারা জীবনের ক্ষিধেও ফিরে আসে। মাঝিদের মুখভাবে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় না। দেহে ঘাম শুধু চকচক করে। একজন উঠে ছইয়ের ভেতরে ঢুকে লাশটার প্রায় গা-ঘেঁষে শুয়ে পড়ে। উরুর মধ্যে তার হাত দুটি সে স্থাপন করে, তারপর চোখ বরাবর দৃষ্টিহীন চোখে তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘুম আসে। অন্য মাঝি হাল দেয় নৌকায়।

এক সময়ে ঘুমিয়ে-থাকা লোকটি উঠে এসে হাল ধরে, এবং যে খালাস পায় সে তেমনি মৃতদেহের প্রায় গা-ঘেঁষে শুয়ে পড়ে। তার ঘুম আসতে দেরি হয় না। এবং এবার যে বাইরে

থাকে সে ভাবে, ছইয়ের তলে দুটি মানুষ যেন ঘুমিয়ে। তারপর মনে হয়, দুজনেই মরে পড়ে আছে। তবে ভেতরের আবছা অন্ধকারেও একটি লোকের দেহে ঘাম চকচক করে।

সামনে, গলুইর কাছে, এতিম ছেলেটিও ঘুমায়। রোদের দিকে তার মুখ ফেরানো, তাই রোদে তেতে লাল হয়ে উঠেছে তার বিষণ্ন মুখ।

অভ্যন্তরে এবার একটি মাছি কোথেকে উড়ে এসে ছইয়ের মধ্যে ঘুরপাক দিয়ে অবশেষে মৃত মানুষের নাকের মধ্যে প্রবেশ করে। মাছিটি প্রবেশ করে, কিন্তু আর বের হয় না।

বাইরে নির্মেঘ আকাশ উপুড়-করা রোদে উজ্জ্বল মোহিনী সাপের মতো হয়ে ওঠে। তারপর অতি দীর্ঘ সময় সে-বিচিত্র সাপ নিঃশঙ্ক ঔদ্ধত্যে ঝিলমিল করে, নির্ভয়ে নৃত্য করে, ফুলে-ফুলে এঁকেবেঁকে দিগন্তে ছুটে যায়। অবশেষে সূর্য যখন রক্তিম রূপ ধারণ করে, পৃথিবীতে ছায়া নাবে, নম্রতা আসে, সে-নির্লজ্জ সাপ তখন আবার নদীতে পরিণত হয়। হাওয়া শীতল হয়, নদীর বক্ষ থেকে শীতলতা নিয়ে সে-হাওয়া শ্রান্ত উত্তপ্ত ঘর্মাক্ত দেহে সে-শীতলতা বিতরণ করে। তারপর নৌকাটি সুপরিচিত বাঁক পেরুলে এবার গ্রামটি নজরে পড়ে। দিগন্তে এক মুঠো ছায়ার মতো দেখায় সে-গ্রাম। সে-গ্রামে তারা লাশ নাবাবে।

পৌঁছতে-পৌঁছতে তাদের সন্ধ্যা হয়ে যায়। পানিতে নেবে-আসা লাল-ইটে বাঁধানো ঘাটের পাশে দুটি লোক আয়েশ করে নাইছিল। তাদের পাশেই তারা নৌকা বাঁধে। খবর পেয়ে পানি থেকে উঠে একটি লোক ছুটে যায়। মাঝি দু-জন নৌকা থেকে পাড়ে উঠে চুপচাপ বসে থাকে। তাদের করবার কিছু নাই।

কিছুক্ষণ পরে আলো হাতে কয়েকজন লোক নিঃশব্দে দ্রুতপায়ে নদীর পাড়ে উপস্থিত হয়। সঙ্গে তাদের ক-জন বউ-ঝিও। বউ-ঝির মাথায় ঘোমটা নাই; নিচু গলায় কাঁদে। তারপর ছায়ার মতো আরো লোকজন জড়ো হয়। মাঝি দু-জন আলাদা হয়ে বসে থাকে। তাদের পানে কেউ তাকায় না।

বুড়ো মানুষটির লাশ কাঁধে করে এবার ওরা পাড়ে উঠে ধীরমন্থর গতিতে গাঁয়ের দিকে রওনা হয়। পেছনে তাদের একটি মিছিল লাগে; অন্ধকারের মধ্যে লণ্ঠনের আলো হেলে-দোলে। কেবল এখন বউ-ঝিরা কেমন মুখ খুলে কাঁদে। একটি বুড়ি বিলাপ করে। হয়তো সে মৃত লোকটির বিধবা। তারপর শীঘ্র তারা অদূরে গাছপালা বাড়িঘরের পেছনে এবং চাঁদশূন্য রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। কান্নার এবং বিলাপের ধ্বনিটা তবু জেগে থাকে অনেকক্ষণ। মাঝি দু-জন কখনো সে-কান্না-বিলাপ শোনে, কখনো শোনে না। হয়তো তা থেমে-থেমে জাগে, অথবা বারবার ফিরে আসে ক্রন্দনভরা রাতের মতো, নিঃস্ব দিনের মতো। তারপর লাল-ইটে বাঁধানো শূন্যঘাটে গভীর নীরবতা নাবে। ছইয়ের ওপর বসে এতিম ছেলেটি নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। দূরে কোথাও এক মাঝি অন্য এক মাঝিকে ডাকে।

মাঝিদের যাত্রা শেষ হয় নাই। তাই তারা পাড় থেকে উঠে দাঁড়ায়। এতিম ছেলেটা ছই থেকে নেবে ডিবেটা জ্বালায়। যে-মাঝি এবার হাল ধরবে সে ছইয়ের বাইরের সরু পথ দিয়ে স্বচ্ছন্দভাবে হেঁটে নৌকার পেছনে যায়। অন্য মাঝি নৌকাটি গভীর পানিতে ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে পাটাতনে ওঠে। তারপর সে গলুইর কাছে নৌকার দিকে পিঠ দিয়ে বসে। ছইয়ের ভেতর লাশশূন্য স্থানটি শূন্য হয়ে থাকে। তারা সেদিকে তাকায় না।

নিঃশব্দ নদীর কালো বুকের ওপর দিয়ে ভেসে চলে কেরায়া নৌকাটি, দুই জোয়ান মাঝি তার দুই প্রান্তে বসে। এতিম ছেলেটি অকস্মাৎ এক গভীর শ্রান্তি বোধ করলে হামাগুড়ি দিয়ে ছইয়ের ভেতরে ঢুকে কাল রাতে যেখানে শুয়েছিল, সেখানেই শুয়ে পড়ে।

তারপর সামনের গলুইর কাছে হাত-পা গুটিয়ে বসে-থাকা মাঝিটির বুক থেকে কণ্ঠনালিতে শ্লেষ্মা ঠেলে-ওঠে-বলে সে সজোরে কেশে পানিতে থুতু ফেলে। হালের মাঝি নিথর হয়ে থাকে।

নৌকার দু-পাশে নদী ছলছল করে।

নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা

আকাশে রঙ-বেরঙের ঘুড়ি উড়ছিল, সেগুলো তাড়াতাড়ি নেবে আসে। ব্যাটা ছেলেরা কাজ ভুলে আরাম ছেড়ে রাস্তায় বেরোয়, পর্দানশিন মেয়েরা দাঁড়ায় বেড়ার পেছনে পর্দার আড়ালে। ঔৎসুক্যের সীমা নাই যাদের তারা রাস্তার মোড়ে-চৌমাথায় জড়ো হয় এবং ন্যাংটা ছেলেরা বাঁদর-নাচ হবে মনে করে তারস্বরে চিৎকার করে দিগ্বিদিগশূন্য ছুটতে শুরু করে।

সারা শহরে খবর পৌঁছে গেছে।

খবরটা অতিশয় বিচিত্র।

সেটি এই যে, বৃদ্ধ সদরউদ্দিন একটি অত্যাশ্চর্য অন্তিমখেয়াল পূর্ণ করতে পথে নেবেছে। খাড়া নাকে কড়া রোদ, গর্তে-ঢোকা চোখে ঘোলাটে অন্ধকার এবং লম্বা শীর্ণ হাড়সার পায়ে কাঠ-কাঠ ভাব, শহরের অলিগলি দিয়ে হেঁটে-হেঁটে সে বন্ধু-শত্রুর সন্ধান করে। মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে মানুষের যখন মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো কামনা থাকে না, যখন তার সমগ্র ইন্দ্রিয় অন্ত্র-তন্ত্র অধীরভাবে চায় যে জীবনের যবনিকা ঘটুক, যখন আশা-ভরসা মায়ামমতা ব্যথা বেদনা সবই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়, তখনই সদরউদ্দিন তার অন্তিমশয্যা ছেড়ে একটি অদ্ভুত মনস্কামনা পূর্ণ করতে বের হয়েছে। তার সময় নাই সে-কথা সে জানে। শয্যা ত্যাগ না করলে এতক্ষণে তার মৃত্যুও এসে যেত। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মনস্কামনা পূর্ণ না করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত পাকে-প্রকারে দৃঢ়সঙ্কল্পের বলে সে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখবে। যে-মানুষ মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছেও উগ্রসূর্যের তলে পথে-পথে এমনভাবে হাঁটতে পারে, সে আর মৃত্যুর ক্রীতদাস নয়। এখন ফেরেশতা নয়, সে-ই সাব্যস্ত করবে তার প্রাণান্তের সময়।

তার অন্তিম বাসনা বন্ধু-মিত্র-শত্রুর নিকট হতে মাফ চাওয়া। তাদের কাছে মাফ না নেওয়া পর্যন্ত সে মরবে না, লকলকে পায়ে অনিশ্চিত পদক্ষেপে যে-শহর ভ্রমণ শুরু করেছে সে-শহর ভ্রমণ হবে না। তার বাসনাটি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে এ-দুনিয়া পরিত্যাগ করবে না।

অবশেষে সদরউদ্দিন কে বন্ধু কে শত্রু তার বাছবিচার আর করে না। সে বিষয়ে কে কখন নিশ্চিত হতে পারে? তাছাড়া মৃত্যুর সম্মুখে সে-বাছবিচার নেহাতই অর্থহীন মনে হয়। সকলের কাছেই মাফ চায় সদরউদ্দিন। যার সঙ্গে সারাজীবনেও একটিবার কথার আদান-প্রদান করে নাই, তাকেও বাদ দেয় না। কে জানে কখন সে নিজেরই অজ্ঞাতে শুধু চোখের অবহেলায়ই কার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে। তবে কারো কাছে সে মাফ ভিক্ষা করে না, দাবিই করে।

একগুঁয়ে-ভাবে হাতের লাঠি ঠুকে-ঠুকে মরণাপন্ন বৃদ্ধ সদরউদ্দিন অগ্রসর হয়। মাঝে-মাঝে লাঠি ঘুরিয়ে সে তার পেছনে ছেলেদের দলটিকে যথাস্থানে রাখে। তারা তার পেছনে ফেউ ধরেছে আজরাইলকে দেখবে বলে। তাতে তার আপত্তি নাই। তবে যখন তারা তার কাপড় ধরে টানে বা হাত ধরতে চায়, তখন সে বিরক্তই বোধ করে।

লাঠি দিয়ে সদরউদ্দিন তার মেয়েকেও দূরে রাখে। চুল আলু-থালু, মুখে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব, মাথা ঘোমটাশূন্য—মেয়েটি তার পিছু ছাড়তে নারাজ। সে কেবল গোঙায়, বৃদ্ধ বাপকে ঘরে প্রত্যাবর্তন করবার জন্যে কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করে। কিন্তু সদরউদ্দিন তার গোঙানিতে বা অনুরোধে কান দেয় না। সে জানে তার মেয়ের ইচ্ছে অপূর্ণ থাকবে না : কায়দামাফিক বিছানায় শুয়েই সে তার শেষনিশ্বাস ত্যাগ করবে।

বৃদ্ধ সদরউদ্দিন এগিয়েই চলে। তাকে দেখে মনে হয়, তার কাম্যবস্তু না এ-জীবনের না সে-জীবনের। গলির পর গলি পেরিয়ে চলে সে, কাঠের পা-দুটি অব্যর্থভাবে সম্মুখদিকে

নিক্ষিপ্ত হয়। সে-পা জীবনীশক্তিতে চলে বলে মনে হয় না। অত্যাশ্চর্যভাবে সোজা তার পিঠ, মাথা উন্নত—যন্ত্রচালিত পুতুলের মতোই সে এ-পথ সে-পথ অতিক্রম করে।

থেকে-থেকে মেয়েটি নিজেকে যেন সামলাতে পারে না। তখন তার গোঙানি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। একবার বৃদ্ধ সদরউদ্দিন ঘুরে দাঁড়িয়ে অপ্রত্যাশিত শক্তির পরিচয় দিয়ে লাঠি ঝেঁকে মেয়েকে শাসন করে। অবশ্য লাঠিকে মেয়ের ভয় নাই। কেবল পুনর্বার তার বাপের অনমনীয় মনের পরিচয় পেয়ে সে এবার ডুকরে কেঁদে ওঠে। সদরউদ্দিন তার কানে খিল দেয়।

যাদের কাছে সদরউদ্দিন মাফ চায়, তারা যে সন্তুষ্ট হয় তা নয়। কেউ গভীরভাবে লজ্জিত হয়, কেউ অপ্রস্তুত হয়, কেউ-কেউ আবার ভয়ও পায়। কিন্তু সন্তুষ্ট হয় না কেউ-ই।

মাফ? কিসের জন্যে মাফ?

উত্তর দিতে তারা দ্বিধা করে, কেউ-কেউ আবার বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলে যেন। যে-মানুষ জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে, যার সম্মুখে কেবল অনন্তকালের সীমাহীনতা, তার সামনে দাঁড়িয়ে, মুখে ভাষা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

তবে লোকেরা যখন উত্তর দিতে দ্বিধা করে তখন সদরউদ্দিনের মেয়ের ভয়ের সীমা থাকে না। ভীতত্রস্ত কণ্ঠে সে বারবার বলে, মাফ দিয়ে দেন, মাফ দিয়ে দেন। মরবার আগে একটি বুড়ো মানুষ মাফ চাইছে, তাকে মাফ করে দেন।

কিন্তু কিসের জন্যে মাফ?

কারো উত্তরের জন্যে অবশ্য সদরউদ্দিন অপেক্ষা করে না। তার সময় নাই। মৃত্যু এখন তার ক্রীতদাস হলেও তার সময় অফুরন্ত নয়। যারা উত্তর দিতে দ্বিধা করে বা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারা কিছু বলবার আগেই সে হাঁটতে শুরু করে। মেয়েটি তার পেছনে আবার ছুটে আসে।

নীল আকাশে উগ্র রোদ; সেখানে একটি ঘুড়িও আর নাই বটে কিন্তু চিল ওড়ে। কড়া রোদে সদরউদ্দিনের নাক ঝলকায়। এবার তার পা-দুটি কেমন অনিশ্চিতভাবে বাঁয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। যেন যন্ত্রের তেজ কিছু কমে এসেছে। তবে সে পূর্ববৎ অগ্রসর হতে থাকে। তার মুখে অজাগতীয় ভাব। দৃষ্টি তার সম্মুখে নিবদ্ধ থাকলেও অন্য মানুষরা যা দেখে সে তা যেন দেখে না। হয়তো সে সত্যিই দেখে না। হয়তো জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সে যে-সত্য দেখতে পায়, সে-সত্য সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। একই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবী, ঘরবাড়ি জীবনের ধারা—সবই যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে তা তাদের কল্পনাতীত। হয়তো সদরউদ্দিন একটি নিরাকার শূন্যতাই কেবল দেখে, যে-শূন্যতা চতুর্দিকে ঘিরে থাকলেও দেখার সময় আসার আগে কেউ তা দেখতে পায় না।

এক সময়ে সদরউদ্দিনের মুখের কথা শুকিয়ে যায়। তাতে তার অবশ্য কোনো অসুবিধা হয় না। সারা শহরে সকলেই এখন জানে কেন সে মৃত্যুর ছায়া পেছনে নিয়ে নাকে সূর্যের ঝলক মেখে এমন অলিগলি ঘুরছে। যাদের কাছ থেকে মাফ চাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে, তাদের সামনে কেবল থামলেই হয়। মনের কথা মুখ ফুটে না বললেও তারা জানে বৃদ্ধ কী চায় তাদের কাছে। একটু থেমে তারপর সে আবার হাঁটতে শুরু করে।

তারপর লোকেদের মধ্যে পরিবর্তন আসে।

শহরের মধ্যে দিয়ে একটা মুমূর্ষু মানুষের এমন বিস্ময়কর বিচিত্র যাত্রা উজ্জ্বল দিনেও অবশেষে মানুষের মনে একটা ভীতির সৃষ্টি করে। স্বচ্ছ পরিষ্কার আকাশে হঠাৎ মেঘ আসার মতো আকস্মিকভাবে আসে সে-ভীতি। রাস্তায়, পাশে সারি সারি বাসা-বাড়িতে, দোকানপাটে, গাছে-বাগানে, পড়োজমিতে ক্রমশ একটা নিঃশব্দতা ঘনীভূত হয়ে ওঠে এবং সে-নিঃশব্দতার মধ্যে মানুষের মনের গভীরতম অঞ্চলে একটি নামহীন আশঙ্কা-ভীতির সৃষ্টি

হয়। সে-শঙ্কা-ভীতি অসহনীয় হয়ে পড়লেই কোনো বাড়ির গহ্বরে একটি অদৃশ্য নারী তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে। তারপর রৌদ্র উজ্জ্বল আকাশও যেন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

সভয়ে মেয়েটি তার বাপের একটি হাত আঁকড়ে ধরে।

বাবা, বাবা এবার ফিরে চল। তোমার কারো কাছে মাফ চাইতে হবে না। সবাই তোমাকে মাফ করে দিয়েছে।

অবশ্য তার উন্মাদপ্রায় মেয়ের মিনতি বৃদ্ধের কানে পৌঁছায় না। পূর্ববৎ লাঠি ঠুকে অনিশ্চিতভাবে পা ফেলে সে অগ্রসর হয়। দেহ ঋজু, মাথা উঁচু।

ভীতি-শঙ্কা ক্রমশ বাড়তে থাকে। মৃত্যুকে পিঠে নিয়ে কেন সে মানুষের বাড়িঘরে দুয়ারে-ভিটেতে অমঙ্গলের ছায়া ফেলে হাঁটছে?

সূর্য আরো চড়ে, সামান্য হাওয়াটুকুও থেমে পড়ে। মনে হয়, নীল আকাশে চিলগুলোও আর নাই যেন।

শহরের যে-সব স্থানে সদরউদ্দিন এখনো পৌঁছায় নাই, সেখানে লোকেরা অপেক্ষা করে বটে কিন্তু তাদের অন্তরে এখন অস্থিরতা। তারা আর অপেক্ষা করতে চায় না। যে-মুমূর্ষু বৃদ্ধলোকটি এখনো এসে পৌঁছায় নাই, তার পদশব্দের জন্যে কান খাড়া করে রাখলেও মনে তাদের সে-কৌতূহল আর নাই। কৌতূহলের স্থানে সে-ভীতিরই সঞ্চার হয়েছে যে-ভীতি মানুষকে পলায়নমুখো করে, তার মায়ামমতা দয়াদরদকে ধ্বংস করে, কখনো-কখনো তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরির মতো মারাত্মক হয়ে ওঠে। যে-বৃদ্ধ লোকটির ছায়া এখনো তাদের পথে পড়ে নি কিন্তু শীঘ্র পড়বে, সে-ছায়া মানুষের জীবনের দুঃখ-দুর্দিনই আনে। সে-ছায়া শয়তানের ছায়া। সদরউদ্দিন পথে-পথে হাঁটছে এবং প্রতি বাড়িতে অকল্যাণ-অমঙ্গলের ছায়া ফেলছে।

অবশ্য বৃদ্ধ সদরউদ্দিন সে-বিষয়ে সচেতন নয়। কেবল তার মেয়ে মুখে কাপড় দিয়ে থেকে-থেকে একটা অদম্য কান্নাকে সংযত করার চেষ্টা করে।

একটা মোড় নিয়ে সদরউদ্দিন এবার একটি অতি সঙ্কীর্ণ গলিতে প্রবেশ করে। দ্বিতীয়বার একটি অদৃশ্য নারী ভূত-দেখা-ভয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে। সে ভূত দেখে না অবশ্য। সে মৃত্যুকে দেখে, সশরীরে, তারই দোরগোড়ায়। যে-মেয়েলোকটি বেড়ার ফাঁকে চোখ পেতে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে ছিল বৃদ্ধ সদরউদ্দিনকে দেখবে বলে, এবার সে ছুটে ভেতরে গিয়ে তার এক বছরের শিশুকে বুকে চেপে ধরে। চিৎকারটা অতি কাছে থেকে আসে বলেই মুহূর্তের জন্যে একটা বিরক্তির ভাব দেখা দেয় বৃদ্ধের মুখে।

দু-কদম পরে একটি মানুষ ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে আসে! তার মুখে ভয়-ক্রোধের মিশ্রিত ভাব। তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপে।

এখানে থেমো না। যাও, যাও।

সেখানে থামার কথা নয়, তাই সদরউদ্দিন পূর্ববৎ অগ্রসর হতে থাকে। তার চলার গতি না হয় শ্লথ, না হয় দ্রুত। আগের মতো ঘোলাটে চোখ দূরে কোথাও নিবদ্ধ। অনতিদূরে ময়লার স্তূপ থেকে লেজ নাড়িয়ে একটা লোম-ছাড়া কুকুর ঘেউ করে ওঠে।

বাবা বাবা! এবার ফিরে চল। নিদারুণ ভয়ে তার মেয়ে বুক-ফাটা স্বরে আর্তনাদ করে ওঠে। সে বোঝে, হাওয়া সত্যিই বদলে গেছে। সে জানে এবার লোকেরা তার মুমূর্ষু বৃদ্ধ বাপকে বদদোয়া দেবে। যে-মানুষ লোকদের কাছে ক্ষমা চাইতে বেরিয়েছে শেষ পর্যন্ত সে তাদের ঘৃণা-বদদোয়া নিয়েই ঘরে ফিরবে।

সদরউদ্দিন লাঠি ঘুরিয়ে মেয়েটিকে হটিয়ে দেয়।

সারা সকাল এ-গলি সে-গলি করে সর্পিল ভঙ্গিতে এঁকেবেঁকে চললেও সদরউদ্দিন একটি বিশেষ লক্ষ্যস্থানের দিকেই অগ্রসর হয়। সেখানে পৌঁছলেই তার এ-বিচিত্র যাত্রার শেষ হবে, তার মনস্কামনা সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হবে।

লক্ষ্যস্থানটি আখলাক তরফদারের বাড়ি। জীবনে যদি কাউকে সে অবিচ্ছিন্নভাবে এবং সমগ্র সত্তা দিয়ে ঘৃণা করেছে এবং সে ঘৃণার দরুন তার ক্ষতি করেছে নানা প্রকারে, তবে সে-লোক ঐ আখলাক তরফদার।

সে-ঘৃণার উৎপত্তি হয় বাল্যকালেই। নদীর ধারে তাদের নিদারুণ হস্তযুদ্ধের কথা, ঘনায়মান সন্ধ্যায় সর্ষের ক্ষেত থেকে ভেসে-আসা ভারি গন্ধের কথা এতদিন পরেও সদরউদ্দিনের মনে আছে স্পষ্টভাবে। সে-সব যেন গতকালের ঘটনামাত্র।

বাল্যকালের শত্রুতা নয়। সে-শত্রুতা থেকে-থেকে ক্রূর রূপ ধারণ করলেও তা একেবারে স্নেহ-মমতাবিবর্জিত নয়। তবু তাদের দুজনের মধ্যে তখন যে-শত্রুতার জন্ম হয়, তা বয়ঃক্রমে কেবল তীক্ষ্ণতর এবং সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। আজ আখলাক তরফদারের মাথায় টাক, পেটে থলথলে ভুঁড়ি এবং তার নিস্তেজ চোখে সারাজীবনের শ্রান্তি-দুর্বলতা। তবু সে-চোখ সদরউদ্দিনের ওপর পড়লে ক্রোধান্ধ পশুর মতো সে-চোখ কালো এবং স্থির হয়ে পড়ে।

বৃদ্ধের গতি ঈষৎ দ্রুত হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, আখলাক তরফদারের কাছে তাকে পৌঁছতেই হবে। তার মাফ না পাওয়া পর্যন্ত সে মরতে পারে না।

তার জবান যে শেষ হয়ে গেছে, সে-কথায় সে বিন্দুমাত্র ভাবিত হয় না। সে জানে একবার সে তার সামনে দাঁড়ালেই আখলাক বুঝবে কেন সে এসেছে। তারপর তাকে ক্ষমা করতে তার বিলম্ব হবে না, তাকে দেখে তার বাল্যবন্ধু এবং চিরশত্রুর চোখ এবার ক্রোধান্ধ পশুর চোখের মতো কালো এবং স্থির হয়ে উঠবে না। বরঞ্চ তাতে স্নেহ-মমতা এবং ক্ষমাই দেখা দেবে।

অকস্মাৎ একটি অপরিসীম প্রত্যাশায় বৃদ্ধ সদরউদ্দিন কেমন উদ্বেলিত হয়ে পড়ে, তার শীর্ণ দেহে একটু কম্পন জাগে।

তাদের আজীবন শত্রুতার কারণ কী? যে-মুমূর্ষু মৃত্যুকে ঠেকিয়ে বিছানা ছেড়ে শহরের এতখানি পথ অতিক্রম করে এসেছে সে-মানুষ এসব প্রশ্নের কোনোই যথাযথ উত্তর পায় না আজ।

নানা স্মৃতি বিপুল বেগে এসে তার মন ভাসিয়ে দেয়। তার কানে আসে বনপথের গরুগাড়ির চাকার আওয়াজ, নাকে লাগে সন্ধ্যার শ্রান্ত গন্ধ। বাল্যকালে সদরউদ্দিন নেহাতই রোগাপটকা ছেলে ছিল। তবু তার মধ্যে ছিল অত্যাশ্চর্য শক্তি। একদিন পথের পাশে ফেলে আখলাককে সে ভীষণভাবে মেরেছিল। আখলাক একটি শব্দ করে নাই। তারপর হঠাৎ হ্যাঁচকা টান দিয়ে বালক সদরউদ্দিন তার আনকোরা নতুন শার্টটি ছিঁড়ে ফেলে। মাত্র দুদিন আগে ঈদের উপলক্ষে তার বাপ তাকে সেটি উপহার দিয়েছিল। সে-ছেঁড়া শার্টটির জন্যেই আখলাক হঠাৎ অসহায় শিশুর মতো কাঁদতে শুরু করে। তাকে অমনভাবে কাঁদতে দেখে সদরউদ্দিনের একটু দুঃখ হয়েছিল কি? না। বরঞ্চ একটি গভীর তৃপ্তিতে সারা মন ভরে উঠেছিল।

হয়তো ঘটনাটি আজ আখলাকের মনে নাই। সেটি বাল্যজীবনের একটি নগণ্য ঘটনা। তবু সদরউদ্দিনের কাছে সেটি আজ খুবই বড় মনে হয়। মৃত্যুর সামনে মানুষ যখন তার সমগ্র জীবন বিশ্লেষণ করে দেখে, তখন কোন কথাটা বড় কোন কথাটা ছোট তা-হয়তো তার পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। হয়তো জীবনে কিছুই ছোট নয়। তাছাড়া এখন সদরউদ্দিন যদি বাল্যকালের ঘটনা স্মরণ করে তার অর্থ এই যে, মানুষের জীবনে বাল্যকাল এবং বার্ধক্যকালের মধ্যে সত্যিই কোনো তফাত নাই। মানুষের জীবনের কোনো সময় অন্য কোনো সময়ের চেয়ে বড় নয়, ছোটও নয়।

আখলাকের সামনে উপস্থিত হবার জন্যে একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বৃদ্ধ সদরউদ্দিন অধীর হয়ে ওঠে। তার গতি দ্রুততর হয়।

একটু পরে পথের সামনে মানুষের জটলা নজরে পড়ে। দৃষ্টিহীন দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে সদরউদ্দিন সর্বপ্রথমে মনে একটু ভীতি বোধ করে। তারা কি তার পথরুদ্ধ করে

দাঁড়াবে নাকি? তার যে সময় নাই।

ক্ষুদ্র জনতাটিকে এড়ানো সম্ভব হয় না। তাদের পাশে একটি মসজিদ। সে-মসজিদ হতে তারা বেরিয়ে এসেছে। সদরউদ্দিন তাদের নিকটবর্তী হলে সাদা কামিজ পরিহিত একটি সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় ব্যক্তি ধীরপদে তার দিকে এগিয়ে আসে।

দাঁড়ান। প্রৌঢ় ব্যক্তিটি হুকুমের কণ্ঠেই বলে।

সদরউদ্দিন তার কথা শুনতে পায় বলে মনে হয় না। সে লাঠি ঠুকে অগ্রসর হয়।

দাঁড়ান, দাঁড়ান। সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় ব্যক্তিটি আবার বলে। তার কণ্ঠে এবার উষ্ণতার ভাব। বলি, খোদার কাছে মাফ চেয়েছেন?

কামিজ পরিহিত লোকটির একজন সঙ্গী কেশে গলা সাফ করে। এতক্ষণ সে অস্ফুটকণ্ঠে দোয়াদরুদ পড়ছিল। সে বলে,

খোদাই আপনাকে মাফ করবে। মানুষের কী শক্তি কাউকে মাফ করে?

তাদের কথা সদরউদ্দিনের কর্ণগোচর হয় না যে তা নয়। ক্ষীণ বাষ্পের মতো অস্পষ্ট তাদের কথা তার কানে ভেসে এলেও সে তা শুনতে পায়, তার মর্মও সে বোঝে। তবে সে যে শোনে তার কোনো বাহ্যিক প্রমাণ দেয় না। মসজিদের লোকদের উপদেশ বৃদ্ধের কাছে অর্থহীনই মনে হয়। তার জীবনে তর্কের সময় শেষ হয়েছে। খোদার কাছে সে মাফ চাইবে বৈকি। কিন্তু সেটা আলাদা ব্যাপার। এখন সে মাফ চাইছে তাদের কাছে যাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন এ-নশ্বর পৃথিবীতে সে বসবাস করেছে এবং যে-পৃথিবী এখন সে ছেড়ে যাচ্ছে। তার মনের কথা ওরা কী করে বুঝবে।

সদরউদ্দিন কোনো দিকে না তাকিয়ে লাঠি ঠুকে এগিয়ে যায়, তার পদক্ষেপে কেমন দৃঢ়তা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জনতা তাকে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সদরউদ্দিন একটু এগিয়ে যেতেই ক্ষুদ্র জনতাটির মধ্যে ক্রুদ্ধ গুঞ্জন জাগে। প্রথমে কামিজ-পরিহিত লোকটি সদরউদ্দিনের স্পর্ধা দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বাক্‌শক্তি ফিরে পেলে সে-ও রাগতভাবে কিছু বলে ওঠে। অবশ্য তার কথা সদরউদ্দিনের কানে আর পৌঁছায় না। অর্থহীনভাবে সে একবার লাঠি ঘোরায়। বিরক্তিকর মাছির দল তাড়ায়।

তবে মসজিদের লোকদের ক্রোধে সদরউদ্দিনের মেয়ে ভয়ে মুষড়ে পড়ে। সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে গিয়ে কামিজ পরিহিত মানুষটির দীর্ঘ আস্তিন চেপে ধরে বারেবারে চিৎকার করে বলে,

তাঁকে বদদোয়া দেবেন না, বদদোয়া দেবেন না।

কামিজ পরিহিত মানুষটি ক্রুদ্ধভাবে আস্তিনটি ছাড়িয়ে নেয়।

চতুর্দিকে অন্ধকার দেখে মেয়েটি এবার হু-হু করে কেঁদে ওঠে। সে-কান্নায় কারো হৃদয় গলে না; সে-কান্না তার বৃদ্ধ বাপের কানেও পৌঁছায় না। বিরক্তিকর মাছির দল পশ্চাতে ফেলে আসতে সক্ষম হয়েছে বলে বৃদ্ধ সদরউদ্দিনের মন এবার নিরুপদ্রবে আখলাকের দিকে ফেরে।

বাল্যজীবনের কলহ-বিবাদ হাতাহাতি মারামারি পরে একটি মারাত্মক হিংসা-বিদ্বেষেই পরিণত হয়। সদরউদ্দিন এখন নিজের দোষটি পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। সারাজীবন সে একটি বিষাত্মক একনিষ্ঠতার সঙ্গেই আখলাকের সুখ শান্তি-ধ্বংস করেছে। কী করে তার আর্থিক-বৈষয়িক ক্ষতি করতে পারে, তারই ফন্দিফিকিরে থেকেছে সদাসর্বদা। কু-মতলব চরিতার্থ করার কোনো সুযোগ পেলে তা হাতছাড়া করে নাই। বারেবারে আখলাককে সে নির্দয়ভাবে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রমণ করেছে। এবং প্রথমে সে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেই তাকে আক্রমণ করেছে বলে হতবিহ্বল আখলাক পাল্টা জবাব দিতে পারে নাই। এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই, যে, সদরউদ্দিনের জন্যেই সে জীবনে কখনো সুখ-শান্তি বা আর্থিক সচ্ছলতা উপভোগ করতে সক্ষম হয় নাই। অথচ সদরউদ্দিন না থাকলে হয়তো সে-সব উপভোগ করার পথে কোনো বাধা থাকত না। বাল্যকালে আখলাক অধ্যয়নশীল সুবোধ ছেলে ছিল। পয়সার

অভাবে শিক্ষা তেমন না এগোলেও সচ্চরিত্রতা–সততা–সাধুতার জন্যে মানুষের মনে সে যে–বিশ্বাস–আস্থার সৃষ্টি করত, সে–মূলধনের সাহায্যেই সে হয়তো অর্থসম্পদ সুখশান্তি লাভ করতে পারত। কিন্তু সদরউদ্দিনের জন্যে তা সম্ভব হয় নাই। সদরউদ্দিনের চক্রান্তে সে যে–দীর্ঘ মকদ্দমায় লিপ্ত হয়, সে–মকদ্দমায় সে সর্বস্বান্ত হয়। সদরউদ্দিন তার বুকে যে সর্বনাশী আগুন জ্বালাতে সক্ষম হয়, সে–আগুনে সে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়। আজ সে ভগ্ন–দুস্থ মানুষ। মুখের বাঁ দিকে তার পক্ষাঘাত; চোখে পরাজয়ের নিবিড় গ্লানি। সে আজ যে–ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, সে–ধ্বংসস্তূপের সৃষ্টিকর্তা সদরউদ্দিনই।

তার কাছে মাফ না চেয়ে কী করে মরতে পারে সদরউদ্দিন ?

আচম্বিতে মেয়েটি এবার তার গন্তব্যস্থলের কথা বুঝতে পারে। মুহূর্তের মধ্যে নিদারুণ ভয়ে সে শীতল হয়ে পড়ে। তারপর সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে বলে,

বাবা বাবা, আর নয়,—এবার ফিরে চল।

মেয়ের আর্তনাদটি বৃদ্ধের কানে পৌছলে কেবল তার পদক্ষেপটা আরো দ্রুত হয়। তার গর্তে–ঢোকা চোখটা ধকধক করে ওঠে একটি বিচিত্র উদ্দীপনায়।

গন্তব্যস্থল আর বেশি দূরে নয়। খেলার মাঠটা, তারপর আখলাকের বাসস্থান। সামনে ক্ষুদ্র উঠানটা সযত্নে লেপাজোকা; তার পাশে একটু গাঁদা ফুলের বাগান। কিন্তু সদরউদ্দিন জানে সে–বাড়ির কাঠে ঘুণ এবং তার ছিদ্রবহুল ছাদে বর্ষার পানি আর ধরে না। এক সময় সদর–দরজায় সবুজ রং ছিল; সে–রং অনেকদিন হল বিবর্ণ হয়ে গেছে। জরাজীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু বাড়ির চতুর্দিকে নির্দয় সদরউদ্দিনের হাতের ছাপ।

মাঠটা অতিক্রম করে সরদউদ্দিন হঠাৎ একটু থামে। লাঠিতে ভর করে দাঁড়ালেও তার দেহ তারপর অসংযতভাবে কাঁপতে শুরু করে। কেবল তার নিষ্পলক দৃষ্টি সম্মুখে স্থির হয়ে থাকে। সে–দৃষ্টি অদূরে বিবর্ণ দরজার পাশে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে–থাকা একটি লোকের ওপর নিবদ্ধ। লোকটির মাথার টাকে রোদের ঝলক, কিন্তু তার চোখ দেখা যায় না।

তার দিকে চোখ পড়তেই মেয়েটি অস্ফুটভাবে আর্তনাদ করে ওঠে। সে বলে,

বাবা বাবা, আর যেয়ো না। শুনছ বাবা? আর যেয়ো না।

সদরউদ্দিন ঝোড়ো গাছের মতো একটু হেলে–দুলে আবার চলতে শুরু করে। তার ক্ষণকালের দ্বিধা–সংশয় কেটেছে। তাকে এগোতেই হবে। আখলাকের কাছে মাফ চাইতেই হবে তাকে। মাফ চাওয়ার অধিকার তার আছে কি না সে জানে না। তবে সে এ–বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, দোজখের ভয়ে সে আখলাকের কাছে আসে নাই, বেহেশতে তার স্থান নিশ্চিত করবার জন্যেও সে তার কাছে মাফ চাইবে না।

আরো অগ্রসর হলে সদরউদ্দিনের মনে হয় সে যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে–থাকা মানুষটির চোখ দেখতে পায়। সে–চোখে কি ঘৃণার ছায়া? মুহূর্তের জন্যে বৃদ্ধের বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেই কেবল। সে জানে আখলাকের ঘৃণায় এখন সে বিচলিত হবে না। বরঞ্চ জীবনের শেষ মুহূর্তে তার চোখে সে ঘৃণাই দেখতে চায়; তার ঘৃণাভরা দৃষ্টির তলেই সে তার শেষনিশ্বাস ফেলতে চায়। সে–সময়ে আখলাকের ক্ষমাভরা চোখ তার সহ্য হবে না। তার কাছে সে মাফ চাইতে এসেছে বটে কিন্তু সে চায় না যে আখলাক তাকে মাফ করুক।

ক্ষণকালের জন্যে একটি প্রশ্ন জাগে বৃদ্ধ সদরউদ্দিনের মনে। তবে কেন সে এসেছে আখলাকের কাছে? সে কি এ–কথা তাকে জানাতে এসেছে যে জীবনের শেষ মুহূর্তে তার মনে অনুতাপ–অনুশোচনা এসেছে? কিন্তু তার অনুতাপ–অনুশোচনা আখলাকের কাছে অর্থহীন মনে হবে। সদরউদ্দিনের দীর্ঘ শত্রুতার ফলে আখলাকের যে–জীবন অঙ্গার–প্রান্তরে পরিণত হয়েছে, সেখানে তার অনুতাপ–অনুশোচনায় এখন আর তৃণ গজাবে না, সজীবতা আসবে না।

সদরউদ্দিন তার প্রশ্নের উত্তর পায় না, উত্তর জানতেও চায় না। তর্কবিতর্কের সময় তার

সত্যিই শেষ হয়েছে। অকস্মাৎ তার সমগ্র হৃদয়ে যে-পরম শান্তির ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করেছে, সে-ধারায় কোনো প্রশ্নই আর দাঁড়াতে পারে না।

অবশেষে দুই চিরশত্রু মুখোমুখি হয়। মুমূর্ষু সদরউদ্দিনের গর্তে-ঢোকা চোখে তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতা; সে-চোখে পলক পড়ে না। মনে হয়, আখলাকের প্রতিক্রিয়াতেই একটি কথা নির্ধারিত হবে : তার জীবনের কোনো অর্থ ছিল কি ছিল না।

আখলাকের মুখের পক্ষাঘাতগ্রস্ত ডান-দিকটা স্থির হয়ে থাকলেও শীঘ্র সুস্থ বাঁ-দিকটা একটি অদম্য চঞ্চলতায় অভিভূত হয়ে পড়ে। সে-অঞ্চলটি বেঁকে-কুঁচকে গিয়ে অসহায়ভাবে কাঁপতে শুরু করে অবশেষে যেন ভেঙেচুরে পড়ে। তার চোখে কি এবার ঘৃণাটি জাগবে—যে ঘৃণায় তার দৃষ্টি মারাত্মকভাবে কালো এবং স্থির হয়ে ওঠে? যে-সামান্য শ্বাসটুকু এখনো আছে, সে-শ্বাসটিও রুদ্ধ করে সদরউদ্দিন নিস্পন্দভাবে তাকিয়ে থাকে আখলাকের দিকে।

তারপর সহসা তার চিরশত্রু আখলাকের চোখে অশ্রুর আভাস দেখা দেয়। তার মুখের সুস্থ অংশটি স্থির হয়েই থাকে, কিন্তু তার নিস্তেজ চোখে ঝাপটা দিয়ে তিক্ত, নিঃস্ব অশ্রুর সঞ্চার হয়। হয়তো আজ সর্বপ্রথম স্বচ্ছদৃষ্টিতে সে দেখতে পায় তার অঙ্গার-প্রান্তরসম জীবনটি। ক্ষমা চাইতে এসে সদরউদ্দিন তাকে সে-কথা বুঝতেই সাহায্য করেছে।

গভীর বিস্ময়ে আখলাকের অশ্রুভরা চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সদরউদ্দিন বিহ্বলভাবে এদিক-ওদিক তাকায়। সে যেন জানে না এখানে সে কী করছে, কীই-বা তার অন্তিম কাম্য, তার এ-বিচিত্র শেষযাত্রাটিরই-বা অর্থ কী।

পেছনে গভীর নীরবতার মধ্যে এবার তার নির্বোধ মেয়েটি নিঃশঙ্কচিত্তে তৃপ্ত নিশ্চিন্ত মানুষের অনাবিল কান্নায় ভেঙে পড়ে।

গ্রীষ্মের ছুটি

সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে সেলিনারা দাদার বাড়িতে বেড়াতে আসার দু-দিন পরেই গ্রামে একটি শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ঘটে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দাদাসাহেবেরই প্রজা তারা মিঞা তার ছোটভাই সোনা মিঞাকে কোঁচবিদ্ধ করে খুন করে। নির্মম ঘটনাটি তুচ্ছ একটি দু-আনা পয়সা নিয়ে ঘটে।

খবর পেয়ে দাদাসাহেব যখন সদলবলে তারা মিঞার বাড়িতে উপস্থিত হন তখন নয় বছরের মেয়ে সেলিনাও যে তাঁর পশ্চাদানুসরণ করে তা তিনি লক্ষ্য করেন না। তারপর এক সময়ে লণ্ঠনের আলোয় লেপাজোকা পরিচ্ছন্ন উঠানে গরু-বাঁধার খুঁটির পাশে পড়ে-থাকা চৌকোণা দু-আনার মুদ্রাটি দেখতে পেয়ে সেলিনা তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলে তিনি তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হন। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। উঠানে রক্তস্রোতের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে-থাকা সোনা মিঞার মৃতদেহটি সে চোখভরে দেখে নিয়েছে।

পরদিনই সেলিনার ভীষণ জ্বর ওঠে। তখন তারা মিঞার উঠানে তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা হয়। কেন সেলিনা মৃত মানুষের বীভৎস দৃশ্যটি দেখে একটু শব্দ করে নাই, বা সে ক্ষুদ্র মুদ্রাটি দেখার পরেই তীক্ষ্ণভাবে চিৎকার করে ওঠে? এ-সব গবেষণা শুরু করে আম-মৌলবী। আম-মৌলবী দাদাসাহেবের আশ্রিত মানুষ। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে। সমগ্র কোরান তার জিহ্বাগ্রে থাকলেও সে অতি দরিদ্র মানুষ। দাদাসাহেবের বাড়ির ছেলেমেয়েদের সে কোরান-হাদিস শেখায়, পাঁচ ওয়াক্ত আযান দেয়, নানাপ্রকার ধর্মীয় ব্যাপারে সম্পাদনা-নেতৃত্ব করে। আমের প্রতি তার অত্যধিক লোভের জন্যে কবে কে তার নাম দিয়েছিল আম-মৌলবী; সে-নামেই এখন সে পরিচিত।

সেলিনার প্রতিক্রিয়ার কারণ আম-মৌলবীর কাছে নিতান্তই সহজ মনে হয়। সে বলে, হতভাগা সোনা মিঞার রক্তাপ্লুত দেহটি অতি বীভৎস দেখালেও ফেরেশতার মতো নির্মলচিত্ত সেলিনা সে-দৃশ্যে বিচলিত হয় নাই, কারণ নির্দোষ মৃত মানুষটি ততক্ষণে বেহেশতে পৌঁছে গেছে। এ-কথা লক্ষণীয় যে, খুনীকে দেখেও মেয়েটি ভয় বা ঘৃণাবিতৃষ্ণা বোধ করে নাই। তার কারণ, সে-ও নির্দোষ। কিন্তু মুদ্রাটির ওপর দৃষ্টি পড়তেই সেলিনা মুহূর্তের মধ্যেই সেটিকে শয়তানের জিনিস বলে চিনতে পারে। শয়তানের সে-অস্ত্রটির জন্যেই কি অতিশয় শোচনীয় ঘটনাটি ঘটে নাই?

আম-মৌলবীর ব্যাখ্যাটি কেউ ফেলতে পারে না। কেন সেলিনা বিলম্বে চিৎকার করে উঠেছিল তার একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকলেও তা মুখরোচক নয়।

আম-মৌলবীর ব্যাখ্যাটি সেলিনার কানেও পৌঁছায়। যারা তার কাছে কথাটি নিয়ে যায় তারা প্রশ্ন করে, সে কি শয়তানের চেহারা দেখেছিল মুদ্রাটিতে? কেমনই-বা শয়তানের চেহারা? অবশ্য সেলিনা কিছুই বলতে পারে না। মুদ্রাটি দেখার পর কেন সে চিৎকার করে উঠেছিল তা সে জানে না। কিন্তু আম-মৌলবীর কথা গোপনে-গোপনে তাকে প্রভাবিত করে। হঠাৎ সে যেন ভালোমন্দ-শয়তান-ফেরেশতা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে সচেতন হয়ে ওঠে।

সাতদিন জ্বর-ভোগের পর আরোগ্য লাভ করলে তার আচরণে একটি বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। সে কেমন গম্ভীর, স্বল্পভাষী হয়ে ওঠে। তার মধুর চঞ্চলতা স্তব্ধ হয়ে যায়, কারো সঙ্গও আর যেন তার ভালো লাগে না। একাকী সে ঘর-দেউড়িঘর করে, বা চুপচাপ বসে থাকে কোথাও।

তারপর একদিন সে বাড়ির পেছনে বিস্তীর্ণ ধু-ধু মাঠটি আবিষ্কার করে।

সেদিন অপরাহ্ণে সে উঠানের প্রান্তে বরই গাছের তলে বসেছিল। অদূরে পাটিতে বসে সেলাই শেখার নামে তার চৌদ্দ বছরের বোন আনোয়ারা সমবয়সী চাচাতো বোনের সঙ্গে ফিসফিস-গুজগাজ করছিল এবং থেকে-থেকে একটু শব্দ না করে অদম্য হাসিতে ফেটে পড়ছিল। আজ তার হাসির ধরন সেলিনার মনে গভীর বিতৃষ্ণার ভাব জাগায়। তার মনে হয়, সে-হাসি আনোয়ারার মোটাসোটা দেহের অভ্যন্তরে মুক্তির জন্যে ঘুরপাক খেয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়েই মারা পড়ে। হয়তো তার ভেতরে তেমন হাসির অনেক লাশ স্তূপাকার হয়ে আছে।

অবশেষে আনোয়ারার হাসি অসহ্য হয়ে উঠলে সেলিনা উঠানের পেছন দিয়ে বেরিয়ে পড়ে প্রথমে হাঁটতে থাকে। বাড়ির পেছনে জঙ্গলের মতো; সেখানে অনেক আমগাছ আছে বলে সেটা আম-মৌলবীর প্রমোদ-উদ্যানই বলা যেতে পারে। সে-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু পথ। সে-পথ দিয়ে ঝরাপাতা মাড়িয়ে অবশেষে সেলিনা ছুটতে শুরু করে। ঘন গাছপালার মধ্যে দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা রোদ ঝরে। সে-ছিটেফোঁটা আলোয় তার হলুদ রঙের ফ্রক ঝিকমিক করে। জঙ্গলটি তার কাছে রূপকিচ্ছার জঙ্গলের মতোই সীমাহীন এবং রহস্যময় মনে হয়।

তারপর আকস্মিকভাবে সে-জঙ্গলটি শেষ হয়। সেলিনার মনে হয়, কে যেন হঠাৎ তার চোখের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে নিয়েছে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সে দেখে, সামনে ধু-ধু মাঠ : একটি উদার উন্মুক্ততায় সে-মাঠ আদিগন্ত বিস্তারিত হয়ে আছে স্বপ্নেরই মতো।

অনেকক্ষণ সেলিনা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চতুর্দিকে গভীর নীরবতা। একটা হালকা হাওয়া থেকে-থেকে পালকের মতো স্পর্শ করে তার মুখ। সে যেন মেঘের ওপর ভাসে। সামনে মাঠের উন্মুক্ততা আরো দৃঢ়প্রসারী হয়। তার চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে।

কল্পনাপ্রবণ সেলিনা বিস্তীর্ণ মাঠের উদার সৌন্দর্যেই বেশিক্ষণ মোহিত হয়ে থাকে না। সে-দৃশ্যে অভিনেতা নাই, বিশাল রঙ্গমঞ্চটি ঘটনাশূন্যও। তাই হয়তো সেলিনা সেদিন-শোনা সতের জন অশ্বারোহীর কথা স্মরণ করে। মাত্র সতের জন অশ্বারোহী-ই নাকি সমগ্র বঙ্গদেশ জয় করেছিল। কথাটির ঐতিহাসিক বা সামরিক তাৎপর্য সে বোঝে না; তাতে তার মন আকৃষ্ট হয় না। তবে সে ভাবে, সামনের উন্মুক্ত মাঠেই সে-অশ্বারোহীদের আবির্ভাব সম্ভব। সে

কল্পনা করে দিগন্তে উদয় হয়ে সতের জন অশ্বারোহী ছুটে আসছে। দূরে যে ঘূর্ণি-হাওয়া, সে-ঘূর্ণি-হাওয়া তাদের ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলাতেই জেগেছে।

কল্পনা শীঘ্র যেন সত্যের রূপ ধারণ করে। তার মনে হয়, সে যেন সত্যিই দেখতে পায় বিপুল বেগে মাঠ অতিক্রম করে ছুটে আসছে অশ্বারোহীরা। তারা আসছেই, আসছেই। তাদের পেছনে এখন মেঘের মতো ধুলা জেগে আকাশ পর্যন্ত অন্ধকার করে ফেলেছে। শীঘ্র সে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ শুনতে পায়, অশ্বারোহীদের মুখও দেখতে পায়। অশ্বারোহীদের চোখ রক্তবর্ণ; কালো আকাশের পটভূমিতে তাদের উদ্ধত তলোয়ার ঝকঝক করে। ঘোড়ার মুখে ফেনা, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত। সেলিনা রোমাঞ্চকর উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করে।

এ-সময় পেছনের জঙ্গল থেকে আম-মৌলবী বেরিয়ে আসে। পেছন থেকেই আসে বলে সেলিনা তাকে দেখতে পায় না, স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে বলে তার ক্ষীণ পদধ্বনিও শোনে না।

আম-মৌলবী কতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর তার গলায় বাঁশের পাতার মতো কম্পন জাগিয়ে সে ডাকে,

সেলিনা! সেলিনা বিবি!

সেলিনা জবাব দেয় না। সে ডাক শুনলেও হয়তো ভাবে অশ্বারোহীদের মধ্যেই কেউ তাকে ডাকছে; তার দেহের কম্পন এবার অদমনীয় হয়ে ওঠে। সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে মাঠের দিকে।

একটু অপেক্ষা করে আম-মৌলবী এবার এগিয়ে আসে সেলিনার পাশে। মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে তার বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। সেলিনাকে প্রথম দেখে তার মুখে বত্রিশ দাঁতের হাসি জেগেছিল; সে হাসি এবার মিলিয়ে যায়।

কী দেখছ সেলিনা? তীক্ষ্ণ, কিছুটা ভীতকণ্ঠে সে প্রশ্ন করে।

সেলিনার স্বপ্ন ভাঙে রূঢ়ভাবে। চমকে উঠে আম-মৌলবীর দিকে একবার তাকায়, তারপর তার দৃষ্টি ফিরে যায় মাঠের দিকে। এবার সে-মাঠ শূন্যতায় ধু-ধু করে। সে আর অশ্বারোহী বা ঘোড়া-তলোয়ার কিছুই দেখতে পায় না।

কী দেখছ সেলিনা বিবি?

সেলিনা উত্তর দেয় না। একটা গভীর নৈরাশ্যে তার মন ভরে ওঠে, আম-মৌলবীর ওপর একটা রাগও বোধ করে। নিস্পন্দভাবে সে মাঠের দিকেই তাকিয়ে থাকে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আম-মৌলবীও সামনের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে অবশেষে ঈষৎ ভীতিময় কণ্ঠে বলে,

মাঠটা ভালো নয়। সেখানে রাতবেরাতে ভূতপেতনী বের হয়। গত বছর সেখানে সারারাত চরকির মতো ঘুরে একটি চাষা মারা পড়ে। ভূতপেতনীর গোলক ধাঁধা থেকে বের হতে পারে নাই।

সেলিনার মনে স্বপ্নের রেশটা এখনো সম্পূর্ণভাবে কাটে নাই। অস্পষ্টভাবেই আম-মৌলবীর কথা তার কানে আসে। তবে ভূতপ্রেতের কথায় শীঘ্র তার কান সজাগ হয়ে ওঠে। এবার সে ঘুরে আম-মৌলবীর দিকে তাকায়।

তার ঈষৎ ঔৎসুক্য দেখেই আম-মৌলবী উৎসাহ পায়। সে আবার বলে,

মাঠটা সত্যিই ভালো নয়।

তারপর তার উক্তির সমর্থনে সে এবার মাঠের ভূতপেতনীর কার্যকলাপের নানা উদাহরণ দেয়। একটার পর একটা নানা রোমহর্ষকর কথা বলে। ক্রমশ সেলিনার চোখে একটা ভীতি জমে ওঠে। অশ্বারোহীদের অতি সুন্দর কল্পনাটি যা তার মনে প্রায় বাস্তবরূপ ধারণ করেছিল, সেটি কি তবে মাঠের ভূতপ্রেতেরই কারসাজি মাত্র? সামনের উজ্জ্বল বিস্তীর্ণ সৌন্দর্য মিলিয়ে গিয়ে সেখানে ভয়াবহ অন্ধকারের সৃষ্টি হয়। সেলিনার মনে ভীতিটা আরো গভীর হয়।

অস্ফুট কণ্ঠে সেলিনা এবার বলে,

মাঠে আমি কিছু দেখেছিলাম।

কী দেখেছিলে?

সেলিনা সহসা উত্তর দেয় না। এখনো তার মন মানতে চায় না যে অশ্বারোহীদের সুন্দর দৃশ্যটি সত্যিই ভূতপ্রেতের কারসাজি। কিন্তু তার মনে যে এখন সব শীতল করে একটা ভয় জেগেছে, সে-ভয়টি সে অস্বীকার করতে পারে না। পূর্ববৎ অস্ফুট কণ্ঠে সে এবার আম-মৌলবীকে অশ্বারোহীদের কথা বলে।

আম-মৌলবী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে। তারপর ক্ষিপ্রভাবে সেলিনার হাত ধরে সে দ্রুতপদে ঘরমুখো রওনা হয়।

সেলিনার এবার সন্দেহ থাকে না যে, অশ্বারোহী ভূতপ্রেতই ছিল।

সে-রাতে সেলিনার আবার মহাড়ম্বরে জ্বর ওঠে।

আম-মৌলবী ফেনিয়ে-ফেনিয়ে অতিরঞ্জিত করে সকলের কাছে অশ্বারোহীদের কথা বলে। শীঘ্র কারো সন্দেহ থাকে না যে, সে যদি সময়মতো উপস্থিত না হত তবে অশ্বারোহীর বেশে দুরাত্মারা সেলিনাকে ঘোড়ায় তুলে কোথাও অদৃশ্য হয়ে যেত। সে এ-কথাও বলে যে, আমবাগানে সে যখন আমের অবস্থা তদারক করছিল, তখন হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ তার কানে লাগে। কৌতূহলবশত বেরিয়ে এলে সে সেলিনাকে দেখতে পায়। সেলিনার মনের অশ্বারোহীরা অন্যদের মনেও একটি বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। এবার যখন সেলিনা আরোগ্যলাভ করে তখন দাদাসাহেব এবং আম-মৌলবীর যুক্ত দোয়া-দরুদের সাহায্যে সে ক-দিন সুস্থ শরীরেই থাকে। তার মুখে আবার রক্ত-লাবণ্য ফিরে আসে, মনে থেকে দুরাত্মার ছায়াও দূর হয়। তারপর একদিন আবার একটি ঘটনা ঘটে।

সেদিন অপরাহ্ণে সেলিনা যখন বাইরের উঠানে বেরিয়ে আসে তখন আম-মৌলবী কেমন বিষণ্ণভাবে কাঁঠালগাছের তলে বসে একটি ছাগলকে পাতা খাওয়াতে রত। হয়তো তার করবার কিছু নাই। আছরের নামায সবেমাত্র শেষ হয়েছে, মাগরেবের নামাযের অনেক দেরি। সেলিনাকে দেখে আম-মৌলবীর মুখ সহসা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে ডাকে,

সেলিনা বিবি!

লোকটি অন্য দিনের মতো সমস্ত দাঁত দেখিয়ে হাসে বটে তবে আজ সে-হাসি কেমন মনখোলা মনে হয়। তাই আজ সে-হাসি সেলিনার ভালোই লাগে। উত্তরে সে-ও একটু হাসে। তারপর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ছাগলের ব্যস্ত-সমস্তভাবে পাতা খাওয়া দেখে। ছাগলের থুতনির কাছে সামান্য দাড়ি। আম-মৌলবীরও তাই। গোপন কৌতুকের সঙ্গে সেলিনা ভাবে, আম-মৌলবী যখন খায় তখন হয়তো তার দাড়িও ছাগলের দাড়ির মতো অশ্রান্তভাবে নাচে।

একটু পরে ছাগলকে পাতা খাওয়ানো অকস্মাৎ বন্ধ করে আম-মৌলবী বলে,

চল সেলিনা নিমগাছের ডাল নিয়ে আসি। ঐ যে পুকুরের ধারে নিমগাছ।

সেলিনা আপত্তি করে না।

আম-মৌলবী অভ্যাসমতো চতুর্দিকে পা ছড়িয়ে দ্রুতপদে হাঁটতে শুরু করে। পেছনে সেলিনাকে থেকে-থেকে একটু দৌড়তে হয়।

আম-মৌলবীর পক্ষে নীরব থাকা দুষ্কর। তাই সে হাঁটতে-হাঁটতে অনর্গল কথা বলতে থাকে। বক্তব্য অবশ্য মেছোয়াকের গুণাগুণ। দাঁত মেছোয়াক করা সুন্নত। আর মেছোয়াকের জন্যে নিমের ডালের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই। একবার পেছনে তাকিয়ে মুখ ব্যাদান করে সে তার সুপরিচিত দাঁতপাটি দেখায়। সেলিনা মনে-মনে স্বীকার করে, লোকটির দেখাবার মতো যদি কিছু থাকে তবে তা ঐ দাঁতপাটিই। সে অতি কদাকার মানুষ। শীর্ণ মুখটি শুধু যে অসমাপ্ত তা নয়, পাতলা চামড়ার তলে হাড়গুলি যেন এমনি-তেমনিভাবে বসানো। তাছাড়া তার লকলকে হাত-পা লম্বা কামিজ-লুঙ্গিতেও ঢাকা পড়ে না।

পুকুরটা বাড়ি থেকে দূরে না হলেও নিমগাছটি অন্যান্য গাছে ঢাকা থাকে বলে সেখান

থেকে দাদাসাহেবের বাড়িটা চোখে পড়ে না। তবু গাছে চড়ার আগে অদৃশ্য বাড়িটির দিকে আম-মৌলবী একবার ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে তাকায়। আমগাছে চড়ার বিষয়ে তার বিশেষ দক্ষতা সকলের জানা থাকলেও মৌলবী মানুষ বলেই হয়তো সকলের চোখের সামনে গাছে চড়তে তার সঙ্কোচ হয়।

তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি গাছে চড়ছি। ওপর থেকে ডাল ফেলব, তুমি কুড়িয়ে নিয়ো।

সেলিনা মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানায়।

লুঙিতে মালকোঁচা মেরে ধাঁ করে আম-মৌলবী গাছে উঠে যায়। কাঠির মতো তার সরু কালো পায়ের দিকে একবার তাকিয়ে সেলিনা দ্রুতভাবে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। শুধু পায়ের অসৌন্দর্যের জন্যে নয়, মৌলবী মানুষের উলঙ্গ পায়ের দিকে তাকাতে কেমন বাধে। চাষা-মজুরদের মধ্যে যা স্বাভাবিক মনে হয়, তা মৌলবী মানুষের মধ্যে অস্বাভাবিক, এমন কি কুৎসিতভাবে উলঙ্গই মনে হয়। হাজার হলেও কণ্ঠে মাধুর্য জাগিয়ে সে কেরাত করে, মিহিমিষ্টি কণ্ঠে আযান দেয় দিনে পাঁচ বার।

ধর ধর! শীঘ্র ওপর থেকে আম-মৌলবী চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে সশব্দে পাতাসমেত দু-একটা ডাল সেলিনার পাশে নিক্ষিপ্ত হয়। ওপরের দিকে না তাকিয়ে সেলিনা ডালগুলি তুলে নেয়। তারপর সে দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে। সেখানে সাদা মেঘে হালকা বেগুনি রং ধরেছে।

ধর ধর! আবার আম-মৌলবী চিৎকার করে বলে। একটি বিচিত্র উত্তেজনায় তার গলা কাঁপে। তাতে আজ বাঁশের পাতার মতো ক্ষীণ সুর নাই। গাছে চড়ে আনন্দের সীমা নাই যেন তার। হয়তো কেবল আমের লোভেই সে আমগাছে চড়ে না।

ধর বলছি, ধর ধর! আবার আম-মৌলবীর আনন্দমত্ত কণ্ঠ রনরন করে ওঠে। ওপরের দিকে তাকাও না কেন? না হলে পড়বে তোমার মাথায়।

মাথা না তুলে সেলিনা উত্তর দেয়,

ফেলুন আমি তুলছি।

তারপর একটি ডাল সত্যিই পড়ে সেলিনার মাথায়। ডালটা অবশ্য ভারি নয়। তবে গাছ থেকে ছেঁড়া হয়েছে বলে তার এক প্রান্ত প্রায় ছুরির মতো ধারালো। সে-ধারালো প্রান্তে সেলিনার গালের পাশটা একটু কেটে যায়।

ধর ধর। আবার আম-মৌলবী ডেকে ওঠে। তবে তার কণ্ঠস্বর মধ্য পথেই থেমে যায়। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সে প্রশ্ন করে,

কী হল সেলিনা বিবি?

সেলিনা উত্তর দেয় না। গালের যেখানে ব্যথা বোধ করে সেখানে সে হাত চেপে আবার যখন হাতটি চোখের সামনে ধরে তখন তাতে রক্ত দেখতে পায়। সে-রক্তই সে চেয়ে-চেয়ে দেখে।

এবার বাঁদরের মতো স্বচ্ছন্দ নিপুণতার সঙ্গে আম-মৌলবী গাছ থেকে ধরণীতে অবতীর্ণ হয়।

কী হয়েছে সেলিনা, কী হয়েছে? তার কণ্ঠে কিছু ভীতির স্পর্শ। তারপর সে সেলিনার গালে সামান্য ক্ষতটি দেখতে পায়। কয়েক মুহূর্ত সে ভেবে পায় না কী করবে, তারপর বত্রিশটি দাঁত দেখিয়ে হাসবার চেষ্টা করে।

ও কিছু না। একটু কেটেছে। বলি নাই তোমাকে ওপর দিকে তাকাতে?

রক্ত পড়ছে। সেলিনা সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দেয়। গম্ভীরভাবেই কথাটা বললেও অনেক রক্ত পড়ছে—তেমনি একটা ইঙ্গিত তাতে।

ও কিছু না। আবার আম-মৌলবী বলে। তারপর সহসা যেন মস্তিষ্কশূন্য হয়ে সে একটি অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে। ক্ষিপ্রভঙ্গিতে সেলিনার সামনে উবু হয়ে বসে তার গালের ক্ষত স্থানে

মুখ দিয়ে সে চুষতে থাকে ক্ষত স্থানটি। তার গালে আম-মৌলবীর কর্কশ ঠোঁটের স্পর্শ পেয়ে সেলিনা হঠাৎ নিথর হয়ে পড়ে। মনে হয় তার সমস্ত শরীর জমে পাথর হয়ে গেছে। পরক্ষণেই ঝট্‌কা দিয়ে মাথা সরিয়ে নিয়ে সে কঠিন দৃষ্টিতে আম-মৌলবীর দিকে তাকিয়ে কঠিনতর কণ্ঠে বলে,

আপনি আমার গা ধরেছেন। দাদাসাহেবকে বলে দেব।

কথাটা অবশ্য তার নিজস্ব নয়। আর বছর বাসাবাড়ির একটি চাকর সম্বন্ধে তাদের ঝি এমন একটি নালিশ করেছিল তার আম্মার কাছে। তবে তা আম-মৌলবীর মধ্যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রথমে মনে হয়, তার চোখের তারা দুটি ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো চরকি খেয়ে অতল গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে যায়। কনীনিকা দুটি দৃশ্যমান হলেও তা এবার পাথরের মতো স্থির হয়ে থাকে বিস্ফারিত শুভ্রতার মধ্যে-মধ্যে। তারপর ভীষণভাবে তার ঠোঁট কাঁপতে শুরু করে। এবার ক্ষিপ্তের মতো সে তার ঢোলা কামিজের জেব হাতড়িয়ে কী খোঁজে। যা খোঁজে শীঘ্রই সে খুঁজে পায়। তারপর সে-জিনিসটি কম্পিত হাতে সেলিনার চোখের সামনে তুলে ধরে।

নাও, এইটে নাও।

কৌতূহল বোধ করে বলে সেলিনা আড়চোখে আম-মৌলবীর প্রসারিত হাতের তালুর পানে তাকায়। তারপর চোখ নড়ে না।

আম-মৌলবীর হাতের তালুর মাঝখানে একটি চৌকোণো দু-আনা। তারা মিঞার উঠানে পড়ে থাকা মুদ্রাটির মতো।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে সে-মুদ্রাটির দিকে সেলিনা তাকিয়ে থাকে। তারপর আম-মৌলবীর ঘর্মাক্ত হাতের তালু তারা মিঞার লেপাজোকা উঠানে রূপান্তরিত হয়, পাশে কোথাও একটি রক্তাপ্লুত বীভৎস মৃতদেহও ভেসে ওঠে।

অবশেষে সেলিনা যখন তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে তখন আম-মৌলবী একবার দিশেহারাভাবে এদিক-ওদিক চেয়ে হঠাৎ দৌড়তে শুরু করে মরণভয়ে ভীত জন্তুর মতো। তারপর হাওয়ায় ঢোলের মতো ফুলে-ওঠা কামিজের তলে তার লকলকে পা-দুটি বিস্ময়কর গতিতে নিমেষে অনেকখানি পথ অতিক্রম করে ফেলে। শীঘ্র দূরে বাঁশঝাড়ের ওপাশে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

লোকজন যখন ছুটে আসে তখনো সেলিনার আর্তনাদ থামে নি। বাড়িতে তাকে আনা হলে স্তব্ধ হয়ে শুয়ে থাকে, শত প্রশ্নেও একটি জবাব দেয় না। সে যেন তার মুখের কথা হারিয়ে ফেলেছে।

দাদাসাহেবের ঘরে শীঘ্র বৈঠক বসে। আম-মৌলবীর তখন খোঁজ পড়ে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ-সময়ে একটি রাখাল ছেলের মুখে জানা যায় যে, আছরের নামাযের পর সেলিনাকে সঙ্গে করে আম-মৌলবীকে পুকুরের দিকে যেতে দেখা গিয়েছিল। পুকুরের পাড়েই নিমগাছের তলে আর্তনাদরত সেলিনাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল বটে কিন্তু তখন ত্রিসীমানায় আম-মৌলবীকে কোথাও দেখা যায় নাই। এবার দাদাসাহেব ভেতরে গিয়ে সেলিনাকে পুনর্বার জেরা করেন। সেলিনা এবারো একটি শব্দ করে না।

কোনো গুপ্তচরের হাতে সেলিনার মৌনতার খবরটি পেয়েছিল কি না জানা নাই কিন্তু আম-মৌলবী মগরেবের প্রাক্কালে ঘরে ফিরে আসে। হয়তো পেটের দানার কথা ভেবেই সে ফিরে আসে। সেদিন বিশেষ দরদী কণ্ঠে সে মগরেবের নামাযের আযান দেয়।

অসম্পূর্ণ বৈঠকটা সান্ধ্য-নামাযের পর আবার বসে। দাদাসাহেব রাখাল ছেলের কথাটি তুললে আম-মৌলবী আকাশ-থেকে-পড়ার মতোই বিস্মিত হয়। তারপর ব্যাখ্যা-বিশারদ লোকটি সত্বর একটি ব্যাখ্যা পেশ করে।

মাঠের ভূতপেতনীই হবে। সেবার এসেছিল ঘোড়সওয়ারির বেশে, এবার এসেছে আমার

রূপ ধরে।

ভূতপ্রেতের আস্পর্ধায় আম-মৌলবীর মুখচোখ যথাযথভাবে ক্রোধে লাল হয়ে ওঠে। মনে-মনে সে ভাবে, সেবার অশ্বারোহীদের কথা অতিরঞ্জিত করে বলে সে ভালোই করেছিল।

অনেক আলাপ-আলোচনার পর সাব্যস্ত হয় যে, সেলিনার সৌন্দর্যের জন্যেই মাঠের দুরাত্মার নজর পড়েছে তার ওপর। সিদ্ধান্ত হয়, বাড়িতে দু-দিন দু-রাত কোরান শরিফ পড়ানো হবে যাতে দুষ্ট আত্মাটি আনাচে-কানাচে কোথাও গুপটি মেরে থাকলেও পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়। দাদাসাহেব স্থির করেন, তিনি নিজেই সেলিনাকে দোয়া-দরুদ পড়ে ঝাড়বেন। এ-ও স্থির হয় যে, গ্রীষ্মের ছুটির বাকি ক-দিন তাকে এক মুহূর্তের জন্যেও বাড়ির বাইরে যেতে দেয়া হবে না, ঘরেও হারুনের মা সর্বক্ষণ তার সাথে-সাথে থাকবে। তারপর আম-মৌলবী ঘোষণা করে, পরদিন সকালেই সে হাতিমপুরের পীরসাহেবের কাছ থেকে একটি বিশেষ তাবিজ নিয়ে আসবে মেয়েটির জন্যে। হারুনের মাও একটি প্রস্তাব করে। সে বলে, সেলিনার মাথাভরা কালো রেশমের চুল অবিলম্বে কেটে ফেলা উচিত। তার যুক্তি হল এই যে, মেয়ে যতই সুন্দরী হোক না কেন, একবার তার মাথাটি আস্ত বেলের মতো নেড়া করে ফেললে দুষ্টতম লম্পট দুরাত্মাও তার দিকে একবারও মুখ ফিরে তাকাবে না।

সব প্রস্তাবই কার্যকর হয়। পরদিন একটি হাজ্জামের নিষ্ঠুর হাতে সেলিনার সুন্দর চুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ছুটির বাকি ক-দিন আম-মৌলবীর আনা কালো সুতায় বাঁধা একটি তাবিজ তার গলা-থেকে ঝুলে থাকে।

নিমগাছের তলের ঘটনাটি সেলিনা কাউকে বলে না। হয়তো মানুষটি সত্যিই আম-মৌলবী ছিল না, কোনো দুরাত্মা ছিল—সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারে না বলেই বলে না। এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে দাদাসাহেবের বাড়িতে বেড়াতে এসে যে-রহস্যময় ছায়াচ্ছন্ন দুনিয়ার সন্ধান সে পেয়েছে, সেখানে কেউ কি সত্য-মিথ্যার বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারে?

সে-দ্বন্দ্বের জন্যেই হয়তো যখন সে ছুটির শেষে শহরে প্রত্যাবর্তন করে তখন তার মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাসে দেখায়।

মালেকা

মুখভাঙা কলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে পিচ-ক্ষয়ে-আসা কঙ্করজর্জরিত পথটা ধরে মিনিট সাতেক হাঁটলেই ইস্কুল। ফিঁকে কমলা রঙের তাঁতের এবং সবুজ পাড়ের মিলের জীর্ণ শাড়ি দুটি অদল-বদল করে প'রে মালেকা আজ ছ-মাস যাবৎ এ-পথে আসা-যাওয়া করছে। প্রথমে পথটা অতিক্রম করতে তার মনে হত অখণ্ড একটা ঘণ্টাই বুঝি কাবার হয়ে গেল। তখন তার পা-দুটো কেমন জড়িয়ে থাকত। খোলা আকাশের তলে উন্মুক্ত রাস্তায় নাবতেই লজ্জাজনিত যে-নিদারুণ জড়তায় সে অভিভূত হয়ে পড়ত, সে-জড়তার জন্যে প্রতি পদক্ষেপই অতিশয় দীর্ঘ মনে হত। ইস্কুলের চাকরিটা নেবার আগে সে কখনো এমন একাকী হাঁটে নাই।

অবশ্য অভ্যস্ত হতে সময় লাগে না, পথের সঙ্গে পরিচয় হতেও দেরি হয় না। তারপর সে বুঝতে পারে, দাইয়ের কথাই ঠিক। দাই বলে, পথটা কেবলমাত্র সাত মিনিটের। দাই অবশ্য ঘড়ি দেখে পথের দূরত্বটা কখনো নির্ণয় করে নাই। তবু তার আন্দাজটা কাঁটায়-কাঁটায় নির্ভুল।

ঘড়ির কথায় হাসি আসে। বহু বছর আগে মালেকার স্বামী খন্দের দিনে একবার শখ করে সস্তায় একটা হাতঘড়ি কিনেছিল। দু-দিনের খেলার বা ফ্যাশনের শখ। সে-কথা জেনেই যেন হাতঘড়িটা ক-দিন চক্কর দিয়ে হঠাৎ একরাতে স্তব্ধ হয়ে যায়। এমনিতেই, আছাড় না খেয়ে, আঘাত না পেয়ে। তখন তার স্বামী আনকোরা নতুন জামাই, সরজমিনে হাওয়ার মানুষ। মরা

ঘড়িটা ক-দিন তবু হাতে বেঁধে বেড়িয়ে শেষে সেটা তুলে রাখে ফুল-আঁকা টিনের বাক্সে। বলে, সারাবে। কিন্তু আর সারানো হয় না।

শখের কথা আলাদা। এদিকে গোটা একটা ইস্কুলই চলছে বিনা ঘড়িতে। ঘড়ি-যে একেবারে নাই, তা নয়। প্রধান শিক্ষয়িত্রীর ঘরে পশ্চিম দেওয়ালে সেকেলে আমলের মস্ত ঘড়ি। তবে ধনী শিকারির বাড়ির দেয়ালে-টাঙানো হা-করা বাঘের কল্লা যেন সেটি। ঘড়ির ধড়ে প্রাণ নাই; তার পেতলের গোল হৃৎপিণ্ডটা কয়েক মাস যাবৎ স্তব্ধ। ওপরওয়ালাকে সে-বিষয়ে জানানো কর্তব্য। প্রধান শিক্ষয়িত্রী জানাতেন এবং ঘড়ি মেরামতের জন্যে পয়সা দাবি করতেন, কিন্তু একটি কারণে তা করেন নাই। ঘড়ির বর্তমান অবস্থার জন্যে তিনি নিজেই কি দায়ী নন? ঘড়িটা কেমন গড়িমসি করতে শুরু করলে তিনি পথ থেকে তালা-চাবি মেরামত করার লোকটিকে যদি ডেকে না পাঠাতেন, তবে হয়তো ঘড়িটা এমন বেমক্কাভাবে হরতাল শুরু করত না। অবশ্য তাকে ডাকার পরামর্শটা দাই-ই দিয়েছিল। তার কথা শোনা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই। ঘড়ির কলকব্জার ব্যাপারে সে কী বোঝে? তালা-চাবির লোকটাও বলতে পারত ঘড়ি-সারানো তার কাজ নয়। আসলে দুনিয়ায় ঠগবাজ জুয়াচোরের শেষ নাই, ভুল পরামর্শ দেবার লোকেরও অভাব নাই। শুধু তাই নয়। কানে কথা তুলবার জন্যেও সবাই সর্বক্ষণ তৈরি। চাকরির জন্যে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর বড় মায়া। শখের মায়া নয়, নিতান্তই পেটের মায়া। কী হতে কী হয়ে যায়, সে-ভয়ে তিনি সদা-সন্ত্রস্ত থাকেন। মাগ্‌গি-ভাতা সমেত মাসে-মাসে পঁচাশি টাকার মতো সামান্য যে-মাইনেটা হাতে আসে, তা সংসার দরিয়ায় বিন্দুবৎ পানি। তবু তা হারাবার কথা ভাবলেই তাঁর বুকটা হিমশীতল হয়ে যায়।

একদিন বিভাগীয় দফতর থেকে একজন মহিলা ইস্কুল পরিদর্শন করতে আসবেন বলে চিঠি এলে তাঁর চিন্তার অবধি থাকে না। বস্তুত কয়েক রাত তাঁর ঘুমই হয় না। মাইনর ইস্কুলও ইস্কুল, এবং ইস্কুল চালানো সহজ ব্যাপার নয়। দায়িত্ব-তো তাঁরই। এমন দায়িত্ব পালনে এখানে-সেখানে দোষঘাট-গাফিলতি না হয়ে পারে না। নিজের দোষ নিজে কেউ দেখে না, কিন্তু অন্য কেউ চোখ খুলে দেখতে চাইলে অনেক কিছুই দেখতে পারে। অবশ্য বারবার চিন্তা করে দেখেও যখন তাঁর কাজে কোথাও দোষঘাট-গাফিলতি দেখতে পান না, তখন স্তব্ধ ঘড়িটাই তাঁর মানসিক যন্ত্রণার প্রধান সূত্র হয়ে দাঁড়ায়। ইস্কুল পরিদর্শনকারিণী সে-বিষয়ে প্রশ্ন করলে কী উত্তর দেবেন? ঘড়িটার বিষয়ে ভুলে থাকাও সম্ভব হয় না। চোখের সামনেই তার মৃতদেহটি সর্বক্ষণ বিরাজ করে। দেয়ালে ঝুলে থাকলেও তা তাঁর বুকে ভারি হয়ে চেপে থাকে। তারপর একদিন উর্দিপরা চাপরাসি নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চেপে বিভাগীয় দফতরের মহিলাটি আসেন। আসেন ঝড়ের মতো, ঝড়ের মতোই চলে যান। ঘোড়ার গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেলে ঘাম-দিয়ে-জ্বর-ছাড়া আরামে প্রধান শিক্ষয়িত্রী দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। তারপর চমকে উঠে সহকর্মিণীদের বলেন,

—এই যাঃ। ঘড়ির কথাটা তাঁকে বলতে ভুলে গেলাম।

তাঁর উক্তিটা অবশ্য সত্য নয়। তা বুঝেই একজন শিক্ষয়িত্রী বলে,

—বললেও কান দিতেন কি না সন্দেহ। মানুষটা কেমন যেন মনে হল। ফ্যাশন-অলঙ্কারেই কেবল নজর যেন।

প্রধান শিক্ষয়িত্রী কিছু-একটা বলতে গিয়ে থেমে যান। ওপরওয়ালার বিরুদ্ধে কথা বলা নিরাপদ নয়। বললে হয়তো কালই একটা বেনামি চিঠি চলে যাবে তাঁর বিরুদ্ধে।

—বলাটা কর্তব্য ছিল। ভারিক্কি গলায় তিনি বলেন।

—ঘড়িটা একটু থেমেছে বলে ইস্কুলটা কি চলছে না? মুখে আস্ত একটা পান ঢুকিয়ে দাই বলে।

কথাটা অবশ্য ঠিক। ঘড়ি ছাড়া ইস্কুলের কাজ চলছে বৈকি। এ-বিষয়ে কারো যদি কোনো অসুবিধা ভোগ করতে হয়, তা প্রধান শিক্ষয়িত্রীই করেন। থানার ঘণ্টার জন্যে তিনিই

কলকাতায় ১৯৪৭ সালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

কানটা সজাগ করে রাখেন। তাঁর কাছ থেকে ইঙ্গিত পেলে দাই ঘণ্টা বাজায়।

সরিয়ে নেয়াই ভালো। ঘড়িতে চড়ুই পাখি বাসা বাঁধল বলে।

শিক্ষয়িত্রীটি আবার বলে।

প্রধান শিক্ষয়িত্রী কেমন শিউরে ওঠেন।

—কালই চিঠি লিখে দেব। ইনেস্পেক্‌ট্রেসের সঙ্গে পরিচয় হল, আর লিখতে তেমন বাধো-বাধো ঠেকবে না। বয়স কম হলেও মানুষটি ভালোই মনে হল।

এবার শিক্ষয়িত্রীটি সুর বদলায়।

—মনে কলুষতা নেই মনে হল।

দাই হঠাৎ গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে হাই তোলে। আজেবাজে কথায় সে কখনো কান দেয় না। তার দিকে তাকিয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রী খনখনে গলায় বলেন,

—তোমার বদ-বুদ্ধিতেই-তো ঘড়িটার এ-দশা হয়েছে।

—আমি অতশত কী বুঝি?

দাই গলা চড়িয়ে উত্তর দেয়। তার কণ্ঠে দোষীর নম্রতা ভাব নাই। দায়িত্বটা আবার প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাঁধেই ফিরে যায়। অবশ্য তিনি এখন বোঝেন, ঘড়ির জন্যে দুশ্চিন্তাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল। তবু এ-সব বিষয়ে কে-কখন সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পারে?

সাত মিনিটের এইটুকু পথ হাঁটতেই মালেকার বুকে হাঁপানি ধরে। আজ আবার তিন দিন জ্বরভোগের পরে আসছে বলে মাঝপথেই তার চোখ ঘোলাটে হয়ে ওঠে। সকালের কড়া রোদ দেখতে-না-দেখতে কেমন আবছায়া হয়ে যায়। তাছাড়া দুর্বল হৃৎপিণ্ডটা হাতুড় পেটায় শীর্ণ বুকে।

কোনোমতে ইস্কুলে পৌঁছে বারান্দায় একটি টুলে বসে হাঁপাতে থাকে। দেখে দাই আসে। জাতিতে নমশূদ্র হরিমতী নামে শিক্ষয়িত্রীটিও পাশে এসে দাঁড়ায়। তারপর একটি ছাত্রী আসে হাতপাখা নিয়ে। মালেকার গায়ে হাওয়া দিতে শুরু করেই সে তার মুখের ফোয়ারা খোলে। বলে, দু-সপ্তাহ আগে এমনি হাঁপাতে-হাঁপাতে তার ফুফুর এন্তেকাল হয়। সেদিন সে-ই তার মুমূর্ষু আত্মীয়াকে হাওয়া করেছিল। তাই সে জানে, মানুষ কীভাবে মরে। বিশেষ কিছু নয়, অমনি হাঁপাতে-হাঁপাতেই মরে।

দাই ধমকে বলে, ওসব কথা বলতে নাই।

মালেকা মেয়েটির কথায় কান দেয় না। মৃত্যুর কথায় তার মনে কখনো ভয় আসে না। বরঞ্চ মৃত্যুর কথায় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের উৎকণ্ঠা ভরা স্নেহ-মমতার নিবিড় উষ্ণতার চিত্রই তার স্মরণ হয়।

সামনে রোদপোড়া তামাটে উঠানের দিকে চেয়ে মালেকা ক্ষীণভাবে হাসে। দাই বলে,

—আরো একটু জিরাও।

যে-মেয়েটি পাখা করে, সে হয়তো একটু নিরাশবোধ করে মালেকা আবার সুস্থবোধ করছে বলে।

পরে প্রধান শিক্ষয়িত্রী বলেন, তোমার তিন দিন কামাই হল কিন্তু।

মালেকা চোখ খুলে চেয়ে শোনে, কিছু বলে না। তিন দিন কামাই মানে তিন দিনের মায়না পাবে না। তার অর্থ প্রধান শিক্ষয়িত্রীও ভালো করে বোঝেন। কিন্তু তাঁর কড়া না হয়ে উপায় কী? ইস্কুল চালাতে হলে আইনকানুন মানতে হয় অক্ষরে-অক্ষরে, শাসন করতে হয় দরকার হলে। কর্তব্যে অবহেলা হলে মাগ্‌গি-ভাতা সমেত পঁচাশি টাকার মায়নায় তাঁর দাবি থাকবে না।

তবে তিনি যখন ক্রোধ প্রকাশ করেন, তখন সে-ক্রোধ শূন্য কলসির মতোই ঠনঠন করে বাজে। তাছাড়া রাগটা কখনো খাঁটি নয় বলে তার প্রয়োগটা যথাসময়ে বা যথাস্থানে হয় না।

নির্বাক মালেকার দিকে চেয়ে হঠাৎ তিনি অতিশয় রাগান্বিত কণ্ঠে বলেন,

—দিনদিন যেন কেবল ভেঙেই পড়ছ। ডাক্তার-দাওয়াই কর না কেন?

—একটু জ্বর হয়েছিল। ক্ষুদ্র গলায় মালেকা উত্তর দেয়।

অবশ্য যে-বিষয়টি তুলেছেন তা নিয়ে বেশি আলাপ-আলোচনা বিপজ্জনক জেনেই তিনি রাগতভাবেই হঠাৎ অন্য বিষয়ে চলে যান।

—শুনলাম সেদিন নাকি মেয়েদের 'কুত্রাপি' শব্দের অর্থ বলতে পার নি।

—ভুলে গিয়েছিলাম। সরল কণ্ঠে মালেকা উত্তর দেয়।—পরদিন ওঁর কাছ থেকে জেনে এসে অর্থটা বলেছি তাদের।

মালেকা অবশ্য বলে না যে তার স্বামীও ঠেকে গিয়েছিল এবং পরে কোথায় একটা অভিধান দেখে এসে শব্দটির অর্থ তাকে বলেছিল।

উত্তর শুনে প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবার সত্যিই যেন রেগে ওঠেন।

—'কুত্রাপি' শব্দের অর্থ জান না, কী মাস্টারনিগিরি করছ। মেয়েরা কী হাতি-ঘোড়া শিখবে তোমার কাছে?

মালেকা এবার চুপ করে থেকেই প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পানে তাকিয়ে থাকে। তাঁর কথায় রাগও হয় না, অপমানও সে বোধ করে না।

তাঁর সরল দৃষ্টির সামনে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর রাগ পড়তে দেরি হয় না। গোপনে একবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন তিনি। কী করবেন তিনি? দেওয়ালেরও কান আছে বলে শাসন করতে হয়, ধমকাতে হয়। তিনি কি বোঝেন না যে 'কুত্রাপির' মতো অকেজো উদ্ভট শব্দের অর্থ শিখে মেয়েদের কী-ই বা লাভ হবে। নেহাত জীবনধারণের প্রশ্ন, নাহলে, সত্যি বলতে কী, ইস্কুলটারই-বা মানে কী হয়? মেয়েদের পড়ানো এক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চৌদ্দগুষ্ঠিতেও যাদের পেটে একটি হরফ পড়ে নি, তারাও দলেদলে তাদের মেয়ে পাঠাচ্ছে ইস্কুলে! মেয়েটাকে একটু পড়িয়ে দিন। তা বেশ, দিচ্ছি পড়িয়ে। তবে বেশি কিছু আশা কোরো না। ইস্কুলে আসা-যাওয়াই-তো শিক্ষা, আর দশ জনের সঙ্গে বেঞ্চিতে বসে কলতান করাই-তো পঠন-পাঠন। একটি ঘরের ঝিলিমিলিতে একজোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। তাদের বাক্‌বাকুম শুনলেও হয় লিখন-পড়ন। আসল শিক্ষা হল বয়স্কদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে শেখা। মাস্টারনিদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে শেখ, সময়ে-অসময়ে গা-মাথাটা টিপে দাও, কখনো স্নেহ-আদরের সঙ্গে বাড়ি থেকে কদুটা-মরিচটা এনে দাও। মাস্টারনিরাও মানুষ। তারা কলযন্ত্র নয়। তাদেরও পরিবার আছে, তাদেরও সমস্যা আছে। চালের দরটার কথা ভেবে দেখ। চল্লিশ-পঞ্চাশের মধ্যেই ওঠা-নাবা করে। নাবলে কাঁকর বাড়ে অথবা ভেঙে ক্ষুদ্র হয়। উঠলে ঘরে এক মুঠো আসে কি আসে না। মানুষের পেটে দানা নেই, 'কুত্রাপি' শব্দের অর্থ জেনে কী হবে?

অবশ্য ভারিক্কি কণ্ঠে মালেকাকে তিনি বলেন—শিক্ষকতার কাজ বড়ই দায়িত্বপূর্ণ। তা মনে রেখ। আরেক কথা। 'কুত্রাপি' শব্দের অর্থ আমাকে না জিজ্ঞাসা করে তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলে কেন? স্বামীরাও স্ত্রীমানুষের মতো গল্প করে বেড়ায়। একবার ইস্কুলের বদনাম উঠলে আর রক্ষা থাকবে না।

মালেকা এবারো কিছু বলে না।

—আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি। যাই কর, ছাত্রীদের সামনে আপন মানটা খুইয়ো না। জান দেওয়া যায়, মান দেওয়া যায় না। কোনো শব্দের অর্থ যদি মাথায় না আসে, ঝট করে বলে দিয়ো কিছু। শব্দের অর্থ তারা ছাই মনে রাখে। এখন বলেছ কি তখন গিলে ফেলেছে। কিন্তু একবার তোমার অজ্ঞতা প্রকাশ করেছ কি অমনি সাত-রকম কথা উঠবে। তুমি কিছু বোঝ না। আজকালকার ন্যাংটা মেয়েগুলো শয়তান কম নয়। পড়তে আসে না ছাই। আসে আমাদের বুকটা ঝরঝরে করে দেবার জন্যে।

ছাত্রীদের পানে তাকিয়ে মালেকা নীরব হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। চোখে জ্যোতি নাই, হাত দুটি সাদা ফ্যাকাসে। নখগুলো পর্যন্ত বীভৎসভাবে সাদা। দেহে কোথাও এক ফোঁটা রক্ত নাই

যেন। একটি ছাত্রী মায়া করে বলে, একটু মাথা টিপে দেই? আরেকজন বলে, চুলে জটা পড়েছে। ছাড়িয়ে দেব?

মালেকা ম্লানভাবে হাসে। না, মাথা টিপতে হবে না, জটাও ছাড়াতে হবে না। ওসবের প্রয়োজন নাই। সে অন্যকথা ভাবে। তার অন্তরের দৃষ্টি একটি উজ্জ্বল স্মৃতিতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যে তার চোখ যেন চকচক করে ওঠে, তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস খাটো হয়ে আসে।

দাই বোঝে তার মনের কথা। যে-মানুষ ঘড়ি না দেখেও নির্ভুলভাবে বলতে পারে পথটা ঠিক সাত মিনিটের সে-মানুষ অনেক কিছু বোঝে। একবার আড়চোখে মালেকার দিকে তাকিয়ে সে আপন মনে গজগজ করে। পরে হরিমতীকে বলে,—একবার প্রাণভরে খাবার জন্যে মেয়েমানুষটির বুক খাঁখাঁ করছে।

মেয়েরা যখন নামতা পড়ার অজুহাতে সমস্বরে চিৎকার করে, তখন টেবিলের ওপর রক্তশূন্য হাত-দুটি রেখে খোলা জানালা দিয়ে রোদ-পোড়া উঠানের দিকে চেয়ে মালেকা স্থির হয়ে বসে থাকে। কী দেখে সে। অবশ্য তার ক্ষিদে নাই, খাওয়ারও আকাঙ্ক্ষা নাই। তবু সে দেখে মগরা-মগরা স্তূপাকার করে রাখা ধান, তেলভরা বড়-বড় জ্যান্ত টাটকা মাছ। সে কি কল্পনার জাল বুনছে?

কথাটা কিন্তু একেবারে অসত্য নয়। তবে তাতে আজ আশা-আকাঙ্ক্ষার একটু রং পড়েছে। এমন স্মৃতি নাই যাতে কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় না।

মালেকা ছোটবেলায় কোরান-হাদিস পড়েছে মৌলবীর কাছে। তারপর মাইনর পাস করে দীর্ঘ ঘোমটা তুলেছে গর্ব ঢাকবার জন্যে। তার বাপ বেদারুদ্দিনেরও গর্বের সীমা থাকে নাই। হাটে-ঘাটে কত ছড়িয়েছে সে-গর্ব। তার ঘরে যেন আস্ত সূর্য উঠেছে। তারপর সে-মেয়েরই বিয়ে হয় তোজাম্মল তরফদারের সঙ্গে। ছেলেটি তখন গ্রামের মাতা বাগ্‌বাদিনী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে বার-কয়েক ম্যাট্রিক ফেল করে ঘরে বসে আছে। বসে আছে কথাটা তখন প্রশংসনীয় ব্যাপারই ছিল। যাদের জমিজমা আছে, যাদের আর্থিক সমস্যা নাই, তারাই এমন বসে থাকতে পারত। যুদ্ধ তখনো শুরু হয় নাই, দেশে দুর্ভিক্ষও আসে নাই। পরীক্ষায় ফেল করাটাও তেমন দোষণীয় বা লজ্জার ছিল না। শখের পড়া, ঠেকার পড়া নয়। পাস না করলেও ইস্কুলের শেষ ধাপ পর্যন্ত উঠেছে, মস্ত-মস্ত অনেক কেতাব শেষ করেছে। এসব কি কম কৃতিত্বের কথা? তাছাড়া পাস-ফেল খোদারই হাতে। সুতরাং যখন তাদের বিয়ে হয়, তখন মালেকার স্বামী তোজাম্মলের মেজাজই অন্যরকম। স্থূল পৃথিবীতে থেকেও তার বিচরণ ছিল আসমানে, চোখ মাথায় থাকলেও দৃষ্টি ছিল ঊর্ধ্বে। মেজাজ ছাড়া, চেহারাও ছিল অন্য ধরনের। মুখে কাঁচা-কাঁচা দাড়ি, আর ঠোঁটে কেমন-একটা অস্পষ্ট ব্যাখ্যাতীত হাসির রেশ। মাইনর-পাস-করা মেয়েটির মনে এমন স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা জাগতে দেরি হয় নাই। তবে আজ যেমন সে-জমিজমা নাই, সে-ধান সে-মাছ নাই, তেমনি তোজাম্মলেরও সে-দাড়িও নাই, সে-হাসিও নাই। তাদের সীমা সংকীর্ণ কিন্তু সুখের জীবনের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে, যে-ঝড়ের সমাপ্তিতে কাঁটাগাছ, ঝোপঝাড় ছাড়া আর কিছু থাকে নাই তাদের জন্যে। সে-ঝড়ের ধাক্কাতে অবশেষে তারা একদিন শহরে এসে উপস্থিত হয়। তোজাম্মল জমি বিক্রি করে সামান্য পয়সা হাতে নিয়ে যে-ব্যবসা শুরু করেছিল, সে-ব্যবসায় লালবাতি জ্বালিয়ে এখন চাকরির উমেদারিতে চরকির মতো রাতদিন ঘোরে। পাস-ফেলের মতো চাকরি পাওয়া-না-পাওয়াও খোদার হাতে। সে হাত এখনো খোলে নাই।

—স্বামীটা বখাটে। দাই বলে। উক্তিটা মালেকা শুনতে পায়, কারণ তাকে শোনাবার জন্যেই দাই উক্তিটা করে। কিন্তু মালেকা কিছু বলে না। তার বলার কিছু নাই যেন। সে অবশ্য জানে তোজাম্মল বখাটে নয়। তাছাড়া তোজাম্মলের চোখে-যে একটি গভীর ভীতির ছায়া এবং যে-ভীতির কথা সে একবারও মুখ ফুটে বলে না, সে-ভীতির কথা মালেকা জানে।

কিন্তু সে-কথাও বলা যায় না।

বারান্দার প্রান্ত থেকে দাইয়ের কণ্ঠ আবার ভেসে আসে,

—বখাটে না হলে রোগাপটকা অসুস্থ বউকে কাজে পাঠিয়ে এমন পার-ওপর-পা-তুলে কেউ বসে থাকে?

এবার হরিমতী দাইকে ইশারায় কিছু বলে। উত্তরে দাই ফোস করে ফণা তোলে,

—সত্য কথার কঞ্জুস আমি নই। বখাটে নয়তো কী? ঘরে বুড়ি মা, দু-দুটি ছেলে-মেয়েও। বখাটে না হলে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কেউ হয়?

দাই অনেক কিছু জানে। তবু সকল রক্তমাংসের মানুষের মতো তারও কখনো-কখনো ভুল হয় বৈকি। ঘড়ির কলকজার কথা সে যেমন জানে না, তেমনি একথাও সে জানে না যে, একটি মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘব হয় না।

কথার ধারা পরিবর্তন করার প্রয়াসে হরিমতী বলে,

—আজ কেমন আছ বোন?

—আজ ভালোই বোধ করছি। বলে মালেকা ম্লানভাবে একটু হাসে।

দাই সজোরে থুতু ফেলে।—ঝুট্ কথা। কাকে ফাঁকি দিচ্ছ? বলে দিচ্ছি একটা কথা। একদিন পথে মুখ থুবড়ে পড়বে, আর উঠবে না। তখন তোমার পেয়ারের স্বামীর টনক নড়বে। সেদিন আত্মশোচনায় তার বুক যেন জ্বলে যাবে।

মালেকা একবার ভাবে, দাইকে বলে তোজাম্মলের চোখের গভীর ভীতির কথা, তার চাকরির উমেদারির কথা। কিন্তু সে নীরব হয়েই থাকে। দাইকে কেন বলবে? প্রতিবাদেরই-বা কী প্রয়োজন? তাছাড়া, তার স্বামী যদি সত্যিই দায়িত্বজ্ঞানশূন্য বদচরিত্র নিষ্ঠুর মানুষ হত, তবেই সে হয়তো প্রতিবাদ জানাত। কিন্তু তোজাম্মল অসহায় মানুষ। তার অসহায়তার কথা সে কী করে বলে? অন্য একটা কিছু বলতে পারলে বলত। ক-দিন ধরে দেশে ফিরে যাবার একটা আকাঙ্ক্ষা তাকে বারেবারে নিপীড়িত করছে। শহরে যে-কয়েদখানায় তারা পড়েছে, সে-কয়েদখানা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে হঠাৎ সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ইস্কুল থেকে ঘরে ফিরে যাবার সময় এলে সে-ভাবটি ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে। ঘর মানে একটি মাত্র কামরা। পাশে একটু বারান্দার মতো। বেড়া দিয়ে সে-বারান্দাকে তারা রান্নাঘরে পরিণত করেছে। ঘরটির পেছন থেকে বস্তির শুরু। তার গা-ঘেঁষেই নালা এবং বস্তির পায়খানা। দুটোর মধ্যে বিস্ময়কর যোগাযোগ। নালা দিয়ে বিষ্ঠা, পাক এবং না-পাক নানাবিধ গলিত-তরল বস্তু প্রবাহিত হয়। কোথায় যায়, সে-বিষয়ে নদীমাতৃক দেশের মানুষের বিন্দুমাত্র কৌতূহল নাই। তবে একটা কথা। ঘরের একমাত্র জানালাটি সে-দেয়ালেই হলেও তা ছাদের কাছাকাছি। তাই নালা-পায়খানা বা বস্তির দৃশ্য চোখে পড়ে না। শুধু কখনো-কখনো ওদিক থেকে হাওয়া বইতে শুরু করলে ঘরটা দুর্গন্ধে ভরে যায়। এখন গ্রীষ্মের দিনে হাওয়ার খাতিরে সে-দুর্গন্ধ সহ্য না করে উপায় থাকে না। বারান্দার দিকটা একটু খোলামেলা ছিল। কিন্তু সেখানে কাঠের গুদামে সর্বক্ষণ মানুষের চলাচল থাকে বলে সে উন্মুক্ততা উপভোগ করা সম্ভব নয়। চতুর্দিক থেকে ঘরটি সত্যই কয়েদখানা। মালেকার মনে হয়, একবার যদি এ-শ্বাসরুদ্ধ-করা নির্মম অস্তিত্ব থেকে উদ্ধার পেয়ে দেশের বাড়িতে তারা ফিরে যেতে পারত, তবে তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হত। তার ব্যাধির সমাপ্তি ঘটত। কিন্তু মালেকা জানে, তা সম্ভব নয়। তারা শখ করে শহরে আসে নাই, প্রাণভয়েই পালিয়ে এসেছে। দেশে তাদের আর মগরা-মগরা ধান নাই, পুকুরভরা জলজ্যান্ত টাটকা মাছও নাই। সম্বলের মধ্যে ভিটেবাড়িটা আছে বটে, কিন্তু ভিটেবাড়িতে ধানের ফসল হয় না, মাছও চরে না। দেশে প্রত্যাবর্তন করবার জন্যে সে যে-তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করে, সে-আকাঙ্ক্ষা কখনো বাস্তবে পরিণত হবে না। তবে সে-কথাই-বা দাইকে বলে কী লাভ?

একটু নীরব থেকে দাই আবার বলে,

—বখাটে মানুষের এক গুণ থাকে। মেয়েমানুষকে বশ করতে জানে তারা। তারপর মেয়েমানুষেরা তাদের ক্রীতদাসী হয়ে থাকে।

হরিমতী ঠাট্টা করে বলে, তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে নিশ্চয়ই।

—ঠিক বলেছ। তবে আমিও কম নই। ঠেঙিয়ে বের করে দিয়েছিলাম। এমন বখাটে নাই যে আমাকে বশ করে।

তারপর দাই উঠে মালেকার দিকে যায়। আঁচল থেকে দুটো ঢেঁড়স খুলে বলে,

—এ দুটি তোমার জন্যে এনেছিলাম। যাও, এবার বাড়ি যাও।

তারপর একদিন সুসংবাদ আসে। প্রধান শিক্ষয়িত্রীর মাইনে বেড়েছে। সেদিন ইস্কুলে হৈ-হুল্লোড় পড়ে। প্রধান শিক্ষয়িত্রীর মেদবহুল প্রশস্ত দেহে আনন্দ-তরঙ্গ জাগে, চোখ বারেবারে ঝাপসা হয়ে আসে।

ইস্কুলের পরে শিক্ষয়িত্রীরা তাঁর ঘরে জড়ো হয়। তারপর তাদের মুখ দিয়ে কথা ঝরে, হাসি ঝরে। চোখে হিংসার রেশ থাকলেও তা-একটা তৈলাক্ত উৎফুল্লতায় ঢেকে থাকে। শীঘ্র প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সংযম-গাম্ভীর্য শিথিল হয়ে ওঠে। তিনিও উদ্যমের সঙ্গে কলতানে যোগদান করেন, কারণে-অকারণে হাসতে শুরু করেন। তাতে দোষ কী? আজ খুশির দিন। তাছাড়া তিনিই আনন্দ-উৎফুল্লতার এ-বিস্ফোরণের কারণ। আজ একটু বাচালতা-প্রগলভতা করলে অশোভন হবে না, পদমর্যাদার ক্ষতি হবে না।

কথার আর হাসির ফোয়ারা থামে না; অজস্র কথায় এবং সাবলীল হাসিতে তারা পরস্পরকে নিমজ্জিত করে। আলাপ-আলোচনার বা মন্তব্য-উক্তির বিষয়বস্তু এই ধরা যায়, এই ধরা যায় না; এই আছে, এই নাই।

—থাম থাম। এক সময়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রী চিৎকার করে বলেন। কথার স্রোতটা শুধু যে হঠাৎ দৃশ্যগত হয়েছে তা নয়, একটি বিচিত্র মোড়ও নিয়েছে। কিন্তু হাসি বা কথা কেউ থামাতে রাজি নয়। বরঞ্চ এবার সমবেত কণ্ঠের উত্তাল হাসি ফেটে পড়ে আতশবাজির মতো।

—বলি তবে। আজ যখন খুশির খবর এসেছে—অবশেষে প্রধান শিক্ষয়িত্রী ঘোষণা করেন—

কথাটা কী করে উঠেছে তা তিনি জানেন না। খুশির খবরটির সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ-যোগাযোগও দেখতে পান না। কিন্তু আজ কথার যুক্তি বা অর্থপূর্ণতার কে বিচার করে?

—শোন বলি। কোনোপ্রকারে নিজেকে সংযত করে প্রধান শিক্ষয়িত্রী বলবার জন্যে তৈরি হন। তবে তাঁর ঘর্মাক্ত, কিছু-ময়লা সাদা ব্লাউজের নিচে অনাবৃত মেদবহুল অঞ্চলটি কোনো সংযম-না-মেনে থল্‌থল করে কাঁপতে থাকে দুরন্ত হাসির বেগে।

গলার স্বরটা খাটো করে তিনি স্বীকার করেন, একদা একটি পুরুষের হৃদয়বীণায় তিনিও প্রেমের ঝঙ্কার তুলেছিলেন।

—কথাটা তোমাদের বিশ্বাস হবে না হয়তো।

অবশ্য আজ তাঁর স্তূপাকার নাসিকা, চওড়া ঠোঁট, লাবণ্যশূন্য স্থূল-কালো মুখমণ্ডল, চাপা মাথায় একমুঠো ফিনফিনে প্রাণহীন চুল এবং মেদবহুল প্রশস্ত দেহের দিকে তাকিয়ে সে-কথা বিশ্বাস করা দুষ্কর। সে-কথা তারাও জানে, তিনিও জানেন। তবে তিনি এ-কথাও বুঝতে পারেন যে, সৌন্দর্যের ভিত্তিতে স্থাপিত না হলে প্রেমের গল্প নিতান্ত পানসা শোনায়, বিবর্ণ দেখায়। তাছাড়া তাঁর মনের গুপ্ত কোণে পুরুষের রুচির প্রতি একটু-যে শ্রদ্ধা নাই তা নয়।

—আজ খুশির দিন বলেই বলছি। প্রধান শিক্ষয়িত্রী সলজ্জ কণ্ঠে আবার ঘোষণা করেন। তারপর বলেন, কথাটা অবিশ্বাস্য শোনালেও যৌবনকালে তিনি দেখতে-শুনতে মন্দ ছিলেন না।

পর-মহূর্তে শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে একটা রব ওঠে। হাসির নয়, উৎসাহেরই রব।

—তোমাদের বলতে কী, কেউ-কেউ আমাকে সুন্দরীও ভাবত। বিশ্বাস করবে না হয়তো, কিন্তু আমার মাথায় একরাশ চুল ছিল। কোঁকড়ানো ঘন চুল, তবু রেশমের মতোই মসৃণ।

একটু থেমে আভাসে-ইঙ্গিতে তাঁর যৌবনকালের দেহেরও বিবরণ দেন।

অনেকটা হরিমতীর মতো।

এ-আকালের দিনেও হরিমতীর টইটম্বুর যৌবন। মুখে কোমল-উজ্জ্বল লাবণ্য, আঁট-করে-পরা শাড়ির বন্ধনে সুদৃশ্য সুডৌল দেহ। তবে কিছু ছিপছিপে। বয়স কম ছিল। তবে পুরুষরা কী দেখে কে জানে? আমার চুলই নাকি তার বুকে কালবৈশাখীর ঝড় জাগায়।

—সবটা বলুন না শুনি। বালিকার-চোখ-ঝলসানো ঔৎসুক্যের সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীরা তাঁকে উৎসাহ দেয়। তবে ততক্ষণে তাদের চোখে কালো ছায়া নেবে এসেছে। সে-ছায়া ঢাকবার আর চেষ্টা তারা করে না। মনের অন্ধকারে বিচ্ছুও জেগে ওঠে। হ্যাঁ, চুল ছিল-তো ইঁদুরের লেজ ছিল, রূপ ছিল-তো কালো হাঁড়ি ছিল, দেহ ছিল-তো উঁইয়ের ঢিবি ছিল।

—তারপর? তীক্ষ্ণ গলায় তারা বলে।

প্রধান শিক্ষয়িত্রীর নেশা ধরেছে। তাঁর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম, চোখে-মুখে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা।

—বলতে যখন বলছ।

দাইয়ের ধৈর্য যেমন সীমাবদ্ধ, তার মুখটাও তেমনি চাঁছাছোলা। তার ভয়ও নাই কাউকে। সত্য কথা গোলার মতো বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে, কোথাও আটকায় না। সে এবার প্রশস্ত হাই তুলে বলে, —পীরিত-টিরিতের কথা কেন বলছেন? পুরুষ আর নারী, তেল আর বেগুন। এক সঙ্গে হলেই ছ্যাঁৎ করে জ্বলে ওঠে। পীরিতের ফল জিজ্ঞাসা করুন আমেনা বিবিকে। ন-টা ছেলেমেয়ে কি এমনিতে হয়েছে? আসল কথা বলুন। সে-কথা শুনবার জন্যেই এরা বসে আছে।

—আসল কথা আবার কী? একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রধান শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাসা করেন।

—মাইনে বেড়েছে, খুশির কথা। কিন্তু একটু মিষ্টি-পানি না হলে চলে কী করে?

শিক্ষয়িত্রীরা চিৎকার করে ওঠে। এমন একটি মজাদার কথা তারা যেন ভুলে গিয়েছিল। এবার মনে পড়তে তারা প্রস্তাবটির সমর্থনে উচ্চকণ্ঠে রব তোলে।

অকস্মাৎ প্রধান শিক্ষয়িত্রীর মেদবহুল দেহে আনন্দ-তরঙ্গ স্তব্ধ হয়ে যায়, চোখের উজ্জ্বল আলোও স্তিমিত হয়। শুষ্ককণ্ঠে তিনি বলেন,

—মাইনে বেড়েছে মোটে পাঁচ টাকা। এমন আর কী বেড়েছে?

—পাঁচ হোক পাঁচ শ হোক, বেড়েছে তো।

—শুধু খবর পেলাম, টাকা হাতে আসে নি।

—না না, ওসব ফাঁকির কথা! সমবেতকণ্ঠে শিক্ষয়িত্রীরা প্রতিবাদ করে। তাদের হিংসা এবার প্রতিহিংসার রূপ ধারণ করে এবং সে-প্রতিহিংসা আগুনের মতো দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে। তারা ভাবে এবার প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে ঘায়েল করা যাবে, তাঁর আনন্দের মুখে চুন দেওয়া যাবে।

প্রধান শিক্ষয়িত্রীর মুখে স্তরের পর স্তর কালো ছায়া নাবে। কিন্তু তাতে তাদের নাছোড়বান্দা ভাব আরো বাড়ে। মনে হয় প্রাণ গেলেও আজ তাঁকে তারা ছাড়বে না। হাতাহাতি হোক, চুল টানাটানি হোক, ছাড়বে না। হাসতে-হাসতেই তারা তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করবে, আবদারের সুরেই তাঁর মনে ত্রাস সৃষ্টি করবে।

—কথা দিচ্ছি, মাইনেটা পেলেই মিষ্টি খাওয়াব।

একজন শিক্ষয়িত্রী বলে,

—খুশির দিনেই খুশির কাজ করতে হয়। এসব ব্যাপারে দেরি হলে মজা থাকে না।

দাই আবার বলে,

—রাজি হয়ে যান। ধৈর্য ধরে আপনার পীরিতের গল্প শুনছে, এবার তাদের শখটা মেটান।

কোণঠাসা জন্তুর মতো অসহায়ভাবে এধার-ওধার তাকিয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রী বলেন,

—কাল হবে, কাল। আজ পয়সা নেই।

—চকের দোকানে বাকি পাওয়া যায়। রাজি হয়ে যান, আমি নিয়ে আসি। কথাটা বলে দাই।

ক্ষণকালের জন্যে প্রধান শিক্ষয়িত্রী অন্ধকার দেখেন। তারপর সে-অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আলো দেখতে পান। উত্তেজনায় কম্পমান কণ্ঠে তিনি বলেন,

—কিন্তু আজ যে মালেকা নাই।

মালেকা আজও আসে নাই। আজ চার দিন ধরে সে অনুপস্থিত।

সহসা ঘরে স্তব্ধতা নেবে আসে। এত হৈ-হুল্লোড়ের পর সে-স্তব্ধতা বিচিত্র ঠেকে।

প্রধান শিক্ষয়িত্রী সহকর্মিণীর দিকে তাকান। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর মুখে একটা বিজয়িনীর ভাব ছড়িয়ে পড়ে। সন্দেহ থাকে না যে, অবশেষে তিনি তাদের যুক্ত আক্রমণ ঠেকাতে সমর্থ হয়েছেন। তবু নিশ্চিত হবার জন্যে বলেন—

—খুশির ব্যাপার। এ-ব্যাপারে কেউ বাদ পড়বেন কেন?

কেউ উত্তর দেবার আগেই দাই উঠে দাঁড়ায়। মুখে তার বিরক্তির ভাব। ঠোঁট উল্টে সে বলে,

—তবে আর মিষ্টিটা হল না।

—কেন নয়? উষ্ণভাবে প্রধান শিক্ষয়িত্রী প্রশ্ন করেন।—মালেকা আজ আসে নি কাল আসবে। থেকে-থেকে তার জ্বর-জ্বারটা হয়েই থাকে।

—আর আসবে না। এবার সে মরবে।

উক্তিটা হাসির ব্যাপার বলে ভুল করে একজন শিক্ষয়িত্রী চপলকণ্ঠে হেসে ওঠে। কিন্তু ঘরের গভীর স্তব্ধতার মধ্যে সে-হাসি শীঘ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

দরজার চৌকাঠ হেলান দিয়ে উঠানের দিকে তাকিয়ে দাই কয়েক মুহূর্ত আপন মনে বিড়বিড় করে। তারপর অন্যদিকে ফিরে সজোরে বলে,

—একটা কথা বলব? মিষ্টির পয়সাটা মালেকার কাফনের জন্যে তুলে রাখাই ভালো হবে।

ঘরের স্তব্ধতা এবার একটা অস্বচ্ছন্দভাবে ভরে ওঠে। কেউ কিছু বলে না। প্রধান শিক্ষয়িত্রীও দাইয়ের কথার কোনো উত্তর দেন না। কিন্তু এবার তাঁর অন্তরে ধীরে-ধীরে একটা ক্রোধের সঞ্চার হয়। দাইয়ের স্পষ্টবাদিতায় তিনি মাঝে-মাঝে বিরক্তিবোধ করলেও কখনো তাকে কিছু বলেন না। তার অতি নির্মম কথারও উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু এখন তার ব্যবহার তাঁর কাছে অসহনীয় মনে হয়। তিনি জানেন, তাঁর ক্রোধের কারণ পয়সা ব্যয়ের ভয় নয়। শিক্ষয়িত্রীদের মিষ্টি খাওয়াতে তাঁর আপত্তি ছিল না। খুশির খবর পেলে বন্ধুবান্ধবকে মিষ্টি খাওয়ানো একটি চলতি রেওয়াজ। কেন তাদের প্রস্তাবটি সহজে মানতে চান নাই তার কারণ আছে। তিনি নির্বোধ নন। অত হাসি-ঠাট্টার মধ্যে প্রস্তাবটি তারা পেশ করলেও তার পেছনে একটি হিংসার ভাব তিনি অনুভব করেন। সে-জন্যেই রাজি হতে তার মন চায় নাই। মালেকার যদি সত্যিই মৃত্যু ঘটে, তার কাফনের জন্যে তিনি খুশি হয়েই পয়সা ব্যয় করবেন। মালেকার জন্যে সকলের মায়া হয়, দুঃখ হয়। রোগব্যাধির জন্যে তার কাজে অহরহ বাধা পড়ে। শিক্ষকতার কাজেও সে তেমন যোগ্য নয়। তবু তার জন্যে মায়া-দুঃখ হয় বলেই তিনি তাকে কিছু বলেন না। বস্তুত, সকলের প্রতি তাঁর অশেষ দয়ামায়া-বিবেচনা। দাই যে এমন নির্ভাবনায় ইস্কুলের কাজে বজায় আছে, তার কারণও তাঁর সহৃদয় পরোপকারী চরিত্র। কিন্তু তাঁর প্রতি কে-একটু মায়ামমতা দেখায়, কেই-বা তাঁর মঙ্গলের কথা ভাবে? আজ তাঁর খুশির দিনে একটা অমঙ্গলের ছায়া ফেলতে দাইয়ের একটু প্রতিবাদ করার প্রয়োজনও কোনো শিক্ষয়িত্রী বোধ করে নাই। সেজন্যেই-তো তাঁর মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে।

প্রধান শিক্ষয়িত্রীর ক্রোধ পড়তে দেরি হয় না। তিন বুঝতে পারেন, খুশি-আনন্দের কথা দাইয়ের কাছে বড় নয়। সে-সব মায়া, আলেয়ার মতো ভুয়ো। জীবনটা তার চোখে দুঃখকষ্টে

সদাছায়াচ্ছন্ন। মালেকার আশু-মৃত্যুর ছায়া অন্যেরা পরিষ্কার করে দেখতে না-পেলেও সে দেখে এবং তার কাছে সে-ছায়াই একমাত্র সত্য। মুহূর্তের জন্যে কৃত্রিম হাসি ঠাট্টায় সে-সত্য ভোলা যায়, কিন্তু তাতে তার জয়লাভ হয় না। সে-সত্যকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। তিনিই-বা কী করে করেন?

প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিস্তেজভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। তারপর দুর্বল কণ্ঠে বলেন,

—যাও, বাড়ি যাও।

শিক্ষয়িত্রীরা একে-একে বেরিয়ে যায়। উঠানে তখন শেষ বেলার ম্লান আলো।

প্রধান শিক্ষয়িত্রী শূন্য ঘরে একাকী আরো কিছুক্ষণ বসে থাকেন। তাঁর সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। অন্তরের নিভৃত কোণে একটা কান্নার ভাব জাগে। কিন্তু সে-কান্নার কোনো অর্থ নাই বলেই যেন শীঘ্র তারও সমাপ্তি ঘটে। একবার ভাবেন, মালেকার আরোগ্যের জন্যে খোদার কাছে দোয়া করবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে মালেকার জীবন-মৃত্যু সুখ-দুঃখ তাঁর মনে কোনোই দাগ কাটে না। মালেকা কে?

যে-গভীর ছায়ায় তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, সে-ছায়া নিরাকার। তাই তা-এত ভীতিজনক।

শীঘ্র বারান্দায় দাইয়ের কণ্ঠ শোনা যায়। সে আপন মনে বিড়বিড় করে। ইস্কুল বন্ধ করবার জন্যে সে অধীর হয়ে উঠেছে। চমকিতভাবে প্রধান শিক্ষয়িত্রী উঠে দাঁড়ান। বুঝতে পারেন, দাইয়ের অসন্তুষ্টিও তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার করে।

উঠানে নেবে তিনি আবার উঠে আসেন। ময়লা সাদা ব্লাউজের ভেতর থেকে আধাভেজা বহু-ব্যবহৃত একটি এক টাকার নোট উদ্ধার করে, তিনি ক্ষুদ্র সলজ্জিতকণ্ঠে বলেন,

—নাও আজ খুশির দিন।

দাই ভ্রূকুটি করে তাকায় নোটটার দিকে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে হয়, সে যেন টাকাটি প্রত্যাখ্যান করবে। প্রধান শিক্ষয়িত্রীর বুকটা কাঁপতে শুরু করে।

—নাও! এবার ভীতকণ্ঠে ক্ষিপ্রভাবে তিনি বলেন।

নোটটা তারপর দাইয়ের কোমরে শাড়ির ভাঁজে অদৃশ্য হয়ে যায়। সে কিছু বলে না। তার ভ্রূকুটিটা আরো গাঢ় হয়েছে যেন, মুখটাও কেমন বাঁকা হয়ে উঠেছে।

তবু একটা গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে প্রধান শিক্ষয়িত্রী উঠানে নাবেন। মনের ছায়াটা যেন একটু হালকা হয়েছে।

স্তন

আবু তালেব মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন সাহেব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ করাটা পারিবারিক ফরজ হিসেবেই দেখেন। যতদিন দুনিয়াদারির কাজে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন ততদিন সে-কর্তব্যটি ইচ্ছানুযায়ী পালন করতে পারেন নি। আজ তাঁর দায়িত্বের ভার অপেক্ষাকৃতভাবে লঘু হয়েছে বলে সে-কর্তব্য পালনে বাধাবিপত্তিও কমেছে।

সালাহ্উদ্দিন সাহেব যখন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যান তখন তার পূর্ব-আয়োজনটি রীতিমতো সফরের আয়োজনের মতোই মনে হয়। বিনা খবরে ঝট্ করে কারো বাড়িতে তিনি উপস্থিত হন না। দেখা করতে আসবেন বলে আগাম খবর পাঠান দিনকয়েক আগে। সময়-প্রহর জানান, সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি চা-মিষ্টি কিছুই গ্রহণ করেন না, পান-দোক্তা তামাকের অভ্যাসও তাঁর নেই। তাছাড়া ডাক্তারের কড়া নির্দেশে পথ্য করেন বলে খানার দাওয়াতও গ্রহণ করেন না। বস্তুত এক গ্লাস

পানি ছাড়া অন্য কিছু তাঁকে দেওয়া সম্ভব হয় না। তবু অসিদ্ধ পানিটা রোগ-ব্যাধির ভয়ে পান করেন না বলে তা-ও ক্বচিৎ স্পর্শ করেন।

তাঁর আত্মীয়স্বজনের চক্রটি কম বড় নয়। শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত সে-পরিবারের লোকসংখ্যা অগুনতি মনে হয়। তবু তাঁর বয়সের জন্যে এবং তাঁর সমৃদ্ধিসম্পন্ন আর্থিক অবস্থার জন্যে তিনি নিজেকে তাদের সকলেরই মুরব্বি বলে মনে করেন এবং পদ্ধতিক্রমে বছরের মধ্যে একবার দু-বার দেখা করে আসেন তাদের সঙ্গে।

তবে আত্মীয়স্বজনের চক্রটি বৃহৎ বলে তাঁকে একটা সীমারেখা টানতে হয়। যারা সে-চক্রের বহির্ভূত, নিয়মিতভাবে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎটা করেন না। সবকিছুতেই কোথাও-না কোথাও একটা সীমারেখা টানতেই হয়।

অতএব সেদিন অপরাহ্ণে বিনাখবরে সালাহ্উদ্দিন সাহেব যখন দেখা-সাক্ষাতের চক্রের বহির্ভূত দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় কাদেরের বাড়িতে উপস্থিত হন, তখন ঘটনাটি নেহাতই বিস্ময়কর মনে হয়। তিন দিন আগে কাদেরের ষষ্ঠ সন্তান জন্মগ্রহণ করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে বলে তিনি-যে দুঃখ প্রকাশের নিমিত্ত এসেছেন তা মনে করা সম্ভব হয় না। সালাহ্উদ্দিন সাহেব নিজেই গভীর শোকগ্রস্ত। প্রায় একই সময় তিন দিন আগে প্রসবকালে তাঁর অতি আদরের ছোট মেয়ে খালেদার মৃত্যু ঘটে।

ক্ষুদ্র বৈঠকঘরে একমাত্র পিঠখাড়া-চেয়ারে আসন গ্রহণ করে সালাহ্উদ্দিন সাহেব লাঠির মাথায় তাঁর হাত দুটো জড়ো করেন। একটু দূরে শীতলপাটি-বিছানো চৌকিতে কাদের মিঞা বসে। তার মুখে কৌতূহলের স্পর্শ। ঘরে কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করে।

অবশেষে উচ্চৈঃস্বরে গলা সাফ করে সালাহ্উদ্দিন সাহেব একনজর তাকান কাদেরের দিকে। তারপর অল্পক্ষণের জন্যে তাঁর চোখ ক্ষুদ্র ঘরের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়। স্বল্পবেতনের কেরানিমানুষ কাদেরের বাড়িতে সর্বত্র দারিদ্র্যের ছায়া। ঘরে আসবাব বলতে নড়বড়ে চেয়ারটি এবং চৌকিটি ছাড়া আর কিছু নেই। ছাতা-পড়া দেওয়ালে শোভার খাতিরে একটি ক্যালেন্ডার টাঙানো। তাতে নদীর বুকে রক্তিম সূর্যাস্তের ছবি। তাতে সেটি দু-বছরের পুরোনো। অপরাহ্ণের সূর্যের তির্যক আলোয় তাতে জমে-থাকা ধুলা নজরে পড়ে। ওপাশে, ভেতরের দরজার কাছে মাটিতে বসে একটি বছর চারেকের মেয়ে বাটি থেকে মুড়ি খাওয়ায় রত। মুড়ি মুখে যতটা না যায় ততটা ছড়িয়ে পড়ে তার চারপাশে। গায়ে তার একটি অপরিচ্ছন্ন ফ্রক। মুখেও সর্বত্র ময়লার স্পর্শ।

সালাহ্উদ্দিন সাহেব যা দেখেন তাতে তিনি নারাজই হন। যে-প্রস্তাবটি নিয়ে তিনি কাদেরের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন সেটি উত্থাপন করা সমীচীন হবে কি না সে-বিষয়ে ক্ষণকালের জন্যে তাঁর মনে একটা সন্দেহ জাগে। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন, সেটি উত্থাপন না করে উপায় নেই।

আবার গলা সাফ করে সোজা তাকিয়ে এবার তিনি বলেন,

আপনার কাছে একটি কথা নিয়ে এসেছি। আমার নাতিকে দুধ দেবার কেউ নেই।

এইটুকু বলেই তিনি থামেন। তাঁর কথাটির মর্মার্থ বুঝতে কাদেরের বিলম্ব হয় না। তবু সালাহ্উদ্দিন সাহেব তাঁর বক্তব্য শেষ করেন নি বলে সে নীরবে অপেক্ষা করে।

প্রস্তাবটি খুলে বলতে সালাহ্উদ্দিন সাহেব সময় নেন। কাদেরের স্ত্রীকে তিনি কখনো দেখেন নি। তবে শুনেছেন, সে বড়ই স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। পাঁচ ছেলেমেয়ের মা, তবু কখনো রোগ-ব্যাধিতে ভোগে নি। তাছাড়া বুকের দুধ দিয়েই সে পাঁচটি ছেলেমেয়েকে হাঁটতে শিখিয়েছে, তাদের মুখে কথা ফুটিয়েছে। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যও ভালো। দরজার কাছে বসে-থাকা মেয়েটি অতিশয় নোংরা হলেও রোগাপটকা নয়। তাছাড়া কাদেরের স্ত্রী সম্বন্ধে এ-কথাও শুনেছেন যে, সে নাকি অতিশয় দয়ালু মানুষ : পরের জন্যে তাঁর দয়া-মায়ার শেষ নেই। এ-সব অতি উত্তম কথা। তবু কাদের এবং তার স্ত্রীর বর্তমান শোকের কথা ভেবেই

তিনি কথাটা খোলাখুলিভাবে বলতে দ্বিধা করেন। তবে সে-দ্বিধা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

শুনেছি আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য খোদার ফজলে ভালোই। ভাবছিলাম, আমার মা-হারা শিশু-নাতিকে তাঁর বুকের দুধ দিতে রাজি হবেন কি? হলে বাচ্চাটিকে এখুনি নিয়ে আসি। সালাহ্উদ্দিন সাহেব একবার চোখ বন্ধ করেন কেবল খুলবার জন্যেই। একটু হুকুমের কণ্ঠে বলেন, আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে আসবেন?

কাদের চলে গেলে লাঠির মাথায় হাত জড়ো করে বসেই তিনি মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে থাকেন। তবে প্রথমে আরেকবার ঘরটির চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করেন, নোংরা মেয়েটির দিকেও একবার ক্ষিপ্রভাবে তাকান। তাঁর মুখে আবার অসন্তুষ্টির ভাবটি জাগে। প্রস্তাবটি করে ভালো করেছেন কি? অনিশ্চয়তার একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি। তবে তিনি বোঝেন, প্রস্তাবটি যখন একবার করেই ফেলেছেন, তখন সে-কথা ভাবার কোনো অর্থ নেই।

কাদের প্রত্যাবর্তন করলে তিনি উদ্বিগ্নভাবে তাকান তার দিকে। তার মুখের ভাব দেখে পর মুহূর্তেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। লাঠিটা মেঝেতে দু-একবার ঠুকে তিনি উঠে দাঁড়ান। এ-বয়সেও তাঁর পিঠ বিস্ময়করভাবে ঋজু।

দরজার নিচেই আধা পাকা রাস্তা। সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তিনি কী ভাবেন। তারপর যে-ব্যাখ্যা প্রথমেই দেওয়া উচিত ছিল সে-ব্যাখ্যাটি এখন দেন অযাচিতভাবে।

ডাক্তার অবশ্য বোতলের দুধ দিতে বলে। ওসব আধুনিক পন্থায় আমার বিশ্বাস নেই। দুধের শিশু বুকের দুধ খাবে, প্রকৃতির রীতিই তাই।

তারপর আচম্বিতে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি পর মুহূর্তেই নিজেকে সংযত করেন। গভীর শোকেও তিনি এমন সংযম দেখাতে পারেন, তার কারণ তাঁর দীর্ঘ জীবনের ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। তিনি একথা শিখেছেন যে, মানুষের জীবনে যখন নিদারুণ দুঃখকষ্ট নাবে তখন মানুষকে তার কর্তব্যের কথাই প্রথমে ভাবতে হয়। তখন ভেঙে পড়লে চলে না।

এ-সময়ে জামাইর কথা মনে পড়তে তিনি ভ্রূকুটি করে ওঠেন। শোকে সে দুর্বল তৃণের মতো ভেঙে পড়েছে। তিনি কী করেন? তাঁকেই সব কথা ভাবতে হয়, যা করবার তা করতে হয়।

গাড়িতে চড়বার আগে বলেন,

বাচ্চার সঙ্গে একটি দাই আসবে।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সালাহ্উদ্দিন সাহেব তাঁর শিশু-নাতিকে নিয়ে আসেন। সঙ্গে দাই। দাই শিশুকে ভেতরে নিয়ে গেলে তিনি বৈঠক ঘরে বসে কান খাড়া করে রাখেন। কাদেরের স্ত্রীর মতটি ইতিমধ্যে বদলায় নি-তো? শোকগ্রস্তা মেয়েমানুষের কথা বলা যায় না। তারপর একটু পরে দাই এসে ভেতরের দরজার পাশে নিঃশব্দে এক পাটি কালো দাঁত-দেখিয়ে দাঁড়ালে তিনি বুঝতে পারেন, কাদেরের স্ত্রী শিশুকে প্রত্যাখ্যান করে নি। অবশ্য সন্দেহের কোনো কারণ ছিল না। দুধের শিশুকে কেউ কি ফেলতে পারে? যে-মানুষ সদ্য সন্তান-হারিয়ে শোকাপ্লুত, সে-ও পারে না।

গাড়িতে চড়তে গিয়ে ক্ষণকালের জন্যে দাঁড়িয়ে সালাহ্উদ্দিন সাহেব বলেন—আপনার স্ত্রীর ওষুধ-পথ্যের দরকার হলে ডাক্তার পাঠিয়ে দেব।

তাঁর কণ্ঠে গভীর তৃপ্তির আভাস। এত গভীর শোকের মধ্যেও একটু সার্থকতার, একটু আনন্দের, একটু সুকীর্তিজাত সন্তোষের অবকাশ আছে। সব খোদারই অসীম মেহেরবাণি, তিনি ভাবেন।

গাড়িতে চড়ে তিনি ঋজু হয়ে বসেন, দৃষ্টি সম্মুখ দিকে।

কাদেরের স্ত্রী মাজেদার সত্যিই উত্তম স্বাস্থ্য। মানুষটি ছোটখাটো হলেও তার দেহ কোথাও অসম্পূর্ণ নয়। পাঁচ ছেলের মা বটে, তবু সে-দেহ আঁটসাঁট, সামান্য মেদবহুল হলেও তাতে কোথাও ঢিলে-ঢালা ভাব নেই।

দাই ঘরে এলে মাজেদা প্রথমে নিস্তেজ দৃষ্টিতে দাইয়ের কোলে কাপড়ের বান্ডিলের দিকে তাকায়। সে বান্ডিলের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মুখ। শিশুর চোখ গভীর ঘুমে নিমীলিত। তমিস্রাময় গর্ভের নিদ্রা তার এখনো শেষ হয় নি। তারপর মাজেদার চোখ জ্বলজ্বল করতে শুরু করে। হঠাৎ সে হাত বাড়িয়ে অধীরভাবে বলে,

দাও, আমাকে দাও।

আজ সকাল থেকে মাজেদা বুঝতে পারে, তার স্তন যেন ভারি, স্ফীত হয়ে উঠেছে। তার সন্দেহ থাকে না যে কুচাগ্রের পশ্চাতে রহস্যময়ভাবে বিন্দু-বিন্দু তরল পদার্থ জমছে নতুন এক জীবনের জন্যে। তাই যে-শোকটা তিন দিনে কিছু স্তিমিত হয়ে এসেছিল, সে-শোকটা আবার তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কার জন্যে তার স্তন এমন ভারি হয়ে উঠেছে? তার গর্ভের সন্তানটি-তো আর বেঁচে নেই। প্রকৃতি কি এতই অন্ধ? সে কি কিছুই দেখতে পায় না? শুধু তাই নয়, প্রকৃতি যেন শোকাপ্লুত মায়ের প্রতি বিদ্রূপ করছে। এক সময়ে তার মনে হয়, এ অন্যায়, অতি নিষ্ঠুর। মনে হয় সে তার দুধভারে স্ফীত স্তন যেন সহ্য করতে পারবে না। তারপর সালাহ্উদ্দিন সাহেব প্রস্তাবটি নিয়ে এলে সহসা সে তার ভারি স্ফীত স্তনের মধ্যে একটি গুপ্ত নির্দেশ দেখতে পায়। না, প্রকৃতি খোদার সৃষ্ট বলে তার সহস্র চোখ : মানুষ যা দেখে না বোঝে না তাও সে দেখে, বোঝে।

বুকের কাছে ধরে মাজেদা নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শিশুটির পানে, একটা অদম্য আবেগে তার সমগ্র দেহ কেঁপে ওঠে বারবার। শীঘ্র শিশুটি চিৎকার শুরু করে। প্রথমে মাজেদা চমকে ওঠে। বান্ডিলের শিশুটি-যে কাঁদতে পারে সে-কথা সে যেন ভাবে নাই। তার সন্তান একটু শব্দ না করেই যে-অন্তহীন অন্ধকার থেকে সে এসেছিল, সে-অন্ধকারেই প্রত্যাবর্তন করেছিল। মাজেদা কি ভেবেছিল, সে তার মৃত সন্তানকেই কোলে নিয়েছে? অদূরে মেঝেতে বসে দাই কোমরের কাপড়ের ভাঁজ থেকে পান-দোক্তা খুলে মুখে ভরে। সে বলে,—বাচ্চার ভুক লেগেছে দুধ দাও।

মাজেদার চোখ আবার জ্বলজ্বল করে ওঠে, অস্পষ্ট কোমল হাসির রেখা জাগে। হাঁ, সে দুধ দেবে বৈকি। তার উন্নত স্ফীত স্তনে ঝরনার মতো আওয়াজ করেই যেন দুধ জমেছে। তার স্তনে সঞ্চিত দুধের বেদনা। সে-বেদনা জীবনেরই বেদনা; বুকে যা-জমেছে দৃষ্টির অন্তরালে তা স্নেহ-মমতার সুধা। মনে আছে তার অন্যান্য সন্তানের বেলায় যখনই শিশুর কান্না তার কানে পৌঁছুত, তখন কুচাগ্র দিয়ে দুধ বেরিয়ে আসত, পেটের নিচে কেমন সঙ্কোচন-প্রসারণ শুরু হত। তার এখন মনে হয়, কোলের শিশুটির কান্নার আওয়াজে কুচাগ্র যেন তেমনি সিঞ্চিত হয়ে উঠেছে, তেমনি সঙ্কোচন-প্রসারণও শুরু হয়েছে পেটের তলে। শিশুটি যে তার নয়, তাতে বাধা পড়ে নি।

দাই আবার বলে,—বাচ্চাটা কেঁদে-কেঁদে হয়রান হয়ে গেল। মা-হারা শিশুকে দুধ দেবে না?

এবার ক্ষিপ্রভঙ্গিতে জীর্ণ, কিছু ঘর্মাক্ত কড়া-লাল-রঙের ব্লাউজের বোতাম খুলে মাজেদা একটি স্তন উন্মুক্ত করে। কুচাগ্রটি ক্রন্দনরত শিশুটির কাছে ধরলে অধীরভাবে সে তা মুখে ধরে।

কিছুক্ষণ পর শিশুটি হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার শুরু করে। সে চিৎকার বঞ্চনা-নিষ্ফলতাই ঘোষণা করে। দাই ভ্রূকুটি করে মাজেদার দিকে তাকায়। যে-দৃশ্যটি সে দেখে তাতে তার ভ্রূকুটি আরো গাঢ় হয়। মাজেদা সামনের দিকে তাকিয়ে কেমন নিস্পন্দ হয়ে বসে, কোলের শিশুটির কান্নায় তার কান নেই যেন।

কী হল? দাই প্রশ্ন করে।

মাজেদা সহসা উত্তর দেয় না। তারপর তার শুষ্ক ঠোঁট একটু কেঁপে ওঠে। ক্ষুদ্র-কণ্ঠে সে বলে,

দুধ জমে গেছে।

শিশুটি এক ফোঁটা দুধ পায় নি। মাজেদার মনে হয়, তার স্তন দুটি জমাদুধে হঠাৎ পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠেছে।

পরদিন ফজরের নামাযের পরই সালাহ্উদ্দিন সাহেব খবর নিতে আসেন। কাদের বৈঠকখানায় এলে তিনি অন্যদিনের মতো লাঠির মাথায় হাত জড়ো করে বসে তার দিকে একবার তাকান, কিন্তু সরাসরি কোনো প্রশ্ন করেন না। প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। শিশুটির ক্রন্দন শোনার জন্যে কান খাড়া করেন একবার। ভেতর থেকে কোনো শব্দ না এলে নীরবতার অর্থ শিশুটির ভোজনতৃপ্তি হিসেবেই গ্রহণ করেন। কাদের তার স্ত্রীর দুধ দেবার ব্যাপারে অক্ষমতাটির কথা এখনো ভালো করে বোঝে নি বলে সে-ও কিছু বলে না।

সালাহ্উদ্দিন সাহেব লাঠিটা একবার সশব্দে ঋজু করেন। আজ তিনি আর বসবেন না। উঠি-উঠি ভাব করে কাদেরের দিকে না তাকিয়ে বলেন,

ফজরের নামাযের পর ওজিফা খুলব এমন সময় একটি কথা মনে হল। মুন্সীর হাটে আমার কিছু জমি আছে। ধান-ফসলের জমি। তার একটি অংশ আপনার স্ত্রীর নামে লিখে দিতে চাই। আশা করি তিনি গররাজি হবেন না।

কথাটা বলেই কাদেরকে কোনো উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ান। রাস্তায় গাড়ির ইঞ্জিন জীবন্ত হয়। শীঘ্র জ্বলা-পেট্রোলের ঝাঁঝালো-মিষ্টি গন্ধে বৈঠকখানা ভরে যায়।

গাড়িতে উঠবার আগে অকারণেই লাঠিটা আকাশের দিকে তুলে তিনি বলেন,

কদিন মাছ-গোশত, শাক-সবজিটা আমার বাড়ি থেকে আসবে। দাই ভালো রাঁধতে জানে।

অপরাহ্ণের দিকে ক্রন্দনরত শিশুকে নিয়ে দাই পিছনের সরু বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে, মুখে তার দুশ্চিন্তার ছাপ। আজও বারবার চেষ্টা করেও মাজেদা শিশুকে দুধ দিতে সক্ষম হয় নি। আজ শিশুর চতুর্থ দিন। জন্ম হবার পর থেকে তার পেটে এক ফোঁটা দুধ পড়ে নি। দাই তাকে চামচে করে পানি দিয়েছে কিছু, কিন্তু পানিতে ক্ষিধে যায় না। অবশ্য সে জানে, নবজাত শিশু না-খেয়ে কয়েকদিন দিব্যি সুস্থ দেহেই বেঁচে থাকতে পারে। তবু চার দিনেও শিশুর মুখে একটু দুধ না-পড়লে তা চিন্তারই কথা।

ভেতরে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে মাজেদা নিথর হয়ে থাকে। তার চোখ নিমীলিত; ঠোঁট শুষ্ক। একটু আগে শিশুকে আবার দুধ দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সে ব্লাউজের বোতাম দেয় নাই। উন্মুক্ত স্তন এখন তার কাছে পাথরের মতো ভারি মনে হয়। এ-বিষয়ে তার মনে এখন কোনোই সন্দেহ নাই যে, স্ফীত স্তনে দুধ জমে গেছে বলেই কিছু নিঃসৃত হচ্ছে না। কিন্তু কেন তার স্তনের এই অবস্থা হয়েছে? এ কি সম্ভব যে, যে-দুধ তার সন্তানের জন্যেই এসেছিল, তার সন্তানটি আর নেই বলে সে-দুধ এমনভাবে জমে গেছে?

কথাটি মনে হতেই তারই অজান্তে একটি বিজয়ের ভাব রক্তের মতো তার ধমনিতে স্রোতশীল হয়। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যেই মাত্র। কথাটি-যে অতিশয় নির্মম তা তার বুঝতে দেরি হয় না। তাই শীঘ্র একটি তীব্র অনুশোচনার জ্বালা সে বোধ করে। কী করে সে এমন নির্মম কথা ভাবতে পেরেছে? শিশুটি নিজের গর্ভের না হোক, তবু সে শিশু। তাছাড়া মা-হারা অসহায় শিশু। এমন শিশুকে কেউ কখনো দুধ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। নিষ্ঠুর মানুষও পারে না। তাছাড়া কথাটি-যে সত্য নয় তার প্রমাণ সে নিজেই দেখতে পায়। শিশুটিকে স্তন দেবার জন্যে সে মনে-প্রাণে-দেহে একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করে। সে আকাঙ্ক্ষা কি ভুল হতে পারে?

কিন্তু শক্ত-কঠিন স্তন ভারি হয়ে থাকে। বাইরে শিশুটির কান্নাও শোনা যায়।

কেন তবে তার বুকে এমনভাবে দুধ জমে গেছে?

এবার আরেকটি আরো নির্মম, আরো নিষ্ঠুর সম্ভাবনার কথা তার মনে জাগে। তার মনে

হয়, শিশুটিকে স্তন পান করাবার জন্যে সে যে একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করে, সেটি আসল সত্যটি ঢাকবার জন্যে তার মনেরই একটি কৌশল মাত্র। আসল সত্যটি এই যে, তার নিজের সন্তানের মৃত্যু হয়েছে বলে সে চায় না যে, পরের শিশু বেঁচে থাক। সে-জন্যেই তার বুকভরা দুধ এমন জমে পাথর হয়ে গেছে।

কথাটি কিন্তু তার সমগ্র অন্তর তীক্ষ্ণভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে! ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, বুঝি শ্বাসরোধ হবে। একটি অদম্য কান্নার বেগে তার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে।

কাদের আপিস থেকে ফিরেছে কি অমনি বাইরে সালাহ্উদ্দিন সাহেবের গাড়ির শব্দ শোনা যায়। আজ সে-শব্দ কানে আসতেই একটা গভীর আতঙ্কে মাজেদার ক্লান্ত মন ভরে ওঠে। শিশুর কথা না ভেবে আজ সালাহ্উদ্দিন সাহেবের কথাই সে সর্বপ্রথম ভাবে। সে যে তাঁর শিশু-নাতিকে এক ফোঁটা দুধ দিতে পারে নাই, সে-কথা তিনি এখনো জানেন না। দাই এখনো কথাটা প্রকাশ করে নি কিন্তু সে কতক্ষণ আর কথাটা প্রকাশ না করে পারে? কাদের তার অক্ষমতার কথাটা এখন জানলেও সে-ও তা প্রকাশ করে নি। কিন্তু তার পক্ষেও বেশিক্ষণ নীরব থাকা সম্ভব নয়। কথাটা জানতে পেলে সালাহ্উদ্দিন সাহেব কী ভাববেন? তাছাড়া তিনি যদি শিশুকে ঘরে নিয়ে ফিরে যান তবে সে কি লজ্জায় মরে যাবে না?

ক্ষিপ্রগতিতে উঠে বসে মাজেদা তার স্বামীকে ডাকে। গভীর উৎকণ্ঠায় তার মুখ বীভৎসভাবে রক্তশূন্য দেখায়। কাদের এলে সে রুদ্ধকণ্ঠে বলে,

ওকে এখনো বোলো না, বুঝলে? শিশু আজ রাতেই দুধ পাবে। আমি জানি। বুকের ব্যথাটা বড় বেড়েছে। আর দেরি হবে না।

কাদের স্ত্রীর অনুরোধটি রক্ষা করে। তবে সে সালাহ্উদ্দিন সাহেবেকে বলে,

মাজেদাকে একটু ডাক্তার দেখানো দরকার।

সালাহ্উদ্দিন সাহেব ঈষৎ শঙ্কিত হন।

কেন?

তার শরীরটা তেমন ভালো হচ্ছে না।

সেদিন সন্ধ্যার পর মাজেদাকে পরীক্ষা করে দেখে ডাক্তার একটি অপ্রত্যাশিত খবর দেয়। সে বলে, মাজেদার দুধ এখনো আসে নি। সেটা নাকি বিচিত্র নয়। আকস্মিকভাবে গভীর আঘাত পেলে দুধ আসতে দেরি হয়। মাজেদার খেয়ালটার কোনো ভিত্তি নাই। সে-কথাও সে বলে। দুধ ব্যতীত স্তনের স্ফীতির কারণও ডাক্তার দুর্বোধ্যপ্রায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে।

ডাক্তারের আবিষ্কার মাজেদাকে গভীরভাবে বিচলিত করে। দুধ একেবারে আসে নি সে-কথাটি দুধ-জমে-যাওয়ার চেয়েও অধিকতর ভীতিজনক মনে হয় তার কাছে।

ভীতির কারণ আছে বৈকি। এবার সে বুঝতে পারে, তার মনের নির্মম কথাটি সে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এবার মনের প্রান্তে একটি নির্লজ্জ কণ্ঠধ্বনি স্পষ্টভাবেই সে শুনতে পায়। সে কণ্ঠ বিজয়ীর সুরে বলে, নিজের সন্তান মরে গেছে-তো, বুকে দুধ আর আসবে কেন।

অবশ্য কথাটি পূর্বের মতো এবারো তার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত করে।

অবশেষে মাজেদাকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয়। সে জানে তার সময় নেই। ডাক্তারের কথা শুনে সালাহ্উদ্দিন সাহেব আর দেরি করবেন না। এবার তাঁর শিশু-নাতিকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। মা-হারা অসহায় শিশুকে বুকের দুধের জন্যে তার কাছে নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তিনি নিরাশ হয়েই ফিরে যাবেন।

অবশ্য মাজেদা এবার পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারে যে, সবটাই তার জন্যে একটি পরীক্ষা মাত্র। তার সন্তানের মৃত্যু, সালাহ্উদ্দিন সাহেবের শিশু-নাতি নিয়ে আসা, এমন কি ডাক্তারের মত—সবই পরীক্ষা। এবার তার চোখে তার সন্তানের মৃত্যু অসত্য রূপ ধারণ করে,

সালাহ্উদ্দিন সাহেবের আবির্ভাব গূঢ় উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত হয়, এবং ডাক্তারের মতটি ধোঁকাতে পরিণত হয়। ধোঁকা নয় তো কী? তার যে স্তনভরা দুধ, সে কথা কি সে জানে না? আজ সন্ধ্যায় তার স্তন আরো স্ফীত হয়ে উঠেছে। দুধ যেন আর ধরে রাখা যাবে না। তাছাড়া তার স্তন আর তেমন শক্ত-কঠিন নয়। তাতে দুধ আর জমে নেই। বরঞ্চ তরল দুধে স্তন টলমল করছে।

তবে কুচাগ্রে কী যেন আটকে আছে বলে দুধটা সরছে না। বোতলের গলায় ছিপি আটকে গেলে যেমন কিছু সরে না, এও তেমনি হয়েছে।

মাজেদা হঠাৎ ধীরস্থিরভাবে উঠে বসে। তার মুখে একটি বিচিত্র শান্তির ভাব। সে জানে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তার মাতৃত্বের দাবি স্থাপিত হবে, তার মৃত সন্তানও ফিরে আসবে।

মাজেদা আর দেরি করে না। তার সময় নেই। দৃঢ় হাতে সে ব্লাউজের বোতাম খুলে প্রথম ডান স্তন, তারপর বাম স্তন উন্মুক্ত করে। এবার বালিশের নিচে থেকে একটু হাতড়ে একটি সরু দীর্ঘ মাথার কাঁটা তুলে নেয়। তারপর নিষ্কম্পহাতে সে কাঁটাটি কুচাগ্রের মুখে ধরে হঠাৎ ক্ষিপ্রভাবে বসিয়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ একটি সুতীক্ষ্ণ ব্যথা তীরের মতো ঝলক দিয়ে ওঠে। সহসা চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তবে সে টুঁ-শব্দটি করে না। একটু অপেক্ষা করে পূর্ববৎ দৃঢ় নিষ্কম্পহাতে একবার শুধু স্পর্শের সাহায্যেই নিশানা ঠিক করে সে দ্বিতীয় কুচাগ্রেও কাঁটাটি বিদ্ধ করে। আবার সে-মর্মান্তিক ব্যথাটি জাগে। ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, সে চেতনা হারাবে। কিন্তু অসীম শক্তি বলে সে নিজেকে সুস্থির করে। দেহে কোথাও মর্মান্তিক ব্যথা বোধ করলেও সে বুঝতে পারে, তার স্ফীত সুডৌল স্তন দুটি থেকে তরল পদার্থ ঝরতে শুরু করেছে। স্তনের নালায় যে বাধাটি ছিল সে-বাধা দূর হয়েছে। স্তন থেকে দুধ সরতে আর বাধা নাই।

বাইরে এবার সালাহ্উদ্দিন সাহেবের গাড়ির আওয়াজ শোনা যায়। মাজেদা সে আওয়াজে এবার আতঙ্ক বোধ করে না। তার স্তন থেকে যখন দুধ ঝরতে শুরু করেছে তখন আতঙ্কের আর অবকাশ নেই। তার স্তন থেকে দুধ ঝরে, অশ্রান্তভাবে দুধ ঝরে। তবে সে-দুধের বর্ণ সাদা নয়, লাল।

মতিনউদ্দিনের প্রেম

মতিনউদ্দিন মেদমাংসশূন্য ক্ষীণ কাঠামোর ক্ষুদ্র আকৃতির মানুষ। ক্ষিপ্রবেগে চলার অভ্যাস সত্ত্বেও পথেঘাটে সে সহজে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। বাচালতা দোষ নাই বলে অন্যদের মতো অজস্র কথায় সৃষ্ট একটি স্পর্শনীয় দৃশ্যমান চরিত্রও তার নয়। আপিসে দীর্ঘ বারান্দা-ঘরের সহযোগীদের মতো রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যাপারে তার মতামত থাকলেও কৃচিৎই তা সে প্রকাশ করে। কেবল চাল-ডালের দামের কথা উঠলে সে একটি বিশেষ মন্তব্য না করে যেন পারে না। একই ভঙ্গিতে একই স্বরে সে প্রতিবার বলে, শায়েস্তা খানের আমলে এক মন চাল পাওয়া যেত মাত্র দু-আনায়। উক্তিটা সত্য হলেও তা এখন সময়-কালবহির্গত এবং বাস্তব হতে এত দূরস্থিত শোনায় যে তার সে-ঐতিহাসিক মন্তব্যটি শূন্যে ঝুলে মিলিয়ে যায়। সে-মন্তব্যটিও তার সহযোগীদের মনে তার সম্বন্ধে স্বল্পভাষী নম্রলাজুক মানুষের ছবিটিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আনে না।

তবে বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র সে-মানুষেরই চেহারা-হাবভাবে একটি বিষম পরিবর্তন ঘটে। বাইরের মতিনউদ্দিন এবং ঘরের মতিনউদ্দিনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

ইট-তর্জা-টিনযোগে কোনোমতে দাঁড়-করিয়ে-রাখা তার ক্ষুদ্র বাসস্থানটি তার নতুন চরিত্রের স্পর্শে প্রাসাদে পরিণত হয়, এবং ঘরে তার স্ত্রী ছাড়া দ্বিতীয় কোনো লোক না থাকলেও মনে হয় যেন তার হুকুম তামিল করবার জন্য মোসাহেব-গোমস্তা বাবুর্চিখানসামা পেয়াদা-হুঁকাবরদারের অন্ত নাই। তখন তার ত্রিশ-ইঞ্চি বুক থেকে অহরহ বাঘের মতো আওয়াজ বের হয়। তবে বন-জঙ্গলের শক্তিশালী পশুটির মতো তার সিনাটা গভীর নয় বলে মনে হয়, নিনাদপ্রচেষ্টায় যে-কোনো সময়ে তার রগ ফেটে যাবে। মতিনউদ্দিনের খড়মেও কম আওয়াজ হয় না। বরাবর দেখে-শুনে শক্ত মজবুত খড়ম কেনে সে। বস্তুত, তার ঘরের জাঁদরেল সত্তাটির একধারে তার গলা অন্যধারে খড়ম।

তিন বছর হল তাদের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু তার বউ খালেদা এখনো জানে না কখন তার স্বামী হুঙ্কার দিয়ে উঠবে, কখন হুড়ুম করে লাফিয়ে যাবে উঠান থেকে কাককুত্তা তাড়াতে। সে-জন্যে সত্যিই পান থেকে চুন খসার প্রয়োজন নাই, উঠানে কাককুত্তার উপস্থিতিরও দরকার নাই। দিনের মধ্যে কতবার যে খালেদার বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে, তার ঠিক নাই।

খালেদাও ছোটখাটো মানুষ। গোপনে শরীরে একটু-যে মেদমাংস হয়েছে সে-খবরটা ঢাকতে চেষ্টা করে নিঃশব্দে আলগোছে হেঁটে, দেহটা কাপড়ে জড়িয়ে রেখে। অবশ্য এ-বিষয়ে তার লজ্জারও কোনো অর্থ নাই, সাবধানতাও নিষ্প্রয়োজন। মতিনউদ্দিন কখনো তার বউয়ের দিকে চোখ খুলে তাকায় না। তাকালেও বুঝবে না যে তার স্ত্রী কেমন একটু মোটাসোটা হয়ে উঠেছে। দোষভাবটা খালেদার মনেই। মোটা-হওয়া মানে খেয়েদেয়ে সে আরামেই আছে। সে-কথা প্রকাশ করতে তার লজ্জা হয়। বিশেষ করে স্বামীটি যখন তেমন রোগাপটকাই থাকে।

তারপর একদিন অকস্মাৎ মতিনউদ্দিনের মধ্যে একটি অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ঘটে। এমন আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটে বিনা খবরে, তার অব্যবহিত পূর্বে ক্ষীণতম ইঙ্গিত ছাড়া। পরিবর্তনটি শুরু হয় সকালেই, কিন্তু খালেদা তা লক্ষ্য করে সন্ধ্যাবেলায়। সেদিন আপিস থেকে ফিরে বেড়াঘেরা ক্ষুদ্র উঠানে বসে মতিনউদ্দিন কেমন নীরব হয়ে থাকে। বসার ভঙ্গিটা শিথিল, দৃষ্টি মাটির দিকে। নিত্যকার মতো চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে আসে খালেদা। মতিনউদ্দিন চা পান করে বটে কিন্তু অন্যদিনের মতো থেকে-থেকে তৃপ্তিসূচক উচ্চ আওয়াজ করে না। তারপর খালেদা হুঁকাটা নিয়ে এলে সে ধূমপানও করে, কিন্তু আজ ইঞ্জিনের ধুঁয়ার মতো রাশি-রাশি ধুঁয়া নির্গত হয় না, হুঁকার পানিতে দুর্দান্ত গড়গড় আওয়াজও হয় না। ধূমপান শেষ করেও মতিনউদ্দিন কেমন নিস্তেজভাবে বসে থাকে, বেড়ার ওপর বসে একটা কাক তারস্বরে আর্তনাদ শুরু করলেও সে টুঁ শব্দটা করে না। এদিকে সূর্য ডুবে যায়, আকাশে চাঁদ ওঠে, পাশের বাড়িতে ছেলেটি উচ্চকণ্ঠে ইতিহাস পাঠ খতম করে ঘুমোতে যায়। খালেদা চুলার আগুনের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে, কিন্তু উঠান থেকে কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করে না, খাবার তৈরি হয়েছে কি না।

তিন দিন কাটলেও মতিনউদ্দিনের এ-অত্যাশ্চর্য ব্যবহার শুধু-যে অব্যাখ্যাত থাকে তা নয়, তার সে-ব্যবহারে কোনো তারতম্যও হয় না। সেদিন রাতে খাবার সময়ে হারিকেনটা একটু তেজ করে রাখে খালেদা। স্বামীকে সে ভালো করে দেখতে চায়, যদি বুঝতে পারে তার পরিবর্তনের কারণ। সে দেখে, মতিনউদ্দিনের মুখে ব্যথা-বেদনার কোনো স্পর্শ নাই, থমথমে ভাবও নাই, কিন্তু গভীর ঘুম থেকে জেগে-ওঠার-পর মানুষের মুখে যেমন একটা আবেশ দেখা যায়, তেমনি একটা আবেশে তার সারা মুখ আচ্ছন্ন। হাত-মুখ নড়ে, কিন্তু তার মনটা যেন ঘুমিয়ে। কিংবা দেহ-পরিত্যাগ করে তার মনটি কোথাও নিরিবিলি স্থানে গাছের ডগায় একাকী বসে আছে।

খালেদার চোখ স্বামীর ওপরই থাকে বলে গ্লাসটা হাত থেকে পড়ে যায়। মেঝেটা মাটির বলে সেটি না ভাঙলেও পানি ছড়িয়ে পড়ে। সভয়ে খালেদা স্বামীর দিকে তাকায়। কিন্তু স্বামীর

চোখ বর্তন থেকে ওঠে না। তারপর খাদ্যের গন্ধ পেয়ে একটি লোমছাড়া কুকুর চোরের মতো অনিশ্চিতভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে তাকালে একটু অপেক্ষা করে খালেদাই আজ কুকুরটাকে তাড়িয়ে দেয়।

এবার হঠাৎ খালেদার মনে হয়, মতিনউদ্দিনের ব্যবহার আর সহ্য করা যায় না। স্বামীর হুঙ্কারগর্জন লাফাঝাঁপি সহ্য হয়, কিন্তু তার এই পরিবর্তন সহ্য হয় না। কিন্তু সে কী করবে? স্বামীকে কোনো প্রশ্ন করা যায় না। তিন বছরের পারিবারিক জীবনে তাদের মধ্যে এমন একটি আদত গড়ে উঠেছে যে, কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা সহজ নয়। কাক-কুত্তা ত্যক্ত করলে তা নিয়ে কথা হতে পারে, কিন্তু স্বামী এক মাস কথা না বললেও তাকে জিজ্ঞাসা করা যায় না তার মৌনতার হেতু। অনেকে হাসি-ঠাট্টার মধ্যদিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে, গুরুতর কথারও উত্থাপন করে, মতিনউদ্দিনের ঘরে তা সম্ভব নয়। বিয়ের প্রথম মাসেই তার স্বামী পরিষ্কারভাবে তাকে বলে দিয়েছিল যে, হাসি-ঠাট্টার মানুষ সে নয়। একদিন রাতের বেলায় মতিনউদ্দিন যখন তার দিকে পিঠ দিয়ে শুয়েছিল, তখন মশকরা করে হালকাভাবে সে তার পিঠে একটু খোঁচা দেয়। তৎক্ষণাৎ মতিনউদ্দিন বিপুলবেগে লাফিয়ে উঠে রেগে লাল হয়ে তাকে প্রশ্ন করে, গুঁতা দেও কেন? সেদিন থেকে খালেদার মশকরায় কোনো সাধ নাই। অবশ্য তাতে খালেদার কোনো আফসোস নাই। তার মতে, স্বামীর আইনকানুন আচার-ব্যবস্থা স্ত্রীকে মানতেই হয়।

কাজেই হারিকেন তেজ করে রাখলেও খালেদা শেষ পর্যন্ত স্বামীকে কোনো প্রশ্ন করে না, তার পরিবর্তনের কারণও জানতে পারে না। তাতে অতি প্রত্যূষে উঠে নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে স্বামীটি যখন আঙ্গিনায় বসে চুপচাপ হয়ে থাকে, তখন তার মনে একটা ভয়ের সঞ্চার হয়। তার স্বামীটির হল কী?

জাগ্রতসময়ের প্রতি মুহূর্তে মানুষ কিছু-না-কিছু ভেবেই চলে। তবে প্রত্যেকের চিন্তাধারার স্বরূপটা নিজস্ব। খালেদার মনে চিন্তাধারাটি দুই বন্ধুর আলাপ-আলোচনার রূপ গ্রহণ করে।

খালেদা তার মনের বন্ধুকে বলে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। বন্ধু উত্তর দেয়, বোঝা মুশকিল।

তারপর খালেদা এবং তার মনের বন্ধু দুজনেই কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকে।

নির্বাক হয়ে থাকলেও একটা কথা দুজনের মধ্যেই উঁকিঝুঁকি মারে। কেবল সেটা তুলতে কারো সাহস হয় না। অবশেষে তার বন্ধুই বলে, আমার কী মনে হয় জান?

কী? সে উত্তর দেয়।

মনে হয় কোনো মেয়েলোকের ওপর তোমার স্বামীর দিল পড়েছে।

সে টক করে উত্তর দেয় না। কথাটা সে যেন বোঝে না। দিল পড়ার অর্থ কী? কেনই-বা একটি পুরুষের দিল একটি মেয়ে মানুষের ওপর পড়ে? তাছাড়া, সে-ও কি মেয়েমানুষ নয়?

তার মনের বন্ধু উত্তর দেয়, হয়তো মেয়েলোকটি সুন্দরী।

খালেদা কিন্তু তার মনের বন্ধুর কথা মানতে চায় না। মাথায় একটু ঝামটা দিয়ে বলে, আমি জানি তার কী হয়েছে।

কী হয়েছে?

কোনো ফকির-দরবেশের ডাক পড়েছে। মনের বন্ধু হাসে, ফকির-দরবেশের ডাক পড়েছে না কচু হয়েছে। দেখ না কেমন যত্ন করে সিঁথি কাটে আজকাল, মুখে-চোখে কেমন আবেশ?

খালেদা জবাব দেয় না। সে নিজেই বোঝে, ফকির-দরবেশের ডাক পড়লে খোদা রসুলকেও মনে পড়ে। কিন্তু মতিনউদ্দিনের মধ্যে বিচিত্র পরিবর্তনটা আসার পর সে এক দিনও কলমা পর্যন্ত মুখে নেয় নাই।

হয়তো তোমার কথাই ঠিক। সে মনের বন্ধুকে বলে। একটু থেমে আবার বলে, তবে চিন্তার কারণ নাই। ভেবেছিলাম, তার অসুখ-বিসুখ হয়েছে বুঝি।

মনের বন্ধু মুখ টিপে হাসে।

সুন্দরী মেয়েমানুষের ওপর তোমার স্বামীর মন পড়লে চিন্তার কারণ নাই?

চিন্তার কী কারণ? গোঁয়ার্তুমির ভাব করে খালেদা উত্তর দেয়।

যদি তোমাকে তাড়িয়ে দিয়ে তাকে বিয়ে করে?

আবার কিছুক্ষণ খালেদা নীরবে ভাবে। তারপর আরেকবার মাথায় ঝামটা দিয়ে বলে, আমি চলে যাব।

সে ভাবে, অন্য একটি বউ ঘরে নিয়ে এসে তাকে তাড়িয়ে দিলে সে বাপের বাড়িতে না-হয় ভাইয়ের বাড়িতে চলে যাবে। এখানে ভাত-কাপড়টা পায়, বাপ-ভাইয়ের বাড়িতেও ভাত-কাপড়টা পাবে। দেশের বাড়িতে ক্ষেতখামার আছে, কুমড়ো শাকসবজি আমকাঁঠাল আছে, গাই-ছাগল আছে, এখানে উঠান ছাড়া আছে কী?

কিন্তু তুমি একটি মানুষের বউ। তাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে না?

আবার একটু ভেবে খালেদা জবাব দেয়, কষ্ট কিসের? যেতে হলে যাব।

মতিনউদ্দিনের চিন্তাধারাটা ভিন্ন ধরনের। তার মনের প্রাসাদের থামের আড়ালে দেয়ালের আনাচে-কানাচে অসংখ্য শ্রোতা। তবে তারা নীরবেই তার কথা শোনে। কেবল তারই কণ্ঠের প্রতিধ্বনি জাগে মনের সে-প্রাসাদের কক্ষে-কক্ষে।

তবে তার মধ্যে ঘোর পরিবর্তনটি আসার পর তার চিন্তাধারার রূপটাও বদলেছে। আজ তার মনের প্রাসাদ নির্জন; সেখানে শ্রোতারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সে নিঃসঙ্গ প্রাসাদের অসীম ভার সে একাই বহন করে বেড়ায়—আপিসে দীর্ঘ ঘরে হোক, মিষ্টিমধুর কলতানমুখর নদীতীরে হোক, আপন ঘরেই হোক। তার এই নিঃশব্দ জগতে একটি কাক পর্যন্ত নাই যে-একটু শব্দের লহরি তুলবে।

আসলে একটা নিদারুণ ভয় পাথরের মতো ভারি হয়ে চেপে আছে তার মনে। সে-ভয়েই নিজের মনে কোনো কথা তুলতে সে সাহস পায় না। কী হয়েছে তার?

সে বোঝে, ভয়ের তলে আসলে আছে একটি বিচিত্র স্নিগ্ধভাব—এমন-এক ভাব যার স্পর্শে এক চাঁদ শত চাঁদ হয়ে ফুটে ওঠে, ধানের ক্ষেতে মধুর হাওয়ার ঢেউ জাগে। সত্য কথা বলতে কী, সে প্রেমেই পড়েছে। কেবল কথাটা স্বীকার করার সাহস তার নাই। নাহলে পাথর ঠেলে যে-স্নিগ্ধ মনোরম ভাবটি বারেবারে তার মন ছেয়ে ফেলতে চায়, তাকে সে বাধা দিত না।

সে যে তার পারিবারিক জীবনের বা খালেদার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আপন মনে এই সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তা নয়। বস্তুত, এ-পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও সে-সব কথা তার মনে পড়ে নাই। সে-যে দায়িত্বহীন তাও নয়। পারিবারিক শাসন-সংযমের খাতিরে কঠোর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তায় সে বিশ্বাসী বলে তার মনোভাবের বাহ্যিক কোনো পরিচয় সে দেয় না। কিন্তু খালেদার প্রতি তার স্নেহ-মমতা দায়িত্ববোধের অন্ত নেই।

যে-কারণে পরিবারের কথা ঘুণাক্ষরেও তার মনের আকাশে উদয় হয় না তা এই যে, তার হৃদয়ে যে-প্রেমের ভাবটি জেগেছে তা অতি বিচিত্র। আসলে তার কোনো বাস্তবরূপ নাই; সে-প্রেমের উৎপত্তি স্বপ্নের মধ্যেই। তবু আজ কদিন ধরে তা-তাকে গভীরভাবে আবিষ্ট করে রেখেছে। তার মানসিক সংগ্রামের এবং ভয়ের কারণ তাই। সে-জন্যেই তার মনের প্রাসাদ কিচ্ছা-কাহিনীর অভিশপ্ত কোনো প্রাসাদের মতো নিস্তব্ধ, নির্জন!

স্বপ্নের কথাটি সে ভাবতে চায় না। তবু বারবার তারই অজ্ঞাতে তার মনে তা ভেসে ওঠে এবং প্রতিবারই তাকে কেমন অবশ করে ফেলে।

তার স্বপ্নটি এই। সে পুকুরে গোসল করতে যাচ্ছে, হাতে লাল গামছা! সেদিন কোনো

কারণে তার বড় তাড়াতাড়ি। হয়তো আপিসে যাওয়ার সময় উতরে গেছে। ঘরে বউটিও রান্না করতে দেরি করেছে। গোসল করতে গিয়েও তার আবার দেরি হয়, কারণ সে দেখতে পায় পুকুরের ধারে মস্ত একটা বাজার বসেছে। মানুষের হৈ-হট্টগোল, ক্রেতা-বিক্রেতার হাঁকাহাঁকি, গরু-ছাগলের পায়ের ধুলায় স্থানটি ভরপুর। ভিড়ের মধ্যে অসংখ্য মানুষের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় দুর্ধর্ষগোছের একটি পুলিশ এসে তার হাত ধরে। তারপর মুহূর্তে কোথাও সব গোলমাল হয়ে যায় যেন। সে যেমন জানে তেমনি পুলিশও জানে, সে নির্দোষ। তবু সে দৌড়তে শুরু করে প্রাণপণে। শীঘ্র সে খোলা মাঠে এসে পৌঁছায়, উন্মুক্ত হাওয়ায় তার বুক ভরে ওঠে। পুলিশ তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবু তার ভয়টা সম্পূর্ণভাবে যায় না। ক্ষেতের আইল ধরে পূর্ণোদ্যমে আবার সে ছুটতে শুরু করেছে, এমন সময় সারা আকাশ খণ্ডবিখণ্ড করে একটি নারীর আর্তনাদ জেগে ওঠে। সে নারীর আর্তনাদে কী ছিল কে জানে, কিন্তু পুলিশের ভয় ভুলে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। শীঘ্র সে বুঝতে পারে, নারীকণ্ঠ আর্তনাদ করে তাকেই ডাকছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে এদিক-ওদিক তাকায়, প্রথমে কোথাও কাউকে দেখতে পায় না। তারপর বিস্ময়ে সে দেখে, সামান্য দূরে বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে একটি সুতন্বী নারী। তার পরনে উগ্র লালবর্ণের শাড়ি, মুখে কেমন বেদনাভরা নমনীয়তা। তাদের চোখাচোখি হতেই নারীটি তাকে হৃদয়বিদারক কণ্ঠে অনুরোধ করে, সে যেন তাকে ফেলে না যায়। পরক্ষণেই উত্তরের অপেক্ষা না করে সে বুক ভাসিয়ে কাঁদতে শুরু করে। সে যেন বুঝতে পারে, মতিনউদ্দিন তাকে ফেলে চলে যাবেই। এ-সময় মতিনউদ্দিনের ঘুম ভেঙে যায়, স্বপ্নেরও অবসান ঘটে।

স্বপ্নটি স্বপ্ন বলেই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে মতিনউদ্দিন। ক্রন্দনরতা যে-মেয়েকে সে জীবনে কখনো দেখে নাই, নিদ্রায় তার আবির্ভাব স্বপ্নের খামখেয়ালি এবং অর্থহীনতা ব্যতীত আর কী? বুদ্ধিমত্তার যুক্তি কিন্তু জয়ী হয় না। সব বুঝলেও সে অজানা মায়াময়ীর ডাক, তার অনুরোধ, তার কান্না ক্রমশ মতিনউদ্দিনের মনে একটা বিচিত্র মোহজাল বিস্তার করে। যে-কণ্ঠ সে শুনতে চায় না সে-কণ্ঠ বারবার তার মধ্যে অবিশ্বাস্য ঝংকারের সৃষ্টি করে, যার রেশ অবশেষে তার সমগ্র দেহে ছড়িয়ে তাকে গভীরভাবে অভিভূত করে। সে জানে স্বপ্নটির কোনো অর্থ নাই। তবু তার হাত থেকে নিস্তার পায় না। বরঞ্চ তার মনে হয়, সে-স্বপ্ন তার মধ্যে একটি নতুন সৌন্দর্যদীপ্ত আকাশ উন্মুক্ত করেছে, একটি সুপ্ত চেতনাকে জাদুমন্ত্রে জাগিয়ে তুলেছে, একটি বিস্ময়কর ভাবাবেগের দ্বার খুলে দিয়েছে। ক্রমশ তার মনে হয়, নারীটি যেন অবাস্তব নয়, একটু চাইলেই সে সশরীরে উপস্থিত হবে। এ-কথায় সে ভয়ই পায়।

তারপর আজ সন্ধ্যায় একাকী নদীতীরে বসে আরেকটি কথা উপলব্ধি করলে তার ভীতিটা আরো ঘনীভূত হয়। সে বুঝতে পারে স্বপ্নের সে নারীটি শুধু যে তার মনের সুখশান্তি ধ্বংস করেছে তা নয়, সংসার থেকেও তার মনকে যেন উঠিয়ে নিচ্ছে। খালেদা তার স্বপ্নের নারীর তুলনায় সোনার পাশে পেতলের মতো সস্তা, অলোভনীয় হয়ে পড়েছে। ভয়ে ক্ষণকালের জন্যে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। সে বোঝে, অবাস্তব যখন বাস্তবকে ধ্বংস করে তখন প্রত্যুত্তরে কিছু করবার থাকে না। বাস্তবের পক্ষে অবাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনো অস্ত্র নাই।

স্বপ্নের মায়াময়ী নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করার অস্ত্র মতিনউদ্দিনের নাই।

ক্ষুদ্র উঠানের কোণে খালেদাও একাকী বসে। অনেকক্ষণ ধরে একটি বাসনই সে বারেবারে মাজে-ঘষে। মনের বন্ধুর সঙ্গে কথালাপনে মগ্ন থাকে বলে তা সে লক্ষ্য করে করে না।

মনের বন্ধু বলে, মেয়েলোকটি কেমন সুন্দরী তা তোমার জানতে ইচ্ছা করে না?

খালেদা একটু ভাবে। সুন্দরী হওয়াটা কী? আসলে সে-কথাই তার সর্বপ্রথম জানতে ইচ্ছা করে। জীবনে সে বেশি মেয়েমানুষ দেখে নি। দেশের বাড়িতে কুলসুম আমেনাকে দেখেছে। এখানে পাশের ঝুনু বিবির সঙ্গে তার দেখা হয়। কিন্তু কখনো ভাবে নি কে কার চেয়ে বেশি

সুন্দরী, কে-বা রূপবতী। কে কার বউ, বা মেয়ে, কার কী নাম, সে-সব কথাই মনে এসেছে। অবশ্য ছোটবেলায় পরীর কথা শুনেছে। কিন্তু তারা হাওয়াই বস্তু। মানুষের আটঘাটের বাইরে তাদের বিচরণ।

কে জানে। হয়তো পরীর ওপর তার নজর পড়েছে। বলে সে হাসে। হাসিটা অবশ্য লোকদেখানো। তার বন্ধুর খাতিরেই সে হাসে। গম্ভীর হয়ে বলে, সুন্দরী হোক অসুন্দরী হোক, আমার তাতে মাথাব্যথা নাই। তবে আজকাল তার খাওয়াটা কমে গেছে। বাসনে হাত নাড়াচাড়া করেই উঠে যায়। কী করি?

কী আর করবে?

মনে হয় চোয়ালের নিচে গাল বসে গেছে। হয়তো অসুখই হয়েছে।

জ্বর নাই, কাশি নাই, লোটা নিয়েও দৌড়াদৌড়ি নাই—অসুখ আবার কিসের?

তবে করি কী?

কী আর করতে পার তুমি?

একটু থেমে খালেদা আবার বলে, থেকে-থেকে বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। মানুষটার হল কী? হাঁকাহাঁকি নাই, গলাবাজি নাই। হল কী তার? কবরের মতো নিঝুম ভাবটি আর সত্যিই সহ্য হয় না। একদিন আমিই এবার পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠব বলে দিলাম।

কথাটি অবশ্য তার মনের বন্ধুরও বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু তা যে শূন্য ভয়প্রদর্শন নয়, খালেদা তার প্রমাণ দেয় সেদিন সন্ধ্যাবেলায়। আপিস থেকে ফিরে কাপড় বদলে উঠানে নিত্যকার মতো মতিনউদ্দিন চায়ের জন্যে অপেক্ষা করে। সে লক্ষ্য করে না যে চুলার তলে ঠাণ্ডা ধূসর ছাইয়ের স্তূপ, খালেদাও দরজার চৌকাঠ ধরে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে। চা না এলে সে একবার অস্পষ্টভাবে এদিক-ওদিক তাকায়, কিন্তু কিছু বলে না। খালেদা নড়ে না। সে একটি উল্লাসমিশ্রিত ভীতি বোধ করে। মনে হয় তার স্বামী হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠে চা দাবি করবে।

কিন্তু মতিনউদ্দিন কিছুই বলে না। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে ঘুমঘোরের মতো উঠে ভেতরে যায়, শার্ট-জুতা পরে তারপর আবার উঠানে নাবে। খালেদাকে সে দেখেই না যেন।

মতিনউদ্দিন যখন উঠানের মধ্যখানে পৌঁছয় তখন খালেদার দেহে কেমন অদম্য কাঁপন ধরেছে। সে নিজেই বুঝতে পারে না, তার কারণ রাগ না ভয়।

মতিনউদ্দিন ততক্ষণে উঠানটা অতিক্রম করেছে বটে কিন্তু অদৃশ্য হয়ে যায় নাই। খালেদা দরজার চৌকাঠ শক্ত করে ধরে। তারপর তার দেহের সে-অদম্য কম্পন হঠাৎ একটি চিৎকারে কেন্দ্রীভূত হয়ে উচ্চ, তীক্ষ্ণ আওয়াজে ফেটে পড়ে। সে বলে, মানুষটি যাচ্ছে কোথায়?

নিজের কানেই চিৎকারটি বিচিত্র শোনায়।

বেড়ার পাশে মতিনউদ্দিন থমকে দাঁড়ায়; তার সারা মুখে গভীর বিস্ময়ের ছায়া। সে অবুঝের মতো এধার-ওধার তাকায়। তারপর তার দৃষ্টি ফিরে যায় খালেদার প্রতি। তার বিস্ময়টা আরো বেশি। নির্বোধের মতো তার নিচের ঠোঁটটি ঝুলে থাকে। সে যা দেখে তা তার যেন বিশ্বাস হয় না।

সে-রাতে মতিনউদ্দিনের নিথর ভাবটি মাত্রাতিরিক্তই মনে হয়। রাতটাও কেমন গুমট ধরে আছে। কোথাও হাওয়া নাই। পাশে বাভিলের মতো নিস্তেজ হয়ে শুয়ে খালেদা কান খাড়া করে রাখে। তার স্বামীর চোখে যে ঘুম নাই সে কথা সে জানে।

আজ মতিনউদ্দিনের নিদ্রাহীনতার কারণটি কিন্তু একদিনের মোহ নয়। বস্তুত, আজ সন্ধ্যায় বেড়ার নিকট হতে ফিরে আসার পর হঠাৎ সে বুঝতে পারে, স্বপ্নের সুতন্বী নারীটি তার হৃদয়বিদারক আবেদন ক্রন্দনসহ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন সজ্ঞানভাবে সে-নারীর কথা স্মরণ করলেও হৃদয়ে ভাবাবেগের ঢেউ ওঠে না, দেহে মধুর ঝংকার জাগে না। প্রথমে সে

একটু ক্ষোভ বোধ করে, তারপর মনে স্বস্তিই পায়। এখন যে-কথা তার ঘুমের ব্যাঘাত করে তা হচ্ছে এই। স্বপ্নের মায়াময়ী নারীর হাত থেকে সে নিস্তার পেয়েছে বটে কিন্তু সে যেন এখনো ধরণীতে প্রত্যাবর্তন করে নাই : সুতন্বী নারীটি তাকে নিরবলম্ব অবস্থায় ঝুলিয়ে রেখেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। যে-পাখায় ভর করে একদিন সে উড়ে বেড়িয়েছিল সে-পাখা আর নাই বটে কিন্তু সে তার পায়ের তলে শক্ত জমি এখনো ফিরে পায় নাই। তাছাড়া তার কণ্ঠেও এখনো ভাষা ফিরে আসে নাই। শুধু তাই নয়, হঠাৎ খালেদা সম্বন্ধে এমন একটি তীক্ষ্ণ সচেতনা সে বোধ করে যে একটু নড়বারও সাহস সে পায় না যেন। তবে তার সন্দেহ নাই, একবার সে ধরণীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারলে তার নিরবলম্বভাব, তার বাকশূন্যতা এবং খালেদার বিষয়ে তীক্ষ্ণ বেদনাদায়ক সচেতনাটি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু কী করে সে মৃত্তিকাময় স্থূল পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে, কী করেই-বা তার সাধারণ স্বাভাবিক জীবন পুনঃগ্রহণ করে?

সাহায্য আসে অপ্রত্যাশিত অঞ্চল থেকে।

বেহেশত-প্রেরিত একটি ফেরেশতা অতি দক্ষতার সঙ্গে তাদের মশারির মধ্যে অদৃশ্য একটি ছিদ্র আবিষ্কার করে। সে-ছিদ্র দিয়ে সে মশারিতে প্রবেশ করে কয়েক মুহূর্ত বিজয় উল্লাসে নৃত্য করে। অবশ্য তার আবির্ভাব অলক্ষিতই থাকে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার প্রশংসনীয় দক্ষতা সত্ত্বেও মনস্কামনা চরিতার্থ করার ব্যাপারে অশেষ ধৈর্য-অধ্যবসায় থাকা সত্ত্বেও ফেরেশতাটি একটি অতি ক্ষুদ্রকায় জীব, দিনের বেলায় তার ছায়া পড়ে না কোথাও, রাতের অন্ধকারে সে অদৃশ্যই থাকে।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর আনন্দোচ্ছ্বাসটি কাটলে বেহেশতপ্রেরিত ফেরেশতাটি এবার আপনকার্যে মনোনিবেশ করে। কাপড়ের বান্ডিলটি উপেক্ষা করে সরাসরি মতিনউদ্দিনের ঘর্মাক্ত ডান গালে সে অবতীর্ণ হয়। তার স্বীয় পাখা দুটিতে আলগোছে বার-কয়েক ঝাপটা দিয়ে সে হঠাৎ নিশ্চল হয়ে পড়ে।

একটু পরে অকস্মাৎ চাপড়ের মতো উচ্চ আওয়াজ শোনা যায়। সঙ্গে-সঙ্গে রাতের গভীর নীরবতা মতিনউদ্দিনের নিকট আর্তনাদে ভঙ্গুর কাচের মতোই খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নিজের গালে চাপড় দিয়ে এবং আর্তনাদ করেই মতিনউদ্দিন ক্ষান্ত হয় না। দুর্ধর্ষ গলায় হুঙ্কার দিয়ে বলে, মশারিতে হাজারো মশা। কী করে মানুষ চোখ বোজে?

তারপর মশারিতে যে মশার অন্ত নাই সে-কথাই প্রমাণ করার জন্যে সে ঠাস্‌ঠাস্‌ করে নিজের দেহের নানা স্থানে চড়-চাপড় মারে। মশা মারতে সে কামান দাগে।

অন্যদিন হলে খালেদা উঠে মশারিটা ঝেড়ে আবার সযত্নে গুঁজে দিত। আজ সে নড়ে না।

মতিনউদ্দিন অবশেষে শান্ত হয়। শত্রুবিজয়ী সেনাপতির মতো আত্মসচেতনভাবে কিছুক্ষণ নড়েচড়ে সে যখন ঘুমের আয়োজন করে, তখন তার পিঠটা খালেদার পিঠের সঙ্গে একটু লেগে থাকে। গ্রীষ্মের দিনে সে সংস্পর্শ মধুর না হলেও মতিনউদ্দিন সরে না।

খালেদার চোখে যখন নীরব অশ্রুর আবির্ভাব হয় তখন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে এমন রব তুলে মতিনউদ্দিন নাক ডাকাতে শুরু করেছে।

অগ্রন্থিত গল্পাবলি

সীমাহীন এক নিমেষে

বৃহৎ জানলাটা খোলা।

ঝোড়ো হাওয়া ঝাপটা মারছে আমার সারা দেহে। খোলা জানলা দিয়ে ঢুকছে সে-হাওয়া—উদ্দাম মুক্তির নিশ্বাস নিয়ে। বন্ধনহীন হাওয়া ছুটছে জোরে কঠিন তীব্র হয়ে—জুঁই ফুলের শুভ্র কোমলতা গুঁড়িয়ে দিয়ে—তুলোর মতো উড়িয়ে নিয়ে।

লতিয়ে আছি বিছানায়, তার কোমলতার সাথে দেহের উষ্ণ কোমলতা মিশিয়ে। নিজকে মিশিয়ে দিয়েছি ভোরের উন্মত্ত আকুল আহ্বানের মাঝে, যেখানে তার লজ্জানম্র অরুণ পরশ বিলীন হয়ে গিয়েছে।

দূরে দীর্ঘ ঝাউগাছগুলোতে অবিশ্রাম মর্মরধ্বনি—বহু নিপীড়িতের করুণ মর্মভেদী আর্তনাদের মতো। বৃহৎ গাছগুলো অধীরভাবে দুলছে, আর সেই সঙ্গে দুলছে আমার হৃদয়। চোখ বুজে আছি পরম তৃপ্তিতে।

বৃষ্টির ছাটে আমার সারামুখ ভিজে যাচ্ছে, জ্বলজ্বল করছে আমার মুখ সিক্ত ফুলের মতো। চোখের পাপড়ি ভারি হয়ে উঠেছে, যেন আনন্দের আতিশয্যের মতো।

ঝোড়ো হাওয়ারই মতো এসেছে সেই লাল-প্যান্ট-পরা ছেলেটা—ছোট্ট পাখিটির মতো নরম কোমল।

তার ভেজা ঠোঁট দুটো ফাঁক হল একটু—

'বাবু, পত্রিকা'—

জানলা দিয়ে কাগজসুদ্ধ সে হাতটা গলিয়ে দিলে, জলের অল্প ছাট-লাগা ভাঁজ-করা কাগজ। ছোট্ট ছাতায় ঢাকা তার মুখ জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। কপালের ওপর চুলগুলো তার চঞ্চল হয়ে উড়ছে।

কচি মুখটি তার ক্লান্ত,—হাওয়ায় ছাতাটা সে স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারছে না। বগলে তার একরাশ কাগজ,—বাসায়-বাসায় বিলি করবে।

ছোট্ট নরম পাখিটির মতোই ঠিক। বয়স হবে তের-চৌদ্দ। দেখতে কিন্তু অনেক ছোট। লাল প্যান্টটার ওপর হলদে শার্টটা তার গায়ের সঙ্গে খাপ খায় বেশ,—যেন দু'রঙা প্রজাপতি।

তার কোমল মুখে শ্রান্তির আর ব্যস্ততার ভাব দেখতে বেশ লাগে। ঠিক যেন তিন-চার বছরের ছোট মেয়ের তার পুতুলের বিয়েতে চিন্তাযুক্ত ব্যস্ততার মতো।

বাড়ানো হাতটা নাড়লে সে—

'নিন বাবু—'

ওর বাড়ানো হাত, আমার গুটানো হাত। ডাকলুম, 'ভেতরে আয়।'

দরজা ঠেলে সে ভেতরে এল।

আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে—ছোট্ট ভেজা ছাতাটা ঘরের কোণে রেখে। ছাতাটা বেয়ে জল ঝরছে। দরজার প্রান্ত থেকে ছেলেটার দাঁড়ানোর স্থান পর্যন্ত কয়েকটা ভেজা পায়ের ছোট্ট দাগ।

পূর্ণ নিস্তব্ধতার মাঝে ছেলেটি কেমন যেন নিশ্চল নির্বাক হয়ে পড়েছে। পড়বেই-তো,—ছেলেমানুষ! বাইরের উন্মত্ত কলরব থেকে এসে ঘরের সুগভীর স্তব্ধতার মাঝে স্তম্ভিত হয়ে পড়বে বৈকি। এখানে ঝড়ের ঝাপটা আর বৃষ্টির ছাট লাগছে না তার দেহে।

ও তাকিয়ে আছে আমার পানে,—স্বচ্ছ চোখ দুটোতে কৌতূহলের ছায়া।

ভালো করে বালিশটা জড়িয়ে নিয়ে বললুম—

'নাম কী তোর?'

একবার ঢোক গিলে কম্পিত মৃদুস্বরে বললে—

'শিশু।'

দূর থেকে ভেসে-আসা অপূর্ব বাঁশির সুরের মতো লাগল নামটা। চমৎকার! এ-যেন তার দেহের ভাষা!

তারপর পরিচয়, জানাজানি, যেন বসন্তের কানাকানি হয়ে গেল আকাশে-বাতাসে। শিশুর ঠোঁট-কাঁপা বন্ধ হল, স্থির হল তার কণ্ঠ। নিবিড় পরিচয়ের ইঙ্গিত জানিয়ে তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফুটল মধুর অনাবিল হাসি—ঝরনার কলধ্বনির মতো।

দেহ ক্ষুদ্র, নাম ক্ষুদ্র, আর ক্ষুদ্র তার পরিচয়।

দূরে কোথায় কোন্ অজ্ঞাত পল্লিতে তার বিধবা মায়ের ছোট্ট নীড়টি,—উন্মুক্ত সুনীল আকাশের তলায়, স্নিগ্ধ নিবিড় সবুজ বনানীর ছায়ায়।

নীড়ের লক্ষ্য সে। তাই সে লাল প্যান্ট আর হলদে শার্ট পরে কাগজ বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মায়ের অপরিসীম স্নেহ বুঝি তার সারা দেহে জড়িয়ে আছে। তাই ঝড়ের ঝাপটা তার গায়ে লাগে না, বৃষ্টির তীব্র ছাট তার দেহে বেঁধে না। তার সারা দেহময় মায়ের প্রশান্ত বক্ষের উষ্ণতা, মাথার চুলে মায়ের কোমল আঙ্গুলের পরশ। তার সারা পথের কাঁকর আড়াল করে যেন বিছানো আছে মায়ের আঁচল, সারা বাতাসে যেন মায়ের মঙ্গলময় আহ্বান। চোখের সম্মুখে তার অহর্নিশি ভাসছে দুটি চোখ—মায়ের স্নিগ্ধ গভীর উজ্জ্বল চোখ, ধ্রুবতারার মতো। পথ চলতে তার ভুল হয় না, পথের আঘাত তার পায়ে লাগে না। তার দিনগুলো যেন রঙিন ফানুস, ইচ্ছেমতো সেগুলো ওড়ানো যায়।

নির্লিপ্ত—নিরুদ্বেগ—সুখী সে, মায়ের বক্ষের নীড়ে পরম নিশ্চিন্ত!—এত নিশ্চিন্ত যে, মেঘাচ্ছন্ন ভয়াবহ আকাশ তার কাছে বজ্রহীন।

শহরে সে কাগজ বিলি করে। দিনান্তে সে মায়ের কাছে ফিরে যায় কত খেয়া পার হয়ে, গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে, মেঠো রাস্তা বেয়ে, সাঁঝের আবছা আঁধারের মাঝখান দিয়ে, পথ চিনে-চিনে।

দুয়ারে প্রদীপ জ্বেলে মা হয়তো উৎকণ্ঠিতভাবে প্রতীক্ষা করেন সাঁঝের শ্রান্তিভরা নিস্তব্ধতায়। যে-পথটা দূরে বটগাছটাকে ঘিরে ওপাশে বিলীন হয়ে গেছে, সেদিকে মা বুঝি অনিমেষে তাকিয়ে থাকেন। প্রদীপের কম্পমান আলো পড়ে তাঁর মুখে,—চোখে তাঁর সুনিবিড় প্রশান্তি।

উন্মুক্ত আকাশে তারার মেলা, গাছগুলোতে স্বপ্নিল ছায়া। দূরে-দূরে পাখির মুখে ভাষা, আর বাতাসে 'কে যেন এল'র গান।

মাথার কাছে খোলা জানলা—মায়ের বুকে ঘুমায় সে অঘোর ঘুমে। তারাগুলো সস্নেহে তাকিয়ে থাকে, চাঁদ বিছিয়ে দেয় তার রুপালি আলো।... সমগ্র রাত্রিব্যাপী স্নিগ্ধ নিটোল ঘুম।

তারপর ভোরের আলো তাকে জাগিয়ে দেয়—কাঁচা সোনার মতো ভোরের আলোর রং। আচমকা জাগে সে, সোনার কাঠির পরশে জেগে ওঠার মতো।

হঠাৎ শিশুর চোখদুটো ছলছল করে উঠল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকলে, 'বাবু'!

কেমন যেন চমকে উঠলুম। অজানা আশঙ্কায় মনটা দুলে উঠল। পুকুরের স্থির জলে কে যেন একখণ্ড পাথর ছুড়ে হঠাৎ আলোড়িত করে তুলল।

প্রশ্ন করলুম, 'কী রে?'

কিছু বললে না, কিন্তু কান্নার আবেগে ওর নাকের ডগাটা কাঁপছে। অবশেষে কান্না থামিয়ে বললে—

'আজ দুদিন মার আমার বড্ড অসুখ, টাকার অভাবে ওষুধপথ্যি দিতে পারছিনে। দুটি টাকা ধার দিতে পার আমায়?'

মনটা আমার হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। পাঁচটি টাকা হাতে দিয়ে বললুম,—

'নে, ও ধার-টার কিছু নয়,—আরো যদি লাগে তো বলিস আমায়।'

তার জলভরা চোখের ভেতর মধুর হাসি ঝিকমিকিয়ে উঠল,—অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর ঝলমলানো রোদ ওঠার মতো।

চলে গেল শিশু।

ঝড় তখন থেমে গেছে!...

তারপর দুদিন ভোরের আকাশ ছিল গাঢ় নীল, আর আলোর মাঝে ছিল চমক-লাগানো ঝলকানি। গাছের সজীব সবুজ পাতায় ছিল নবীনতা, আর মখমলের মতো তৃণভূমিতে ছিল দখিনা বাতাসের শিহরন।

সারা বিশ্বময় আলোর সমারোহ, সারা প্রকৃতিব্যাপী বিরাট প্রতীক্ষা,—কোথায় কে যেন আসবে।

এল না সে দুদিন ধরে, যে-দুদিন গেল আলোর ঝলমলানির ভেতর দিয়ে।

তারপর তৃতীয় দিন আবার সারা আকাশ ঘনিয়ে এল, বাতাস ছুটল জোরে, ধাক্কা মারলে আমার ঘরের রুদ্ধ দ্বারে। অস্ফুট আর্তনাদ করে দ্বার খুলে গেল।

বাইরে দাঁড়িয়ে শিশু,—সে যেন ঝড়ের বাণী।

ঘর আমার জলে ভেসে যাচ্ছে, আর উদ্দাম বাতাস যেন আশ্রয় খুঁজছে ঘরের কোনায়-কোনায়।

প্রাণের আনন্দ শিশুর মুখে ঝিকমিকিয়ে উঠছে। হেসে বললে,—

'মার অসুখ সেরেছে।'

বুকটা আমার ভরে উঠল।

মার অসুখে তার বড্ড ভয় হয়েছিল,—সারা রাতদিন এক মুহূর্তের জন্যেও সে মায়ের পাশ থেকে নড়ে নি। মা যেন লতিয়ে গেছেন বিছানায়। সারা দেহ যেন মূর্ছিত, স্তব্ধ কালো চোখ দুটি ক্লান্তিতে ভরা, আর শুভ্র দেহটি ছিল তৃপ্ত।

মায়ের অপরূপ মূর্তি। শুভ্র কাপড় পরা শুভ্র দেহটির মনোরম কান্তি। সারা মুখের স্নিগ্ধ দীপ্তির মাঝে বৃহৎ কালো চোখ দুটি গভীর, শান্ত ও উজ্জ্বল। আর অম্লান দেহটি যেন শেষরাতের জ্বলজ্বল শুকতারা!

শিশুর অনুযোগ, মা শুধু সাদা শাড়ি পরে। ওর আজন্মের সাধ, মাকে একবার রঙিন শাড়ি পরাবে, মেঘমুক্ত উজ্জ্বল নীল আকাশের মতো হবে শাড়ির রং।

শিশুর চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঠোঁটের কোনায় হাসির আভা ঝিকমিক করে উঠল। বললে,—

'আচ্ছা বাবু, মাকে তুমি কল্পনা করতে পার?'

সারামুখ তার আনন্দে টলমল করছে।

কিন্তু হঠাৎ পুকুরের স্বচ্ছ জলে পড়ল উড়ে-যাওয়া মেঘের কালো ছায়া। চোখদুটি তার ছলছল করে উঠল। বুঝলুম।

একটা হালকা নীল শাড়ি কিনে দিলুম। সে নাচতে-নাচতে চলে গেল—যেন একটা আনন্দের হাওয়া-ভরা কান্না উড়ে গেল।

...গভীর রাতে স্বপ্নে দেখলুম আবোল-তাবোল, দেখলুম, শুধু হালকা নীল শাড়ি, আর একটি সুপ্ত ছেলের কচি মুখ।...

সন্ধ্যা হয়-হয়।

বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ছি একখানি বই সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে। পড়ব আমি, যতক্ষণ পর্যন্ত অক্ষরগুলো আবছা না হয়ে উঠবে।

সামনে ক্ষুদ্র বাগানে অজস্র ফুল, তার রং লেগেছে আমার মনে। স্তব্ধ সন্ধ্যাটি আজ বড় শান্ত—বড় স্নিগ্ধ।

রুদ্ধ নিশ্বাসে আমি পড়ছি...যেখানে সত্যের আবরণে ঢাকা মিথ্যে অকস্মাৎ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

আমার এক বন্ধু এল। আমায় শেষ পর্যন্ত পড়তে দিলে না। অক্ষরগুলো এখনো পড়া যাচ্ছে।

বন্ধুটি হঠাৎ আমায় চমকে দিলে। সামনের দিকে ঝুঁকে বললে, 'শিশু মায়ের কথা বলে তোর কাছ থেকে টাকা নেয় নাকি রে?'

চমকে উঠলুম।

'হ্যাঁ—কিন্তু কেন?'

বন্ধুটি একগাল হাসল।

'সব বাজে কথা। ওর মা-বাপ কেউ নেই, শুধু ফাঁকি দিয়ে টাকা মারে।'

মাথাটা আমার ঝিমঝিম করছে।

বইয়ের এই কটা লাইন যেন বড় হয়ে আমার সম্মুখে নেচে বেড়াচ্ছে,—যেখানে রয়েছে সত্যের আবরণ থেকে নিষ্ঠুরভাবে মিথ্যের প্রকাশ হয়ে পড়ার কথা।

ক্ষুদ্র বাগানটা যেন জ্বলে উঠেছে...তারি তপ্ত আঁচ লাগছে আমার মনে।...

পরদিন শিশু এল। কাগজটা রেখে মধুর হেসে বললে,—

'কাল মা বলল, তুমিও তার ছেলে। বাঃ! বেশ মজা হল—'

আমার ভেতরে যে-আগ্নেয়গিরিটা ফেটে পড়বার উপক্রম করছিল, সেটা যেন জাদুমন্ত্রে শীতল হয়ে গেল এক মুহূর্তে!—

তাকে কাছে টেনে এনে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, আমি হলুম তাঁর বুড়ো ছেলে—কেমন?'

অমন সরল স্বচ্ছ চোখ—ও কি মিছে বলতে পারে!

কিন্তু একদিন—

যেদিন কাগজে ভয়াবহ যুদ্ধের খবর—জার্মেনির অমানুষিক অত্যাচারের খবর,—সমগ্র জগদ্ব্যাপী আতঙ্কের সাড়া—

সেদিন—

কঠোরভাব প্রশ্ন করলুম,—

'সত্যি করে বল শিশু—তোর মা আছে?'

শিশুর মুখ মুহূর্তে পাণ্ডুর হয়ে গেল, ফ্যাকাসে...সামনের দেয়ালের মতো সাদা। চোখদুটি তার ভীতিচঞ্চল, আর ঠোঁট-দুটি অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে।

হঠাৎ সে অদ্ভুত স্বরে বললে,—

'আছে—'

তারপর পালিয়ে গেল দমকা হাওয়ার মতো—সবকিছু যেন অকস্মাৎ ওলটপালট করে দিয়ে।

বৃষ্টির একটানা ঝমঝমানি সুর আমায় অলসভাবে শুইয়ে রেখেছে। স্বপ্নাবিষ্ট চোখদুটি আমার ঘুরে বেড়াচ্ছে হারানো দিনগুলোর কোনায়-কোনায়—যেখানে ব্যথার রাশ জমা

রয়েছে। মনে পড়ছে—এমনি বাদলা দিনে কে কবে বলেছিল একটি দুঃখের কথা, কে ফেলেছিল এক ফোঁটা চোখের জল।

কাগজ হাতে এসে ঠেকল—

'বাবু।'

করুণ কণ্ঠস্বর—যেন তেপান্তর হতে ভেসে-আসা। চমকে উঠলুম। একদিনে কি শুকিয়েছে ছেলেটা!

আরো একটা কী যেন হাতে এসে ঠেকল,—কাগজে মোড়া নীল শাড়িটা, আর একটা পাঁচ টাকার নোট। দিয়ে সে কুণ্ঠিতভাবে চলে যাচ্ছিল।

ডাকলুম,—

'শিশু!'

হাত দিয়ে স্পর্শ করলে প্রজাপতি যেমন কেঁপে ওঠে, তেমনি সে কেঁপে উঠল। তারপর কান্না আসবার আগে যেমন করে রুদ্ধ নিশ্বাসে লোকে কথা বলে, তেমনিভাবে কটা কথা সে এক নিশ্বাসে বলে ফেললে—

'মিথ্যে কথা বলেছিলুম আমি, মা নেই আমার। কিন্তু মাকে অমনি করে ভাবতে আমার খুব ভালো লাগে বাবু...মিথ্যে কথা বলছিনে, বিশ্বেস কোরো।'

অনেক কিছু যেন তার বলবার ছিল, বলতে পারলে না। তবু মনে হল, তার ঐ না-বলার ভেতরই সব কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়ে গেছে।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লুম।...

স্তব্ধ হয়ে পড়েছি,—বৃষ্টির একটানা সুর বুঝি আমায় চেতনাহীন করে ফেলেছে।

হারানো অতীতের একটি দিনের মতো সে আমার অজ্ঞাতে চলে গেল—জল-ঝরার শব্দের মাঝে নিঃশব্দে।—

ভাবছি শুধু, কী অদ্ভুত, কী আশ্চর্য!

আরো ভাবছি, হারানো দিনগুলো আজকের মতো অত মধুর-দুঃখময় নয়। মধুর-দুঃখময়,—কারণ, সে আর ফিরে আসে নি কখনো, ঝড়ের প্রভাতে ঝড়ের বাণী হয়ে আর আসে নি!

সুনির্মল মুক্ত আকাশ যে-চোখে সে অহর্নিশ দেখত, সে-চোখের নীলিমা তাকে টেনে নিয়ে গেছে বহু দূরে—কোথায় কে জানে!

ঘরের মধ্যে ভেজা পায়ের দাগগুলো কবে রোদের তাপে শুকিয়ে গেছে।

বৃষ্টির ছাট আর ভালো লাগে না।

বৃহৎ জানলাটি রন্ধ্র।...

১৯৩৯

চিরন্তন পৃথিবী

আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ রাঙাপথ ছেড়ে কাজলী নদীর ধারে-ধারে বরফ-কণার মতো সাদা ঘাসফুল পায়ে মাড়িয়ে ওরা দুজন হাঁটছিল, নওয়াজ আর তার স্ত্রী হোসেনা। পেছনে গ্রাম ছাড়িয়ে এসেছে। সম্মুখে বসতিশূন্য প্রান্তর, পাশে শীর্ণ নদীটি, আর ওপরে দিগন্ত-প্রসারিত অনন্ত নীল আকাশ। মাসটা মাঘ। নওয়াজের গায়ে দামি ভারি ওভারকোট, হোসেনার গায়ে গাঢ় লাল রঙের কাশ্মিরি শাল। চেহারার কোমল ভাবে মনে হয় তারা যেন জগৎকে আনন্দোৎসব বলেই জেনেছে। তাদের কাছে আকাশের নীলিমা যেন সাগরের শীতল অতল জল; তাতে নেয়ে ওঠে

দেহ সিক্ত এবং তার অসীমতায় হৃদয় প্রসারিত করা যায়।

হোসেনার সুন্দর দুটি চোখ নির্মলভাবে ঝিকমিক করছে। অদূরে রাঙা পলাশফুলের পানে চেয়ে সে মিষ্টি কণ্ঠে হেসে বললে :

—আসতে তুমি এত দেরি করলে কেন বল তো? সেই কবে থেকে কেবল আসছ-আসছ বলছ। আচ্ছা তুমি অমন কেন, যে-দিন আসবে বলে লেখ ঠিক সে-দিনই আসতে পার না?

—আসব বলে না-এলে তুমি খুব ব্যথা পাও, না?

হোসেনা তার আনন্দোচ্ছল মুখখানা মুহূর্তে গম্ভীর করে তুলল। শান্ত গলায় বললে :

—না। পাই না।

—ও! বলে হোসেনার মুখের ওপর হতে মুখ ফিরিয়ে নওয়াজ দূরে নদীর ওপারের সবুজ ঘন বনরেখার পানে চাইলে, তার মুখচ্ছবি নির্লিপ্ত, প্রশ্নশূন্য।

—'ও' মানে? হোসেনা একটু চঞ্চল হয়ে প্রশ্ন করলে : 'ও' মানে কী?

—'ও' মানে? অতি সোজা। মানে, ও-ও-ও।... আচ্ছা হোসেনা, ওই যে বনের রেখা—

—বনের রেখা থাক। 'ও' বললে যে তুমি কী বুঝেছ বল। তুমি না-এলে আমি বুঝি ব্যথা পাই না? আমি যেই বললুম অমনি তুমি বিশ্বেস করে ফেললে। আচ্ছা বুদ্ধি তোমাদের, প্রশংসা করতে ইচ্ছে করে।

মুখ ফিরিয়ে নওয়াজ মধুর কণ্ঠে হাসল। স্নেহ-কোমল গলায় বললে :

—কার মাথা যে স্বচ্ছ এখুনি তার প্রমাণ পাওয়া গেল।... ও কী, রাগছ কেন?

—রাগব কেন? আমি তো বোকা, তোমার মাথা স্বচ্ছ, ঝকঝকে, ফটিকের মতো।

—তোমার মাথাও।

—দেখ আজ আমাকে রাগিয়ো না বলছি।

—তুমি রাগলে আজ রাতের গাড়িতেই আমি পালাব কিন্তু।

—পালাও না, পালাও। আমি বুঝি রাগছি?...উঁ...

—উঁ

—যাঃ। মিছিমিছি মুখ ভেঙিয়ো না।

—আচ্ছা হোসেনা, মানুষের এত আনন্দ যে হয়, আগে তো জানতুম না। একটা তীব্র আনন্দ আমার অন্তর উদ্বেল করছে। আমার কী করতে ইচ্ছে করছে জান, হেসো না শুনে, ইচ্ছে করছে প্রবলভাবে নাচতে, না হয় নদীর অতলে গিয়ে নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকতে। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক থেকে হোসেনা মৃদু অস্ফুট কণ্ঠে বললে :

—আর আমার কী মনে হচ্ছে জান? মনে হচ্ছে, জগৎটা বিরাট ছলনা, শুধু ফাঁকি। তবু আনন্দ হচ্ছে। ছলনায় তো আনন্দ হয়।

নওয়াজ থমকে দাঁড়াল। বিস্মিতকণ্ঠে বললে,

—অদ্ভুত তো! কিন্তু কী জান, তোমার আনন্দটাই হয়তো খাঁটি, নিবিড়, আর আমারটা হালকা।

—যাকগে ওসব। ওগো ওদিকে একবার চেয়ে দেখনা, নদীর বাঁকের ওধারে সূর্য কেমন রং ছড়িয়ে ডুবছে, যেন বিশ্বমানবের অন্তর রাঙিয়ে তোলবার আয়োজন, যাবার আগে সবার অন্তর ছোঁবার চেষ্টা।

—আজ চতুর্দশীর চাঁদ, না?

—হুঁ।

কাজলী নদীর বয়ে চলার বিরাম নেই, ওদের দুজনের হাঁটারও যেন বিরাম নেই। তারা পথ ধরে-তো হাঁটছে না যে চলতে গিয়ে বাধা পাবে। রাঙা মাটির সংকীর্ণ পথ রইল তাদের জন্য যারা পথের শেষ, চলার সীমা কামনা করবে। নওয়াজ-হোসেনার শ্বসনও যেন সারা

আকাশময় হচ্ছে; তাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস বুঝি আকাশের প্রতি কণা প্রতি বিন্দু স্পর্শ করছে, কাঁপিয়ে তুলছে। কোথা দিয়ে সূর্যের শেষ আলোটুকু মিলিয়ে গিয়ে ধরণীর বুকে চাঁদের স্নিগ্ধ আভা ফুটে উঠল, তারা লক্ষ্য করতে পারলে না। পথের কথা না-ভাবলেও তারা নদীর ধারটা কিন্তু ছাড়ছে না, কাজলীর স্রোত আর তাদের অন্তরের আনন্দ-স্রোত সাঁওতালদের জোড়া বাঁশির মতো এক সুরে বাজছে বলে। মাঝে-মাঝে তারা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবোল-তাবোল কথা কয়ে উঠছে, নয়তো নিবিড় নীরবতায় গুম হয়ে থাকছে। একবার নওয়াজ বললে যে আজ রাতে ঘরে ফিরে যেতে পারবে না, কারণ সেখানে তাদের স্থান হবে না, আবার খানিক পরে চঞ্চল হয়ে বললে, চল চল, তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যাই, নইলে হয়তো নীল আকাশে আমরা হারিয়ে যাব, মিলিয়ে যাব। হাতের ঘড়িতে ক'টা বাজছে সে-খোঁজ নেবার প্রয়োজন তারা কেউ অনুভব করছে না, কারণ বর্তমানে যে-কালের ঢেউ তাদের ওপর দিয়ে প্রবলভাবে অথচ নিঃশব্দে বয়ে চলেছে, সে-মহাকাল পৃথিবীর সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে বন্দি নয়।

নদীর ওপারে বনরেখা চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় আবছা-আবছা, রহস্যময় দেখাচ্ছে। সেইদিকে একবার তাকিয়ে নওয়াজ বললে :

—ওগো, তুমি হলে ঝরনা, আমার আজকের আনন্দের মূল উৎস। দেখো, তুমি যেন শুকিয়ে অথবা ম্লান হয়ে যেও না লক্ষ্মীটি।

হোসেনা কোনো উত্তর দিলে না, শুধু চলতে-চলতে নীরবে নওয়াজের দেহ-ঘেঁষে এল। দূরে কয়েকটা আলো মিটমিট করে জ্বলছে, বোধ হয় মামুদপুর গাঁ। অদূরে সেই বৃহৎ অশ্বত্থ গাছটা, আর বহু পুরাতন ভাঙা ছোট মসজিদটি। পাশে কাজলী নদী ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে।

তারা হাঁটছে, শুধু এই হাঁটার শব্দটুকু ছাড়া চারিদিকে চাঁদের আবছা অস্পষ্ট আলোর মধ্যে এমনি একটা নীরবতা-নিঃশব্দতা যে অন্যদিন হলে হয়তো তারা চলতে পারত না। কিন্তু আজ তাদের কানে চারিপাশের নৈঃশব্দ ছাপিয়ে শুধু দু-জোড়া চঞ্চল অধীর চরণের শব্দ রহস্যময় হয়ে বাজছে।

—ও কী?

হঠাৎ তারা চলতে-চলতে থমকে দাঁড়াল। ও কী? নওয়াজ উৎসুক হয়ে চেয়ে দেখলে নদীর খাড়া ভাঙা-পাড়ের নিচে যেখানে জলের রেখা, সেখানে একটা সাদা বস্তু যেন ধপধপ করছে। অনেক ঠাহর করেও যখন বস্তুটা কী আন্দাজ করতে পারলে না, তখন হোসেনাকে তীরে দাঁড় করিয়ে রেখে নওয়াজ পাড়ের ভাঙনের ধাপে-ধাপে নিচে নেবে এল।

একটা নগ্ন মৃতদেহ। সেটার অর্ধেক দেহ জলে, অর্ধেক মাটিতে। মৃতদেহটির মানুষের আকার আর নেই; সে-টা বিকৃত ও বীভৎস। চেয়ে দেখলে অন্তরটা শিউরে কেঁপে ওঠে, ঘৃণা হয়। চারিধারে কেমন একটা পচা দূষিত দুর্গন্ধ। পাশ দিয়ে নদীর জল কলকল শব্দে অস্ফুট গুঞ্জন করে বয়ে চলেছে, মৃতদেহের অর্ধাংশের চারপাশে ছলছল করছে, ঝিকমিক করছে।

সুস্থ অন্তরে নওয়াজ সে-কুৎসিত দৃশ্য চেয়ে-চেয়ে দেখলে। কিন্তু পাড়ের ওপরে যখন উঠতে যাবে তখন সে অনুভব করলে যে তার সমগ্র অন্তরটা একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়েছে, খেয়ে অসাড় ও নিস্পন্দ হয়ে পড়েছে। সে পাড়ের ওপরে উঠল, অনেক কষ্টে, নিজেকে হেঁচড়ে টেনে। মনে হল, এক যুগ যেন কেটে গেল। হোসেনা ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলে :

—কী? কী ওটা?

নওয়াজ কোনো উত্তর দিলে না; সেই মুহূর্তে হয়তো দিতে পারতও না। অতি ধীরে-ধীরে হোসেনার সম্মুখে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। চারিদিকে কেমন একটা অসহনীয় নিঃশব্দতা, নির্জনতা! চরণের ধ্বনি এখন নিস্তব্ধ বলে। পূর্ণ চাঁদের আলোয় হোসেনার সারা দেহ অপরূপ সৌন্দর্যময় হয়ে উঠেছে; সুন্দর ছোট মুখটি, কালো-কালো ডাগর চোখ দুটি অপ্রতিম সৌন্দর্যে-

লাবণ্যে মায়াময় রহস্যময় হয়ে উঠেছে। তাই যেন নওয়াজ একান্তভাবে চেয়ে-চেয়ে দেখছে, কিন্তু বারেবারে তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে; মুদে আসছে; তার চোখে যেন তন্দ্রা নাবছে; সে যেন স্বপ্ন দেখছে। কয়েক মুহূর্ত পর। নওয়াজের ঠোঁট একটু নড়ল, অতি বিস্মিত ও অতি মৃদু-জড়িত কণ্ঠে সে হোসেনাকে প্রশ্ন করলে :

—তুমি কে?

হোসেনা নির্বাক, বিমূঢ়। তার চোখে ভয়-মিশ্রিত বিস্ময়। এ-প্রশ্নের উত্তর সে কী করে দেবে? সে-যে মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

পৌষ ১৩৪৮ ডিসেম্বর ১৯৪২

চৈত্রদিনের এক দ্বিপ্রহরে

'ওমা, আমি ভেবেছিলুম এ ঘরে বুঝি কেউ নেই; যা অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না।' শুনে নিরন্ধ্র অন্ধকারে আনোয়ার হাসলে, বোধ হয় কথাটা মিথ্যে বলে; চোখ মেলে অন্ধকারের মধ্যে আবছা সাদা বস্তুর পানে তাকিয়ে বললে : 'আলাপ করবে? উঁ? করবে-তো ওঘর হতে আলোটা নিয়ে এসে বস।'

'আলো?...তা...' ছালেহা ইতস্তত করে থেমে গেল। আনোয়ার উঠে দাঁড়ালে; অন্ধকারের মধ্যে অন্ধের মতো হাতড়ে-হাতড়ে একটা অর্ধদগ্ধ মোমবাতি খুঁজে বের করল, জ্বালাতে-জ্বালাতে, বললে : 'বুঝেছ? মাঝে মাঝে একেবারে ভুলে যাই আমাদের বাড়িতে শুধু একটি আলো। মুসলমানদের এ-ধরনের ভুল প্রায়ই হয়ে থাকে, এবং সেইখানেই সবচেয়ে বড় দুঃখ।'

ছালেহা কিছু বললে না; আনোয়ারের ছেঁড়া-নোংরা মাদুরের এক প্রান্তে নিঃশব্দে বসল। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক থেকে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলে : 'অন্ধকারে চুপচাপ কী ভাবছিলেন বলুন-তো?

'কী ভাবছিলাম...?' থেমে আনোয়ার হাসল, বলল : 'এ রকম প্রশ্ন কখনো কাউকে কোরো না, এতে সাধারণত নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়।...তাছাড়া, যারা গরিব, দুঃখী, নিঃসহায়, তাদের অমন কথা জিজ্ঞেস করলে তারা মনে-মনে লজ্জা পেয়ে থাকে, এবং উত্তরে তাদেরকে অর্থহীন মিছে কথা বলতে হয়।'

লজ্জা ছালেহাই পেল। লজ্জা-মিশ্রিত মৃদু হাসি হেসে মাথা নত করলে।

'তবে, বোধ হয় আমার নিজের কথাই ভাবছিলুম। আচ্ছা ছালেহা, আমি যে নিতান্ত গরিব, এতে আমি কেন নিজেকে এতটা সৌভাগ্যবান বলে মনে করি—জান? কারণ, গরিব বলে আমার চোখ দুটি উন্মুক্ত, প্রসারিত। দুঃখে-দারিদ্র্যে নিপীড়িত মুসলমানরা একটা আবছা আকাঙ্ক্ষা ও মিথ্যে মায়ায় ভুলে সর্বদা উন্মত্ত ও অস্থির হয়ে থাকলেও তারা জানে তারা কী; কী অবস্থা তাদের; কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ যদি হঠাৎ অর্থের নাগাল পায়, তখুনি সে জগতের বাস্তব আকৃতির কথা ভুলে যায়, ভুলে যায় যে সে মুসলমান। আমি বেঁচেছি; আমি সত্যি সৌভাগ্যবান।'

ছালেহা কথা বললে না; আনোয়ারের দারিদ্র্যের কথা উঠলে সে নির্বাক থাকে, চোখ নত করে রাখে।

'শুনেছ, আজ সকালে আমাদের পাড়ার হামিদ আলি মারা গেছে।'

'কে? সেই গাড়োয়ান?'

'হুঁ। লোকটা গাড়ি চালাত।...তার বাড়ির লোকদের সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলুম... তাদের পানে তাকিয়ে-তাকিয়ে একটা কথা মনে হল। যা আমার মনে হয়, তা বলছি। তার আগে তুমি বল তো, আমাদের মুসলমান বিড়িওয়ালা পানওয়ালা গাড়োয়ান ভাইদের দেখে তোমার কী ধারণা হয়?'

'ঠিক ধারণা বলতে কিছু হয় না, তবে তাদের দেখে দুঃখ হয়, কান্না পায়।'

'পাওয়া স্বাভাবিক। যাদের হৃদয় আছে তারা চিরকালই পাবে এবং তোমার তাদের সম্বন্ধে কোনো সুষ্ঠু ধারণা না জন্মালেও অন্তরে-অন্তরে তুমি তাদের ঠিক চিনেছ। সে-চেনাই বড় জিনিস।...তাদেরকে অনেকেই চেনে না; অনেকে বলে, তারা সুখী। কিন্তু কী জান তাদের বিশৃঙ্খল জীবন যেন একটা বিরাট যন্ত্রণাদায়ক দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কাটে, একটা জ্বালাময় মর্মযাতনা তাদের তিলে-তিলে ধ্বংস করে। পূর্বস্মৃতি, বর্তমান হীন জঘন্য অবস্থা, ভবিষ্যতের অর্থহীন আশা-আকাঙ্ক্ষা এ-সবের মধ্যে তারা ভীষণ দোলা খেতে থাকে। অতৃপ্ত বাসনা-কামনা, অতৃপ্ত বুভুক্ষার তাড়নায় দুঃস্বপ্নের তীব্র ঝাঁঝালো নেশায় তারা অহর্নিশি আচ্ছন্ন থাকে। তারা যে কী, সে-কথা তারা ভুলতে চেষ্টা করে, তাই তাড়ি খায়, সস্তা রংবেরঙের সিল্কের জামা পরে। যার ওপর ন্যায্য অধিকার ছিল, তা' থেকে তারা নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত হয়েছে; নিজের সাথেই ছলনা করা ছাড়া তাদের যেন আর অন্যপথ নেই।...তাদের দেখে তোমার কান্না পায়, আমার সারা শরীর জ্বালা করে ওঠে। জ্বালা করে তারা অক্ষম বলে, নিজকে নিজে ফাঁকি দেয় বলে।'

আনোয়ার থামল, ছালেহা চোখ নত করে পায়ের নখ খুঁটতে লাগল। আবর্জনাময় অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ঘরে মোমবাতিটি স্তিমিত আলো ছড়িয়ে নিঃশেষ-প্রায় হয়ে এসে জ্বলছে; বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

খানিকক্ষণ নীরবতার পর।

'কাল আপনি আমাকে যে-ইতিহাস বইখানা পড়তে দিয়েছিলেন, সে-টা পড়ে খুব আনন্দ পেলাম, বর্তমান অবস্থার কথা মনে করে দুঃখও হল।'

'পরের লেখা অসত্য ইতিহাস পড়ে তোমার আনন্দ হয়েছে—শুধু আনন্দ হয়েছে, কিন্তু যদি সত্যিকারের ইতিহাস পড়, তাহলে তোমার সারা বুক একটা অদম্য গৌরবে ফেনিয়ে উঠবে, হঠাৎ সে-উচ্ছ্বাস তুমি সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু সত্যিকারের ইতিহাস কোথায়?...জান, মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় কে-যেন আমার শ্বাসরোধ করতে চাইছে, কিংবা আমার সম্মুখে যেন বৃহৎ লোহার দরজায় বৃহৎ লোহার তালা ঝুলছে, ভেতরের মণিমাণিক্য দেখবার ক্ষমতা আমার নেই। সত্যি কি নেই? নেই। না থাক, তবু এই আমাদের চরম সান্ত্বনা, একটা অচিন্তনীয় অতি গৌরবময় অসাধারণ ইতিহাস আমাদের আছে, এবং এতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব।...কী জান, একটা জাতির মধ্যে সাড়া ও জাগরণ আনতে হলে তার একটা গৌরবময় ইতিহাস চাই। আজ পর্যন্ত যে-দেশে যে-জাতিই জেগেছে, তার সে-জাগার পেছনে উত্তেজনা ও অনুপ্রেরণা দেবার জন্যে জ্বলন্ত ইতিহাস রয়েছে, যে-জাতির ছিল না, সে-জাতি কাব্য ও কাহিনী রচনা করিয়ে তার সাহায্যে জেগেছে।...আমাদের অতি উজ্জ্বল, অতি অদ্ভুত ইতিহাস আছে, শুধু চোখের সম্মুখে সে-ইতিহাস মেলে ধরতে হবে, প্রাণে-প্রাণে অন্তরে-অন্তরে আমাদেরকে জানতে হবে, অনুভব করতে হবে।'

কিছুক্ষণ পর। বাইরের নিরন্ধ্র অন্ধকার থেকে শীতল হাওয়া বয়ে এসে নিবন্ত মোমবাতিটি নিভিয়ে দিয়ে গেল। পূর্ণ আঁধারে ছালেহা নড়েচড়ে উঠলে।

'কী?...যেতে চাও?'

'হুঁ।'

'কেন?'

অন্ধকারের মধ্যে থেকে কোনো উত্তর এল না।

'মোমবাতিটা নিভে গেছে বলে?... একটা কথা শিখে রাখ ছালেহা, নিজকে অতটা সংকীর্ণ ও নীচ হতে দিও না : তুমি তো সাধারণ মেয়ে নও—তোমার ঐ রকম সংকোচ হবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।...তাছাড়া আমার আম্মার কথা যদি বল, তাহলে এটুকু তোমাকে বলতে পারি যে, তিনি আমাকে বিশ্বাস করেন—তোমাকেও।—লজ্জা পেলে, না?'

অন্ধকারে বোঝা না গেলেও আনোয়ারের অনুমান সত্যি।

'তোমাকে প্রথম যখন দেখি, তখনই তোমাকে আমার ভালো লেগে গেল কেন জান? কারণ, সে-দিন না-জেনে প্রথম আমার সম্মুখে পড়ে গেলে, তখন তুমি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে পালাও নি, সে-দিন সে-মুহূর্তে আমি বুঝলাম, তুমি সাধারণ মেয়ে নও। আজকাল ছুটে অবশ্য অনেকেই পালায় না, কিন্তু তাদের মুখে যে-ভাবের ছায়া পড়ে থাকে, সে-ভাবের ছায়াও তোমার মুখে ছিল না।...জান, যতক্ষণ তুমি আমার কাছে বসে থাক, ততক্ষণ আমার খুব ভালো লাগে, মনে হয়, সমগ্র দুনিয়াটা যেন গুটিসুটি মেরে একান্তভাবে আমার পায়ের কাছে বসে রয়েছে।'

'আপনার কাছে বসে গল্প করতে আমারও খুব ভালো লাগে।' চোখ বুজে কোনোমতে বললে ছালেহা। তারপর দু-মিনিটব্যাপী গভীর নীরবতা।

'ছালেহা।'

'জি?'

'আমাদের ধর্ম সম্বন্ধীয় কোনো বই তোমাকে পড়তে দেব কি? তুমি পড়বে?'

'বেশ তো, দিন না।'

'বেশ, বেশ। কালই এনে দেব। কী জান, আমাদের আজ যে এতটা আপজাত্য ঘটেছে, তার মূল কারণ হচ্ছে ধর্ম-সম্বন্ধে অজ্ঞতা। শুধু ইসলাম ধর্ম-সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞান থাকলেই যে-কেউ একজন অসাধারণ ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে। না, না—এ-আমার অন্ধ পক্ষপাতিত্ব নয় ছালেহা। এ-বিষয়ে অতিরিক্ত পড়ে দেখ, কদিন পরে তুমি নিজেই এর সত্যাসত্য উপলব্ধি করতে পারবে।'

কয়েক মুহূর্তব্যাপী নিবিড় নীরবতার পর ছালেহা মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আজকে তাহলে আসি।'

আনোয়ার কী যেন ভাবছিল, চমকে উঠে কোমল কণ্ঠে বলল : 'আচ্ছা, এস।'

'আচ্ছা ছালেহা, তোমার কাছে আমি অত্যন্ত বকি—না?'

'হুঁ। কিন্তু আমার খুউব ভালো লাগে, শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যাই।'

'মুগ্ধ হও তোমার বিশেষত্বে,—আমার বকুনিতে নয়। অন্য কোনো মেয়ের কাছে যদি এমনিভাবে বক্‌তে থাকতাম, তবে সে আমাকে ঠিক পাগল ঠাওরাত, তুমি মুগ্ধ হও। তুমি তো আর সাধারণ মেয়ে নও।'

'শুধু আপনার ঐ দোষটুকু?' বলে ছালেহা লজ্জায় মধুরভাবে রেঙে উঠল।

'ঐ দোষটুকু—কোন্ দোষটুকু?' আনোয়ার স্নিগ্ধভাবে হাসলে।

ছালেহা নিরুত্তর।

'প্রশংসা করি, না?'

'হুঁ।'

'ও তো প্রশংসা নয় ছালেহা, ও হচ্ছে তোমার চরিত্র-বিশ্লেষণ।... যাক।'

কয়েক মুহূর্ত পর।

'তোমার পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, বাংলার দরিদ্র অশিক্ষিত মুসলমান চাষাভুষাদের সঙ্গে তোমার-তো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে—না? আচ্ছা! কিন্তু এদের ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেছ কী?'

'দেখেছি তো।'

'কী দেখেছ, বল।'

ছালেহা নিরুত্তর। নতমুখে ইতস্তত করে বললে :

'পারি না।'

'বুঝেছি। আমার সম্মুখে তোমার মুখ খুলতে চায় না, শুধু কান দুটো হরিণীর মতো একাগ্রভাবে খাড়া হয়ে থাকে, না? আনোয়ার হাসলে, 'দুষ্টু।'

ছালেহা লজ্জা পেলে তার পানে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আনোয়ার বললে :

'জান, বাংলার এই যে শত-শত অর্ধদগ্ধ কুৎসিত চাষার দল, যারা আমাদের আত্মীয়স্বজন, শুধু তাদের পানে চোখ মেলে তাকালেই প্রাণ ফেটে কান্না আসতে চায়; কদাকার শুষ্ক মলিন চেহারা, দগ্ধপ্রায় ফাটা রুক্ষ চামড়া, ঘোলাটে নির্বোধ সরল চোখ—তারা কি আমাদের মতো মানুষ না বিজাতীয় জীব, সময়-সময় যেন বুঝে উঠতে পারি না ছালেহা। তারা নাকি মুসলমান, আমাদের ভাই। এরা যে তাঁদেরই বংশধর, যারা মাত্র কিছুদিন পূর্বে অদ্ভুত শক্তি ও ক্ষমতা দেখিয়ে সারা ভারতের বুকে রাজত্ব করেছেন, যারা বিচিত্র বিস্ময়কর স্থাপত্যশিল্প, কারুকার্য দেখিয়ে সমস্ত দুনিয়ার লোকের মাথা শ্রদ্ধায় অবনত করিয়েছেন—একথা তাদের দেখে কে বিশ্বাস করবে বল? বল, কারো এ-সকল কথা মানতে ইচ্ছে করে? একি কোনো জাদুর ভোজবাজি? মনে হয়, ওদেরকে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করি, ওরে, আমার ভাইরা, এমন অবস্থা তোদের কে করলে? তোরা যে মুসলমান—শুধু এ-কথাটি তো জানিস? ওরা উত্তরে কী করবে জান, অতি নির্বোধের মতো অর্থহীন দৃষ্টিতে নির্বাকভাবে শুধু তাকিয়ে থাকবে। তারা মূক প্রাণী হয়ে গেছে, ছালেহা, মূক প্রাণী হয়ে গেছে। মৃতের দেহে ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে প্রশ্ন করা যেমন ব্যর্থতা, এও তেমনি। কী প্রচণ্ড নির্মম আঘাত, কী মর্মন্তুদ ব্যথা ও যাতনা আজ তাদের মূক প্রাণীতে রূপান্তরিত করেছে, বাইরের লোক তার কী বুঝবে? সবকিছু সহ্য করা যায়, কিন্তু তাদের ঐ নির্বোধ সরল চাহনি যেন সহ্য করা যায় না। এই সকল চাষারা, যারা আজ সমাজের চোখে হেয়, অপমানিত, লাঞ্ছিত, তাদের প্রত্যেকের পেছনে একটা বিগতকরুণ—অতি করুণ ইতিহাস রয়েছে, যা-শুনলে মনে হবে, সত্যিই তারা অসহায়, শক্তিহীন, মূক প্রাণীর দল, না-হলে, মানুষ হয়ে—আর দশজনের মতো রক্তমাংসের মানুষ হয়ে কী করে তারা এই নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নিপীড়ন নীরবে সহ্য করতে পারলে?...ছালেহা, তাই গাঁয়ে গিয়ে আমি থাকতে পারি না, আমার সারাদেহে সারাক্ষণ কে যেন চাবুক মারতে থাকে। অসহ্য!'

আনোয়ারের কণ্ঠ শেষের দিকে কোমল ও সজল হয়ে এসেছিল; যেন ঝড় থেমে এল। সে নীরবে ছালেহার পানে তাকালে, তাকিয়ে দেখলে তার অশ্রু-সজল চোখ বেয়ে পানি ঝরছে; সে কাঁদছে। আনোয়ার কিছু বললে না।

এক, দুই, তিন—মুহূর্তগুলো যেন ভয়ে-ভয়ে সন্তর্পণে সামনের পানে এগিয়ে চলেছে। ক্ষুদ্র ঘরে হাওয়া মুষড়ে রয়েছে : আনোয়ার নির্বাক ও নিশ্চল। তার সে-ই নিশ্চল-হয়ে বসে থাকার ভঙ্গিটা যেন ছালেহার কাঁদবার ভঙ্গিটার চেয়েও ব্যথাতুর, বেদনাময়।

সে ভাবলে, ছালেহা কাঁদুক, আরো প্রাণ খুলে কাঁদুক। ও কান্না তো আর সকলে কাঁদতে পারে না, ও কান্নার মূল্য আছে।

কান্না নিঃশেষ হয়ে আসার পর ছালেহা যখন চোখ মেলে তাকালে, তখন আনোয়ার নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। তার সুন্দর বড় বড় চোখ দুটি প্রশান্ত ও গভীর, ঠোঁটের পাশে কোমল রেখা। তার প্রশস্ত সুগঠিত বক্ষের পানে তাকিয়ে ছালেহা যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলল, স্নিগ্ধ ও গভীরতাময় চোখের পানে তাকিয়ে তার সারা অন্তরটা যেন সিক্ত হয়ে গেল।

মনে হল, তার নরম কোমল দেহের ওপর বিস্তৃত হয়েছে ঘনপল্লবময় বিশাল বৃক্ষ, সে-

বৃক্ষের পাতা কাঁপিয়ে ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া বয়ে তার মনপ্রাণ স্নিগ্ধ করে দিয়ে গেল; বৃক্ষের তলাটা ছায়াচ্ছন্ন ও ঠাণ্ডা।

'মাঝে মাঝে মনে হয় ছালেহা, খোদা আমাকে এত দরিদ্র ও নিঃস্ব করে সৃষ্টি করলেন কেন?'

ছালেহা বাধা দিলে :

'ওসব কথা থাক। ওসব শুনতে আমার ভালো লাগে না।'

আনোয়ার হাসলে, বললে :

'তবে থাক। অন্য কথা পাড়ি। অন্য কথার মধ্যে এটুকু বলতে পারি যে, একটা কথা নিত্য আমার মনে জেগে, আমাকে ব্যথা দিচ্ছে। মনে হয়, তোমাকে আমি যদি বিয়ে করতে পারতাম। লজ্জা পাচ্ছ... না? কিন্তু কী করবে? মনে-জাগা কথা শুধু বলছি, না হলে যে স্বস্তি পাব না। ওকি, উঠছ?'

ছালেহা বসে পড়লে। আনোয়ার নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত ভাবলে। আবার বললে : 'ঠাট্টা নয় ছালেহা। সত্যি। পালিয়ো না, শোন। এ-ক'দিন ধরে কথাটা প্রায়ই মনে জাগছে, আর অক্ষমতার কথা মনে পড়তে ভেতরটা মুষড়ে যাচ্ছে। তোমার মতো এমনি মেয়ে যদি বিয়ে করতে পারতাম, তাহলে বোধ হয় সেটাকে আমার জীবনের অপ্রাপ্য উপহার বলে মেনে নিতাম, আর কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা করতাম না। কিন্তু... তুমি বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, আর আমি এতই দরিদ্র যে দু-বেলা পেট ভরে খেতে পাইনে। আমার বিদ্যেও তেমন নেই যে, সংসার চালাবার মতো চাকরি পাব। টিউশনি করে যে ক'টা টাকা পাই, তা বড়লোকের মাসিক চুরুটের বিলের চেয়েও অনেক কম।... আমার জীবনের ব্যর্থতা মূল্যহীনতা সম্বন্ধে আমার যেন অকস্মাৎ নতুন জ্ঞান হল; মানুষের মতো বাঁচবার ক্ষমতা আমার কখনো হবে না, তোমাকেও সাথী হিসেবে পাব না।.... ও কী?' ছালেহার পানে তাকিয়ে আনোয়ার বিস্মিত হল। তার সারা মুখ কালো হয়ে গেছে, চোখ-দুটি বারে-বারে বুজে আসছে। কোমল কণ্ঠে আনোয়ার প্রশ্ন করলে : 'কী হল ছালেহা?'

'কিছু না।' সে নিজেকে দমন করতে চাইলে, কিন্তু পারলে না, বন্যার মতো হু-হু করে কেঁদে উঠল।

বাইরে চৈত্রের রৌদ্র খাঁখাঁ করছে, ঘরে তপ্ত হাওয়া গুম হয়ে আছে। অদূরে সজনে গাছটার ওপর হতে একটা ঘুঘু উদাস কণ্ঠে ডাকছে; আকাশ নীল; সেখানে অনেক ঊর্ধ্বে চিল ঘুরে-ঘুরে উড়ছে।

অবশেষে আনোয়ার কথা বললে, তার কণ্ঠ ভেঙে পড়েছে। বললে : 'জানি ছালেহা, জানি। কিন্তু কী জান, তুমি এখন মোহাচ্ছন্ন। মোহের এ-ঘোর যখন কাটবে, তখন তুমি লুকিয়ে কাঁদবে, মৃত্যু কামনা করবে, অথবা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। আমাদের দুজনের জীবনই একটা বিরাট ব্যর্থতায় পরিণত হবে;—সে হতে আমি দেব না।...এক কাজ করবে ছালেহা? কাল হতে তুমি আর আমার কাছে এস না—কেমন?'

ছালেহা নিরুত্তর; তার ব্যথাভরা মুখখানা এমন হয়েছে যে মায়া হয়।

'ছালেহা!' বজ্রকণ্ঠে আনোয়ার ডাকলে; ছাহেলা শুনলে। সে যেন জোর করে নিজেকে তুলে দাঁড় করালে, তারপর চৈত্রের দুপুরের উত্তপ্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে ধীরে-ধীরে নিঃশব্দ-চরণে সে চলে গেল, কতটা ব্যথা বুকে করে বয়ে নিয়ে গেল, জানা গেল না।

...আনোয়ারের কাছে এ আঘাত কিছু নয়, সে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করলে না। বরঞ্চ দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ করা রৌদ্রের তাপে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ভাবলে, এর চেয়ে অনেক তীব্রতর তীক্ষ্ণতর আঘাত মুসলমানদের সহ্য করতে হয়েছে, হচ্ছে এবং সম্মুখেও করতে হবে।

আনোয়ার নিশ্চিন্তে ঝিমালে বটে, তবু বুকের ভেতরটা মাঝে-মাঝে চিনচিন করে উঠতে

লাগল। প্রথমে সে গ্রাহ্য করলে না, ভাবলে ডাক্তারকে বুকটা দেখাবে, অবশেষে মনে মনে স্বীকার করলে; জ্বালা করে তার চোখ দুটি পানিতে ভরে উঠল।

...মেয়েটা দুষ্টু। কাঁদবার সময় মুখটা যা করে...

মাঘ ১৩৪৮ জানুয়ারি ১৯৪২

ঝোড়ো সন্ধ্যা

বাইরে আকাশ কাঁদছে, ঘরে কাঁদছে রহিমা।

ঝমঝম শব্দে অবিশ্রান্ত অবিরাম বর্ষণ হচ্ছে : বৃষ্টির ছাটে জানলার স্বচ্ছ সার্শিগুলো ঝাপসা-ঝাপসা হয়ে উঠছে : অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে পানি ঝরার একটানা করুণ সুরে-সুরে রহিমা কাঁদছে; আর অদূরে ঝাপসা সার্শির মধ্য দিয়ে বাইরের অস্পষ্ট সিক্ত বস্তুগুলোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঈষৎ মাথা নিচু করে প্রস্তরমূর্তির মতো আনোয়ার দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে ক্রন্দনরতা রহিমার স্বামী।

আকাশের পানি অবিরাম ঝরছে, কিন্তু রহিমার কান্না যেন ক্রমে-ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসছে। সে-কথা আনোয়ার জানে। জানে বলেই সে কিছুটা অধীরচিত্তে আগতপ্রায় সন্ধ্যার কথা ভাবছে। সন্ধ্যা-আলো আজ মলিন থাকবে। এ-মলিনতার মধ্যে এখানে আসবার পথ কি মমতাজ বেগম খুঁজে পাবে? একবার খুব করে জোর ঝোড়ো হাওয়া বইলে হত, তাহলে নিমেষে উড়ে যেত সব জমাট নিরন্ধ্র মেঘ, সন্ধ্যাকাশ মলিন না হয়ে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠত, সে-ঔজ্জ্বল্য মমতাজকে আগবাড়িয়ে নিয়ে আসত। তবে ঔজ্জ্বল্যের চেয়ে মালিন্যই ওর পক্ষে বাঞ্ছনীয়, কারণ বর্ষামুখর রাতে ওর কালো-কালো চোখ দুটি কেমন রহস্যময় হয়ে ওঠে। সে-রহস্যময় চোখের পানে তাকালে মনে হয়, সে যেন কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্টতার পানে তাকিয়ে রয়েছে, অথবা তাকিয়ে রয়েছে দিগন্তের পানে—যেখানে সাগর আর আকাশ এক হয়ে মিশেছে। আবার এমনি বাদলা দিনে মমতাজ শেলির কাব্য পড়তে অত্যন্ত ভালোবাসে, কিন্তু আনোয়ারের কাব্য মমতাজের কালো গভীর চোখে, তার হালকা চুলে ও চুলের গন্ধে, তার দৈহিক স্নিগ্ধ রঙে।

বাইরে অনাবিল ধারায় ঝর ঝর ঝর করে পানি ঝরছে-তো ঝরছেই, কিন্তু রহিমার চোখ দিয়ে আর ঝরছে না : নরম কোমল বালিশে মুখটি গুঁজে সে নিঃশব্দে নিশ্চলভাবে পড়ে রয়েছে। তার ফুলে-ওঠা ক্লান্ত-শ্রান্ত চোখ নিবিড়ভাবে বোজা; মাঝে মাঝে তার পাতলা ঠোঁট শিশুর ঠোঁটের মতো হঠাৎ কেঁপে-কেঁপে উঠছে; সে যেন বর্ষণের সুরে-সুরে কখন অজ্ঞাতে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আনোয়ার নিশ্চিতভাবে জানে যে, সে ঘুমোয় নি। বর্ষণসঙ্গীত রহিমার চোখে ঘুম নাবাতে কি গভীর অবোধ্য ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারে না, পারে শুধু মমতাজের চোখে, যার চোখ এমনি দিনে শুধু রহস্যময় হয়ে ওঠে।

জোর ঝোড়ো হাওয়া বইল কিন্তু। নিশ্চল আনোয়ার হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল, ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় নিজের মুখখানা ক্ষত-বিক্ষত করবার ইচ্ছা হলেও সে কিন্তু জানলা খুললে না, ঘরে ঘুমাচ্ছন্নের মতো রহিমা পড়ে রয়েছে বলে। এ-ঘুমের ছলনা যেন মৃত্যুর ছলনা।

সার্শির বাইরের জগৎ আনোয়ারকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে : আর দূরে অদৃশ্য হতে ডাকছে বোধহয় মমতাজ, যার মুখ এতক্ষণে বিদ্রোহিনীর মতো নির্ভয়ে সোজা ও উদ্ধত হয়ে উঠেছে। সমস্ত জাগতিক স্নেহবন্ধন ছিঁড়ে ফেলে ঝোড়ো হাওয়া যেন তাকে মুক্তির অসীম পূর্ণতায় ছুড়ে ফেলতে চাইছে, মমতাজ নীরবে দৃঢ়চিত্তে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে অগ্রাহ্য

করছে। নতুন কিছু নয়, পুরাতনই সব, তার মাঝেই পূর্ণতা, শান্তি। কিন্তু তাই কি? না। ঝড়ের প্রচণ্ডতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে মমতাজ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে, ফুলের কোমলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে সে কোমল হয়ে পড়ে; এবং এই তার স্বভাব।

ঘরে মৃদু পদশব্দ। বিছানা ছেড়ে রহিমা উঠেছে। ঝোড়ো হাওয়া বইছে কি না—সে আর ঘুমাচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকতে পারছে না, জানলা দরজা সব বন্ধ আছে কি না একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সংসার তার সবকিছু; পানির ছিটায় ঘর ভিজে গেলে, মেঝের দামি কার্পেটটা ভিজে গেলে তার অনেকটা ক্ষতি। ঝড়কে যে বাধা দেয়, সে-ঝড় কি তার চোখে কুয়াশা-স্বপ্নিল ছায়া সৃষ্টি করে?

মৃদু পদশব্দ বাইরে মিলিয়ে গেলে আনোয়ার ভাবলে, ও কি সত্যিই কাঁদে? অর্থাৎ দুঃখে, অর্থাৎ ব্যর্থতায় কাঁদে? আনোয়ার রহিমাকে ভালোবাসে না, বাসতে পারে না; তার বাসা উচিত নয়। এতে কাঁদবার কিছু নেই, আছে সহজ-সরল স্বীকারোক্তি। তুমি আমায় চাও না, অতএব আমিও তোমায় চাই না। এতে সহজেই যবনিকা পড়তে পারে। রহিমা তাকে ভালোবাসে? সে কী করে সম্ভবপর হয়? যে তাকে ভালোবাসে না, তাকে সে কী করে ভালোবাসতে পারে? জগৎটা এক ছন্দেই ঘোরে; সে-ঘোরার মধ্যে ছন্দপতন নেই। তবে? তবে হয়তো সে সমাজকে ভালোবাসে, যে-সমাজ তাকে নিয়ে গঠিত। তাকে নিয়ে গঠিত বলেই সমাজ ভুল বুঝে থাকে; সহজ স্বীকারোক্তি করতে অক্ষম। তারা কুয়াশাকে ঘৃণা করে, গোর্কির মতো সিঁদেল চোরের আর্ট বলে অপবাদ দেয়, কিন্তু তারাই যে কুয়াশা একথা কুয়াশার ভেতর দিয়ে দেখে বলে জানতে পারে না। তাদের নিয়ে (রহিমা যাদের অন্যতমা) সমাজ গঠিত; যে-সমাজের বাইরে আনোয়ার এবং বর্ষণমুখর দিনে যে-মেয়েটির চোখ রহস্যময় হয়ে ওঠে, সে।

রহিমা ফিরে এসেছে। এসে দাঁড়াল ঠিক আনোয়ারের পেছনে। দাঁড়াল যখন তখন নিশ্চয়ই কিছু বলবার আছে, অভিযোগ না হয় মিনতি। তবে তাদের দু-জনার মধ্যে পূর্বের নীরবতার মূক সম্পর্কটি স্বচ্ছন্দ নয় বলে রহিমা শাড়ির খসখসানির মধ্য দিয়ে ইতস্তত করলে; আনোয়ার নির্বাক-নিশ্চল।

'কাল আমি বাপের বাড়ি যাব।'

'ও। আচ্ছা।'

'তবে যাবার আগে তোমাকে এটুকু শুধু জানাতে চাই যে, ভুল করে যে-প্রকাণ্ড অনাসৃষ্টির আয়োজন তুমি করেছ, পরে এর জন্য অনুতাপ করার সময় পর্যন্ত তুমি পাবে না। অন্যায় করে কারো অন্তরে ঘা দিলে খোদা কখনো সহ্য করেন না; এ-অন্যায়ের শাস্তি তোমাকে একদিন বইতেই হবে।'

বাইরে শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে। জীবনটা ঝড়। চলবার পথে সম্মুখে যত বাধাবিঘ্ন—সব ঝেঁটিয়ে উড়িয়ে চলতে হবে নতুনতর সুখশান্তির নিমিত্তে। অচল পাথরকে সচল করতে যাওয়া ভুল, তোমার সচলতায় তাকে পেছনে ফেলে রেখে যাও সেই ভিড়ে, যেখানে রয়েছে অন্ধকার, রুদ্ধ বিষাক্ত হাওয়া, পুরাতনের বোঝাপড়া আর রহিমার সমাজ।

জানলা যেন খুলে যেতে চায়। সার্শির ওপাশে অপরিসর স্থানে দুটি কবুতর যে বসে থাকবার জন্য ডানা ঝটপট করে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, হাওয়ার ঝাপটে তারা অন্য কোথাও নতুন স্থানের অন্বেষণে উড়ে গেছে; তারা চেয়েছিল অচল হতে, হাওয়া তাদের সচল করলে। অচলতায় মৃত্যু; সে-মৃত্যু সত্যিকার মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ, দুর্বিষহ।

'আমি কখনো অনুতাপ করি না রহিমা; আমার জীবনের খসড়া আমি পূর্বেই এঁকে রেখেছি। ভুল হলে বলব সে-ভুল সৃষ্টির, আমার নয়।'

ম্লান সন্ধ্যা অন্ধকার হয়ে আসছে; মমতাজের রহস্যময় চোখেও আজ বুঝি আঁধার ঘনিয়ে উঠছে। যে-কবির কাব্য সে পড়তে ভালোবাসে, ঝড়ের ঘায়েই সে প্রাণত্যাগ করেছিল অশান্ত পানির বুকে এমনি একটা ঝড়ে। যে-সুর এই দুর্বার ঝড় মরণোন্মুখ কবির কানে-কানে

গেয়েছিল, সে-সুর আজও গাইছে। তবে অনুভূতির দিক থেকে সে-সুরে ছিল তীক্ষ্ণ নির্মম আর্তনাদ, এ-সুরে নৃত্যের ঝংকার।

'আজ রাতে বুঝি একটা ট্রেন আছে। কটার সময় জান?'

'সাড়ে নটায়।'

'গুছিয়ে নিতে পারলে সেটাতেই হয়তো যাব।'

'তোমার যখন সুবিধে হয়, তখনই যেয়ো।'

ঝড়ের শোঁ-শোঁ আর্তনাদ হঠাৎ এতটা প্রচণ্ড হয়ে উঠল যে, মনে হল রহিমা পেছন হতে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল।

ঝড় যেন দৈত্য, আরব্য-উপন্যাসের ভীষণাকারের দৈত্য। সারা আকাশে কে যেন শুধু পালাতে আদেশ দিচ্ছে, কারা যেন শুধু অন্ধের মতো দিগ্বিদিক-জ্ঞান হারিয়ে শুধু ছুটছেই। চিরকাল এমনি আদেশ দিয়েছে, চিরকাল এমনি পালিয়েছে—কে বা কারা, কে জানে? মানুষ শুধু এতে সুর খুঁজে পায়, নানা অনুভূতি দিয়ে নানা বিচিত্র সুর। জাগতিক আবহাওয়াতে,—জাগতিক নাট্যে এ বাদ্যের কাজ করে। যেন রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য মধুর বিচিত্র বাজনা।

প্রায় নটার সময় ঝড় থেমে এল। ঝড় থামল, আর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ও গভীর নীরবতা ভারি হয়ে নাবল। নাবল যেন ঠিক আনোয়ারের বুকের ওপর, ভারি পাথরের মতো, অসহনীয় অচল বোঝার মতো। সে-ভার নাবাতে পারে মমতাজ, কিন্তু সে-তো এল না। এল রহিমা : বুঝি বিদায় নিতে।

কাছে এসে নত হয়ে রহিমা আনোয়ারের পা-ছোঁবার চেষ্টা করতেই, আনোয়ার দ্রুতভাবে পেছনে সরে দাঁড়াল। অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট বুঝতে পারা না গেলেও, সে যে একটা আঘাত পেল, তা বুঝা গেল তার উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে! সে-আঘাত যেন দান করতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার মতো আঘাত। কয়েক মুহূর্তের জন্য রহিমা স্তব্ধ হয়ে পড়ল; তারপর মুখ খুলবার পূর্বে একটু নড়ল-চড়ল। মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বলল : 'তোমাকে বলবার আমার কিছুই নেই; থাকবার কথাও নয়। তবে তোমার জীবনটা যাতে ব্যর্থ না হয়ে সুখে-শান্তিতে সার্থক হয়ে ওঠে, খোদার কাছে সে-দোয়াই করছি। তোমাকে ভুলের অনুতাপ না করতে হলেই আমি খুশি হব। আমার জীবনের জন্য আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। আর, কখনো যদি ভুলেও আমার প্রয়োজন বোধ কর, তবে আমাকে ডাকলেই আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়াব। তুমি আমার রইলে না, কিন্তু চিরকালই আমি তোমার রইলাম, জেনো; সেখানেই আমার শান্তি, আমার জীবনের সফলতা।' তার কণ্ঠস্বর যেন গাঢ় বিষাদে জড়ানো। মৃদু ধীরে-ধীরে বলা কথাগুলো যেন অন্ধকারের গায়ে করুণ সুরের মতো বাজল; তবে সেটা অন্ধকারের বুকেই বাজল।

'গাড়ির সময় হয়ে এল, এখন আসি।'

'শোন, জীবনে তুমি যদি সুখী হতে পার, তাহলে মনে-মনে আমি অনেকটা শান্তি পাব। মানুষের জীবনই-বা কত দিনের! সে-ক্ষুদ্র জীবন অপূর্ণ থাকার মতো দুঃখ আর নেই। আরেকটা কথা, তুমি আমাকে ভুলবার চেষ্ট কোরো, তাতে মঙ্গলই হবে। আচ্ছা, এস।'

কাঁদবার কথা ছিল না, তবুও হঠাৎ রহিমা কেঁদে ফেলল, কেন যে কাঁদে, সে-ই জানে। সেকথা নিয়ে আনোয়ার ভাববে না; তার বুকের ওপর অন্ধকার ও স্তব্ধতা অসহনীয়ভাবে জুড়ে রয়েছে। মমতাজ-তো আর এল না, ঝড়ও থেমে গেল; আর বিদায়বেলায় হাত দিয়ে মুখ ঢেকে অর্থহীন কান্না রহিমা কাঁদছে। জীবনের সফলতা কোথায়, কে বলতে পারে? সে কি সেই রহস্যময় দুটি চোখে, চুলে আর চুলের গন্ধে, আর দৈহিক রঙে?

ঘরে আবছা আলো : সেই আবছা অন্ধকারে, চাপা কান্নার সুরে হাওয়া গুম হয়ে আছে; যেন ব্যথায় যন্ত্রণায় একটা কালো জন্তু নুয়ে পড়ে আছে। পৃথিবী বোধহয় স্বপ্ন দেখছে, তার নীরবতার মধ্যে স্তব্ধ ঔৎসুক্য। সে কি দুটি জীবনের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনীতে কৌতূহলী, চাপা কান্নার সুরে দুঃখিত, আনোয়ারের নিষ্ঠুর-নিশ্চল স্থিরতায় ব্যথিত?

কে জানে? কিন্তু জীবন হল ঝড়, যে-ঝড় শুধু ঝেঁটিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় সম্মুখের যত বাধাবিঘ্ন, যত অবাঞ্ছিত অন্তরায়।

সময় সচল বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু পদশব্দে যেন করুণ ইতিহাস রচে ধীরে-ধীরে রহিমা চলে গেল; গেল, কিন্তু যেন জানিয়ে গেল না, যেন জানাবার মতো এ-জগতে তার কেউ নেই।

দুঃখ? না, দুঃখ নেই। পথের কাঁটা তুলতে কি কেউ দুঃখ পায়? সম্মুখে সবুজ ঘাস আর লতাগুল্মের ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে লাল কাঁকরের পায়ে-হাঁটা যে-পথ গিয়েছে, সে-পথ হতে কাঁটা তুলতে কেউ কখনো ব্যথা পায় না; তাতে নিঃসংশয়ের শান্তি আছে।

জগতে শুধু আসা আর যাওয়া। তাই নীরব-নিথর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে মিটমিট-করা আলো নিয়ে, গভীর দুঃখের ছায়া ছড়িয়ে-ছড়িয়ে রহিমাকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চলে যেতেই ঝকঝকে মোটরে মমতাজ এল। স্বল্পালোকিত আবছা পথের বুকের ওপর দিয়ে কতক্ষণ পূর্বে যে-বন্ধ গাড়ি ঘরঘর শব্দ করে দাগ এঁকে গেছে, সে-দাগ মমতাজের গাড়ির গতিতে ও উজ্জ্বল আলোতে নিমেষে মুছে গেল। সে-বন্ধ গাড়ির ভেতর ছিল ক্রন্দনরতা রহিমা, এ-গাড়িতে ঝলমলানি রূপ নিয়ে দীপ্তিময়ী মমতাজ। যত গভীর দাগ হোক না কেন, পরমুহূর্তে মুছে যেতে বাধ্য। জীবন তো ঝড়। এ-ঝড়ে কিছুই থাকে না।

'এত রাতে আজ হঠাৎ?' আনোয়ার লাফিয়ে উঠে নিচে নেবে এল; তার চোখে-মুখে চাঞ্চল্য, চলনের ভঙ্গিতে তৃপ্তি। বুকের ভারি বোঝা নেবে গেছে।

'এলাম। বিকেলে আমার কানে-কানে ঝড় যা বলে গেল, তা তোমায় না জানালে আমার সে-জানা অসমাপ্তই থেকে যাবে। আমি গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু তোমার ভেতর দিয়ে উপলব্ধি করি। ধরবার আধার আমার আছে, কিন্তু উপভোগ করবার শক্তিটুকু নেই। সে-শক্তি বোধহয় তুমিই নষ্ট করেছ।'

'ঝড় আজ কী বললে বল তো!'

'দাঁড়াও, আগে ভালো করে বসি।—ঐ আলোটা নিভিয়ে চাঁদের আলোটা জ্বালিয়ে দাও, আর, কাউকে ডেকে এক-কাপ কোকো দিতে বল।'

উজ্জ্বল আলোটা নিভে গেল; পরমুহূর্তে ঘর ভরে উঠল অস্পষ্ট স্নিগ্ধ আলোয়। যেন চাঁদের আলো।

জানলার পাশের গদিতে বসে আনোয়ার বললে :

'জান, আজ সাড়ে নটার গাড়িতে ও চলে গেল।'

'ও, ও কে?'

'রহিমা।'

'রহিমা! আজ হঠাৎ চলে গেল কেন? কবে আসবে?'

আনোয়ার হাসলে। বললে : 'আসবে মানে? তুমি যেখানে আছ সেখানে কি তার কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে তাজ? তাকে-তো আমি ভালোবাসি না, তাকে শিগ্‌গিরই ত্যাগ করব। আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ অনিবার্য।

হঠাৎ উঠে মমতাজ জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জানলা খোলা; আকাশের বুকে তারা; নিচে সিক্ত ঝোপঝাড়ের ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে জোনাকিরা জ্বলছে-নিভছে, আর সোঁদালো গন্ধ বয়ে অতি মৃদু শীতল হাওয়া বইছে।

জোনাকিগুলোর পানে তাকিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে মমতাজ বলল :

'আপনি ভুল করেছেন, আনোয়ার সাহেব।'

পলকে আনোয়ার সোজা হয়ে বসল; হাতের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে ব্যগ্র চাপা গলায় আবার বললে :

'বুঝলাম না।'

'আপনি বিজ্ঞ, আপনার বোঝা-তো উচিত।... মানে, যে-অভাবটা আপনি আমাকে পূর্ণ করতে বলছেন, তা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'তুমি-তো আমায় ভালোবাস মমতাজ!'

'ভালোবাসি। কিন্তু সে-ভালোবাসা ইন্টেলেকচুয়াল বন্ধু হিসেবে, স্বামী হিসেবে নয়। ও-কল্পনা আমার মনে কখনো স্থান পায় নি। আমাকে মাফ করবেন।'

জানলা গলে কালো শীতল হাওয়া ভেসে আসছে। রাত্রির নিবিড় অন্ধকার ছুঁয়ে এসেছে সে-হাওয়া। ঘরে টিকটিক করে ঘড়ি চলছে; সময় চলছে; চাঁদের মতো স্নিগ্ধ আলোয় দুটি স্তব্ধ কালো ছায়া।

'এবার তাকে ফিরিয়ে আনুন।'

'আনলে আমার গর্ব চূর্ণ হবে। ওকে ডাকা আমার দ্বারা আর হবে না। যে-ভুল করলাম, সে-ভুলের শাস্তি আমাকে ভোগ করতেই হবে; তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জো নেই মমতাজ।... যাবার পূর্বে ও বলেছিল, অন্যায় করে কারো অন্তরে ঘা দিলে খোদা কখনো সহ্য করেন না। হয়তো-বা তাই হয়েছে। কোনো পথ আর দেখছিনে, হঠাৎ আমার দু-চোখ যেন অন্ধ হয়ে পড়ল।'

গভীর দুঃখে আনোয়ারের কণ্ঠস্বর ভেঙে গেল। বড় আশা-ভরসা নিয়ে সে যে-ঝড়ের মুখের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল, সে-ঝড় তার মুখ ভেঙে দিয়ে গেল। অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে সে-ঝড় এখন বিদ্রূপ করছে।

'জান মমতাজ, তোমার ওপর কতখানি আস্থা রেখে আমার সুখের গড়ে-তোলা সংসারটি মুহূর্তে ছাই করে দিলাম। তোমাকে দোষ দিই না, দোষ আমার বুঝবার।'

নীরবতার মধ্যে মমতাজ নিস্পন্দ হয়ে রইল। তার যেন বলবার কিছু নেই। ঝড় যার কানে কথা কয়ে যায়, এ-বিপর্যয়ে তার কিছু বলবার নেই।

রহিমার কান্নায় যে মনে-মনে হেসেছিল, সেই এখন কাঁদছে। খোদা কখনো অন্যায় সহ্য করেন না। অতল স্তব্ধতার মধ্যে অবাঙ্মুখ হয়ে বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ আনোয়ার কেঁদে ফেলেছে। সে যে অপরাধী তাই প্রকাশ পাচ্ছে তার কাঁদবার ভঙ্গিতে।

এমন সময় একটি ঘোড়ার গাড়ি ঘড়-ঘড় করে গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল। বোধহয় রহিমা ফিরে এসেছে। গেট বন্ধ; গেটের পাশে ছোট দারোয়ানের ঘরে পশ্চিমা বৃদ্ধ দারোয়ান ঘুমোচ্ছে। ডাকাডাকিতে দারোয়ান উঠে গেট খুলতে যেতেই মমতাজ দীপ্তভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে জানলার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে সুউচ্চ কোমল গলায় বললে : 'রব্বানি। গেট মৎ খোলো। সাব্‌কা হুকুম নেহি হ্যায়।'

'যো হুকুম।'

দামি কৌচে ডুবে-যাওয়া অবাঙ্মুখ আনোয়ার মুখ তুলে চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ আলোর মধ্য দিয়ে শুধু ভাষাহীন-অর্থহীন-দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মমতাজের হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তিময় মুখের পানে। কিন্তু সে-বিমূঢ়তা শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে গেল খোলা জানলার ধারে। চিৎকার করে বলল :

'গেট খোল দেও, দারোয়ান।'

ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা; সময় যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। আনোয়ার আস্তে ফিরে দাঁড়াল, তার মুখে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য চোখে তৃপ্তির স্নিগ্ধ ছায়া। স্থির মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা মমতাজের পানে চেয়ে সে অতি মৃদুকণ্ঠে বললে :

'ও বলেছিল প্রকাণ্ড ভুল, সত্যি তাই আমি করতে বসেছিলাম। কিন্তু, আমাকে ভাগ্যবান বলতে হবে। আমার রহিমার স্থান যে সাধারণ্যের অনেক উচ্চে, তার প্রমাণ আজ সর্বপ্রথম পেলাম। তার তুলনা নেই, তাই আমার মতো সুখী লোকও দুনিয়াতে নেই।'

আনোয়ার দরজার পানে চলতে আরম্ভ করে মধুরভাবে হেসে কোমলকণ্ঠে বললে : 'চল মমতাজ, ওকে আবার নতুন করে ঘরে তুলে আনি, আর আমরা ভুলে যাই আমাদের সব অপরাধ। কেমন?'

দরজার ভারি খয়েরি রঙের পর্দা আনোয়ার সরাবার পূর্বেই একটা লম্বা মতো লোক সেটা সরিয়ে ঘরে ঢুকলে। সে রহিমার ভৃত্য। ঘরে ঢুকেই লোকটা আনোয়ারের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

'কী? কী হয়েছে?' আনোয়ারের কণ্ঠে অস্বাভাবিক উত্তেজনা, চোখ-মুখ শঙ্কাকুল। রহিমার ভৃত্যের অশ্রান্ত কান্নার মধ্যে-মধ্যে যে-সব অসংলগ্ন কথা থেকে-থেকে ফুটে বেরুতে লাগল, তা একত্র করে-করে সংক্ষেপ করলে এই হয় যে, তাদের ঘোড়ার গাড়ি যখন স্টেশনে পৌঁছল, তখন সে কৌচবাক্স হতে নেবে দরজায় নীরবে মায়ের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু মা নাবল না, বা সাড়া দিলে না। তখন সে ডাকলে, তবু গাড়ির ভেতরের অন্ধকারে নীরবতা। শেষে আলো নিয়ে দেখে মার মৃত্যু হয়েছে।—রহিমার মৃত্যু হয়েছে।

আনোয়ার অর্থহীন অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে প্রস্তরমূর্তির মতো নিস্পন্দভাবে রইল দাঁড়িয়ে, আর তার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে অবিশ্রান্তভাবে ডুকরে-ডুকরে কাঁদতে থাকল লোকটা।

বাইরে পুঞ্জীভূত নীরবতার মধ্যে মোটরের ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ হল। অলক্ষ্যে-অজ্ঞাতে মমতাজ কখন নীরবে চলে গেছে; আনোয়ারের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবার সাহস বুঝি তার নেই।

বৈশাখ ১৩৪৯ এপ্রিল ১৯৪২

প্রাস্থানিক

চৈত্রের শেষে পল্লবশূন্য গাছে-গাছে নতুন সবুজ কচিপাতা গজিয়ে ওঠবার আগেই সাঈদের মেয়াদ ফুরিয়ে এল। তার অস্থায়ী পোস্টাফিসের চাকরিটির নির্দিষ্ট সময় উতরে গেলে। এবার তার যাবার পালা।

যে-দিন সাঈদ তার কর্মস্থল ত্যাগ করে বাড়ি চলে যাবে, সে-দিন অতি প্রভাতে সে বিছানা ছেড়ে উঠল। উঠে ধীরে-ধীরে জানলার কাছে গিয়ে গরাদ ধরে দাঁড়ালে। তার ঋজু পাতলা দেহে তখনো ঘুমের জড়িমা : তার পদ্মের মতো চোখ দুটি তখনো নিদ্রালস। জানলার নিচেটা নানারকম ফুলের গাছে পরিপূর্ণ; তারই মিষ্টিমধুর গন্ধে সাঈদের নাক ভরে উঠল। বাইরে আকাশে আলো ফুটেছে, কিন্তু সে-আলোতে রক্তাভা নেই : আছে একটা বিস্তৃত পবিত্র সুনির্মল স্নিগ্ধতা। দূরের জিনিস আবছা-আবছা দেখাচ্ছে, যেন পৃথিবীর গায়ে কুয়াশা। আর ধূলিধূসর সাদা মাটির পথটি, যে-পথে আজ সে চলে যাবে, সে-পথটি, অস্পষ্টভাবে একাকী বিলম্বিত : তার নিদ্রা এখনো যেন ভাঙে নি।

যে-প্রভাত এ-স্থানের ওপর অপূর্ব মাধুর্যে জড়িয়ে প্রত্যহ নাবে, যে-প্রভাত তাঁর অস্ফুট আলোয় সর্পিল নিদ্রিত পথটির নিদ্রা প্রত্যহ ভেঙে দেয়, সে-প্রভাত দেখা সাঈদের আর কখনো ঘটবে না; পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানের প্রভাতের অস্পষ্ট নির্মল আলোয় তার জীবনের দিনগুলো কেটে যাবে, হয়তো সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবে অপরিচিত কোনো প্রভাতী ঝিরঝিরে হাওয়ায় : এ-স্থানের প্রভাতের নিকট তার চিরবিদায়।

যে-বাড়িটার পর হতে ধু-ধু করা লতাগুল্মহীন প্রান্তর আরম্ভ হয়েছে, সে-বাড়িতে নিঃশব্দ-চরণে সাঈদ প্রবেশ করলে। দোরগোড়ায়, দুটি থাবার ওপর মুখ রেখে একটা কুকুর

ঝিমাচ্ছিল, সাড়া পেয়ে লেজ নেড়ে তাকে স্বাগত করল। কয়েক মুহূর্ত ওকে আদর করে, সম্মুখের বড় ঘরটিতে প্রবেশ করতেই সাঈদ গৃহকর্ত্রীর সাথে মুখোমুখি হল। কর্ত্রী হাসলেন, তাঁর স্নেহ-কোমল মুখখানি সে-হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি মিষ্টি গলায় বললেন :

'এস, বাবা, এস।'

সাঈদ তাঁর মায়াময় স্নিগ্ধ চোখের পানে চোখ মেলে তাকালে, মৃদুকণ্ঠে বললে :

'হয়তো শুনেছেন, এখান থেকে আমার চলে যাবার সময় হয়েছে।'

'শুনেছি বাবা। শুনে সেদিন আমার মনটা যেন কেমন করে উঠল।... কবে যাবে?'

'আজ।'

'আজ?'

সাঈদ কিছু বললে না, শুধু মুখ নত করলে।

'আজই চলে যাবে বাবা?...' কর্ত্রী কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকলেন, তারপর : 'মনটা কেমন করছে সাঈদ।...আমার ছেলে নেই, তুমি আমার ছেলের মতোই ছিলে। কিন্তু, তোমাকে যে এত মায়া করি সে কি আগে জানতাম?'

সাঈদ নিরুত্তর। শুধু এক মুহূর্তের জন্য সে চোখ তুলে জানলা দিয়ে ধূসর বিস্তীর্ণ প্রান্তরের পানে তাকালে। রোদ তখনো চড়ে নি, তাই প্রান্তরে প্রভাতের সজলতা, স্তব্ধ নীরবতা। মাথা নত করে সে মনে-মনে ভাবলে, এত সকালে আসা তার অনুচিত হয়েছে, প্রান্তরের গায়ে এখনো সজলতা, নীরবতা।...কর্ত্রীর চোখ ছলছল করছে, অপরাধীর মতো সাঈদ অবাঙ্মুখ। তাঁর বুকে কতখানি লেগেছে সাঈদ জানে, এবং জানে বলেই তাঁর চোখের পানে তাকাতে সাহস হচ্ছে না।

কতক্ষণব্যাপী নীরবতার পর গাঢ় কণ্ঠে কর্ত্রী বললেন :

'আল্লার কাছে দোয়া করি, যখন যেখানেই তুমি থাক না কেন, তিনি যেন তোমাকে ভালো রাখেন, তোমার জীবনে যেন উন্নতি হয়, সুখ-শান্তি হয়।' সাঈদ একাগ্রমনে তার ব্যথায় জড়ানো কণ্ঠের কথাগুলো শুনলে। শুনে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল তাঁর শুভ্র-কোমল সুন্দর পা-দুখানির পানে। ভাবলে, অমন সুন্দর পায়ের ওপর যদি তার অধিকার থাকত, তাহলে সে জন্ম সার্থক হয়েছে বলে মনে করত : মনে করত, জীবনটা শান্তি ও স্নেহে পরিপূর্ণ, আপ্লুত।

কর্ত্রীর বড় মেয়ের বড় ছেলে আবু কোথেকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলে সাঈদকে। ফুটফুটে চেহারা, কোঁকড়ানো চুল, লাল ঠোঁট, আর কালো চঞ্চল দুটিচোখ। সে-চোখদুটি সাঈদ ভালোবাসে, আর ভালোবাসে তার সুন্দর স্বভাবকে।

আবু ফিক করে হাসলে, মিষ্টিগলায় বললে :

'জানেন, আসছে রোববার আমরা পেছনের বাগানে চড়ুইভাতির আয়োজন করছি। আপনার কিন্তু আসা চাই সাঈদ ভাই।'

ওর গালদুটো টেনে, একটু হেসে, সাঈদ বললে :

'আজ যে চলে যাচ্ছি আবু।'

'হঠাৎ আবুর চোখদুটো বিস্ময়ে ভরে উঠল। বললে :

'কোথায়?'

'বাড়ি।'

'বাড়ি?...ইস। মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে কথা। জানি, এসব না আসবার ফিকির। কিন্তু কোনো ছাড়াছাড়ি নেই, আপনাকে আসতেই হবে।...ও ছোট আপা!'

আবু দরজার পানে তাকালে, সাঈদও। কে যেন দাঁড়িয়েছিল সরে গেল। কিন্তু, অবশেষে যখন আবু জানতে পারলে যে, সাঈদ ভাই সত্যিই চলে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ যেন সে মুষড়ে পড়ল, তার কালো চঞ্চল চোখদুটি স্থির ও ব্যথাতুর হয়ে উঠল। নানির কোলঘেঁষে সে নিঃশব্দে

দাঁড়িয়ে রইল। ওপর পানে চেয়ে ম্লান হাসি হেসে কর্ত্রী বললেন :

'আবুটা তোমাকে বড় ভালোবাসে সাঈদ। দেখনা, তোমার যাবার খবরটা শুনতেই ওর মুখটা কেমন শুকিয়ে উঠল।.... আচ্ছা বাবা, কোনো চেষ্টাচরিত্তির করে তুমি কি এখানে আরো কিছুদিন থাকতে পার না?'

'সে কি আর হয়! আর তাছাড়া, যতই থাকব, ততই-তো মায়া বাড়বে। চিরদিন যখন আর একসাথে থাকতে পারব না, তখন মিছিমিছি মায়া বাড়াবার চেষ্টা করে কী লাভ বলুন?'

কর্ত্রীর বড়মেয়ে নাজমা, যিনি গতকালমাত্র শ্বশুরবাড়ি থেকে এখানে এসেছেন, এসে মধুর হাসি হেসে বললেন :

'এই যে, সাঈদ। কখন এলে? এই এখন? জান আসবার সময় ট্রেনে মনে-মনে ভাবছিলাম, হয়তো এবার গিয়ে তোমার দেখা পাব না, এ্যাদ্দিন কি আর তুমি আছ! যাক, সময় তাহলে বেশ কাটবে, না?'

'ও আজ চলে যাচ্ছে রে নাজমা।'

'চলে যাচ্ছে? আজ চলে যাচ্ছে ও, আম্মা? বল কী?...সাঈদ, সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ, আজ চলে যাব।'

নাজমার চোখে যে কয়েক মুহূর্ত পূর্বে একটা উচ্ছল আনন্দের ঔজ্জ্বল্য ছিল, সে-ঔজ্জ্বল্য মুছে গিয়ে তার চোখ দুটি অস্পষ্ট বেদনায় ভরে উঠল। সহসা তিনি কোনো কথা বলতে পারলেন না। তারপর ব্যথাতুর মুখের ওপর ম্লানভাবে হেসে বললেন :

'তাহলে, আমাদের মায়া কাটিয়ে সত্যিই চলে যাচ্ছ, সাঈদ?...চলে-তো যাবে, কিন্তু আমাদের কথা কি তোমার মনে থাকবে, না ভুলে যাবে? সেই যে, পেছনের বাগানে ছুটোছুটি করে আমাদের লুকোচুরি খেলা, অশ্বত্থ গাছটার তলায় দোলনায় গান গেয়ে-গেয়ে দোলা, জোছনারাতে নৌকোয় করে বেড়ানো,... কতসব অসংখ্য মধুর স্মৃতি, সব ভুলে যাবে, না, মাঝে মাঝে মনে পড়বে ভাই?'

'ও-কি কেউ কখনো ভোলে আপা, মিছিমিছি প্রশ্ন করে কেন ব্যথা দিচ্ছেন?'

'ব্যথা দিচ্ছি?...ও, তুমি ওতে ব্যথা পেলে সাঈদ?'

বাইরে রোদ চড়ছে; প্রান্তরে আগুন-জ্বলা বোধহয় শুরু হয়েছে। এখন ওদিক হতে যে-হাওয়া ভেসে আসবে, সে-হাওয়ায় ভরা থাকবে আগুনের হল্কা। সে-তপ্ত হাওয়ায় সজল—অশ্রুসজল চোখ শুকিয়ে ওঠে।

নাজমা কাতরভাবে হাসলে, মাকে বললে :

'কেমন লাগছে আম্মা, বল তো?'

কর্ত্রী কিছু বললেন না; তার অভিজ্ঞ চোখে ব্যথার স্পষ্ট ছায়া।

অন্তরে ব্যথা লাগছে কি না, সাঈদ বুঝতে পারছে না, ওঁদের সকলের অপরিসীম ব্যথার ঢেউয়ের দোলায় তার ব্যথা যেন তলিয়ে গেছে। ব্যথা না লেগে বরঞ্চ তার সঙ্কোচ হচ্ছে; একজনের জন্যে অনেকে ব্যথিত হলে সঙ্কোচ হয় বৈকি।

বাড়িটার পেছনে বড় বাগান। সে-বাগানের মাঝখানে কৃষ্ণচূড়ার লালিমার তলায় আয়েশা নীরবে নতমুখে সূচীশিল্প নিয়ে মগ্ন। একবার মুখ তুলে সে সাঈদের আগমন লক্ষ্য করল—শুধু এক মুহূর্তের জন্য, তারপর আবার মাথা নত করলে। তার হাতের কাজ এগিয়ে চলেছে।

স্থানটি ছায়াচ্ছন্ন, যেন অস্পষ্ট বেদনায় সমাচ্ছন্ন। প্রান্তরের উত্তপ্ত হাওয়া—যে-হাওয়া অশ্রুসজল চোখ শুকিয়ে তোলে, সে-হাওয়া এখানে নেই; এখানকার হাওয়া স্নেহের মতো সুশীতল, স্নিগ্ধ।

'শুনছ?' মৃদুকণ্ঠে আয়েশার নতমুখের পানে তাকিয়ে, স্তব্ধ-নীরবতা ভেঙে সাঈদ প্রশ্ন করলে।

সুচ থেকে সুতো খুলে গিয়েছিল, সে-টা আবার পরাতেই আয়েশা ব্যস্ত থাকল, উত্তর দিলে না। বোধহয় শুনেছে।

'তোমার ইস্কুল আজ ছুটি, আয়েশা ?'

'আজ রোববার।'

'ও।'

বাগানের এক প্রান্তে কটি ইউক্যালিপ্টাস গাছ; তারই গন্ধে সারা বাগান ভরা। সে-গন্ধের তীব্রতার কাছে অন্যান্য গন্ধীগাছ যেন ম্লান হয়ে গেছে। নীরবে কতক্ষণ তা-ই লক্ষ্য করলে সাঈদ, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে :

'তাহলে আসি। বিছানা, সুটকেস, সবকিছু গোছাতে হবে, বাঁধতে হবে।...তা, আমাকে তোমার মনে থাকবে আয়েশা?'

'না।' গম্ভীরভাবে নতচোখেই আয়েশা উত্তর দিলে, কণ্ঠে বিন্দুমাত্র কম্পন নেই। এটা কি রহস্য, না, তার সত্যবাদিতার অন্যতম দৃষ্টান্ত, সাঈদ বুঝলে না। একটু মর্মাহত হয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললে :

'ও।...আচ্ছা। এবার আসি, বেলা হল।'

'না'। গাম্ভীর্য নিয়েই আয়েশা উত্তর দিলে, চোখও তুললে না। সাঈদ বিস্মিত চোখে তার পানে তাকালে, বললে :

'না! মানে?'

'না মানে, না' আয়েশা এবার মুখ তুললে : কয়েক মুহূর্ত কেমনতর এক স্থিরদৃষ্টিতে সাঈদের পানে তাকিয়ে থেকে সোজাসুজি বললে :

'আপনি কোথায় যাবেন মনে করেছেন? আপনার যাওয়া হবে না।'

'কী বলছ, আয়েশা?'

'হুঁ। আপনার যাওয়া হবে না, আপনি এখানে থাকবেন।'

'তুমি পাগল হলে নাকি? আমার চাকরি যখন আর রইল না, তখন এখানে থাকি কী করে? এ-কি আমার বাড়ি?'

সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিতে না-পারলেও কয়েক মুহূর্ত পর সে নিতান্ত অবুঝের মতো জোর দিয়ে বললে :

'না, না। ওসব আমি বুঝি না। আপনি থাকবেন।'

'মাথা খারাপ। পাগলী।' অসহায়ের মতো সাঈদ হাসলে।

'বেশ। তবু থাকতে হবে।' আয়েশার ঠোঁটে, চোখে, বলার ভঙ্গিতে ছেলেমানুষেমি।

আম আর জামগাছের ফাঁক দিয়ে প্রান্তরের ক্ষুদ্র এক প্রান্ত দেখা যাচ্ছে; তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সাঈদ নির্বাক হল। সুশীতল ছায়ার ভেতর দিয়ে সে-জ্বলন্ত ভূমিখণ্ডের পানে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তার চোখ জ্বালা করে উঠল; বনানীর ছায়ায় দয়িতার পাশে বসে ছলছল চোখে সে স্তব্ধ হয়েই থাকল।

'সত্যিই আজ চলে যাচ্ছেন, না সাঈদ ভাই?'

সাঈদ উত্তর দিলে না, উত্তর দেয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন। নিরুত্তর থাকাই শ্রেয়।

'আচ্ছা, আমাকে, আমাদের ছেড়ে যেতে আপনার বুকের কোনোখানটাও কি একটু টনটন করছে না? আপনি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারছেন?...আমি হলে কিন্তু এক্ষেত্রে কখনো চলে যেতে পারতাম না। কারো প্রাণে আমি দুঃখ দিতে পারি না। আপনি পারেন!'

'কেন ব্যথা দিচ্ছ?' সাঈদ গাঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল।

'কে ব্যথা দিচ্ছে?' সাথে-সাথে দৃঢ়কণ্ঠে আয়েশা তার প্রতিবাদের প্রতিবাদ করলে।

কৃষ্ণচূড়া-বৃক্ষের লালিমার তলায় নাজমাও এসে বসলেন। তাঁর কোমল উজ্জ্বল ফরসা মুখের পানে তাকিয়ে, তাঁর অমিতাময় চোখের পানে তাকিয়ে মনে শ্রদ্ধা জাগে, সম্ভ্রম জাগে।

সাঈদের ও আয়েশার সত্তাকে ম্লান করে দিয়ে তিনি ধীরে-ধীরে তাদের মাঝখানে বসলেন। বললেন : 'কটার সময় যাবে সাঈদ?'

'সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে যাব। সেটাতে গেলে আমাকে এখান থেকে গোটা চারেকের সময় রওনা হতে হবে।'

'তবে দুপুরে খানা, বিকেলে চা, আমাদের এখানে খাবে। কেমন?...মেসে যদি যাবার কোনো দরকার থাকে, তবে এখন একবার ঘুরে আসতে পার।'

'যাওয়া-তো উচিত। সবকিছু গোছাতে হবে। সকালে চা খেয়েই বেরিয়েছি, কিছু ঠিক করি নি।'

'ও আপা!' আব্দারে গলায় আয়েশা নাজমাকে ডাকলে : 'ওঁর আর কী দরকার মেসে যাবার? মেসে যা-কিছু ওঁর আছে, এক্ষুনি চাকর পাঠিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি। এমন কীই-বা আছে!'

সাঈদ হাসলে :

'থাকবার-তো কথা নয়। আমি গরিব। পেটের দায়ে ত্রিশ টাকার কেরানিগিরি করতাম, তাও তো গেল। এবার আমি পথের ভিক্ষুক।'

'ইস্! বললেন একটা কথা! আমি বুঝি তাই বললাম?'

'তাই-তো বললে।'

'ও আপা! দেখনা কী বলছে!' আপার বলার অপেক্ষা না করেই সাঈদের পানে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে সে বললে : 'লোকটা কী রে!'

'লোকটা যা-ই হোকনা কেন, আজ সে চলে যাচ্ছে।'

'যাকনা, যাক। খুশি হই তাহলে।' আয়েশা ঠোঁট উল্টে মাথায় মৃদু ঝাঁকুনি দিলে, আর ঝাঁকুনি লেগে একফোঁটা পানিও চোখ হতে টস্ করে গড়িয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। সে-তপ্ত ফোঁটা নাজমা লক্ষ্য না করলেও সাঈদের চোখ এড়াল না।

তা-ই হল। চাকর গিয়ে মেস থেকে বিছানাপত্তর নিয়ে এল। গত রাত্রেই মেসের বাকি পাওনা মিটিয়ে দেয়া হয়েছিল, কাজেই সেদিকে কোনো বিপত্তি ছিল না, শুধু একটি মাত্র হলদে কাগজে দুটি পৃষ্ঠাই ভরা নানা হস্তে লেখা একখানা চিঠি পেয়ে সাঈদ মনে-মনে শঙ্কিত হল; পড়বার আগে বললে : 'আমার মেসের বন্ধুরা বোধহয় শেষদর্শন প্রার্থনা করছেন।'

ঝট করে ওর হাত হতে কাগজখানা কেড়ে নিয়ে আয়েশা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললে। বললে :

'থাক। ও আর পড়ে কাজ নেই।'

'যাবার-দিনে অমন করতে নেই আয়েশা।'

'না, করতে নেই।'

'যাবার-দিনে অত রাগ করতে নেই।'

'খুব করব, একশোবার করব। আবার করতে নেই।'

তখন কর্ত্রী অথবা নাজমা কেউ সেখানে ছিলেন না, তাই মৃদুকণ্ঠে হেসে সাঈদ বললে :

'কৃষ্ণচূড়ার তলায় তখন তোমার চোখ হতে ও কী ছিটকে পড়েছিল আয়েশা?'

'কী আবার?'

'তুমি বল না।'

'কী? কাঁদছিলাম ভেবেছেন বুঝি? কেন? কোন্ দুঃখে আমি কাঁদতে যাব? ইস!'

'যাবার-দিনে একটু ভালো করে কথা বলবে না আয়েশা?'

'যাবার-দিন! শুধু যাবার-দিন যাবার-দিন শোনাচ্ছেন কেন আমাকে? ভেবেছেন, আপনি চলে যাবেন বলে আমার বুকে বড় লাগছে, না?'

'তবে তখন যেতে চাইলে 'না' বলেছিলে কেন?'

'কাজ ছিল বলে। সুচে সুতো পরাতে দিতাম।'

কর্ত্রী, নাজমা-আয়েশার মা, আজ নিজ হাতে রান্না করছেন। বাবুর্চিখানায় তাঁর কাছে গিয়ে একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে সাঈদ বসলে। বললে :

'মা, আপনি রান্না করছেন যে?'

'তোমার জন্যে,...আজ হঠাৎ আমাকে মা বললে যে বাবা?' উনোন হতে কড়া নাবাতে-নাবাতে স্নেহময় চোখের ওপর স্নিগ্ধ হাসি হেসে তিনি বললেন। সাঈদ উত্তর দিলে না, তার ফরসা কোমল মুখটি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তার পদ্মের মতো দুটি চোখ নত হয়ে এল। উনোনের তাপে ঘরটা উত্তপ্ত, সে-উত্তপ্ত আবহাওয়ার মাঝখানে সাঈদ ঘেমে উঠল। কর্ত্রীও ঘামছেন। তাঁর কপালে ও নাকের তলাটায় বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'বাবা, তোমার সাথে আমাদের পরিবারের পরিচয় শুধু মাস ছয়েকের, এরই মধ্যে তুমি যেন কত আপনার হয়ে উঠেছ। তোমাকে ছাড়তে মন চাইছে না, কিন্তু কী করি, কোনো উপায়-তো নেই বাবা। তোমার কথা আমাদের আজীবন মনে থাকবে। তোমার মধুর ব্যবহার, সুন্দর স্বভাব, ফুটফুটে চেহারা, বড়দিলের কথা—সব সময়েই মনে পড়বে।...তুমি আজ হঠাৎ আমায় মা বলে ডাকলে, বড় ভালো লাগল বাবা, শুনে বুকটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কৈ, নাজুরা-তো অত মিষ্টি করে কখনো আমাকে ডাকে না। তোমার মা নেই কিনা, তাই অত প্রাণ দিয়ে ডাকতে পারলে।'

শুধু মা নেই? মনে-মনে সাঈদ ভাবলে, তার কীই-বা আছে? তার জীবনটা যেন ঐ রৌদ্রদগ্ধ ধু-ধু-করা বিস্তীর্ণ প্রান্তর; সেখানে ছায়া নেই, মায়া নেই, শীতলতা নেই। নিজের অজ্ঞাতেই তার পদ্মের মতো চোখদুটি ছলছল করে উঠল; হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বললে :

'মা এখানে থাকতে পারছি নে। মসলার ঝাঁজ লাগছে চোখে।' বলে সে ছুটে সেখান হতে পালিয়ে গেল।'

'আপা, আপনি গুছাচ্ছেন যে?'

নাজমা ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে মধুরভাবে হেসে বললেন :

'থাক। যাবার দিনে ভাইয়ের এটুকু কাজ করলামই-বা সাঈদ, কেন বাধা দিচ্ছ?'

ও-ঘরে একটা বেতের চেয়ারে আয়েশা নিশ্চলভাবে বসে ছিল। তার পেছনে চুপি-চুপি গিয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় মৃদুভাবে ক-টা টোকা দিতেই একবার খপ করে আয়েশা সাঈদের কর্মরত আঙুলটা ধরে ফেললে; সে-আঙুলে আস্তে মোচড় দিয়ে সে বললে :

'এবার দি ভেঙে? উঁ? দি ভেঙে?'

কিছুক্ষণ পর।

'আচ্ছা আয়েশা, "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে" গানটা একবার গাইবে?'

'কেন শুনি?' "তখন চাঁদের পানে চেয়ে-চেয়ে নাই-বা আমায় ডাকলে" আমাকে দিয়ে বলাবার জন্যে বুঝি? চাঁদের পানে চেয়ে কেন, কখনো স্বপ্নেও-তো আমি আপনাকে ডাকব না। ডাকার-তো কোনো প্রয়োজন আমি দেখছি না।'

সাঈদ মুখ টিপে হাসলে।

'হাসছেন যে বড়?'

'কেন হাসছি বলব না।' অল্পক্ষণ থেমে আবার বললে :

'আমাকে এমনভাবে বিদায় দেয়া তোমাদের কিন্তু উচিত হয় নি। ঘরে ডেকে সম্বন্ধটা আরো ঘনিষ্ঠ করে তুলে বিদায় দিলে; এ যেন কুকুরকে লাই দিয়ে মাথায় তুলে লাথি মেরে তাড়ানোর মতো হল আয়েশা।

'ছিঃ! কার সাথে কী তুলনা করছেন?'

'করব বৈকি! যা ইচ্ছে হয় তা-ই করব। আমার অন্তরটা আমি দৈন্য দিয়ে ঢাকতে নারাজ। গরিব হতে পারি, তা বলে কাঠ নই। আঘাত করলে নীরবে সইব তা-যেন মনে কোরো না।'

এবার আয়েশা মধুরভাবে হাসলে। হাসিটা সত্যিই মধুর। আরো মধুর লাগল এই কারণে, যে, তাকে আজ এক মুহূর্তের জন্যও হাসতে দেখা যায় নি; যেমন সূর্যের আলো আরো ভালো লাগে সারাদিন মেঘের অন্তরালে থাকার পর ফুটে উঠলে। সে হাসলে। বললে :

'ওসব কী মাথামুণ্ডু বলছেন, বলুন তো?'

সামনের বারান্দা দিয়ে ঘুরে তারা পেছনের বাগানে গেল। বারান্দা দিয়ে যখন যাচ্ছে, তখন তারা দুজনেই প্রখর রোদে উত্তপ্ত জ্বলন্ত তৃণগুল্মহীন ধু-ধু-করা প্রকাণ্ড প্রান্তরের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে অকস্মাৎ আয়েশা শিউরে উঠল, আর, যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত সাঈদ অনিমেষ নয়নে সে-রুদ্রমূর্তির পানে তাকিয়ে রইল।

বাগানে ছায়া-শীতলতা। দীর্ঘ দেবদারুগাছটার তলায় তারা দুজনে বসল। দূরে কোথাও একটা ঘুঘু উদাসকণ্ঠে ডাকছিল। সে-ডাক ওরা দুজনে কতক্ষণ একাগ্রমনে একান্তভাবে শুনলে, তারপর আয়েশা কথা বললে, দুজনার স্তব্ধ নীরবতা ভেঙে গেল।

'সত্যিই আপনি চলে যাবেন সাঈদ ভাই? আমার কেন জানি কথাটা বিশ্বাস হতে চাইছে না।...সত্যি-সত্যি চলে যাচ্ছেন, না?' তার বড়-বড় চোখদুটি অস্পষ্ট ব্যথায় ভরে উঠল, তার ওপর করুণভাবে হেসে সে আবার বললে :

'বলুন না! সত্যিই যাচ্ছেন, না? কিন্তু কী করে যাবেন আপনি? বুকে কি একটুখানিও ব্যথা লাগবে না?...আপনি চলে গেলে আমার মনটা যে কেমন করবে, থেকে-থেকে শুধু বুক ফেটে কান্না আসতে চাইবে।...সে-কথা কি ভেবে দেখেছেন?'

সাঈদ অবাঙ্মুখ ও নীরব। তাদের মাথার ওপর দীর্ঘ দেবদারুগাছটাতে অস্পষ্ট শিরশির শব্দ হচ্ছে; গাছের পাতার এই শব্দটুকু ছাড়া স্থানটি অতি নীরব, নিস্তব্ধ; সে-নীরবতা যেন শেষরাতের শৈলশিখরের স্তব্ধ নীরবতা। এ-নীরবতায় প্রাণের বেদনার অস্পষ্ট ছলছলানি যেন শোনা যায়, কোথায় কোন অভিমানের বাঁকে সে-স্রোত জোয়ারের মতো ফুলে-ফুলে উঠছে, তাও উপলব্ধি করা যায়।...এ-ছায়াচ্ছন্ন নীরবতার মাঝে ওদের দুজনার—সাঈদ আর আয়েশার, নির্বাক নিশ্চল হয়ে থাকতেই ভালো লাগছিল, তবু আয়েশা গভীর ব্যথায় ভেঙে-পড়াপ্রায় কণ্ঠে বললে :

'আপনি আমার পানে তাকান, তাকিয়ে বলুন যে, এখানে আপনি কিছুতেই থাকতে পারেন না?'

'না, আয়েশা।'

'আমাদের ছেড়ে আপনি চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছেন,...চিরকাল। আর কখনো কি আপনার সাথে আমাদের দেখা হবে না সাঈদ ভাই?'

'হতে পারে। কখনো কোথাও দেখা হতেও পারে।'

'কখনো কোথাও দেখা হতেও পারে।' আস্তে-আস্তে আয়েশা পুনরাবৃত্তি করলে অস্ফুট কণ্ঠে। 'ঐ' "কখনো কোথাও"র ওপর আমাদের ভরসা করে থাকতে হবে। তাই, না? কিন্তু কেন? এছাড়া কি অন্য পথ নেই? সারাটা জীবন শুধু অন্ধের মতো চলব, কখনো কোথায় খোদার রহমতে আপনার দেখা পাই-তো পাব। কিন্তু মৃত্যুর সময় যখন এতদিনকার এই আশায় গড়ে-তোলা ভিতটা ভেঙে পড়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে, তখন কী হবে?'

সাঈদ অবাঙ্মুখ ও নীরব হয়েই থাকল। আর আয়েশা মুখ তুলে ব্যথাপূর্ণ দৃষ্টিতে

আগ্রহভরে সাঈদের পানে চেয়ে কী প্রশ্নের উত্তরের আশায় আশান্বিত হয়ে থাকল।

নীরব কয়েক মুহূর্ত। গাছের পাতাও নড়ছে না; ঘুঘুটা যে ডাকছিল, সে-টাও কোথায় উড়ে চলে গেছে। তারপর দু-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হঠাৎ আয়েশা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। অপ্রতিভ সাঈদ মনে মনে ভাবলে, কাঁদা ভালো, কাঁদা ভালো, ওতে অন্তর অনেকটা হালকা হয়ে আসে, যেমন পানিবর্ষণের পর গুমট আকাশের হয়। বুক যেন আকাশ।

প্রখর রৌদ্রের তাপে ঝিমিয়ে-পড়া অলস বেলা আগতপ্রায় বিদায়ের ব্যথায় অভিভূত আয়েশা ও সাঈদের ওপর দিয়ে ধীরে-ধীরে গড়িয়ে গেল। আয়েশা সাঈদের কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে মিনতি জানাল :

'আরেকবার বাগানে আসবেন?'

'চল।'

নানারকম গাছে-ভরা নির্জন বাগানটা আয়েশার খুব প্রিয়, সাঈদেরও। বকুলগাছের তলায় বসে অস্ফুটকণ্ঠে আয়েশা বললে :

'এ-বাগানে আসা আমার এই শেষ।'

'শেষ কেন আয়েশা?'

আয়েশা কোনো উত্তর দিলে না।

'আচ্ছা আয়েশা, আমাকে কি তুমি ভুলতে পারবে না?'

'ভুলতে আপনি হয়তো পারবেন, আমি পারব না।' তার কণ্ঠ ছাপিয়ে একটু অভিমান ভেসে উঠল।

'ভুলতে পারা না-পারার কথা এখানে হচ্ছে না, কিন্তু চেষ্ট করা কি নেহাত খারাপ হবে আয়েশা?'

'চেষ্টা আমি কখনো করব না।' এবার সে রেগে উঠেছে : 'ওসব কী বলছেন আপনি?'

সাঈদ নীরব হল। ওর পায়ের কাছে, আয়েশার পায়ের কাছে ঝরা-বকুল ফুল। তারই গন্ধ স্থানটা বিভোর করে রেখেছে, সাঈদের নাকও। বাগানে তখন ছায়া পড়েছে, দীর্ঘ-দীর্ঘ ছায়া।

আয়েশা রাগলে যে রাগলেই। সে-রাগ আর ভাঙল না। আসন্ন-বিদায়ের বেদনায় সমস্ত বাড়িটা যেন স্তব্ধ। কর্ত্রীর আর নাজমার স্নেহভরা মুখে ম্লান-হাসি, সে-ম্লান হাসির পেছনে স্পষ্ট ব্যথার ছায়া; আর চোখগুলো টলমল ছলছল করছে। নির্বাক আবু হঠাৎ হাত দিয়ে চোখ ঢেকে কেঁদে দিলে। ওর কান্নার সুর সবাইকে কয়েক মুহূর্তের জন্য অসাড় করে ফেলল।

আয়েশার পানে তাকিয়ে সাঈদ বিস্মিত হল। তার মুখটি উজ্জ্বল, চোখদুটি স্বচ্ছ, আর চলার ভঙ্গি দৃঢ় ও স্বচ্ছন্দ্। আয়েশা তাকে মাথা হতে পা পর্যন্ত ক-বার দেখলে, দেখে মুখ টিপে হাসলে। সাঈদের পরনে পাজামা, গায়ে ছাই রঙের সিল্কের শার্ট, ছাই রঙের কোট, পায়ে ব্রাউন রঙের পাম্পসু।

নত হয়ে কর্ত্রীর পা ছুঁয়ে সালাম করতে গিয়ে সাঈদের চোখ ছলছল করে উঠল, উঠে দাঁড়িয়ে আর চোখ মেলে চাইতে তার সাহস হল না। প্রান্তরে তখন সূর্য-তাপের প্রখরতা কমেছে।

যে-ধুলিধূসর সাদামাটির সর্পিলপথের পানে তাকিয়ে আজ প্রভাতে সাঈদ যাবার কথা ভেবেছিল, সন্ধ্যাকাশ ধুলোয় আচ্ছন্ন করে, অস্পষ্ট ম্লান আলোর মধ্য দিয়ে, সে-পথেই তাকে প্রত্যাগমন করতে হল।

প্রান্তরের কাছাকাছি এসে সে প্রান্তরের পানে তাকিয়ে বিস্মিত হল; মনে হল দিনের বেলার জ্বলন্ত ধ-ধু-করা বিস্তীর্ণ প্রান্তর যেন পরাজয় মেনে অন্ধকারের অন্তরালে মুখ ঢেকেছে।

কর্ত্রীর চোখ ঝিকমিক করে উঠল :

'যখন আবার ফিরে আসতে হল, এবার তোমাকে এখানে ক-দিন থেকে যেতেই হবে।'

'হ্যাঁ সাঈদ, থেকে যেতেই হবে।' নাজমা উজ্জ্বল চোখে মাকে সমর্থন করলে।

সাঈদকে একাকী পেয়ে বারান্দার আবছা অন্ধকারে আয়েশা অস্ফুটকণ্ঠে বললে :

'ভুলতে-তো চেষ্টা করছিলাম, আবার এলেন কেন?'

'ও দুষ্টু। ট্রেন ফেল করবার জন্যে ঘড়িটা তবে কে স্লো করে রেখেছিল, শুনি?'

'কে করেছে তা আমি কী জানি? ইস্! বললেই হল আর কী, না?'

ভাদ্র ১৩৪৯ আগস্ট ১৯৪২

'পথ বেঁধে দিল...'

প্রথম শ্রেণীর একটা ছোট কামরা।

অস্পষ্ট কোলাহলে কামালের তন্দ্রা ছুটে গেল; চোখ বুজেই সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে—মাদকতাপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস; অনুভব করল মাঝারি গোছের একটা নাম-না-জানা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে। ক্রমে কোলাহল ও ব্যস্ততার শব্দ ডুবে গেল রাত্রির সীমাহীন গভীর নীরবতার বুকে : যারা নাববে নেবে পড়ল, যারা উঠবে তারা উঠে পড়ল।

কামাল কান পেতে আছে : সামনের কয়েকটা অনির্দিষ্ট মুহূর্তের যে-কোনো একটা মুহূর্তে গার্ডের বাঁশি বেজে উঠবে, তার সুরের তীক্ষ্ণতা ক্ষণিকের জন্য ভরে তুলবে কালো নিষ্কম্প আকাশ, মায়াময় রহস্যময় করে তুলবে তন্দ্রাচ্ছন্ন যাত্রীদের আধ-জাগা কান, আর গাড়িতে আনবে চাঞ্চল্য ও গতি। কিন্তু হঠাৎ কামালের অপেক্ষমাণ কানদুটি সচকিত হয়ে উঠল, দরজা খোলার দ্রুত হ্যাঁচকা শব্দে। কয়েকটা মৃদু অথচ ক্ষিপ্র পায়ের শব্দ : মনে হল কে-যেন তার কামরায় উঠে দাঁড়িয়েছে; তারপর দাঁড়িয়ে থাকার নিস্তব্ধতা।

এবার কামালকে চোখ খুলতে হল এবং বিস্মিত হয়ে সে দেখল, দরজার প্রান্তে দাঁড়িয়ে এক তরুণী। তাঁর পাতলা সুঠাম দেহ জড়িয়ে লতিয়ে উঠেছে একটা অনুজ্জ্বল অথচ আকর্ষণী রঙের শাড়ি, সাধারণ ব্লাউজটাতে গায়ের রং, পায়ে ক্ষুদ্র হিলযুক্ত মসৃণ সাদা জুতো, মাথার চুল দুপাশে এলোমেলো; সিঁথির দীর্ঘ রেখাটি শুভ্র ও উজ্জ্বল, দেহময় নিঃসঙ্গতার একাকিত্বের স্নিগ্ধতা; আর চোখদুটি, কামাল বিস্মিত হয়ে দেখলে, অসংযত, ভীত ও চঞ্চল।

তরুণী বাঁ হাত দিয়ে টেনে দরজা বন্ধ করতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

কামাল সোজা হয়ে বসল; মুখে সে কিছু বললে না, কিন্তু সমস্ত প্রশ্ন যেন তার স্থির চোখ দুটিতে পাঠ্য ও স্পষ্ট হয়ে উঠল। তরুণীর ঠোঁট একবার একটু নড়ল : পলকে কামরার চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন :

'এ কামরায় শুধু আপনি? একা?

'হ্যাঁ।' কামাল ঈষৎ মাথা নাড়লে; প্রশ্নগুলো তার চোখে আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

'ইয়ে, দেখুন, আজ রাতটার মতো আমি এ-কামরায় থাকতে চাই। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না তো?'

'অসুবিধে?' কামাল অবাক হয়ে হাসল, 'অসুবিধে কিসের? দুটি বেঞ্চ খালি...' ওধারে জানালার পাশের বেঞ্চিতে তরুণী বসলেন; একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এসে তাঁর চোখদুটি স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল করে তুলল। যেন জোর বাতাস বইল; আকাশে গুম হয়ে থাকা মেঘের দল মুহূর্তে উড়ে পালাল।

কামালের মালপত্রের ওপর তরুণী একবার হালকা চোখ বুলালেন, তারপর স্বাভাবিক

দৃষ্টিতে কামালের ভাষাময় প্রশ্নময় চোখের পানে তাকালেন। তাঁর রক্তিম ঠোঁট নড়ে উঠল :

'পাশের মহিলা-কামরায় ছিলুম—একা। আলোর পাশে পোকা পর্যন্ত নেই।'

'একা বলে ভয় করছিল?'

'হুঁ', দ্রুতভঙ্গিতে তরুণী মাথা হেলালেন, 'মনে হল কে যেন জানালা দিয়ে উঁকি মারল—ভীষণ তার চেহারা,'—তার স্বচ্ছ চোখে স্পষ্টভাবে ভীষণতার ছায়া পড়ল; কামাল একটু হাসল।

'যখন ভীষণ চেহারা, ডাকাত নিশ্চয়ই হবে। কামরায় ঢোকে নি-তো?'

'উঁহুঁ। তবে চিৎকার না করলেই হয়তো—'

'ঢুকে পড়ত, না?'

জানালার বাইরে ঘনীভূত অন্ধকার। সে দিকে একবার তাকিয়ে কামাল বললে :

'আপনি চলে এলেন, ডাকাতের সুবিধে হল। চুরি করতে আর বাধা দেবে না কেউ।'

'মালপত্রের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওগুলো সে নেবে না।'

'তবে কী নেবে? গলার ঐ হার, হাতের ঐ চুড়ি?'

এবার তরুণী উত্তর দিলেন না, শুধু মুখ টিপে হাসলেন, গূঢ় অর্থ চেপে। কামালও হাসল, ওঁর মুখের পানে চেয়ে। বললে :

'বুঝেছি।'

কয়েক মিনিট স্তব্ধ নীরবতা প্রভুত্ব করল কামরার প্রতি কণায়, বিন্দুতে। তারপর কামাল মুখ তুললে, হেসে বলল :

'ডাকাতরা ডাকাতি করে পেটের দায়ে, ক্ষুধার তীব্র জ্বালায়। আপনার নরম কোমল হাতের ঐ সোনার চুড়িগুলো যদি আপনা-আপনি হাত হতে খসে আসত, তবে সে আপনার ঐ হাত আর ধরত না। ওতে ওদের লোভ নেই; পেট যেখানে বড়, সেখানে ওসব প্রবৃত্তি আসে না।'

'এ আপনার পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে।'

'মোটেই নয়। অর্থাৎ—'

'যাকগে, ওসব অবান্তর কথা...' সজোরে তরুণী বলে উঠলেন। কামাল হাসল, সেও জোর দিয়ে বলে উঠল :

'যাকগে।'

বাস্তরই হোক আর অবান্তরই হোক, প্রসঙ্গটার মুখ বন্ধ করা হল একটা বদ্ধমূল দম্ভের জোরে, যে-টা নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

কয়েক মুহূর্ত র‍্যাকে ঝোলানো দোদুল্যমান কোটটির পানে অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অকস্মাৎ কামাল তরুণীর পানে তাকাল। তরুণী তাকিয়ে ছিলেন বাইরের পানে, চিন্তায় ডুবে থাকার বড়-বড় চোখ করে। কামাল তাকিয়েই রইল, দৃষ্টি সূক্ষ্ম করে এনে। তরুণীর বয়স যেন গোলাপের রঙিন পাপড়িতে দোল খাচ্ছে, তবু তারই মধ্যে জানাশোনার ছায়া রয়েছে। তবু, চোখেমুখে অভিজ্ঞতার স্পষ্ট ছায়া থাকলেও, মাঝে-মাঝে যেন অনভিজ্ঞতার নতুনত্বের সারল্য উঁকিঝুঁকি মেরে ওঠে। এটা কামালকে আশান্বিত করল।

'কী দেখছেন?' হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে তরুণী প্রশ্ন করলেন।

'দুল—আপনার দুলজোড়া। সুন্দর, আর্টিস্টিক।'

'মোটেই নয়', তরুণী হাসলেন, 'ভাবছেন দুল-পরিহিতার কথা।' ভাবছেন 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি'।

'আমরা দুজন চল্‌তি হাওয়ার পন্থী।'...

'ঠিক মেলে না।'

'তবু।'

কিছুক্ষণ পর।

'একটা বালিশ দিন না, একটু কাত হই।'

'নিশ্চয়।' হালকা হলদে রঙের সিল্কের ওয়াড়ে আবৃত একটা কোমল বালিশ কামাল তাঁকে দিল; একটা চাদরও। বললে :

'একটা বালিশ দিলাম। দুটো দেবার মতো বদান্যতার দৌর্বল্য আমার নেই। আমি একটু স্বার্থপর কিনা।'

'সেই ভালো। সব দিয়ে দিলে ফিরে পাবার আর আশা থাকে না।' একটু থেমে মাথা তুলে আবার বললেন :

'আলোটা নিভিয়ে দেবেন কি? চোখে বড় লাগছে।'

'যদি ডাকাত আসে?'

'উঁহুঁ।' স্বচ্ছকণ্ঠে তরুণী উত্তর দিলেন, 'আপনি আছেন, ও আর আসবে না।...ওপরেরটা নিভিয়ে আপনার মাথার কাছেরটা জ্বেলে দিন না হয়।'

উঠে দাঁড়িয়ে কামাল বললে :

'আমাদের ছাড়া আপনারা এক পাও চলতে পারেন না, অথচ আমাদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চালাবেন—আপনাদের এ ন্যাকামি অসহ্য।'

'এটা হল ভালোবাসবার ও বাসাবার নবতম অভিনব পন্থা।' বলে তরুণী হেসে উঠলেন উচ্চকণ্ঠে, যেন হাসির তীক্ষ্ণতার খোঁচায়-খোঁচায় কথাটার গুরুত্ব ভেঙে হালকা করার চেষ্টা।

ওপরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কামাল ভাবছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করল :

'ঘুমোবেন?'

'ঘুম। উঁহুঁ। ট্রেনে আমার ঘুম হয় না।' কিন্তু কামালের কাছে মনে হল যে, তাঁর কণ্ঠ এরই মধ্যে গাঢ় হয়ে উঠেছে।

'তবে কথা বলুন।'

'কথা? কী কথা?'

'যা ইচ্ছে হয় আপনার। আবোল-তাবোল বকলেও আপত্তি নেই।'

'দাঁড়ান, ভাবি।' তাঁর কণ্ঠ নির্লিপ্ত।

কয়েক মুহূর্ত পর কামাল মাথা তুলল, ডাকলে :

'এই যে, শুনছেন ?—ঘুমোলেন নাকি?'

তরুণীর মুখ ওপাশে ফেরানো। ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর এল :

'উঁহুঁ' শব্দটা যেন দূর হতে ভেসে-আসা।

কামাল মাথাটা আরো উঠাল, দেখলে, ওঁর নিবিড়ভাবে বোজা চোখের ওপর যেন রাজ্যের ঘুম আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কামাল একটু হাসল। পায়ের কাছ থেকে চাদরটা টেনে গায়ে জড়াতে-জড়াতে অস্ফুট কণ্ঠে বললে :

'বাঃ। জায়গা চাই, বালিশ চাই, অন্ধকার চাই—এবার উঁহুঁ।'

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, আচমকা কামাল জেগে উঠল। মানে হল, কে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার দেহের ওপর...একটা অস্ফুট আর্তনাদ...কে যেন তার ডান হাতটি দৃঢ়ভাবে চেপে ধরল।

'কে?' স্তব্ধ অন্ধকারে কামালের কণ্ঠ গর্জে উঠল।

চারিদিক নিস্তব্ধ।

'কে?...ও আপনি!'

আবছা আলোয় কামাল চেয়ে দেখলে, তরুণীর চোখদুটি ভীত, স্তব্ধ। ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বললেন :

'ঐ যে, সেই। আবার এসেছিল। প্ল্যাটফর্মের উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম; কী ভীষণ চেহারা...উঃ!'

কামাল অনুভব করল, ট্রেন মন্থর গতিতে চলছে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখলে, একটি বড় রকমের স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের সম্পূর্ণটা এখনো ট্রেন ছেড়ে আসে নি : অদূরে অসংখ্য আলোকমালা।

'ট্রেন এইমাত্র একটা স্টেশন ছেড়ে এল। ট্রেন ছাড়তেই ফুটবোর্ডে...উঃ! মাগো। বড় বড় চোখদুটো যেন ধক্‌ধক্ করে জ্বলছিল...'

কামাল নিরুত্তরে তাঁর দিকে তাকাল, তাকাল ভয়ার্ত কোমল সুন্দর মুখখানার দিকে, চেয়ে-চেয়ে অন্তরটা একটা নিবিড় কারুণ্যে ছাপিয়ে উঠল। ম্লান আলোয় ওঁর শঙ্কিত ভীত মুখ-চোখ চমৎকার দেখাচ্ছে, বিশৃঙ্খলভাবে এলিয়ে-পড়া চুলগুলোও।

অসহায় অবস্থা, কামাল মনে-মনে ভাবলে, প্রেম জন্মাবার চরম মুহূর্ত। তাঁর আরেকটি নরম হাত নিজের হাতের মুঠোয় বন্দি করে মৃদুকণ্ঠে বললে : 'ভয় নেই। আমি কাছে থাকতে ও কিছু করতে পারবে না। দেখেছেন এই বিশাল দেহ, সরল বাহু—উঁ?'

'হুঁ।'

কতক্ষণব্যাপী নিস্পন্দ নীরবতা, এবং সে নীরবতায় তরুণী নিশ্চলভাবে পড়ে থেকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হলেন, চোখ মেলে সলজ্জ হাসি হেসে বললেন :

'উঃ। কী ভয় না পেয়েছিলাম!'

কামাল ওর মুখের ওপর ঝুঁকল, বললে :

'এখনো করছে?'

'না।'

কামালের কাছে তাঁর সলজ্জ নম্র হাসি মায়াময় ও মধুর লাগছে। খানিকক্ষণ সে নির্বাক থেকে মন্তব্য করলে :

'দুটি বিশিষ্ট অবস্থায় আপনাদের ভারি সুন্দর দেখায়। অভিমানে চোখ ছলছল করলে, আর লজ্জামিশ্রিত হাসি হাসলে। ঐ ভঙ্গিগুলোর স্বতন্ত্র সরল ছন্দ আছে। অবিশ্যি, ভয় পেলেও চমৎকার দেখায়।'

তরুণীর চোখদুটি লজ্জায় আরো জড়িয়ে এল, মৃদুকণ্ঠে বললেন :

'হাত ছাড়ুন।'

'ছাড়ব?'

'হুঁ'।'

তাঁর ঘর্মাক্ত হাতটি মুক্তি পেল। এবং তিনি ধীরে-ধীরে উঠে মাঝের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন। এখনো যেন লজ্জা তাঁর সারা দেহ ঘিরে রয়েছে নিবিড়ভাবে।

'আবার ঘুমোবেন?'

'পাগল।' তরলকণ্ঠে তরুণী হেসে উঠলেন; কামালও হাসল। তারপর একটা বৃহৎ জনসঙ্কুল স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ালে কামাল উঠে দাঁড়িয়ে বললে :

'যাই। এক টিন সিগ্রেট কিনতে হবে।'

তরুণী সোজা হয়ে বসলেন; তাঁর চোখ-মুখ ভরে উঠল মধুর শঙ্কায়, বললেন :

'না, না। আমাকে একলা ফেলে যাবেন না।'

'কী হবে?' কামাল হাসল, 'এত লোক!'

'তবু। না, না,—'

'বেশ, সাথে আপনিও চলুন।'

এক টিন সিগ্রেট কেনা হল, আরেক টিন চকোলেট, তরুণী খাবেন। তাঁর চোখদুটি

আনন্দে ঝিকমিক করে উঠল। বললেন :

'চকোলেট খেতে আমি বড্ড ভালোবাসি।'

'কিন্তু আপনার নাম তো জানা হল না।' একটা সিগ্রেট ধরিয়ে কামাল বললে।

'নাই-বা জানলেন।' চকোলেটের দেহ হতে রুপালি কাগজ খসাতে-খসাতে তরুণী উত্তর করলেন, 'আপনারটাও থাক অজানা। নতুনত্ব তাতেই।'

'পাটনায় নাববেন?'

'হুঁ।'

'আমিও।'

চকোলেটটা মুখের গহ্বরে ছেড়ে দিয়ে বললেন :

'চকোলেটগুলোতে যেন রোমান্স আছে।'

'সেইটে ঠিক বলতে পারি না, তবে আপনি যে চুষছেন, ঐ চোষার ভঙ্গিটা আমার কাছে রোমান্টিক লাগছে।'

'আজ রাতটির কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।' কামাল বললে।

'আমারও।'

'মনে থাকবে চকোলেটের কথা—'

'আর সিগ্রেটের কথা আমার মনে—'

'আর ডাকাতটাও, ভদ্রভাবে এলে বকশিশ দিতে রাজি আছি।'

'আমি একটি চুড়ি খুলে দেই।'

'ওতে সম্পূর্ণতার অঙ্গহানি হবে; আংটি দিলেই চলবে।'

খানিকক্ষণ পর।

'একটি সিগ্রেট দেব?' কামাল শুধোল।

'দিন। আর আপনি একটা চকোলেট নিন।'

'এই বেঞ্চে এসে বসুন।'

'বেশ।'

তরুণী শিথিল ভঙ্গিতে কামালের পাশে এসে বসলেন, দুলজোড়া দুলল, ঝিকমিক করল আলোয়।

'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি...'

'আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।...' তরুণী ও কামাল উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। অকস্মাৎ তরুণী বললেন : 'উঃ!' বলে সজোরে ছুড়ে ফেলে দিলেন হাতের জ্বলন্ত সিগ্রেট।

'কী, কী হল?'

'মাথা ঘুরছে।'

'খুব ঘুরছে কি?... শুয়ে পড়ুন।' একটু থেমে, কামাল আবার বললে :

'মাথা টিপে দেব—উঁ?'

'ধন্যবাদ। মাথা ধরে নি, ঘুরছে।'

'ও।...কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন, সিগ্রেট আমিই দিয়েছি কিনা—'

'উঁহুঁ। ক্ষমা করব না।'

'দুর্ভাগ্য।'

একবার মুখ টিপে তরুণী হাসলেন, তারপর অনেকক্ষণ পড়ে রইলেন নিশ্চলভাবে, নিমীলিত চোখে।

'বালিশ দেব, বালিশ?'

'দিন।'

আস্তে তরুণীর মাথাটা তুলে ধরে, কামাল বালিশটা গুঁজে দিলে তাঁর ঘাড়ের তলায়, এবং সেই ফাঁকে একবার হাতটা বুলিয়ে নিলে, সতর্কভাবে, তাঁর চুলের ওপর।

'সকাল হলে ও–কামরায় চলে যাব।' খানিকক্ষণ পর তরুণী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন।

কামাল নীরব।

তরুণী আস্তে–আস্তে তাঁর কোমল হাতটি কামালের হাতের ওপর রাখলেন।

'আপনার কথা আমার মনে থাকবে।' কিন্তু এবারো কামাল নির্বাক; বাইরের ছুটন্ত ঘনীভূত অন্ধকারের পানে চেয়ে কী যেন ও ভাবছে।

কখন যে তাদের ট্রেনটি একটা স্টেশনে এসে দাঁড়াল, তারা জানতে পারলে না। যখন দরজায় মৃদু শব্দ করে কালোমতো মোটা দীর্ঘদেহী এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাদের কামরায় এসে উঠলেন, তারা দুজনে এ–আকস্মিক আগমনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, রাঙামুখে তরুণীটি উঠে বসলেন, আর কামাল মুখ ফিরিয়ে ওপাশের দেয়ালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। লোকটি অবস্থাটা লক্ষ্য করে ভারি মোটা গলায় হেসে উঠে ইংরেজিতে বললেন :

'অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি।'

'ওধারে বসে একটা মৌলমেন চুরুট ধরিয়ে তিনি আবার হাসলেন, অতি মোটা গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন :

'খুব বেশি দূরে যাচ্ছেন কি?'

'আমরা পাটনায় যাচ্ছি।'

লোকটি আলাপী; তীব্রগন্ধী কড়া চুরুটের নীলাভ ধোঁয়া ছাড়তে–ছাড়তে কামালের সঙ্গে শীঘ্রই নিবিড় আলাপ জমিয়ে তুললেন, এবং অবলীলাক্রমে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, ঘাত–প্রতিঘাত ইত্যাদি বলে যেতে লাগলেন। তারপর তাঁদের দুজনার মধ্যে পরিচয় বিনিময় হল। ভদ্রলোকটি পাঞ্জাবি খ্রিস্টান, নাম মি. স্যামুয়েল, দেশে তার বড় কাঠের ব্যবসা।

ওদিকে কামালের নিকট হতে একটু দূরে সরে বসে বাইরের পানে চেয়ে নীরবে তরুণীটি বসেছিলেন, তাঁর সে লজ্জা কাটে নি এখনো, বসার ভঙ্গিতে লজ্জার জড়িমা। মি. স্যামুয়েল এবার তা লক্ষ্য করে সরল উদাত্ত কণ্ঠে হেসে উঠলেন, বললেন :

'মিসেস চৌধুরী, আপনাকে দেখে আমার আশঙ্কা হচ্ছে এখনো আপনি আমাকে ক্ষমা করেন নি।'

ভদ্রলোকটির এই অপ্রত্যাশিত সম্বোধনে কামাল ও তরুণীটি চমকে উঠলেন; কামাল কিছু বলবার চেষ্টা করলে বটে কিন্তু তার মুখে কথা ফুটল না, যুক্তিসঙ্গত কোনো কথা খুঁজে পেলে না বলেই হয়তো, আর তরুণীর কানদুটো লাল হয়ে উঠল একে নিমেষে। তিনি লাজরক্তিম মুখটি ফিরিয়ে নম্রকণ্ঠে হেসে বললেন :

'না, না, কী বলছেন?...আপনার কথাই আমি একমনে শুনছি; ভারি মিষ্টভাষী আপনি।'

কিন্তু অন্যদিকে অমনি করে মুখ ফিরিয়ে থাকলে বক্তা যে উৎসাহ পায় না মিসেস চৌধুরী।' এবার শুষ্কমুখে কিছু নীরস হাসি হেসে আড়চোখে তরুণীর পানে চেয়ে কামাল বললে : 'লজ্জার বিষয়ে আমার স্ত্রী এখনো মধ্যযুগীয়।'

উঁচু ভারি গলায় প্রচুর হেসে পরের স্টেশনেই মি. স্যামুয়েল নেবে গেলেন। দরজার প্রান্ত হতে খট্ করে একটা শব্দ হতেই আড়চোখে কামালের পানে চেয়ে লজ্জিত মুখে তরুণী শুধু বললেন :

'ছিঃ।'

'ছিঃ কেন?' ক্ষণকাল নির্বাক থেকে আবার বললে কামাল : 'কিন্তু অভিনয়টি এত উত্তম যে বাস্তবে পরিণত করতে ইচ্ছে করছে মিস্—'

'রাহেলা বেগম।' কিন্তু লজ্জায় তাঁর মাথাটি নত হয়ে এল, তবু জোর করে মুখ তুলে

চেয়ে হেসে বললেন :

'যাঃ কী বলছেন মিস্টার—?'

'কামাল চৌধুরী।'

কিছুক্ষণ পর। একটা উচ্ছল আনন্দের আবেগে রাহেলার মুখচোখ ঝলমল করছে, ক্ষণে-ক্ষণে তিনি কামালের পানে চেয়ে অকারণে তরল মধুর কণ্ঠে হেসে উঠছেন। বাইরে তখন রাত্রির বুক তরল হয়ে আসছে, ঠাণ্ডা শীতল হাওয়া বইছে মৃদু-মৃদু। এক সময়ে রাহেলা উজ্জ্বল চোখে বললেন :

'ওই ডাকাতটা যদি আসে-তো শুধু আংটি কেন, আমার সমস্ত অলঙ্কার আমি দিয়ে দিতে রাজি আছি।'

'আর মি. স্যামুয়েলকে?'

'বিয়েতে দাওয়াত করে আমরা দুজনে একসঙ্গে ওঁর কাছে একটা চিঠি লিখব, কেমন?'

আশ্বিন ১৩৪৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪২

মানুষ

দূরে সবুজ বনরেখা। সে-বনরেখার পেছনে যে নীল পাহাড়গুলো দিগন্তরেখায় ঢেউ তুলে সারি-সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে, পাহাড়িরা বলে সেখানে নাকি একটি স্বচ্ছ জলের গভীর হ্রদ আছে, যার চারিধারে প্রাচীর সৃষ্টি করে ভিড় করে রয়েছে দীর্ঘ ঘন সন্নিবদ্ধ পাইন-বৃক্ষ। ওই সবুজ বনরেখা পেরিয়ে সেই স্বচ্ছ জলের হ্রদের তীরে—জড়াজড়ি-হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ঘন পাইনের বন ঘেঁষে আজ সকালে এক ঝাঁক নাম-না-জানা হলদে পাখি উড়ে গেল।

হলদে পাখির ঝাঁক উড়ে গেল, সকালের নম্র স্নিগ্ধ সোনালি রোদের ভেতর দিয়ে মনির তা-ই চেয়ে-চেয়ে দেখেছে, অলস কান পেতে শুনেছে তাদের পাখার সম্মিলিত অস্ফুট ধ্বনি, আর চলতে-চলতে হোঁচট খেয়েছে। বনের অন্তরালে ওরা মিলিয়ে গেলে পাহাড়ের ওপরে ঝাউগাছটার তলে একটা তামাটে রঙের পাথরে সে বসলে। হলদে পাখির ঝাঁক গেল মিলিয়ে, ওধারে পাহাড় বেয়ে হলদে শাড়িপরা একটি মেয়ে উঠে আসছে ওপরে; পথটা আঁকাবাঁকা ও বন্ধুর, তাই সে চলছে ধীরে-ধীরে, মৃদু পায়ে।

ওপরের আকাশ কিছুটা সোনালি, কিছুটা ধূসর; দূরে কোথায় গভীর বনে ঘুঘু ডাকছে। পাহাড়ের নিচের নোংরা কাঠের বস্তিগুলো থেকে কুয়াশার মতো ধুঁয়ো উঠছে হাওয়াশূন্য আকাশ বেয়ে অতি ধীরে, ওই মেয়েটির চলার মতো। স্থানটি নিস্তব্ধ; সে-নিস্তব্ধতার মধ্যে মেয়েটির পায়ের মৃদু শব্দ এবার জেগে উঠল; ও কাছে এসে পড়েছে; একটা গাছে ও বাঁকের আড়ালে ঢেকে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত পরে অদূরের ওই গোলগাছটির কাছে সে বেরিয়ে এল, তারপর গাছের তলায় সরে এসে সেখানে উবু হয়ে বসল। গাছ হতে লাল ফুল ঝরে সে-স্থানটা ভরে রয়েছে, তাই সে তার আঁচলে কুড়িয়ে নেবে।

মেয়েটি অন্ধ; তবু পথের সাথে তার পায়ের জানাশোনা, আর তার হাতের সাথে ফুলের পরিচয়। প্রতি সকালে সে অমনি করে আঁকাবাঁকা ও বন্ধুর পথ বেয়ে কোমল পায়ে পাহাড়ে উঠে আসে, গাছটার তলায় এমনি করে উবু হয়ে বসে আঁচল ভরে লাল ফুলগুলো কুড়িয়ে আবার নিচে নেবে যায়; নিচের নোংরা কাঠের বস্তিতে সে থাকে। এধারে তামাটে রঙের পাথরে বসে নীরবে তা-ই চেয়ে-চেয়ে মনির দেখে, তার ফুল কুড়োনোর ভঙ্গি, সরু কোমল হাতদুটি, স্থির নিস্তব্ধ ছোট মুখটি। মনিরের কথা সে হয়তো জানে না, তাই কোনোদিন ফুলকে

গালে চেপে ধরে হঠাৎ হেসে ওঠে মধুর কণ্ঠে, নয়তো যে-শুকনো বাসি ফুলটি সে তুলে নিয়ে অবজ্ঞাভরে ছুড়ে দূরে ফেলে দিয়েছিল, সেটাকেই আবার স্নেহভরে হাতড়ে-হাতড়ে কুড়িয়ে নেয়, সযতনে ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে অস্ফুটকণ্ঠে কী সব কয়ে ওঠে, আর ঠোঁটের প্রান্তে হাসে একটু লাজরক্তিম হাসি।

ওপরে আকাশে এমন প্রসারিত অনুচ্চারিত নীরবতা আর দূরবিস্তৃত অতীতের শুভ্র বেদনাময় বিস্মৃতি যে মনিরের ঘুম-ক্লান্ত অবসন্ন মন হঠাৎ উদাস হয়ে উঠে ডানা মেলে ওই সোনালি আর ধূসর আকাশ বেয়ে নিঃশব্দ পাখাসঞ্চারে কোথায় যেন উড়ে চলল; বোধহয় হলদে পাখিদের পিছু পিছু সেই স্বচ্ছ জলের হ্রদের তীরে আর ঘন পাইনের বনে। মেয়েটির হলদে আঁচল লুটিয়ে পড়েছে সবুজ ঘাসে, লাল ফুলশয্যার ওপরে তার কোমল হাতদুটি চঞ্চল হয়ে উঠেছে, থেকে-থেকে কাচের চুড়িতে মৃদু শব্দ উঠছে, আর তার দেহের একধারে, গালের আর চুলের প্রান্তে সূর্যের আলোর স্পর্শ লেগেছে। কী যেন হল হঠাৎ, তামাটে পাথরটি ছেড়ে মনির উঠে দাঁড়াল, মৃদু পায়ে আস্তে-আস্তে অদূরের ওই গাছটির পানে এগিয়ে চলল, যে-গাছের তলায় বস্তির ওই অন্ধ মেয়েটি তার হলদে আঁচল ভরে তুলছে লাল ফুল। নিচের কাঠের বস্তি থেকে যে-হাওয়াশূন্য আকাশ বেয়ে ঋজুরেখা এঁকে কুয়াশার মতো ধুঁয়ো উঠছে, একটু হাওয়া বইতে সে-রেখা কেঁপে উঠল, কিছু ভেসে গেল, কিছু মিলিয়ে গেল, আর তা-ই দেখে মনিরের মনের যে-ধারা স্থির ও নিষ্কম্প হয়েছিল হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। পায়ের শব্দে মেয়েটি মুখ তুলে চাইলে, ফুল কুড়োনো তার থেমে গেল, স্তব্ধ নিমীলিত চোখের রেখা রহস্যময় ছায়ায় আরো গভীর হয়ে উঠল, প্রশ্নের উত্তর সে বাইরে খোঁজে না, খোঁজে অন্তরের গভীরতায়। ফুলশয্যার ধারটাতে সবুজ ঘাসে পা ছড়িয়ে মনির বসে পড়ল, ওধারে মুখ ঘুরিয়ে তাকালে দিগন্তের পানে, সেখানে কিসের একটা আবছা চলমান কম্প্রমান রেখা জেগে উঠেছে : আরেক ঝাঁক পাখি আসছে বোধহয়; তারপর সে মুখ ফিরিয়ে আবার যখন চাইলে মেয়েটির পানে তখন দেখলে যে তার স্তব্ধ চোখ ঘিরে শঙ্কা জেগে উঠেছে, আর তার চঞ্চল হাত ঘিরে যে-ফুলগুলো একটু আগে মুখর হয়ে উঠেছিল, সে-গুলোও যেন তার এই অনাহূত আগমনে দৃষ্টিহীনতার অন্ধকারের গায়ে কান পেতে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। যে-হাওয়া ধুঁয়োর ঋজুরেখা কাঁপিয়ে দিয়েছিল, সেই হাওয়ার মতো মনির হঠাৎ আস্তে কথা কয়ে উঠল :

—ভয় পেয়ো না : আমি বসেছি তোমার কাছে।

—কে তুমি?

মনির কোনো কথা কইল না, দুটো-তিনটে ফুল কুড়িয়ে ওর আঁচলে ঢেলে দিয়ে সে হাসলে ঠোঁটের প্রান্তে, তারপর বললে,

—আমার হাতে দুটো ফুল দাওনা, এই যে আমি হাত পেতেছি তোমার কাছে।

মেয়েটি ফুল দিলে না, তার স্তব্ধ চোখে এখনো বিস্ময়ের স্পষ্ট রেখা। ওধারে দূর হতে শব্দ ভেসে আসছে, সূর্যকিরণে ঢেউ তুলে উদ্দাম গতিতে আরেক ঝাঁক পাখি উড়ে আসছে এদিকে, গায়ের রং তাদের ধূসর, ঠোঁটগুলো লম্বা আর চিকন, তারা যেন আকাশের দেহ কেটে উড়ে চলেছে। আরেকটি ফুল কুড়িয়ে নিয়ে তার হলদে আঁচলে ছেড়ে দিয়ে মনির আকাশের পানে চাইলে, আবার হাসলে স্বচ্ছকণ্ঠে, বললে :

—আওয়াজ শুনছ? আচ্ছা বল তো, ওই পাখিগুলোর কী রং?

মেয়েটি কোনো উত্তর দিলে না; তাই আবার হাসল মনির, বললে :

—তুমি জান না।...ওগুলোর রং কালো, অন্ধকারের মতো কালো। আচ্ছা ওরা কোথেকে উড়ে আসছে, বলতে পার?

সে-কথাও বলতে পারে না মেয়েটি, যে-মেয়ে পায়ে পথ চিনে নিত্য পাহাড়ে উঠে আসে, ঝরা-ফুলগুলো আঁচলে কুড়িয়ে আবার চলে যায়; তার চোখে স্তব্ধ বিস্ময়, আর সরু হাতে নিশ্চলতা।

—শোন। দূরে, বহুদূরে নীল সাগরের মাঝখানে একটা ছোট দ্বীপ, যে-দ্বীপের চারধারে উন্মত্ত সাগরের উত্তাল ঢেউ দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে নাচে। যে-দ্বীপটি ভরা ছোট ছোট গাছ, যে-গাছগুলো উদ্দাম হাওয়ার বেগে শুধু নুয়ে-নুয়ে পড়ে। এবং হাওয়ার আঘাতে সঙ্কুচিত সেই গাছগুলো জড়িয়ে বাস করে এই পাখিগুলো, যারা সারাক্ষণ চিৎকার করে, ডানা ঝাপটিয়ে সংগ্রাম করে উদ্দাম হাওয়ার সাথে। তারপর কে যেন কখন এই পাহাড়ের কথা, দীর্ঘ ঘন পাইনের বনের কথা আর স্বচ্ছ জলের গভীর হ্রদের কথা বলে দেয় তাদের কানে-কানে, তারা দ্বীপ ছেড়ে ওই হাওয়ার চেয়েও উদ্দাম গতিতে উড়ে আসে এদিকে, ওড়ে আর সারা আকাশময় বলে সে-হাওয়া-বিক্ষুব্ধ দ্বীপের কথা, বলে, কেউ যেন যেয়ো না সেখানে, সেখানে শান্তি নেই, আছে শুধু সংগ্রাম।

—তুমি কে? কোথায় তোমার দেশ?

—সেই দ্বীপে—সেই নীল সাগরের দ্বীপে আমি থাকি।—কে যেন আমার কানেও বলে গেছে এই দেশের কথা, যে-দেশ তোমার ওই চোখের মতো স্তব্ধ, আমিও চলে এসেছি সে-দ্বীপ ছেড়ে। ওই পাখিদের আমি চিনি, ওদের আমি জন্মাতে দেখেছি, ওদের ঠোঁটের আঁচড় আমার দেহে চিহ্ন হয়ে আছে।

ধূসর রঙের পাখির ঝাঁক মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, তাদের পাখার আওয়াজ নিঃশব্দ নিশ্চল পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে ঘাসের ডগায় আর গাছের চূড়ায় প্রখর হয়ে উঠেছে, হাওয়াও কাঁপছে বুঝি। মেয়েটির ভাষাশূন্য নিমীলিত চোখ যেন কোনো কথার আঘাতে চঞ্চল হয়ে উঠল।

—আমার হাত নাও, এই যে, ধর একবার হাতটি।

মনির হাত বাড়িয়ে ওর করতল স্পর্শ করলে, আর কয়েক মুহূর্ত পর মেয়েটি তার বাড়ানো হাতটি ধরলে গভীরভাবে, তবু যেন আলগোছে। মনির হাসলে, বললে,—আমি। আমার হাত ধরেছ তুমি। আমাকে তোমার ভয় নেই।

ওদের মধ্যে জানাশোনা হয়ে গেল, মেয়েটির কোমল হাত ওই লাল ফুলগুলোর মতো মনিরকেও চিনে নিলে, আর ওদের হাতের স্পর্শ বেয়ে দুজনার অন্তরের গভীরতম কথা নিঃশব্দে এল-গেল, মুখে তারা কিছুক্ষণ নীরব হয়েই রইল।

—তোমার নাম কী?

—মুলকী। তোমার?

—আমার নাম? আমার নাম হাওয়া। বলে দিগন্তের পানে চেয়ে মনির হাসলে, সে হাসির কোনো অর্থ নেই।

রোদ চড়ছে আকাশে, গাছের তলাটা ছায়াচ্ছন্ন। দূরে সবুজ বন আর নীল পাহাড়ের ঢেউ, যার মাঝে ধূসর রঙের পাখির ঝাঁক এতক্ষণে মিলিয়ে গেছে। সেদিকে একবার চেয়ে মুলকীর হাতটি আস্তে একটু দুলিয়ে মনির বললে :

—আমি যখন এসেছিলুম তোমার কাছে, তখন তুমি কী ভেবেছিলে মুলকী?

—কী জানি। কিছু ভাবি নি শুধু শব্দ পেয়েছিলাম।

—শব্দ পেয়েছিলে, কিন্তু শব্দ শুনে ও কিসের শব্দ বলে তোমার মনে হয়েছিল?

মুলকী উত্তর দিলে না; সে শুধু শব্দই শুনেছিল; কিসের যে শব্দ, তা ভাবতে পারে নি। আর হাতটি আবার দুলিয়ে মনির বললে :

—তুমি ওই আকাশের মতো, তোমার কাছে এক সময়ে আমি মুক্তি চেয়ে নেব মুলকী, তোমার চোখের অন্ধকারের অসীমতায় আমি পথ খুঁজে নেব।

নিস্তব্ধ আকাশের তলে পাহাড়-ঘিরে সে-নিস্তব্ধতার গভীরতা, ঘুমের মতো নিশ্চলতা। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে মনির হঠাৎ প্রশ্ন করলে :

—আচ্ছা, এই যে ফুলগুলো কুড়োচ্ছিলে, এগুলোর কী রং তুমি জান?

—জানি; লাল।

—কী করে জানলে?

—মা বলেছিল। হ্যাঁ, এগুলো লাল, রক্তের মতো।

—রক্তের মতো? রক্ত দেখেছ তুমি?

—না। মা বলেছে ফুলগুলো রক্তের মতো লাল, আর সে-রং ভারি সুন্দর। তাই এগুলো রোজ আমি কুড়োই।

—ভুল বলেছে তোমার মা। এগুলো লাল নয়, ওই পাখির মতো কালো, অন্ধকারের মতো কালো, তোমার চোখে যে-অন্ধকার সে-অন্ধকারের মতো কালো; আর সে-অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে মুক্তির পথ, সে-পথ দিয়ে আমি মুক্তিলাভ করব মুলকী।

মুলকী হঠাৎ শিউরে উঠল, এক হাত বাড়িয়ে ফুলগুলো একবার স্পর্শ করলে, তারপর মনিরের হাত ছেড়ে দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে কয়ে উঠল :

—আমার চারধারে এই যে আঁধার, এগুলোও এমনি আঁধার? না না, তুমি মিছে কথা বলছ, মা বলেছে লাল—এগুলো রক্তের মতো লাল।

—মা মিছে কথা বলেছে। এদেশে শান্তি আছে বটে, কিন্তু এদেশের মানুষরা মানুষকে ঠকায়, তাই তোমার মাও তোমাকে ঠকিয়েছে। আমি থাকি দ্বীপের দেশে, সেখানে শুধু প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম; সেখানকার লোকেরা ঠকায় না কাউকে, তোমাকে আমিও ঠকাচ্ছি না মুলকী। শোন, কোথাও কোনো বর্ণ নেই, আছে গভীরতম নিবিড় তিমির।

—না না।

—না নয়, সত্যি বলছি; তোমার ভালোর জন্যই বলছি। সত্য কথায় মন আহত হয়, তাই এরা শান্তির দেশে লোককে মিছে কথা বলে মুলকী। আমার কথা মেনে নাও, চারধারে যে নিশ্ছিদ্র প্রগাঢ় অসীম অন্ধকার, সে-অন্ধকারকে ছিদ্র করে কেন তুমি আঘাত দেবে, এতে যে শুধু তোমারই লোকসান। তোমাকে পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ হতে হবে, নইলে তোমার কাছে আমি মুক্তি চাইব কী করে মুলকী?

আর কোনো কথা না বলে মুলকী উঠে দাঁড়াল, তার আঁচল হতে ফুলগুলো সবুজ ঘাসের ওপর ঝরে পড়ল ঝরঝর করে, যেন ভুল ভেঙে ঝরে পড়ল, আর তার চোখের রেখায় স্তব্ধতা নিবিড়তম হয়ে উঠল। কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে ধীরে-ধীরে চলে গেল শূন্য-আঁচলে ব্যথা-মিশ্রিত-বিস্ময় ভরে নিয়ে, পেছনে লাল ফুলশয্যা অনাদৃতভাবে রইল পড়ে।

মৃদু হাওয়া বইছে; ঝাউগাছে অস্পষ্ট শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে। শুকনো হাওয়ার আঘাতে উপেক্ষিত লাল ঝরাফুলগুলো যেন শুকিয়ে উঠেছে, আর সূর্যের আলো হতে কাঁচা সোনার মতো স্নিগ্ধ রং মুছে গেছে। দূরে বনরেখার সবুজ রঙে পাহাড়ের নীল রঙে আর ধূসর আকাশের বুকে যে-মোহ জড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, সে-মোহ হালকা ও ফিকে হয়ে আসছে ক্রমে-ক্রমে, তাই মনির এবার উঠবে, উঠে আঁকাবাঁকা বন্ধুর পথ বেয়ে নিচে নেবে যাবে, ঘাড়ে রোদ চিনচিন করবে, কাঁকরগুলো ঠেকবে পায়ে।

এর পরদিন ওই লাল ফুলগাছের নিচে ঝরাফুলের পাশে মুলকী বসলে বটে, কিন্তু ফুলগুলো আর কুড়োলে না, সোজা হয়ে বসে অন্তরের অন্ধকারের পানে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। এদিকে তামাটে রঙের পাথরে বসে তা-ই কতক্ষণ চেয়ে-চেয়ে দেখে মনির হঠাৎ উঠে দাঁড়াল; দিগন্তে আজ যেন মেঘ জমেছে, আর ঢেউ-তোলা পাহাড়মালা ঘন নীল হয়ে উঠেছে, তার চেয়ে ওই-যে হলদে শাড়ির বেগুনে-আঁচল সবুজ ঘাসের প্রান্ত ছুঁয়েছে সে-ম্লান ক্ষীণ স্পর্শটুকু মনিরের চোখে লাগল ভালো। পাহাড়ের নিঃশব্দতায় পায়ের মৃদু আওয়াজ হল, নিস্তরঙ্গ স্তব্ধ দিঘির মতো মুলকীর চোখদুটি তরল হয়ে উঠল, আর তার পাশে ঘাসের ওপর গতকালের মতো পা ছড়িয়ে মনির বসে পড়ে দূর-দিগন্তের পানে চেয়ে চোখের প্রান্তে হাসতে থাকল। তারপর ঘাড় হেলিয়ে ওর হাতের পানে চেয়ে সে বললে :

—আমি; হাওয়া।

মুলকীর চোখের স্তব্ধতা থেকে-থেকে এত অতল হয়ে ওঠে যে, কেউ কথা কইতে গেলে সে আবার হাঁপিয়ে গিয়ে ভেসে আসে ওপরে। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক থেকে আবার মনির বললে :

—ফুল কুড়োচ্ছ না-যে? —মা কী বললে, আবার লাল বললে বুঝি? মিছে কথা।

—মাকে-তো আমি কিছু জিজ্ঞেস করি নি।

তারপর খানিকক্ষণ মুলকী আর কিছু বললে না, আর তাই মনিরও নীরব হয়ে রইল, কথাগুলো যেন শূন্যের অভ্যন্তরে ডুব মেরে রয়েছে। দূরে ওই পাহাড়ের কোল-ঘেঁষে কারা যেন উবু হয়ে পিঠে বোঝা নিয়ে পথ চলছে, স্মৃতির আবছা পটে কারা যেন হাঁটছে, মুখ চেনা যায় না তাদের। ওদের পানে চেয়ে মনিরের প্রথম মনে হল যেন তাদের সে চেনে, শেষে মনে হল যে তারা মানুষ; কথাটা প্রথমে তার খেয়াল হয় নি বলে সে তাদের চেনে বলে ভুল করেছিল। অন্তরটা যেন পাখি, থেকে-থেকে বেরিয়ে এসে নিঃশব্দে এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়ায় অলসভাবে, এধারে-ওধারে গাছের পাতায় ঝোপের ভেতরে আলোতে ছায়াতে কী যেন খুঁজে বেড়ায়; এবার মুখ উঁচিয়ে দেখলে সেই লোকগুলোর পানে। যারা পাহড়ের কোলঘেঁষে পথ চলছে, যখন তাদেরকে মানুষ বলে মনে হল তখন সে হঠাৎ উড়ে চলল আবছা-হয়ে-উঠে অজস্র কুয়াশার মধ্য দিয়ে, যেন যে-দেশ কখনো দেখা যায় না সে-দেশে যাচ্ছে, অতীতের দেশ হতে ঘুম নিয়ে আসবে, নিয়ে এসে ওই যে গাছের পাতাগুলো নিঃশব্দ হাওয়ায় নড়ছে আর চিকচিক করছে সেগুলোকে নিস্পন্দ করে তুলবে।

পাশে মুলকীর অতল স্তব্ধতা এবার যেন ছলছল করে উঠল : ভাসা-ভাসা কণ্ঠে সে কয়ে উঠল :

—চারধারে এত আঁধার, এত আঁধার? আমার ভয় করছে।

রক্তের মতো কী একটা ভারি সুন্দর রঙের কথা সে যে মায়ের মুখে শুনেছিল, সে-রং মিছে হয়ে মুছে গেছে বলে তার অন্ধকার নিবিড়তম হয়ে উঠেছে, এবং সে-অন্ধকারে সে যেন তলিয়ে যাচ্ছে। এবার গতকালের মতো স্বচ্ছ কণ্ঠে মনির হেসে উঠল, ওর একটি হাত ও মুঠোয় নিয়ে বললে :

—ভয় কী মুলকী, এই যে আমি তোমার হাত ধরেছি।

—তুমি কে? তোমাকে আমি চিনি না।

—আমাকে তুমি নাই-বা চিনলে, এই যে আমি তোমার হাত ধরেছি এই স্পর্শটুকু তুমি চিনে রাখ, তাহলে অন্ধকারকে তোমার ভয় করবে না মুলকী।

—ওই স্পর্শকে আমার ভয় করছে, তুমি আমার হাত ছেড়ে দাও।

মনির হাত ছেড়ে দিলে।

ওধারে শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে, মনির ভাবলে হাওয়ায় ঝাউগাছে বুঝি অমন শব্দ হচ্ছে, আকাশের পানে চেয়ে দেখলে আরো একঝাঁক পাখি উড়ে আসছে; তাদের রুপালি পাখা সোনালি আলোয় ঝলমল করছে।

—পাখি উড়ে যাচ্ছে? হঠাৎ মুলকী একটু সচকিত হয়ে উঠল, মাথা ঝুঁকিয়ে প্রশ্ন করলে মনিরকে।

—হ্যাঁ, একঝাঁক পাখি।

—তাদের গায়ের রং কী?

—কালো।

—কালকের পাখিগুলোর মতো?

—হ্যাঁ, আর তোমার চোখের অন্ধকারের মতো কালো।

—ওদের তুমি চেন? ওরা নীল সাগরের দ্বীপ থেকে উড়ে আসছে? ওদের ঠোঁটের আঁচড় আছে তোমার গায়ে?

—দ্বীপের দেশের লোক আমি, সংগ্রাম করি বলে মিছে কথা বলি না। ওদের রং কালো, ওদের আমি চিনি।

হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে মুলকী চেঁচিয়ে উঠল, কেউ বুঝি তার গায়ে ছোরা বিঁধিয়ে দিয়েছে। ওপরে পাখার আওয়াজ প্রখর হয়ে উঠেছে, আকাশের বুক কাঁপছে, নীরবতার সুর যেন ধরা-পড়ে-গিয়ে অস্ফুটকণ্ঠে কেঁদে উঠছে, ব্যর্থ হয়ে পালাবার পথ খুঁজছে।

—কোথায় তোমার হাত, ও দ্বীপের দেশের লোক?

—এই যে, এই যে, আমার হাত।

—এত আঁধার যে তার মধ্যে যেন ডুবে যাচ্ছিলাম, তোমার হাতের স্পর্শ ভালো লাগছে—কী তোমার নাম?

—হাওয়া। বল একবার, শুনি।

—হাওয়া।

—কী মিষ্টি তোমার গলা, আর কী গভীর; হৃদয়ের উৎস হতে তোমার কথাগুলো যেন উৎসারিত হয় মুলকী।

রোদ চড়ছে, গাছের ছায়া যেন আরো ঘনীভূত হচ্ছে, ঘন-পল্লবের ফাঁকে সূর্য ঝকমক করছে।

—আচ্ছা মুলকী এ-পাহাড়ের পথ তুমি কী করে চিনলে, এ-ফুলগাছের খবর কী করে জানলে।

—আগে আমার মা ফুল কুড়োতে আসত, তার সঙ্গে আমিও আসতাম। মার পা ভেঙেছে বলে আর চলতে পারে না তাই আমি তার জন্যে রোজ ফুল কুড়োই। মা এ-ফুল ভালোবাসে।

—আজ তুমি ফুল কুড়োবে না?

—না।

—কেন?

—মা মিছে কথা বলেছে আর ঠকিয়েছে, তাই তার জন্যে আমি ফুল নিয়ে যাব না। আর, কালো ফুলকে আমি ঘৃণা করি।

—আমি যে মিছে বলি নি তা কী করে বুঝলে?

—না, তুমি মিছে কথা বলতে পার না; তুমি দ্বীপের দেশের লোক, যে-দ্বীপে ওই পাখিরা থাকে, আর যাদের আওয়াজ আমি শুনেছি।

মনির হাসল অস্পষ্ট গলায়, তারপর তার হাত ছেড়ে আস্তে উঠে পড়ল, দিগন্তের পানে চেয়ে বললে :

—এবার পালাই। তুমি নাববে না?

—নাবব। ... কিন্তু অমন লাগছে কেন?

—কেমন লাগছে?

—ভয় করছে, মনে হচ্ছে কোথায় যেন গভীর গুহা তার ভেতরে পড়ে যাব। তোমার হাতটি আমাকে দাও...

—এই নাও। ওঠ।... কিন্তু দ্বীপের দেশে যখন আমি ফিরে যাব মুলকী, তখন তো তোমাকে একা দাঁড়াতে হবে, এই পথ দিয়ে একা চলতে হবে?

—না, কেন তুমি যাবে? না, যাবে না, এই শান্তির দেশে তুমি থাকবে কিন্তু মিছে কথা বলবে না, আর তোমার হাতটি আমাকে ধরতে দেবে।

—তাহলে তুমি কী দেবে আমাকে?

—কী দেব, কী দেব? মুলকীর কণ্ঠ থেমে গেল, চলাও। তার এমন কী আছে যে সে দিতে পারে সে-লোকটাকে, যে-তাকে ডাঙ্গার ইশারা দেবে? মনিরের অদ্ভুত প্রশ্ন তাকে বিমূঢ়

করে ফেলল, তার হাত ছেড়ে দিয়ে সে অস্ফুট কণ্ঠে বললে : কিছু দিতে পারি না।

—নাও, হাত ধর। যা তুমি আমাকে দেবে, সে-অমূল্য দান তুমি জান না মুলকী। তুমি ক্রমে-ক্রমে বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছ, আর আমার মুক্তি আসছে দ্রুত তোমার চোখের অন্ধকার হতে।

—কিন্তু তোমার দান আমি বুঝতে পারি।

—আমার দান যে বন্ধন তাই অত স্পষ্ট, তোমারটা মুক্তি বলে অস্পষ্ট। তোমার দানই বড় মুলকী। তোমাকে আমি ঠকিয়েছি, আমাকে মাফ কোরো।

কী একটা আবেগ মেয়েটির অন্তরের অন্ধকার তরঙ্গিত করে তুলল, সে মনিরের হাতটি কঠিনভাবে চেপে ধরল, কয়েক মুহূর্ত পরে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল :

—তোমার কাছে আমি ঠকতে চাই। আমাকে ছেড়ে তুমি কখনো চলে যেয়ো না। বল যাবে না?

—সে-কথা কেউ কখনো বলতে পারে না মুলকী। বলে, মনির আর দাঁড়াল না, ওর হাত ধরে নাবতে লাগল নিচে—এতটা দ্রুতভাবে যে মুলকী দুয়েকবার হোঁচট খেল, শেষে একটা বড় পাথরে ঠোকর লেগে একটা আঙ্গুলে আঘাত পেল। ওর পায়ের কাছে মনির উবু হয়ে বসল, দেখলে আঙ্গুলটার ধার দিয়ে রক্তের সূক্ষ্মরেখা দেখা দিয়েছে।

—ছিঃ। হঠাৎ মুলকীর ম্লান কপোলে রাঙা আভা জেগে উঠল, আর তাই চেয়ে দেখে মনির শুধোল :

—কী?

—তোমার ওই হাত—যে-হাত তুমি আমাকে ধরতে দিয়েছ সে-হাত দিয়ে তুমি আমার পা ছুঁয়ো না। বলে একটু নিচু হয়ে হাতটি সযত্নে ধরে তুলে কোমলভাবে সে মাথায় ঠেকিয়ে রাখলে কয়েক মুহূর্ত, তার চোখের প্রান্তে হালকা পক্ষ্ম ঘিরে ওই রক্তরেখার মতো অশ্রুরেখা দেখা দিল। তার মুখে রোদ ঝলমল করছে, গলার নিচে ঘাম জমেছে আর কপোলে এমন প্রশান্ত শ্যামলিমা যেন ওই আবছা ধূসর নীল-দিগন্তের প্রসারিত অনুচ্চারিত চিরমৌন স্নিগ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওর ছোট কপোলটি ঘিরে।

—তোমার আঙ্গুল দিয়ে রক্ত পড়ছে মুলকী!

—পড়ুক।

—ব্যথা করছে খুব?

—করছে, কিন্তু ওই ব্যথাটুকু ভারি ভালো লাগছে কেন?

—ও হল বন্ধনের শৃঙ্খলের ব্যথা। বন্ধন তুমি চাইছ বলে সে-শৃঙ্খলের ব্যথাও প্রশান্তি, যে-প্রশান্তি শৃঙ্খলের ব্যথার আনন্দ থেকে উৎসারিত হয়েছে, সে-প্রশান্তি আমার কাছে অভিরাম লাগছে মুলকী।

মনিরের বাসার চারধারে পাহাড়, এবং এ-স্থানটা সে ভালোবাসে। মুক্ত স্থানে নিজেকে ধরা যায় না বোঝা যায় না; মানুষের মন যেন আলো, বাধা সরিয়ে দিলেই ছড়িয়ে পড়ে।

তখন পাহাড় বেয়ে আকাশকে ধূসর করে আঁধার উঠছে আর উপত্যকার বুকে ঘন ছায়া জমে উঠছে ধীরে-ধীরে, এখানে-ওখানে তারা ফুটছে দুয়েকটা, যেন আকাশের চোখ খুলছে একে-একে, আকাশ নয়ন মেলে চাইতে আরম্ভ করছে। দূরে কোথাও কোন বস্তিতে সম্মিলিত গভীর কণ্ঠে পাহাড়িরা সান্ধ্যপ্রার্থনা করছে, তারই আবছা-হয়ে-ওঠা সুর অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে। সাঁঝের আকাশ ভরে-তুলে যাঁর কাছে পাহাড়িরা সান্ধ্যপ্রার্থনা করছে, তিনি হয়তো থাকেন পর্বতের শিখরে-শিখরে, রক্তজবার মতো লাল ঝরাফুলে, উড়ন্ত পাখির ডানার রহস্যময় শব্দে, আর বনানীর বর্ণে। হয়তো শীতের বস্ত্র দেবার জন্যে অথবা উঁচু দুর্গম তুষারশুভ্র পর্বতের ওপাশে দৈত্যের কবল হতে শিশুদের বাঁচাবার জন্যে অথবা রাত্রির কৃষ্ণ-আবরণে

অবগুণ্ঠিত কৃষ্ণকায় প্রেতের নখের আঁচড় হতে মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তারা প্রার্থনা করছে, কিন্তু তবু সেটা প্রার্থনা, সম্মিলিত গম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে স্বনিত সন্ধ্যার ধূসর নিস্তব্ধতায় অপূর্ব অচিন্তনীয় প্রার্থনা, যেন ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে তারা পর্বতমালায় ঘুম নাবাচ্ছে, এবং এবার তারা ঘুমিয়ে পড়বে, জাগবে না আর যতক্ষণ পর্যন্ত উষার শান্ত স্নিগ্ধ আলো পুবের পাহাড়ের শীর্ষ স্বচ্ছ করে না-তোলে।

সন্ধ্যার আবছা আলোর নিস্তব্ধতা ঘিরে একটা অপরিসীম বিস্তৃতি, সে-বিস্তৃতি আর সমবেত কণ্ঠের প্রার্থনার অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো মধুর সুর স্থানটিকে মায়াময় ও অবাস্তব করে তুলেছে, এবং, এর মধ্যে নিশ্চল হয়ে বসে থেকে মনিরের মনে হল যেন এ-কোনো ভুলে-যাওয়া জগৎ, যেন কোনো অচেনা-অপরিচিত দূর-দূরান্তের আকাশের প্রান্তবর্তী ম্লান নক্ষত্র।

কখন সান্ধ্যপ্রার্থনা থেমে গেছে, অন্ধকারাচ্ছন্ন উপত্যকার মাঝে নিশ্ছিদ্র নীরবতা প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে, কোথায় কোন গাছে একটা নিশুতিরাতের পাখি ডাকতে শুরু করেছে; চারধারে নিশাজল পড়তে আরম্ভ করেছে, যেন ঘুম নাবছে, তন্দ্রা নাবছে, আর ওপরে কালো আকাশে তারা—অগুন্তি তারা বিস্মৃতির স্পন্দনের মতো কাঁপছে-নড়ছে।

অতগুলো তারার মধ্যে কোন তারা যে-ইশারা করলে কে জানে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মনির চলতে শুরু করে দিলে। কাঁকরে আর পাথরে ভরা পথ,—নৈঋত কোণের ওই প্রত্যন্ত পর্বতটির বিশালকায় জন্তুর মতো দেহের ছায়ায় সে-পথ কালো হয়ে উঠেছে; ওধারে পাহাড়ি কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে, মাথায়-কাপড়-দেওয়া কে যেন চলে গেল পাশ দিয়ে।

বস্তিতে লোকে নিচুগলায় কথা কইছে, তারই গুঞ্জন ভেসে আসছে থেকে-থেকে : এঘরে-ওঘরে আলো জ্বলছে—স্তিমিত ম্লান আলো, আর প্রত্যেক ঘরের দরজায় আগল পড়েছে। ওধারে একটা দীর্ঘ সরু বৃক্ষ, তার নিচে খানিকটা স্থান পাথরে বাঁধানো, আর তার পাশে যে-নিচু নোংরা কাঠের ঘর, সে-ঘরের রুদ্ধ দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে পল্লবমর্মরের মতো স্বপ্নিল কণ্ঠে মনির ডেকে উঠল :

—মুলকী।

কয়েক মুহূর্তব্যাপী নিশ্চলতা ও নীরবতা; মুলকী এল না, দরজা খুলে বেরিয়ে এল বেঁটে মতো চেপ্টামুখো একটা লোক, ছোট ছোট তার চোখ আর বোঁচা নাক, হাতে লাঠি আর হারিকেন লণ্ঠন। তার মুখে কথা নেই, শুধু হারিকেনের স্তিমিত আলোয় ওর ছোট চোখদুটি ধকধক করে জ্বলতে লাগল; তার পেছন দিয়ে একটা কুকুরের মুখ বেরিয়ে এল—লম্বা উঁচু পাহাড়ি কুকুর, তার সরু দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ জিহ্বা লকলক করছে, আর তার চোখও যেন ওই নির্বাক লোকটির চোখের মতো আবছা আলোয় জ্বলছে হিংস্রভাবে। কয়েক মুহূর্তব্যাপী নীরবতার পর মনির নতমাথায় রাস্তায় নেবে এল, পেছনে দরজার প্রান্তে লণ্ঠনের আলো আঁধারের বুকে ম্লান-আলো ছড়িয়ে নিষ্কম্প হয়ে রইল, আর কুকুরটির গলায় কেমন ঘড়ঘড় আওয়াজ হতে থাকল। রাস্তার পাশের নালা হতে ভাপসা গন্ধ আসছে।

মনির ধীরে-ধীরে পথ চলছে, এক-আধবার আকাশে চেয়ে তারা দেখছে আর পাথরে হোঁচট খাচ্ছে থেকে-থেকে, এমন সময়ে পেছনে এক-জোড়া পায়ের আওয়াজ বেজে উঠল, কিছুটা অসংযত ও দ্রুত তার চলার শব্দ। পেছনের অন্ধকার হতে চাপা গলায় কে যেন কয়ে উঠল : কে যায়? তারপব সে হাঁপাতে থাকল। মনির থমকে দাঁড়াল, বললে না কিছু; পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে আবছা আঁধারের গায়ে মুলকীর মতো একটা দেহ ফুটে উঠেছে অস্পষ্টভাবে। সে-ছায়ার মতো কায়াটি আবার শুধোল :

—কে যায়?

—আমি। আমি হাওয়া।

—তুমি, দ্বীপের দেশের লোক? তোমার গলার আওয়াজ আমি পেয়েছিলাম আমাদের ঘরের দোরে। কেন গিয়েছিলে? কেন চলে এলে?

—ওই লোকটির আর তার পেছনের কুকুরটার চোখ জ্বলছিল।

—তাই চলে এলে? তুমি ভয় পাও? না, না; তোমার হাত ধরে যে আমি সাহস পাই মনে, তুমি ভীতু নও।

—তুমি পালিয়ে এসেছ মুলকী?

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কেন গিয়েছিলে?

—গিয়েছিলাম তোমাকে একটা কথা বলতে।

—সে কী কথা?

—এখন থাক।

—বল। তুমি ভয় পেতে শুরু করেছ বলে আমি ভয় পাচ্ছি। বল না সে কী কথা?

—শোন। আকাশের নীরবতা আর নির্জনতায় ডুবে থেকে হঠাৎ মনে জাগল যে তোমার সাথে প্রবঞ্চনা করায় আমার পাপ হয়েছে।

—তুমি প্রবঞ্চনা করেছ, দ্বীপের দেশের লোক?

—হ্যাঁ। তোমাকে নিঃসহায় করেছি বটে কিন্তু সহায় হবার সামর্থ্য ও শক্তি–তো আমার নেই মুলকী। তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম, ওই ফুলের রং, ওই পাখির রং কালো নয়, কালো রং তোমার চোখে, আর সারা জগৎ ভরে শুধু সাত রঙের লীলা। আর আমার দেহে পাখিদের ঠোঁটের আঁচড় নেই, ওদের আমি চিনি না!

শুধু সেদিনকার মতো প্রগাঢ় নীরবতা ও অন্ধকারের মধ্যে মুলকী অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল : বিশ্বাসভঙ্গের আঘাতে মুখটি অসহায় হয়ে উঠতে চাইলেও সে তরল হবার চেষ্টা করতে লাগল, মুখে আভা এল না।

পেছনে অন্ধকারের মধ্যে ক–টা স্তিমিত আলো–বিন্দু মিটমিট করে উঠল, কারা যেন সেখানে কথা কইছে, পথের কাঁকরে তাদের চরণ বাজছে। তার ক্ষীণ আওয়াজ মুলকীর কানে গেছে বোধহয়, তাই সে সোজা হয়ে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর কিছুটা কম্প্রমান গলায় বলে উঠল :

—তারা আসছে, আমাকে খুঁজতে আসছে। তোমার হাতটি দাও, সে–হাত ধরে আমি তাদের সম্মুখে সোজা হয়ে দাঁড়াব।

—না। আমি পালিয়ে যাচ্ছি। তোমার চোখের অন্ধকারে আমি মুক্তি চেয়েছিলুম মুলকী, মৃত্যু চাই নি।

কালো আকাশে তারা ঝকঝক করছে, ঘনায়মান তমসায় মনির মিলিয়ে গেল, নিমীলিত চোখে প্রগাঢ় স্তব্ধতা ভরে তুলে স্থির মূর্তির মতো অন্ধকারের গায়ে যেন ঠেস দিয়ে মুলকী দাঁড়িয়ে রইল : নিস্তব্ধতার মধ্যে ওদের পায়ের আওয়াজ আর অস্পষ্ট কথা থেকে–থেকে কানে ভেসে আসছে।

রোদ কড়া হয়ে উঠেছে পৃথিবীর গায়ে, চুলের গোড়ায় আর ঘাড়ে ক্ষীণ প্রদাহ হচ্ছে, তবু মনির পাহাড়ে চড়তে লাগল। সেই নীল পাহাড়মালা ও সবুজ বনের ধারে যে–স্বচ্ছ জলের গভীর হ্রদ আছে, তার শীতলতা অত বদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ কেন, সে–সরোবর উদ্বেলিত তরঙ্গায়িত হয়ে উঠে ছড়িয়ে পড়তে পারে না সারা বিশ্বময়? একথা ভাবলে মনির, তারপর মুখ তুলে চেয়ে দেখলে ওই সম্মুখের গাছের তলায় কে যেন বসে রয়েছে—যার দেহ গাছের ছায়ার শীতলতায় অনুজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। ও মুলকী।—পায়ের আওয়াজ শুনছি। কে ওখানে? স্তব্ধ মুলকীর দেহ এবার যেন চঞ্চল হয়ে উঠল, স্তব্ধ চোখে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে সে প্রশ্ন করল। মনিরের ঔৎসুক্য নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাই সে একবার চোখ তুলে অলসভাবে চেয়ে দেখলে আকাশের

প্রান্তের সাদা মেঘগুলোর পানে, তারপর চাইলে পাহাড়ের নিচে যে-কটা ভেড়া চরছে সে-গুলোর পানে; এবার একটু কেশে অনুচ্চ গলায় বললে :

—আমি। থেমে আবার বললে : তোমাকে বলতে এলাম যে তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। তোমার চোখের অন্ধকারে আমি মুক্তি চেয়েছিলাম, মুক্তি পেলে তুমি, আর বন্ধনের শৃঙ্খলে আমি জড়িয়ে পড়ছিলাম; তুমি আমাকে জড়িয়ে ফেলেছিলে।

—গলার স্বর অত দূর হতে আসছে কেন?

—দূরে বসেছি বলে।

—কাছে এসে বস। তোমার কোনো কথা আমি বিশ্বাস করি না, শুধু তোমার হাতটিকে আমি চিনি। কাছে এস। তোমার হাত ধরতে দাও আমাকে।

—না। আজ চলে যাচ্ছি।

—কোথায়? সেই দ্বীপের দেশে? .... আমিও যাব, আমাকে নিয়ে চল, এখানে আমিও থাকব না; এখানকার মাটি পাহাড় গাছপালারা কথা কয় না, বুড়োর মতো অচল হয়ে থাকে, এখানে আমার ভালো লাগে না।

—দ্বীপের দেশে আমার ঘর নয়। কোনো দ্বীপ আমি জানি না।

—এও মিথ্যে? মুলকীর মুখ যেন ভেঙে আসছে, ব্যথার আঘাতে তার চোখের রেখাগুলো কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে; ক্ষণকাল নীরবতা, তারপর আবার সে শুধাল :

—তুমি কে?

—আমি মানুষ। এই পৃথিবীতে জন্মেছি, এই পৃথিবীতেই মরব। তাই আমরা মানুষরা শুধু প্রতিশোধ নিতে চাই, কার বিরুদ্ধে জানিনে। আমরা এখানে কামড় দেই, ওখানে আঁচড় কাটি, সত্য চিনিনে বলে থুতু ফেলে মিথ্যে বলি, আর আমরা স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে সে-স্নেহ-মমতা লাথি মেরে ভেঙে দেই, বেদনায় হাসি।

—তোমার কথা আমি বুঝতে পারছিনে। অন্ধকারে আমার ভয় করছে, তোমার হাত দাও, দাও।

—না।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে তিক্ত বিকৃত সুরে অসহায়ভাবে হঠাৎ মুলকী চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, উঠে দাঁত দিয়ে হাত কামড়াতে লাগল, চুল ছিঁড়তে লাগল, এবং অবশেষে একটা অদ্ভুত প্রগাঢ় স্তব্ধতায় সে শান্ত হয়ে এসে মাথাটা ঈষৎ হেলিয়ে কী যেন ভাবতে থাকল, চোখের রেখা ভাষার অতীত শূন্যতায় স্পষ্ট ও স্থির হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পর সে আবার শুধাল :

—আকাশে ও কিসের শব্দ?

—একঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে।

—কী তার রং?

—ধূসর।

—কোথেকে উড়ে আসছে?

—জানিনে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে মুলকী কিছুটা কোমল ও নরম কণ্ঠে কয়ে উঠল :

—তুমি ফুল নেবে? প্রথম দিন আমার কাছে হাত পেতে তুমি ফুল চেয়েছিলে, আমি দেই নি; আজ দেব, নেবে?

পাহাড়ের নিস্তব্ধতা হতে কেউ কোনো উত্তর দিলে না : শুধু অসীম আকাশের প্রান্তে উড়ন্ত পাখিদের পাখার ম্লান-হয়ে-আসা অস্পষ্ট শব্দটুকু এখনো শোনা যাচ্ছে, যেন দূরান্তের চির-অন্তরিত রহস্যময় গোপন বাণী বেদনার সুরে অতি ক্ষীণভাবে গোঙাচ্ছে। মুলকীর চোখের অন্ধকারের বাইরের বিরাট অত্যুজ্জ্বল শান্ত দিনটি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে সেই গোঙানির সুরে, আর সে-ঘুম বেয়ে কোমল ব্যথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দ চরণে কখন-যে মনির পাহাড় হতে

নেবে গেছে মুলকী জানতে পারে নি; তার কান হয়তো সেই শূন্যতায় ভরে উঠেছিল, যে-শূন্যতায় সৃষ্টির জন্ম।

কার্তিক ১৩৪৯ অক্টোবর ১৯৪২

অনুবৃত্তি

আজ সন্ধ্যায় উত্তর আকাশের মেঘগুলো নীলাভ হয়ে উঠেছে, আর তাই চেয়ে-চেয়ে দেখে আরশেদ হামেদের স্বচ্ছ চোখও যেন নীলাভ হয়ে উঠল। হাতে তার একটা রক্তজবা, গাঢ় লাল তার রং। পাশের ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বাসন্তী রঙের শাড়ি-পরা যে-ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি বসে ছিল নীরবে, তার পানে চেয়ে সে বললে :

'ওই যে নীল মেঘগুলো—স্নেহের মতো নরম কোমল নীলাভ মেঘগুলো, ওইগুলো দেখে হঠাৎ একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল, ভারি দুঃখময় সে-ঘটনাটি। শুনবে?....বলছি, আগে এই ফুলটি নাও।'

মেয়েটির সরু-সরু আঙ্গুলগুলো কোমল আর দীর্ঘ, সে-আঙ্গুলগুলো দিয়ে সে হামেদের হাত হতে আস্তে ফুলটি নিলে, নিয়ে মাথা নিচু করে কেমন করে সেটা খোঁপায় গুঁজে দিলে। তার কালো চুলে লালফুলটি মানাল ভালো।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসে পূর্ণদৃষ্টি মেলে হামেদ তাকালে মেয়েটির পানে। মুখটি তার সুন্দর নয় বটে, তবু দীর্ঘ ঘন পল্লবে ঘেরা চোখে, ঈষৎ পুরু ঠোঁটে, বাঁকা সরু ভ্রূতে, দীর্ঘ ক্ষীণদেহে আর স্নিগ্ধ উজ্জ্বল শ্যাম রঙে কেমন একটা আকর্ষণ। নাম তার বেগম—সংক্ষেপে।

মাথাটি আস্তে ঈষৎ হেলিয়ে ঠোঁটের প্রান্তে হেসে বেগম ফিরে চাইলে হামেদের পানে, মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল :

'মানিয়েছে?'

'মানিয়েছে, খুব মানিয়েছে।'

'আহা, ভারি তো। ... আচ্ছা, এবার তোমার সেই ঘটনাটি বল, শুনি।'

দূরে দিগন্তরেখা ঘিরে আস্তে-আস্তে আঁধার ছাপিয়ে উঠছে সমস্ত নীলিমা আর সমস্ত আকাশ, এবং কটা ম্লান তারা ফুটছে এখানে-সেখানে। বিচিত্র এই মহাকাশ, এই ধরণী, এই আধোআলো আধোছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ, ওই ক্ষীণ কম্পমান তারাগুলো, আর তাদের ঘিরে যে-শাশ্বত নিবিড় নিশ্ছিদ্র নীরবতা, সর্বশেষে এই চোখ, বাঁকা ভ্রূ আর লালফুল-গোঁজা চুলের খোঁপা। বেগম নীরব হয়ে রয়েছে গল্প শুনবে বলে, হামেদ নীরব হয়ে রয়েছে গল্প বলবে বলে, এবং এই নীরবতার মধ্যে আরশেদ হামেদের চোখ হঠাৎ ব্যথায় ভরে উঠল, যেন কোনো বিস্মৃত প্রস্থিত ঘটনা তার মনের দ্বারে ঢেউ জাগিয়ে তুলেছে, তারই আঘাতে তার চোখে ব্যথা উঠল ভরে। যে-কারুণ্য নীরবতার মধ্যে ক্রমে-ক্রমে ফুটে উঠল তার চোখে, তা লক্ষ্য করে বেগম কিছুটা আহত হল; তার চোখের পানে চেয়ে নরম কণ্ঠে বললে :

'থাক্‌গে, ওসব বলে তোমার কাজ নেই। .... শোন, ওই আকাশের পানে তাকিয়ে নতুন-নতুন তারার জন্ম তুমি চেয়ে-চেয়ে দেখ, আর আমি তোমাকে মৃদুকণ্ঠে একটা গান গেয়ে শোনাই। ... শোবে? শোও না আমার কোলে মাথা রেখে।'

তারার পানে মুখ করে বেগমের কোলে মাথা রেখে শিশুর মতো হামেদ শুয়ে পড়ল : কোলটি উষ্ণ ও কোমল, যেন স্নেহভরা।

কয়েক মুহূর্ত পরে চোখ মুদে শান্তকণ্ঠে হামেদ প্রশ্ন করল :

'বাসায় যাবার প্রয়োজন–তো তোমার তেমন নেই, না?'

'না। কোনো সাংসারিক প্রয়োজন নেই, আর, উনি আসবেন শেষরাতের ট্রেনে, সে–তো তুমি জান। অবিশ্যি ন্যায়–অন্যায়ের কথা যদি তুমি তোল, তাহলে আমাকে এখুনি বাসায় ফিরে যেতে হয়, তবে এখানে এই নির্জনে সমাজ নেই তাই ন্যায়–অন্যায়ের শাণিত তলোয়ারও ঝলসাচ্ছে না এখানে।'

'থাক। এবার তুমি গান ধর।'

'ধরি।' বেগম মাথা নিচু করে মিষ্টিভাবে হাসলে, তার চোখের পানে গভীরভাবে চেয়ে দেখলে, এলোমেলো শুষ্ক চুলে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে বললে :

'তোমার চুলগুলো ভারি সুন্দর রেশমের মতো, হালকা আর নরম।' থেমে কয়েক মুহূর্ত নির্বাক থেকে হঠাৎ প্রশ্ন করলে : 'আচ্ছা, একটা কথা। তুমি কিন্তু আগের চেয়ে যেন অনেক ছন্নছাড়া হয়ে গেছ, কেন বল–তো? আগে তোমার যে–চোখদুটো নির্মল আনন্দে সর্বদা উজ্জ্বল হয়ে থাকত, প্রদীপ্ত হয়ে থাকত শাণিত কৌতুকে, সে–চোখ এমন দীপ্তিহীন, আর নিষ্প্রভ হয়ে উঠেছে কেন, কোথায় গেল সেই ঔজ্জ্বল্য, সেই দীপ্তি?'

নিমীলিত চোখে হামেদ নীরবে কথা শুনছিল, অনুচ্চকণ্ঠে ক্ষুদ্রভাবে উত্তর দিলে :

'হারিয়ে গেছে।'

বেগমের চোখে আর কণ্ঠে ব্যথা জেগে উঠল, সে বললে :

'কেন হারিয়ে যাবে, কিসের অত দুঃখ তোমার হামেদ?'

'দুঃখ? দুঃখ কোথায়? বোধহয় সে–ঔজ্জ্বল্য আর দীপ্তি সাগরের পানিতে ধুয়ে–মুছে গেছে।'

কয়েক মুহূর্ত দূরে আঁধারের পানে তাকিয়ে বেগম নীরব হয়ে রইল, তারপর আবার বললে :

'ইস্, কতদিন পরে তোমার সাথে আজ আমার দেখা, না হামেদ? প্রায় চার বছর। বিয়ের পর তোমার একবার খোঁজ করেছিলুম, যদিও দেখা করার সাহস আমার ছিল না, তবু শুধু তোমার খবরটা জানতে চেয়েছিলুম। তুমি আঘাত পেয়েছিলে, আমার সাথে রাগ করে চলে গিয়েছিলে, তাই তোমার খবরটার জন্যে মন আমার আকুল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কেউ তোমার কোনো খবর দিতে পারলে না। শেষে শিলচরে কালু ভাই সংবাদ দিলে যে তুমি নাকি জাহাজে চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে গেছ, আর কখনো দেশে ফিরবে না। সেদিন রাতে আমার ভয়ানক কান্না পেয়েছিল, ওঁর ভয়ে বালিশে মুখ গুঁজে চেপে–চেপে কেঁদেছিলুম অনেকক্ষণ, তবু মনের বেদনা হালকা হল না।'

কোমল অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বেগমকে বাধা দিয়ে হামেদ বলল : 'থাক, থাক ওসব।' তারপর ওর খোঁপার পানে চেয়ে প্রশ্ন করলে :

'ও–কী? রক্তজবাটা কোথায় গেল?'

'ক্ষিপ্রহস্তে বেগম খোঁপায় হাত দিলে, শেষে নিচে ঘাসের ওপর থেকে ফুলটি কুড়িয়ে নিয়ে বললে :

'কখন যে পড়ে গেছে...। অত আলগোছে–তো লাগাই নি, পড়ল কী করে?'

'অন্ধকার ওর রঙটা মুছে নিয়েছে কিনা, তাই লজ্জায় ও ঝরে পড়ে গেছে।'

সেই সরু–সরু কোমল আঙ্গুলগুলো দিয়ে কেমন করে ফুলটি আবার খোঁপায় গুঁজে সে বললে : 'তোমার দেওয়া ফুলের রং কেউ মুছে দিতে পারে না হামেদ।'

'অত বড়াই কোরো না, কাল কিন্তু কান পেতে শুনছে। তার আক্রোশটা আমার ওপর এসে পড়তে পারে, যেহেতু তাকে অবজ্ঞা করে তুমি অমন দম্ভভরা কথা কইছ।'

'ছিঃ, কী বলছ ওসব, যত অলক্ষুণে কথা?'

হামেদ হাসলে, বললে :

'জান, যেখানে আমার বাস আর আমার কাজ, সেখানে শুভ কথায় অলক্ষুণে কথায় কোনো প্রভেদ নেই বেগম। আমার জীবন সেখানে নীল সাগরের ঢেউয়ের দোলায় নাচে।

সেখানে কোনো স্নেহ-মমতা নেই, রয়েছে শুধু নিষ্ঠুর বাস্তবতা।'

'যাঃ, যাঃ।' কথাটা দু-বার বললে বেগম, হামেদের মাথায় মৃদু ঠেলা দিয়ে; তার কণ্ঠ এল ভারি হয়ে, অভিমানে ঠোঁটদুটো ফুলে উঠল। বললে :

'এবার শুরু হল যত অলক্ষুণে কথা। শোন, মিছিমিছি না বকে একবার শুনবে তুমি আমার গান?'

হামেদ চোখ বুজলে। কোলের স্নেহভরা কোমলতা ও উষ্ণতায় তার সারা মুখে নির্মল শান্তির আভা ফুটে উঠল। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে বললে :

'গাও না, আমি শুনতেই-তো চাইছি।'

আকাশে তারার আর অন্ত নেই, অদ্ভুত বিচিত্র সেই তারাগুলো। আর সারা আকাশ হতে নিস্তব্ধতা ঝরছে পৃথিবীর ওপর। দূরে কোথায় বনের মধ্যে ঝরনা রয়েছে বুঝি, তারই অস্পষ্ট শিরশির শব্দ প্রগাঢ় নীরবতার মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠল হামেদের কানে। মৃদু শীতল হাওয়া থেকে-থেকে ঝিরঝির করে বইছে, গাছের পাতা কাঁপিয়ে চুল দুলিয়ে, আর তাইতে হাস্‌নুহানার মিষ্টিমধুর গন্ধ ভেসে এসে ভরে তুলছে নাক।

বেগমের গলার কোনো সাড়া না পেয়ে আধমিনিট পরে হামেদ চোখ মেলে চাইল, বিস্মিত হয়ে দেখলে, বেগমের দৃষ্টি তার মুখের ওপর নিবদ্ধ, সে মাথা নিচু করে নিশ্চলভাবে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে তার পানে। হামেদের চোখ কোমল হয়ে উঠল; সে বললে :

'গান গাইবে বলে আমি চোখ মুদে রইলুম, আর তুমি তাকিয়ে রয়েছ আমার পানে। লক্ষ্মীটি, অমন করে কী দেখছ বল-তো?'

মাথায় ছেলেমানুষের মতো মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বেগম নিরুত্তরে সামনের পানে তাকাল, আর সে-ঝাঁকুনিতে এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়ল হামেদের শুষ্ক ঠোঁটের ওপর। হামেদ চমকে উঠল, বিস্মিত হয়ে তাকালে তার পানে, ক্ষণকাল চেয়ে থেকে সতর্ক মৃদুকণ্ঠে ডাকল :

'বেগম।'

বেগম নিস্তব্ধ, নিশ্চল; একদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রয়েছে দূর দিগন্তের পানে, যেখানে আঁধার জমেছে ঘন হয়ে, যেখানে মানুষের দৃষ্টি হয় ব্যর্থ। মুখ ফিরিয়ে হামেদ তাকালে সংখ্যাতীত ম্লান মূক তারাগুলোর পানে; তারাগুলো নড়ছে, কাঁপছে, আর সেই কম্পনে বৃষ্টিকণার মতো যেন বেদনা ঝরছে, আকাশ বেয়ে নাবছে এই ধরণীর ওপর। হামেদের মনে হল কোথায় যেন আকাশ ছাপিয়ে, তার অন্তর ছাপিয়ে, অতি করুণ সুরে সঙ্গোপনে কী একটা সুর থেকে-থেকে গোঙিয়ে উঠছে, সে-সুরে শুধু ব্যথা। হামেদের ম্লান চোখে ব্যথার ছায়া ঘনিয়ে উঠল, একটি কথাও সে বললে না। তার ঠোঁটের ওপর যে-অশ্রুকণাটি একটা অব্যক্ত ব্যথার পেষণে ঝরে পড়েছিল ওই ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটির ঘনপল্লবঘেরা চোখ হতে, সেটা শুকোয় নি এখনো; নিজের অজ্ঞাতে হামেদ জিহ্বা দিয়ে চেটে নিলে সে-অশ্রুকণাটি, যেন সে মেয়েটির মনের ব্যথায় চুমো দিলে, মিশিয়ে নিলে নিজের রক্তে।

তারপর আবছা অন্ধকারে হামেদ অতি মৃদুকণ্ঠে নিশ্বাসের শব্দের মতো হাসলে : 'আমার হাসি পাচ্ছে বেগম। দুঃখে যে মানুষের হাসি পায়, সে-কথা জান তুমি?'

গভীর নীরবতার মধ্য হতে কোনো উত্তর এল না, তাই হামেদ আবার বললে : 'একবার আমাদের জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল সান্‌ফ্রান্সিস্কো। একদিন রাতে প্রবল ঝড় উঠল এবং সেই ঝড়ে ভিজে আমার ভয়ানক জ্বর হল। জ্বরের ঘোরে এক সময়ে হঠাৎ আমার মনে হল যে, আমি আমার গাঁয়ের বাড়িতে শুয়ে রয়েছি, আমার দেহময় ছড়িয়ে রয়েছে কোমল আরাম, পেছনে গোয়ালঘরে গরুর শব্দ পাচ্ছি, দোরে মোরগ কক্‌কক্ করছে আর সারা আকাশ প্রশান্ত হয়ে আছে একটা বিস্তৃত সুনিবিড় শান্তিতে। আর মনে হল কে যেন আমার পরম আত্মীয় বসে রয়েছে আমার মাথার কাছে, স্নেহভরে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর আমার পানে চেয়ে মিষ্টিভাবে হাসছে। যখন সে-ঘোর কেটে গেল, চোখ মেলে চেয়ে দেখলুম কেউ নেই

আমার শিয়রের কাছে বসে, বরঞ্চ আমি ভাসছি অকূল মহাসাগরে যেখানে এমন কেউ আমার নেই যার চোখ আমার পানে চেয়ে সজল হয়ে উঠবে, নীরবে আমার তপ্ত হাতটি টেনে নেবে তার হাতের মধ্যে, তখন সে-আঘাতটা প্রচণ্ডভাবে লাগল আমার বুকে। কিন্তু কী জানি কেন হাসি পেল আমার, উঁচু গলায় হাসলুম। একটু দূরে চেয়ারে বসে থার্ড অফিসার উবু হয়ে কী যেন করছিল আর শিস্ দিচ্ছিল, মুখ তুলে আমার পানে চেয়ে হাসির কারণ প্রশ্ন করলে। কয়েক মুহূর্ত হাসির কোনো হেতু খুঁজে পেলুম না, তারপর মনে হল সেই ভেরাক্রাজ-এ একটি লোক দেখেছিলুম যার নাক তলোয়ারের মতো, তার কথা মনে পড়েছে বলে হাসি পাচ্ছে। কিন্তু হেসেছিলুম অতি দুঃখে, যে-দুঃখের কোনো প্রতিকার নেই; সে-কথাটি জ্বরের ঘোরে তখন বুঝি নি।' হামেদ থামল, তাই চারধারে নীরবতা আবার গভীরতর হয়ে উঠল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে সে-নীরবতার মধ্যে তীক্ষ্ণ তলোয়ারের ঝন্‌ঝনানির মতো বেগম কথা কয়ে উঠল, তার কণ্ঠ এমন শোনাল যেন অন্ধকার আর্তনাদ করে উঠল হঠাৎ : 'তুমি কেন এসেছ আমার কাছে? কেন এসেছ? তোমাকে-তো আমি চাই নি; আর কখনো তুমি এস না হামেদ।'

দূরে ঝরনার ঝিরঝির আওয়াজ আবার জেগে উঠল নীরবতার মধ্যে; ঝোপের মধ্যে ঝিঁঝি ডাকছে অবিশ্রান্তভাবে, পাতায় মর্মর শব্দ হচ্ছে, কম্পমান তারা হতে আকাশ বেয়ে বেদনা ঝরছে, আবছা-আবছা আঁধারে হাওয়া কাঁপছে। হামেদের চোখময় স্বপ্ন, আর তিক্ত ব্যথায় বেগমের ঘনপক্ষ্মঘেরা চোখদুটি যেন অন্ধকারে জ্বলছে : বিশ্বময় বিস্তৃত অবসাদ।

কয়েক মিনিট পরে একটি কোমল হস্তের সঙ্কুচিত স্পর্শ মৃদুভাবে হামেদের চুলে এসে ঠেকল, অতি মৃদুকণ্ঠে মেয়েটি হেসে উঠল, সে-হাসিতে অনুতাপের আর লজ্জার জড়িমা, এবং সে-হাসি মিলিয়ে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত পরে অনুচ্চ গলায় জেগে উঠল ছোট কুণ্ঠিত কথা :

'মাফ কোরো।'

হামেদের রেশমের মতো হালকা নরম চুলের মধ্যে বেগমের সরু-সরু আঙ্গুলগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। ক্ষণকাল পরে আবার সে হাসল, নরম তার সুর, যেন ব্যথায় ম্রিয়মাণ; সে বললে :

'কতদিন পরে মাত্র একটি দিনের জন্য তুমি এসেছ আমার কাছে, কালই আবার চলে যাবে, হয়তো জীবনে আর কখনো আমাদের দেখা হবে না; অথচ তোমার সাথে আমি কথা কইছি কীভাবে, ছি! আচ্ছা, এই, তাকাও আমার পানে।' চুলে মৃদু টান দিয়ে, 'চোখ মেলে তাকাও না। শোন, তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, বল রাখবে তুমি?'

'আগে শুনি তো।'

'না না, আগে বল রাখবে?'

'আচ্ছা আচ্ছা, রাখব। এবার বল শুনি।'

'বলছি। কিন্তু চোখ বুজলে চলবে না, তাকাও আমার পানে, আমার চোখের পানে। শোন, তুমি আমার কাছে নাই-বা এলে, আমরা পরস্পর দুজনকে না হয় ভুলেই গেলাম, কিন্তু তোমাকে ওই জাহাজের চাকরিটা ছাড়তে হবে এই আমার অনুরোধ। আমার মতো সামান্য মেয়ের জন্যে তোমার জীবনটা কেন তুমি অমন ছন্নছাড়া করে তুলবে হামেদ? জান, কোনো দাম নেই এসব ভালোবাসার, জীবনের মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশি। যদি তুমি ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশ ছেড়ে এমনি জাহাজে-জাহাজে আজ এ-বন্দরে কাল সে-বন্দরে করে ঘুরে-ঘুরে বেড়াও-তো কেমন লাগে আমার বল-তো? বল আমার কথা রাখবে—তাকাও না আমার পানে, বল চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে দেশে এসে ঘর-সংসার করতে আরম্ভ করবে লক্ষ্মী মানুষটির মতো?'

হামেদের মুখে রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল, সে বললে :

'সে কি হয় কখনো? সামুদ্রিক জীবনের আস্বাদ কখনো পাও নি বলেই অমন কথা তুমি বলতে পারলে। একবার কেউ যদি রিক্তহস্তে অসহায়ের মতো সাগরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, সে আর কখনো তার মাদকতার কঠিন বাহুবন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে আনতে পারে না! আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু তার মাঝে উৎস হয়ে গেছে। অমন অন্যায় অনুরোধ পালন করতে আমায় কখনো বোলো না, আমাকে তুমি বাঁচতে দাও যে-কটা দিন আমার হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন থাকে।'

বেগম আর কিছু না বলে স্তব্ধ হয়ে রইল, দৃষ্টি তার সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে, আর তার স্নেহকোমল সরু-সরু আঙ্গুলগুলো চলতে থাকল হামেদের এলোমেলা চুলের মধ্যে দিয়ে। কিছুক্ষণ পর নীরবতার মধ্যে হঠাৎ আত্মবিস্মৃতের মতো হেসে উঠল হামেদ, স্বপ্নে কথা বলার মতো বললে :

'শোন, একবার সাতসাগরের পরপারে কোনো এক বন্দরে বুগাঁভিলিয়া গাছের তলে বসে চেয়ে ছিলাম দূর-দিগন্তের পানে, দাঁত দিয়ে হাতের নখ কাটছিলাম, আর নীরবে শুনছিলাম পল্লবমর্মর ও সাগরের অবিশ্রান্ত ক্রন্দন। দূরে পামবনের ছায়ায়-ছায়ায় শ্লথপদে একটি মেয়ে আসছিল ইদিক পানে, তার চুলে রক্তজবার মতো এমনি কী একটা বড় লাল ফুল; হঠাৎ তার পানে চেয়ে আমার মনে হল যেন তুমি আসছ,—সেই চোখ, সেই চিবুক, তেমনি ক্ষীণ দীর্ঘ দেহ। একটা তীব্র উদ্বেল আনন্দের প্রাবল্যে আমার চোখ বুজে এল, নিশ্বাস বইতে লাগল জোরে, আর দেহ সুখাবেশে নিশ্চল হয়ে এল। পল্লবমর্মর বিচিত্র শোনাল কানে, সাগরের ক্রন্দন যেন হঠাৎ তীব্র হয়ে উঠল, তবু সে-সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে আমার কানে সুরের মতো বাজতে লাগল দুটি চরণের অলস ধ্বনি। আবার চোখ মেলে চাইলাম, আঙ্গুল দিয়ে কবার চোখ মুছলাম, পামবনের তলে ছায়া, দূরে সাগরের গভীর নীলিমা, কেউ কোথাও নেই। লালফুল মাথায় গোঁজা কোনো মেয়ে নেই সেখানে, শুধু সোনালি স্নিগ্ধ প্রশান্ত রোদে পামগাছের পাতাগুলো আর বিস্তীর্ণ বালুরাশি ঝিকমিক করছে। সাগরের গর্জন ক্ষীণ হয়ে এল কানে, মনে হল অজানা কোনো অনুচ্চারিত চিরন্তন ব্যথায় কাঁদছে সাগর ফেনিয়ে-ফেনিয়ে, গুমরে-গুমরে।'

আঁধারের মতো আকাশের মতো, বেগম নিস্পন্দ নির্বাক। আবছা আঁধারে হামেদ তার ঘন দীর্ঘ পক্ষ্মে-ঘেরা চোখের পানে তাকাতে চেষ্টা করলে, আঁধারের অসীমতায় তার চোখও বুঝি মিলিয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। বেগমের যে-হাতটা তার মাথায় ছিল, সে-টা সে টেনে নিলে একটা অব্যক্ত ব্যথামিশ্রিত গভীর অতল মমতায়, কতক্ষণ কিছুই বললে না। তারপর আগের মতো তেমনি আত্মবিস্মৃতের মতো হেসে বললে :

'আরেকবার, অন্য কোনো এক বন্দরে জনাকীর্ণ অপ্রশস্ত পথ দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলছিলাম, সন্ধ্যার ছায়া তখন জমছে ধীরে-ধীরে, আর চারধারে উজ্জ্বল আলোর মালা একে-একে জ্বলে উঠছে। চলতে-চলতে একটা ছোট মনহারী দোকানের সামনে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম, চেয়ে দেখি দোকানের পসারিণীটি দেখতে ঠিক তোমার মতো, সেই ঘন দীর্ঘ পক্ষ্মে-ঘেরা কালো চোখ, লম্বা মুখ, ঈষৎ পুরু ঠোঁট আর ক্ষীণ দীর্ঘ দেহ। সে-দোকানে ঢুকে অযথা অনেক জিনিসপত্তর কিনলাম দরকারি বে-দরকারি। পসারিনীটি আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে কী যেন কী বুঝলে, হঠাৎ চোখ নত করে অনুচ্চকণ্ঠে আমাকে প্রশ্ন করল : অমন করে কী দেখছ তুমি বিদেশী? বললাম, ঠিক তোমার মতো একটি মেয়েকে আমি হারিয়ে এসেছি সাতসাগরের পরপারে। সে আর কিছুক্ষণ কিছু বললে না, চোখও তুলল না, কিন্তু সে যখন চোখ তুলে শান্তভাবে আমার পানে চাইলে, দেখি তোমার মতো কালো-কালো চোখদুটি তার অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। কিছু না বলে আবার যখন জনসঙ্কুল অপ্রশস্ত আলোকিত পথে নেবে এলাম তখন মনে হল যেন অতি বিচিত্র এই জগৎ, তারায় ভরা এই কালো অসীম আকাশ, পৃথিবীর এই মানুষরা,—সবকিছু বিচিত্র, অতি বিচিত্র।'

নিঃশব্দে টুপ করে একফোঁটা তপ্ত অশ্রু হামেদের কপালে ঝরে পড়ল। ওই মনিহারী দোকানের ক্ষীণাঙ্গী বিদেশিনীর চোখের জল যেন আকাশের কোন প্রান্তে জমা হয়েছিল, আজ হঠাৎ ঝরে পড়ল; বেদনার হাওয়া বুঝি প্রবল হয়ে উঠেছে।

অস্পষ্ট কণ্ঠে নিমীলিত চোখে হামেদ বললে :

'আজকের তোমার এই দু-ফোঁটা চোখের পানি আমার জীবনে চিরন্তন হয়ে থাকবে বেগম। চোখের পানিতে আমার কপাল অঙ্কিত করে আমাকে তুমি বিজয়ী করে দিলে, আর আমার শুষ্ক তৃষিত ঠোঁট চোখের পানিতে সিক্ত করে আমার চিরদিনের তৃষ্ণা মেটালে তুমি।'

কতক্ষণ পরে গাঢ় শঙ্কিত নীরবতার মধ্যে হামেদ যেন ঘুম হতে জেগে উঠল। তখন দূর-বনান্তের ওপাশ দিয়ে অদ্ভুত বিস্ময়কর বৃহৎ লালচে চাঁদ ধীরে-ধীরে উঠছে, অন্ধকারের বুক তরল হয়ে আসছে, আস্তে-আস্তে দু-একটি তারা কোথায় যেন মুখ লুকিয়ে ফেলছে। চাঁদটি যেন ঘুমন্ত পৃথিবীর স্বপ্ন; সুষুপ্ত পৃথিবীর মাঝে স্বপ্নের উদয় হচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে হামেদ স্তব্ধ বেগমের পানে তাকাল, চাঁদের স্নিগ্ধ আলো তার কপাল স্পর্শ করেছে, ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে আসছে তার মুখটি। হামেদ সবচেয়ে বিস্মিত হল বেগমের স্থির স্বপ্নিল চোখের পানে চেয়ে, সে-চোখদুটোকে তার অজাগতিক বলে মনে হল। সে চাঁদের পানে আবার ফিরে চাইলে, কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ থেকে অতি ম্লানকণ্ঠে বললে :

'বেগম মনকে শক্ত করতে হয়। পৃথিবীতে কতকগুলো অদ্ভুত অর্থহীন ঘটনা সময়-সময় ঘটে থাকে, যে-গুলোর বিরুদ্ধে কোনো কথা চলে না, অভিযোগ চলে না, শুধু মনকে শক্ত করে মেনে নিতে হয়।'

বেগমের চোখে সেই স্বপ্নিল স্তব্ধ দৃষ্টি। এবার সে হঠাৎ মাথা নিচু করে হামেদের পানে তাকাল, একটু ভাবল, তারপর বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে :

'শুধু মেনে নিতেই হবে, কোনো কথা চলবে না এর বিরুদ্ধে?'

'চির নিরুত্তরের বিরুদ্ধে কী বাক্য-অস্ত্র তুমি সাজাবে বেগম? মানুষের শক্তি অসীম বলে তোমাকে মেনে নিতেই হবে যে।'

চাঁদের আলো বেগমের ললাট হতে বুক পর্যন্ত নেবেছে, সে যেন ধীরে-ধীরে বিকশিত হচ্ছে। অল্পক্ষণ পরে হামেদ বললে :

'অনেক রাত হয়েছে। উঠবে এবার?'

কথাটা যেন কঠিন ও অপ্রত্যাশিত, এবং তাই আঘাত করলে বেগমকে। সে কিছুটা আহত কণ্ঠে বললে :

'উঠব, এত অতৃপ্তিকর জ্বালা নিয়ে?'

হামেদ সোজা হয়ে উঠে বসল, একটু রহস্যময় হাসি হেসে বললে :

'পৃথিবীতে মানুষকে শুধু অতৃপ্তির জ্বালাই বইতে হয়। এ-সত্যটি আমি নিখুঁতভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি বেগম, এবং এ-সত্যটিই শৈলশিখরে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে, রক্ত গোধূলিতে, রোদঝরা প্রথম আকাশে অথবা এমনি জোছনারাতের গায়ে লেখা রয়েছে দেখবে। তৃপ্তি বলে একটি শব্দ রয়েছে বটে, বস্তু নেই।'

'একথাও কি মানবার কথা?'

'জন্ম-মৃত্যু মানতে হলে তোমাকে একথাও অবিশ্যি মানতে হবে।...ওঠ এবার, কেমন?'

'বেশ। কিন্তু তার আগে বল আমার একটি শেষ অনুরোধ তুমি রাখবে?

'আবার অনুরোধ? কী শুনি?'

'আমার দিকে ফিরে বসে আগে আমার চোখের পানে তাকাও।...হ্যাঁ, কথা দাও যে এবার হতে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাবে, আর কখনো আমার কথা মনে করবে না? ...ও-কী, মুখ ফিরালে কেন? হাসছ?'

'তুমি ছেলেমানুষ, বেগম।'

'তা হোক, তুমি বল যে আমাকে ভুলে যাবে।'

'বেশ, বেশ, খুব, তোমাকে-তো আমার বেশি মনে পড়ে না, খুউব পারব ভুলতে। আর, কী জান, যা-আমার জীবন—সামুদ্রিক জীবনের কথা বলছি, তাতে মানুষ নিজেকে পর্যন্ত ভুলে যায় বেগম, পর তো দূরের কথা।'

হামেদের কণ্ঠ কী জানি কেন গাঢ় হয়ে উঠল, কিন্তু বেগমের ঘনপল্লবে আচ্ছন্ন কালো চোখদুটি স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে ঝলমল করে উঠল, প্রদীপ্ত হয়ে উঠল উচ্ছল আনন্দে, সে খুশি হয়ে ছেলেমানুষের মতো মাথা হেলিয়ে বললে :

'সে-জীবন তুমি যেন কখনো ত্যাগ কোরো না। আর শোন, আরেকটি কথা। এই রক্তজবাটি নাও, নাও না।'

'নিলুম। কী করতে হবে?'

'তোমার জুতোর তলায় পিষে ফেলো ওটা।'

কয়েক মুহূর্তব্যাপী প্রগাঢ় নীরবতা; বনের মধ্যে ঝিঁঝি ডাকছে, হাওয়ায় পাতা কাঁপছে, দূর হতে ঝরনার শব্দও আসছে ভেসে। তারপর নিস্তব্ধতার মধ্যে হামেদের ম্লানকণ্ঠ দুঃখের মতো উঠল বেজে :

'যে-ফুল তোমার মাথায় ছিল, সে-ফুল আমি আবার পায়ে মাড়াতে পারি, তুমি ভাবতে পার একথা? এ কেমন ধারা কথা হল তোমার? আমার দেয়া ফুল তুমি কি পায়ে দলতে পার?'

অস্বাভাবিক দীপ্তিতে বেগমের চোখ প্রদীপ্ত, অনুচ্চ উত্তেজিত কণ্ঠে মাথা নেড়ে বললে : 'পারি, খুব পারি।'

হঠাৎ হামেদের চোখ রূঢ় ও কঠিন হয়ে উঠল, সে বেগমের চোখের পানে চেয়ে কঠোরভাবে বললে : 'দাও, ফুলটি আমাকে ফিরিয়ে দাও।'

অর্ধমিনিটব্যাপী প্রগাঢ় নীরবতার পর অস্বচ্ছন্দ আবহাওয়া আর আবছা আলোর মধ্যে বাসন্তী রঙের শাড়িপরা ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি হঠাৎ কেঁদে উঠল, সরু-সরু আঙ্গুলগুলো দিয়ে ঢাকল তার মুখ। হামেদের চোখ-মুখ তিক্ততায় ভরে উঠল, চুলের মধ্যে হাত গলিয়ে চুলগুলো আরো এলোমেলো করে তুলল, তারপর অতি বিস্ময়কর বৃহৎ চাঁদের পানে চেয়ে ভাবলে, কত যুগ আর চাঁদ এই অসমাপ্ত একঘেয়ে একই খেলা দেখবে বারেবারে? মানুষেরা-তো শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, এই বিচিত্র স্বাদে চাঁদের বিতৃষ্ণা জন্মাবে কবে?

বেগম হঠাৎ নিজেকে সামলে নিলে; আঁচল দিয়ে চোখ মুছে কতক্ষণ নিশ্চল হয়ে রইল, তারপর বেদনার্ত মুখে ম্লানহাসি হেসে লজ্জিতভাবে বললে : 'দূর, কাঁদছিলাম কোন্ দুঃখে?' বলে কথাটি সে আরেকটু ভেবে দেখলে, তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল, গাঢ় কণ্ঠের সে-হাসি ভারি মিষ্টি শোনাল কানে; আবার সে বললে : 'তাই তো, ছিঃ, কী ছেলেমানুষের মতো কাঁদছিলাম।' তারপর চাঁদের পানে চেয়ে কিছুটা ব্যস্ত হয়ে বললে :

'এখন উঠবে, না বসবে আরো কিছুক্ষণ?... আরেকটু বসি, কেমন?'

কিছুক্ষণ পর একটা কথা তার মনে পড়ল, স্মৃতির একটা কথা ফেলে-আসা দিনগুলোর মধ্যে কয়েকটা বিশিষ্ট মুহূর্ত। হেসে বেগম বললে :

'মনে আছে সেইবার গরমের ছুটিতে একদিন রাতে তুমি আমাদের বাগানে এসে আস্তে-আস্তে গান গাইছিলে, তন্দ্রা ছুটে গিয়ে ওধারের জানলা দিয়ে সে-গান আমার কানে এল। বালিশে মুখ গুঁজে ভাবলুম, যাব না আমি, তোমাকে জব্দ করব। কিন্তু তোমার গলা যেমন চড়তে লাগল আমি ভয় পেয়ে গেলুম পাছে কেউ জেগে শুনে ফেলে। কিন্তু রাগ হল তোমার বোকামিতে, উঠে ত্রস্তপদে বেরিয়ে গেলুম বাগানে, তোমাকে বকলুম, আর তাই তুমি হঠাৎ রাগ করে চলে গেলে। আচ্ছা বোকা তুমি, অমন চলে যাবার জন্যেই আমি বুঝি বকেছিলুম তোমাকে? আর আমার ঘরে ফিরে আসা হল না, বাগানে ঘাসের ওপর পা মেলে কালো

আকাশের তলায় বসে রইলুম, শেষে চোখের সামনে শুকতারা যখন ঝকঝক করে উঠল, আস্তে ঘরে ফিরে এলুম, বিছানায় দেহ এলিয়ে দিয়ে ভাবলুম, তোমাকে বকব, আরো বকব, তোমার সাথে তারপর আড়ি দেব, আর কখনো কথা কইব না। খুব শাস্তি, খুব শাস্তি! তারপর আমার ক্লান্ত চোখে ভোরের শীতল হাওয়া লেগে ঘুম এল জড়িয়ে। তার পরদিন তোমার সাথে দেখা হলে অবশ্য বকবার ভাষা পেলাম না, তবে তোমার পানে চাইলামও না, কথাও কইলাম না। তুমি চেয়ে-চেয়ে দেখলে কতক্ষণ, তারপর এক সময়ে একাকী পেয়ে দেয়ালের ছবির পানে চেয়ে বললে, বোম্বে থেকে একটা মেয়ে নাকি চিঠি লিখেছে তোমাকে যেতে এবং তুমি নাকি রাতের ট্রেনে চলে যাচ্ছ। আমি যেন কিছু শুনলাম না, চুপ করে রইলাম, কিন্তু তোমার কথায় আমার মনে যা-ঝড় হচ্ছিল! আবার তুমি বললে সেই দেয়ালের ছবির পানে চেয়েই নির্লিপ্তভাবে যে বোকা মেয়ের কাছে আর তুমি কখনো ফিরে আসছ না। এবার ফিরে দাঁড়িয়ে তোমার মাথার চুল আচ্ছা করে টেনে দিলুম, আর তখন তুমি খপ করে ধরে ফেললে আমার হাত, বললে আমি তোমার সাথে কথা নাই-বা কইলাম, তুমি কিন্তু আমার হাতটি ছাড়ছ না। আমি বললুম, বেশ তো, ধরে থাক, এতে তোমারই ক্ষতি, কারণ তাহলে বোম্বে যাওয়া হবে না তোমার। তুমি বললে, বোকা মেয়েটির হাত ধরেছি বলে সে অত দেহ ঘেঁষে আসছে কেন?...ছি, কি দুষ্টু তুমি যে ছিলে হামেদ।...আচ্ছা, কোথায় গেল সে-সব মধুর দিনগুলো, আর কোনোদিন কি ফিরে আসবে না সেই দিনগুলো?'

বেগম কারুণ্যভরা দৃষ্টি মেলে তাকালে হামেদের পানে, চাঁদের আলোয় দেখলে তার চোখ কেমন একটা বেদনার ছায়ায় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আর ঠোঁটের পাশে ক'টা রেখা জেগেছে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেগম বললে :

'থাক, থাক। তোমাকে ওসব বলে দরকার নেই।...আচ্ছা, তুমি তাহলে কথা দিচ্ছ এবার হতে আমাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাবে, এক মুহূর্তের জন্যও কখনো মনে করবে না আমাকে, পামবনের পানে চেয়ে তোমার মনে হবে না যে আমার মতো কে যেন আসছে তার তলা দিয়ে?' বলতে-বলতে বেগমের চোখ আবার সজল হয়ে উঠল, তবু তার মধ্যে হাসবার চেষ্টা করতে থাকল, কিন্তু হাসি কি ফোটে ছাই।

দু-বছর পরে ফিলাডেলফিয়া শহরে এক আলোকোজ্জ্বল চঞ্চল ও মুখর সন্ধ্যায়, দূরে আকাশে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে আরশেদ হামেদ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে ছিল। নিচে প্রশস্ত রাস্তা : তার ওপর দিয়ে দিনান্তের মানবপ্রবাহ উদ্দামগতিতে বয়ে চলেছে, তারই উগ্র কোলাহল যেন দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। দূরে যেখানে ঘন হয়ে সন্ধ্যা নাবছে, দিগন্তঘিরে আকাশছেয়ে আঁধার উঠছে দ্রুত, এখানে-সেখানে তারা জন্মলাভ করছে, সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ হামেদের একটি সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেল, সে-সন্ধ্যা ছিল ঠিক এরই মতো, আর যে-সন্ধ্যার আবছা আলোয় নিঃসঙ্গ আকাশের প্রান্তে তার দেহ-ঘেঁষে বসেছিল সেই মেয়েটি, যার নাম বেগম, যার দেহ ক্ষীণ আর দীর্ঘ, ঠোঁট ঈষৎ পুরু, ভ্রূ-দুটি বাঁকা ও সরু। সে-সন্ধ্যায় সে-মেয়েটি দু-ফোঁটা চোখের পানি ফেলেছিল, একটি তার ঠোঁটে, আরেকটি কপালে, এবং এতদিন পরে হামেদের কপাল আর ঠোঁট হঠাৎ জ্বালা করে উঠল নতুনরূপে। তার দেহ বেয়ে ওই অন্ধকারের মতো কী যেন উঠছে, আর তাইতে দেহ অবশ হয়ে আসছে, প্রাণের অন্তরালে কোন এক নিভৃত অংশ হঠাৎ স্তব্ধ ও নিশ্চল হয়ে পড়ল। কোথায় তার দেশ, কোথায় তার সেই ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি, কোথায় সেই মধুর স্নিগ্ধ সন্ধ্যাটি, যে-সন্ধ্যাটি বেগমের ক্ষণিক নিবিড়তম সাহচর্য আর তার হাসি-কান্নার ম্লানমধুর স্মৃতিতে হামেদের শুষ্কমনের এক প্রান্তে বেদনা ও আনন্দে মিশ্রিত অদ্ভুত অনুভূতিতে অনুপম হয়ে রয়েছে? অকস্মাৎ আরশেদ হামেদ নতুন করে অনুভব করল যে তার জীবনখাতার সবগুলো পাতা শূন্য, ব্যর্থতায় ফাঁকা, কোনো পাতায় একটুকু আঁচড় নেই স্নেহ-মমতার, ভালোবাসার; যে-পাতাগুলো বেগম ছুঁয়েছিল

সেগুলো আবার ব্যর্থতার প্রচণ্ডতায় বর্ণহীন ও চিহ্নহীন হয়ে উঠেছে। কোথায় কোন-এক বন্দরে একটি মনিহারী দোকানের পসারিণীকে সে বলেছিল যে সে তার প্রিয়াকে হারিয়ে এসেছে সপ্তসিন্ধুপরপারে, সে-কথাটি তার আবার মনে পড়ল। আর কখনো, কখনো তার দেখা হবে না সে-মেয়েটির সাথে, যাকে সে চিরকালের জন্য হারিয়ে এসেছে সাতসাগরের পরপারে, কখনো সে আর তার মন দীর্ঘ পক্ষ্মে আবৃত চোখ মেলে গভীরভাবে তাকাবে-না হামেদের পানে, তার দুঃখে সে কাঁদবে না হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে, সরু-সরু কোমল আঙ্গুল দিয়ে বুলিয়ে দেবে না তার চুল, আর হামেদের মাথাটি মমতাভরে চেপে রাখবে না উষ্ণ কোমল স্নেহভরা উৎসঙ্গে? একটা অদ্ভুত তিক্ত ব্যথা ক্রমে-ক্রমে হামেদের সারা অন্তর ছড়িয়ে উঠল, সে-ব্যথিত বেদনার্ত অন্তর আকুল হয়ে উঠল সাতসাগরের পরপারে বেগমের কাছে ফিরে যেতে, ভাষাশূন্য দৃষ্টি মেলে শুধু একটিবার চেয়ে দেখতে তার রহস্যময় কালো চোখের পানে। চিরন্তন মহানীরবতার ও আঁধারের অতলে ডুবে গিয়ে বিরাট অসীম আকাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে হামেদের চোখ জ্বালা করে উঠল, ঠোঁট উঠল কেঁপে, তার কাঁধে হাত রেখে কে যে পাশটিতে নীরবে এসে দাঁড়াল সে একটুও জানতে পারলে না। যে-লালচে রঙের ঈষৎ স্থূল নারীটি তার পাশে এসে দাঁড়াল, সে ক্ষণকাল নির্বাক থেকে কোমলকণ্ঠে প্রশ্ন করল :

'তোমার কী হয়েছে, চোখ অমন ছলছল করছে কেন?'

হঠাৎ হামেদ ঘুরে দাঁড়াল, মুখ নত করে অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে কতক্ষণ চেয়ে-চেয়ে দেখলে বিদেশিনীর মুখটি, তারপর সবলে শক্ত করে তার কোমল শুভ্র বাহু দুটি ধরে রুদ্ধ কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন করলে :

'বল, বল তুমি আমাকে ভালোবাসবে? যদি বাস তাহলে আমার যা-কিছু আছে সমস্ত তোমার পায়ে উজাড় করে দেব, নিজেকে নিঃশেষ করে দেব তোমার কাছে। শুধু একটিবার বল যে তুমি আমাকে ভালোবাসবে?'

হামেদের আকস্মিক ব্যবহারে বিদেশিনীর চোখে যে-ভীতি সঞ্চারিত হয়ে উঠেছিল, ধীরে-ধীরে তা মুছে গিয়ে তার চোখ উজ্জ্বল ও মোহময় হয়ে উঠল, আর রঞ্জিত রক্তিম অধরের পাশে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল; কুন্দশুভ্র দাঁতগুলো দেখিয়ে কটাক্ষ হেনে গ্রীবা হেলিয়ে সে বললে :

'তোমাকে যে ভালোবাসি, বাসব কী বলছ?'

এমন দৃষ্টি এমন ভঙ্গি এমন কথা কি কামনা করেছিল হামেদ, যার মরুভূমির মতো শুষ্ক হৃদয় আজ তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে ছায়াশীতল স্নেহের জন্যে? না। দু হাত দিয়ে প্রবলভাবে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সে জানলার কাছে আরো ঘেঁষে এল, আকাশের তারাগুলোর পানে আরো নিবিড়ভাবে তাকাতে চেষ্টা করল : সারা আকাশের কাছে কী যেন তার চাইবার, কামনা করবার আছে। তার জীবনখাতার পাতাগুলো কি এমনি শূন্যই থেকে যাবে চিরকাল?

কার্তিক ১৩৪৯ অক্টোবর ১৯৪২

সাত বোন পারুল

বড় রাস্তা হতে যে-সরু নোংরা গলিটি নগণ্য ঘটনার মতো আলগোছে নীরবে ওধারে সরে পড়েছে, সে-গলি দিয়ে কয়েক-পা এগুলেই এক বিচিত্র আবহাওয়ায় গিয়ে পৌঁছোনো যায়। এ যেন তুচ্ছ ঘটনার পুচ্ছ ধরে বিরাট পরিণতি স্ফীত হয়ে ওঠার মতো। বড় রাস্তা হতে মোনায়েম সে-গলিতেই মোড় নিল।

একটা ঝুনো বাসার দরজায় কড়া নাড়তে যে-মেয়েটি এসে দরজা খুলে দিল, তাকে মোনায়েম প্রথমেই বলল :

পথ ভুলে আসি নি, বিশ্বেস কর।

মেয়েটি হাসলে, বললে :

তা না হয় করলাম, কিন্তু ওরা যা খেপেছে সে-কথা আর বলবার নয়। বিচারে কী সাব্যস্ত করেছে জানেন?

কী? সভয়ে মোনায়েম তাকাল ওর চোখের পানে।

আপনাকে এ-বাসায় আর কক্ষনো ঢুকতে দেয়া হবে না।

বল কী, সর্বনাশ!

তা বৈকি!

কিন্তু তুমি-তো ছিলে, কিছু এধার-ওধার করতে পারলে না?

মানে? আমিই জজিয়তি করেছি, কী ভেবেছেন আপনি?

বাস্‌রে!

বাস্‌রে নয়, ভিতরে চলুন।

ঘরে ঢুকেছে কী অমনি এ-দরজা দিয়ে সে-দরজা দিয়ে একটা-দুটো করে ক্রমে-ক্রমে আরো ছটা মেয়ে এসে হাজির হল। মোনায়েমকে দেখেই সবগুলো হুল্লোড় লাগিয়ে দিলে, কেউ-বা চেঁচাতে লাগল, কেউ-বা হাসতে থাকল, কেউ তীক্ষ্ণ গলায় কথা কইতে শুরু করল। রুনু নামের মেয়েটি এবার শুধাল :

শুনেছেন?

শুনেছি। কিন্তু অপরাধ?

অপরাধ এই যে—এই ঝুনু, রায়টাই না-হয় পড়ে শোনা।

সেরেছে, আদালত বুঝি বসল আবার।

কিন্তু ঝুনু এগিয়ে এসে হাত নেড়ে বললে :

না, ভয় নেই, আদালত আর বসবে না। কিন্তু রায়েতে যা-শাস্তিবিধান করা হয়েছে তা-ই পালন করা হবে।

শুকনো গলায় মোনায়েম বললে :

কিন্তু ঢুকে পড়েছি যে—। আমার কিছু দোষ নেই, ওই তোমাদের জজসাহেবাই-তো—

যে-মেয়েটি দরজা খুলেছিল তার নাম মুনু। সে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে :

আমি রায় বদলে ফেলেছি। শাস্তি হবে অন্য ধরনের,—বলছি।

আদালত? পাইক-পেয়াদা উজির-নাজির ডাকব? ওপাশ থেকে টুনু গলা-উঁচিয়ে উৎসাহিত হয়ে প্রশ্ন করল। সে-কথায় কান না দিয়ে মুখ উন্নত করে চোখ নত করে গম্ভীরভাবে মুনু বললে :

শাস্তিবিধান এই যে—ছুলু কোথায়, মানে দারোগা?

সভয়ে চোখ বড় করে মোনায়েম বললে :

বাস্‌রে! আবার দারোগা কেন?

সে-কথার কেউ উত্তর দিলে না। ছুলু দুমদাম পা ফেলে এগিয়ে এল, তাকে কাছে টেনে মুনু যেন তার কানে-কানে কী বলে দিলে, আর সে সরে এসে মোনায়েমের কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করলে সিগ্রেটের টিনটা, করে ওপাশে লুলুর হাতে চালান করে দিলে। গলা শক্ত করে গম্ভীর সুরে মুনু বললে :

শাস্তি এই যে, আপনাকে আমাদের বাসায় সারাদিন আটক করে রাখা হবে, এবং একটা সিগ্রেটও আপনাকে খেতে দেওয়া হবে না।

সেরেছ! কিন্তু অপরাধটা কি একবার শুনতে পাব না?

ও! মুনু যেন আকাশ হতে পড়ল, অবাক হয়ে বললে : বা রে, বলা হয় নি বুঝি? তবে শুনুন, মন দিয়ে কিন্তু? অপরাধ হল এই যে, কোলন-ড্যাশ, ব্রাকেটে এক নম্বর, আপনি একমাস যাবৎ আমাদের বাড়িমুখো হন নি, দাঁড়ি। ব্রাকেটে দ্বিতীয় নম্বর, আমাদের নামে কবিতা লিখেছেন 'দুনিয়া' সাপ্তাহিকে, দাঁড়ি।

শুধু কবিতা কেন, ভাবছি বিরাটকায় একটা উপন্যাস লিখব। বলেই তাড়াতাড়ি মোনায়েম জিভ কাটল, তক্ষুনি হেসে ভালোমানুষের মতো বললে :

ও, আসল কথাই তোমাদের বলা হয় নি!

কী কথা?

মানে, এ-মাসটা আমি কলকাতায় ছিলাম না, গিয়েছিলাম—

শুনেই টুনু এবার চেঁচিয়ে হেসে উঠল, অবাক হয়ে বললে :

ওমা, কী মিথ্যে কথা! কেন, লুলু আপনাকে সেদিন দেখে নি ট্রাম থেকে বগলে বিরাট প্যাকেট চেপে ছেঁড়া-চটি-সামলে ফুটপাত ঘেঁষে চলছিলেন হনহন করে?

আহা, বলতে দাও-তো আমাকে। হ্যাঁ। গিয়েছিলাম সৈয়দপুরে। সেখানে বড় ব্যস্ত ছিলাম নানা কাজ নিয়ে, আর সেখান থেকে মাত্র একদিনের জন্য কলকাতায়ও একবার ছুটতে হয়েছিল। ইস্, এত খাটুনি যে—

একটা দুষ্টু বুদ্ধিতে মুনুর চোখমুখ কেঁপে উঠল। আড়চোখে চেয়ে সংযত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করলে :

আচ্ছা, যেদিন আপনি কলকাতায় এসেছিলেন, সেদিন কী তারিখ ছিল?

মোনায়েমের উজ্জ্বল চোখদুটির কবার পলক পড়ল, কিন্তু সে সামলে নিয়ে ঝুনুর পানে চেয়ে শান্ত ও গভীর গলায় বললে :

হুঁ, অত তারিখ-ফারিখ বুঝি মনে থাকে আবার।

কেন আপনার সে-ডায়েরিতে—যে-ডায়েরিতে দেশলাই কেনার কথা—জুতোতে পেরেক ঠোকার কথা পর্যন্ত লেখা থাকে, তাতে এতবড় একটা কথা লেখা নেই, এ-কি বিশ্বাসযোগ্য বলতে চান?

রেহাই পাবার আলো দেখতে মোনায়েম একটু নড়েচড়ে সুস্থির হয়ে বসে কোটের পকেটে সিগ্রেটের টিনের সন্ধানে হাত চালিয়ে দিয়ে উঁচু গলায় বললে :

তা হয়তো লিখেছি, কে জানে! কিন্তু সে-ডায়েরি-তো আর পকেটে করে নিয়ে আসি নি?

কিন্তু পকেটে কী খুঁজছেন শুনি? হাসি চেপে আস্তে টুনু প্রশ্ন করলে।

মোনায়েম চমকে উঠে পকেট হতে হাত টেনে নিলে, যেন আগুন ছুঁয়েছে। নাকে একটা আওয়াজ করে ভ্রূ-কুঁচকে মুখ তুলে চেয়ে সে বিরক্ত হয়ে বললে :

কী জ্বালাতন! পকেটে হাত রাখতেও তোমরা দেবে না? ভাবছ বুঝি টিন খুঁজছি? কেন, আমি কানা নাকি যে লুলুর হাতে টিনটা দেখতে পাব না?

কোথায় লুলুর হাতে টিন, কোথায়? শুধু লুলু কেন, আমরা সব্বাই দুটো-দুটো হাত তুলে দেখাচ্ছি। রুনু একসাথে কয়ে উঠল।

বাস্‌রে, এ যে ভোজবাজি।

মুনু এবার গলা হাঁকলে, বললে :

আরেক কথা। ওঁকে 'বাস্‌রে' বলতে দেয়া হবে না। আবার বললেই এমন একটা কিছু করতে হবে যে—

পাশের ইজিচেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে মোনায়েম এমন করে হতাশভাবে সবার পানে চাইলে যে ওরা সাত বোন সাত রকম গলায় হেসে উঠল খিলখিল করে। সে-হাসির

আওয়াজ যখন কমে এল, তখন হঠাৎ মোনায়েম সবার পানে বৈষয়িক দৃষ্টিতে চেয়ে বললে :

না, হাসি নয়। যে-কথা নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে, শোন সেটা।

কী কথা আবার? আপনার বিয়ে বুঝি?

কোথায়?

কবে হবে?

দূর! যত সব ইয়ে... বিয়ের কথা বলেছি আমি? শোন এবার। হ্যাঁ, জান বোধহয় গবর্মেন্ট মেয়েসৈন্য চাইছে বিদেশে যুদ্ধে পাঠাবে বলে? তা ভাবছি, তোমরা সাত বোন গেলে মন্দ হয় না, পল্টন হবার যোগ্য তোমরা!

ঝুনু উৎসাহিত হয়ে উঠল :

একশোবার যাব, কেন যাব না? কিন্তু তার আগে এক কথা। আপনাকে আমাদের সেনানায়ক হতে হবে।

আড়াল হতে ছুলুটা খিলখিল করে হেসে উঠল, বললে :

হ্যাঁ, সেনানায়ক মানাবে বৈকি। দেখেছিস, ছাঁট কেমন দিয়েছেন? মাথার পেছনটা একদম সাফ যেন গড়ের মাঠ।

হুটোপুটি করে কজন এগিয়ে এল মোনায়েমের মাথার পেছনটা দেখতে, কিন্তু নিমেষের মধ্যে পকেট হতে রুমাল বের করে মাথা বেঁধে ফেলে সে গলা উঁচিয়ে হেঁকে উঠল :

এক চোখ দেখা, চার-চার পয়সা! ফেল পয়সা, খুলছি মাথা।

লুলুটা ধাঁ করে রুমাল কেড়ে নিলে, আর তার মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে ছুলু বলে উঠল :

লাল কাপড়ের থলে আনুন, তারপর দেব পয়সা।

কিন্তু এমন ছাঁট কে দিল? রাস্তার ধারে কোথাও টুপ করে বসে পড়েছিলেন বুঝি? অসম্ভব নয়, যা কিপ্টে মানুষ।

আসল মর্ম তোরা বুঝিস নে। শোন, ওঁর মাথার ওপরটা হল গাছের ছায়া, আর পেছনটা হল মাঠের হাওয়া। এটা হাল আমলের বৈজ্ঞানিক রীতি।

কিন্তু ওটা কী, ঠোঁটের ওপরে?

গোঁফ রেখেছে! সবগুলো হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ছুলুটা ঝুঁকে এসে গবেষণা শুরু করে দিল, তারপর গম্ভীরভাবে বললে :

কলম্যানের মতো গোঁফ, না? কিন্তু ধারদুটো উঁচিয়ে উঠবে না, নইলে চাড়া দেবেন কী করে?

আরে, ও-কী? নাকের ভেতরেও গোঁফ যে, একটু-একটু নড়ছেও আবার।

আচ্ছা, একবার নাক দিয়ে ফোঁস করুন-তো?

না, করব না! সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এবার মোনায়েম রাগ করে উঠল : আমি চললাম আর কখনো এ-বাড়িমুখো হব না।

কোথায় ছিলেন এই এক মাস?

কলকাতায়!

তবে বসুন।

আর বলুন যে কখনো অমন এক মাস গা ঢাকা দিয়ে থাকবেন না।

এবং, 'বাস্‌রে' কখনো আর বলবেন না।

এ-যাত্রা রেহাই পেয়ে কতক্ষণ আরাম করে চোখ বুজে থেকে মোনায়েম হেসে বললে :

জমানার যে পরিবর্তন হয়েছে, এ-কথা অস্বীকার করার যো নেই।

কেন? গলা সাফ করে সোজা হয়ে বসে লুলু প্রশ্ন করলে।

মানে, সে-জমানায় ছিল সাত ভাই চম্পা, আর এ-জমানায় হয়েছে সাত বোন পারুল—

ওর কথার রেশ হতে টুনু সুর করে কয়ে উঠল :

কেন ভাই মনুভাই ডাক রে?

তোমরা কি আর ঘুমিয়ে থাক যে ডাকতে হবে? তোমরা ঘুমালে তো বাঁচতাম।

মানে? মানে?

দূর ছাই, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বলছিলাম কী, তোমরা যদি ঘুমিয়ে থাকতে তবে আমার যে কী কষ্ট হত, উঃ!

থাক, চোখ অত ওপর-পানে তুলতে হবে না, সব বুঝতে পেরেছি।

আসল কথা শোন।

কী আবার কথা?

মানে, ইয়ে, তোমাদের আম্মা কোথায়?

কেন, সেই চিলেকোঠায়? আমাদের ভয়ে সহজে আর নিচে নাবেন? ওপরে বসে-বসে শুধু কোরান তালাওয়াত করেন।

আর আব্বা?

উনিও ঘরে থাকা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। আপিসের সময় আপিস, নয়তো এধার-ওধার আড্ডা মেরে বেড়ান। ভাবছি, চিলেকোঠার পাশে আরেকটা ঘর তুললে কেমন হয়?

কাল রাতে হয়েছে কী জানেন মনু ভাই?

বল, শুনি।... আচ্ছা, পরেই না হয় হেসো, আগে বল তো!

কথাটা তুলেছিল টুনু, কিন্তু হাসির ধমকে একটি শব্দও বলতে পারছে না দেখে গলা কেশে ঠোঁটের কোনায় হেসে মুনু বললে :

কাল রাত তখন বারটা, সব চুপচাপ। ওঘরে চৌকিতে শুয়ে ছুলু লুলু বুলু বাঁদরামি করছিল, কাতুকুতু দিচ্ছিল, আর খিলখিল করে হাসছিল—

শুনে ছুলু খনখন করে উঠল :

কাতুকাতু দিচ্ছিলাম বুঝি? ছারপোকায় কামড়াচ্ছিল বলে আমরা ছটফট করছিলাম। ইস্, চৌকিভরা যা বাগ্‌স।

বুলুটা ইয়া-বড়া একটা পাকড়েছিল, টিপে মেরে দেখে কী যে সেটা আগেই ভেগেছে। বুলুটা আস্ত গাধা।

আর লুলুটা কিন্তু পাকড়াচ্ছিল আর মারছিল। মেরে-মেরে নাকের কাছে হাত তুলে শুঁকছিল আর নাক সিটকাচ্ছিল 'খুঁঃ' বলে।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে এবার মুনু চেঁচিয়ে উঠল :

আহ্, থাম! কথাটা আমাকে বলতে দে-তো?...বুঝলেন, ছুলু লুলু বুলু যাহোক একটা কিছু করছিল, আর তাদের আওয়াজ পেয়ে ও-ঘর হতে আব্বা ডেকে উঠলেন, কী করছিস রে তোরা, ঘুমাবি না? আব্বার গলার সাড়া পেয়ে ওরা সবগুলো উঠে পড়ে আলো জ্বেলে হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিলে। খানিকক্ষণ চুপ থেকে আব্বা আবার আস্তে শুধোলেন, তোরা উঠলি কেন? ছুলু বললে, ছারপোকা মারতে, বড্ড কামড়াচ্ছে। একঘণ্টা পরে আবার আব্বার গলার আওয়াজ শোনা গেল, এখনো তোরা ছারপোকা মারছিস রে বুলু? বুলু করুণভাবে উত্তর দিল, জি। আম্মা শুনেই তেড়ে এলেন, আর অমনিতে ওরা স্নেকলেডার উল্টেপাল্টে ফেলে দিয়ে যে-যার মতো সব শুয়ে পড়ল, আর টুঁ শব্দটি নেই।

লুলু আহ্লাদী গলায় বললে :

বারে আমি কী করব? ছুলু বললে যে স্নেকলেডার খেলায় যে-হারবে তাকে আব্বার

হাতবাক্স হতে পুরোনো কলমটা চুরি করে যে-জিতবে তাকে দিতে হবে, তাই খেলতে বসলাম। অবশ্য দুপুরে কিনা একটা লম্বা ঘুম—

বেশ, বেশ। রাতদুপুরেই-তো স্নেকলেডার জমে ভালো। মোনায়েম সমর্থন করল, তারপর রুনুর পানে চেয়ে আস্তে বাঁ চোখটা একটু টিপে বললে :

রুনুর নাকি দুলা খোঁজা হচ্ছে?

সাত বোনের মধ্যে রুনু সবচেয়ে বড়, আর সবচেয়ে ছোট হচ্ছে বুলু। রুনুর বয়স উনিশ, বুলুর দশ। হলে কী হবে, সবগুলো এক মাপের, এক ঢঙের, কেউ কারো চেয়ে কোনো দিক দিয়েই কম নয়। মোনায়েমের কথা শুনে রুনু ঠোঁট উল্টাল, বললে :

সে কি আজ নতুন খোঁজা হচ্ছে নাকি? কিন্তু শালীর দঙ্গল দেখে কেউ বিয়ে করতে এগুলে-তো। বরঞ্চ বুলুর বিয়ের ভরসা আছে, বয়স হলে ওরটা চট্ করে হয়েও যেতে পারে।

তাই নাকি, বুলু কী বলে?

বুল কী আর বলবে, রুনুর মতো ঠোঁট উল্টিয়ে বুলু বললে, কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলেই দুলার কানে-কানে বলব যে বোনদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড়, শুনে দুলা যদি দোর খুলে লেজ তুলে ভোঁ-দৌড় না দেয় তো বলব শাবাশ।

বাহ্‌বা, কেয়া বাত। মোনায়েম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

কিন্তু দুলাকে শোয়াব ওই চৌকিটাতে-বাগ্‌সভরা চৌকিটাতে। নড়লে-চড়লে নাক ফ্যাঁৎ-ফ্যাঁৎ করে কেঁদে ফেলে বলব যে, তুমি আমাকে ভালোবাস না, তুমি নিষ্ঠুর।

নড়লে-চড়লেই?

বা-রে, স্বামীর চিঠি রোজ না-পেলে হাপ্স যদি বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে পারে, তবে—

নিশ্চয়ই। তাহলে বুলুর বেশ বিদ্যে হয়েছে বলতে হবে, কী বল মুনু?

তা বৈকি? বুলু আরো বলে যে সেই নাকি সব্বার চাইতে বড়, কারণ তার জন্মবছর ১৯২৯ সালের পেছনে সবার জন্ম। সে রুনুর চেয়ে ন-বছরের বড় এই হিসেবে যে রুনু জন্মেছে ১৯২০ সালে।

তা বটে, তা বটে। বলে মোনায়েম বুলুর পানে চেয়ে দেখলে যে সে ভ্রূ-কুঁচিয়ে খুব গম্ভীর হয়ে রয়েছে। মোনায়েম চাইতেই সে প্রশ্ন করল :

কেমন , তা-ই মনে হয় না আমাকে দেখে?

একশোবার। তোমার চোখের পানে চাইলেই আমার বুকের ভেতরটা শুকিয়ে ওঠে!

এখন কথা হচ্ছে কী, ঝুনুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, চাল বেচে আপনি নাকি লাল হয়ে উঠেছেন?

কে? আচমকা এমন কথায় মোনায়েম যেন আকাশ হতে পড়ল।

কে আবার, আপনি। আমরা-তো আর চালের বেসাতি করি নে।

আমরা মাথার বেসাতি করি। পাশ থেকে বুলুটা বললে।

সেই জন্যেই তোমাদের আমার এত ভয়। কী জান—

বাধা দিয়ে ঝুনু সোজাসুজি বললে :

কিছু জানতে হবে না, আসল কথার জবাব দিন।

লাল হই নি, বরঞ্চ ফিকে হয়ে উঠেছি। ক্ষীণকণ্ঠে মোনায়েম স্বীকার করল।

অর্থাৎ রুপালি হয়েছেন। এখন কথা হচ্ছে কী যে, আজ আমাদের আপনাকে বায়োস্কোপ দেখাতে হবে। ফার্স্ট শো।

আমাদের মানে?

সোজা। রুনু ঝুনু মুনু টুনু ছুলু লুলু বুলু।

বা—বা, নাঃ! বেরিয়ে গিয়েছিল আরেকটু হলে। কিন্তু রক্ষে কর।

কেন, দিব্যি-তো চেয়ারে বসে আছেন দেখছি।

এবার বুলু বললে :

আপনাকে কিছু করতে হবে না, শুধু আমাদের সাথে থাকতে হবে আর টঙ্কা দিতে হবে। তা-ও যদি ভরসা না হয় তবে আমি আপনার হাতটি ধরে থাকব'খন।

বুলু জিন্দাবাদ! মোনায়েম হেঁকে উঠল, কিন্তু বুলু একটুও হাসলে না, বরঞ্চ আরো গম্ভীর হয়ে বললে :

বায়োস্কোপ-তো পরের কথা, আগে আমাদের নিয়ে এধার-ওধার বেড়াতে হবে। তার জন্য দু-ঘণ্টা সময়। মানে সাড়ে চারটার সময় আমরা ঘর থেকে বেরুব।—ও কী, মুখ অমন শুকিয়ে উঠেছে কেন? এক গ্লাস পানি খাবেন?

পানি চাইনে, কিন্তু শোন, পথের মধ্যে আমি যদি ভুলে 'পুলিশ পুলিশ' বলে চেঁচিয়ে উঠি তবে আমাকে তোমরা দোষ দিতে পারবে না।

বা রে, পুলিশ ডাকবেন কেন?

হঠাৎ যদি ভুলে মনে হয় যে আমাকে নিয়ে তোমরা পালিয়ে যাচ্ছ?

সে-ভয় নেই, কারণ গবর্মেন্ট এখনো সেকেলে রয়ে গেছে। আমরা একবার চেঁচিয়ে উঠতে পারলে আপনি আর পালিয়ে কূল পাবেন না।

মুনু সাহস দিল :

আর রাস্তায় আমরা হট্টগোল করব না, ডিসিপ্লিন মেনে চলব। আপনি চলবেন আগে-আগে, আমরা পর-পর দাঁড়িয়ে চুপচাপ চলব। অবশ্য এসব মানব এই শর্তে, যদি আপনি আমাদের হোটেলে নিয়ে মাছভাজা খাওয়ান।

এবার কাব্‌লিগলায় হঠাৎ মোনায়েম চেঁচিয়ে উঠল : লে হালুয়া! কিন্তু তক্ষুনি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে ব্যগ্রকণ্ঠে বললে :

পাঁচ মিনিটের ছুটি দেবে আমাকে? ছুটে যাব আর আসব।

না, না, না। নানা গলায় ওরা সব বাধা দিলে, কিন্তু শুধু বুলু শান্তগলায় প্রশ্ন করলে :

কেন? কোথায় যাবেন?

দৌড়ে গিয়ে একটা ফোন করে আসব 'দুনিয়া' আপিসে, ওরা যেন প্রোমিনেডের ফোটো নিতে লোক পাঠিয়ে দেয়।

অমনি সবাই তাকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিলে : কেউবা তার চুল টানল, কেউ তার গলার তলায় কাতুকুতু দিল, আর দু-হাত নেড়ে মোনায়েম চেঁচাতে থাকল :

বেশ তো যাব না, যাব না। ওরা যখন শান্ত হল তখন মোনায়েম দস্তুরমতো ঘামছে। তারপর ঝুনু ছোট শিশুর মতো নাকী-সুরে হঠাৎ কয়ে উঠল :

সত্যি মনু ভাই, কতদিন ধরে বায়োস্কোপ দেখি না। আব্বার কাছে সে-কথা তুলেছি কী হয়েছে, অবশ্য সাতজনকে নিয়ে—। তবে মুনুটা একবার বলেছিল যে এক-একজন করে বায়োস্কোপে গেলে মন্দ হয় না, শুনেই আব্বা তেড়ে উঠেছেন, বললেন, আমার যেন কাজ নেই আর কী; এক-একজন করে বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে যাব আর আনব, ওঃ! কাজেই বুঝতে পারছেন মনু ভাই, যে, আপনাকে দেখাতেই হবে। ও কী, কথা বলছেন না কেন?

বেশ-তো, যাব'খন। হাত নেড়ে মোনায়েম সব্বাইকে আশ্বাস দিলে।

ছুলুটা ধাঁ করে ছুটে বেরিয়ে গেল, ফের যখন এল তখন তার হাতে সিগ্রেটের টিন, আর মুখটা হাসিখুশি। খুব সযত্নে একটি সিগ্রেট বের করে মোনায়েমের ঠোঁটে লাগিয়ে টিনটা আবার বন্ধ করতে-করতে সে ঠোঁট উল্টিয়ে মাথা হেলিয়ে আড়চোখে মোনায়েমের পানে চেয়ে বললে :

দুহ্। খায়-তো গ্রেস, তা সাহেবের বাহাদুরি কত, পকেটে নিয়ে বেড়ান। দুহ্! মুনুটা টুক

করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সিগ্রেটের ডগায় ধরালে, সে-ও তেমনি সুরে বললে :

দেব নাকি গোঁফে ধরিয়ে?

সিগ্রেটে একটা প্রচণ্ড টান দিয়ে মোনায়েম চমকে উঠে খপ্ করে একটা হাত ধরে ফেলল, আর লুলুটা কঁকিয়ে উঠল তীক্ষ্ণগলায়। কিন্তু তক্ষুনি লুলু একেবারে ভালো-মানুষটি বনে গেল, বললে :

দেখছিলাম আপনার পকেটে কী আছে, কিন্তু তাই বলে অমন লাফিয়ে উঠতে হয় নাকি? দেখছিস কেমন কিপ্টে মানুষ?

বুলু বললে :

আমার কাছে আপনার মনিব্যাগটা দিয়ে দিন, আমার বাক্সে তালা দিয়ে রেখে দেব। ওরা সব চোর, কখন যে আপনার পকেট হতে ব্যাগটা সরিয়ে ফেলবে ঠিক নেই। কিন্তু তালার কথা শুনে লুলু ভেংচি কেটে বললে :

এঃ, ভারি-তো তালা! চার পয়সা দামের জাপানি তালা, মাথার কাঁটা দিয়ে গুঁতিয়ে খোলা যায়।

বেশ-তো একবার খুলে দেখ। শান্তগলায় বুলু জবাব দিলে।

তাহলে বুঝতে পারছ, এবার মোনায়েম বিজ্ঞের মতো বললে : যদি তোমাকে মনিব্যাগটা দেই, তাহলে মিছিমিছি একটা অনর্থ ঘটতে পারে। অতএব এটা আমার পকেটেই থাক। আর, সহজে ওটা কেউ আমার পকেট থেকে সরাতে পারবে না। দেখছ না, লুলুটা এখনো তার হাতের কব্জি বুলোচ্ছে?

আচ্ছা থাক, বুলু সম্মত হয়ে বললে : আপনার পকেটেই ওটা থাক। তবে কথা হচ্ছে এই যে, বায়োস্কোপ দেখানোতে কোনো ফাঁকি নেই-তো?

নড়েচড়ে বসে চোখ কপালে তুলে মোনায়েম বিস্মিত হয়ে বললে : পাগল হয়েছ? তোমাদের আমি ফাঁকি দেব? আমি কি তেমন মানুষ?

কেন, সেবারের কথা আমরা কি ভুলে গেছি নাকি?

কী হয়েছিল সেবার?

আহা, যেন ভুলে গেছে আর কী?

জিভ্ কেটে লজ্জার হাসি হেসে নিচু গলায় মোনায়েম এবার বললে : ছিঃ, অমন কি আর কখনো হয়? আজকে আলবৎ দেখাব।

বুলু বললে, সে-কথা বলছেন বটে, কিন্তু আমরাও সাবধান থাকব। ছুলুটা হচ্ছে ডিটেকটিভ, ও আপনার ওপর চোখ রাখবে। আর সদর দরজায় থাকবে মুন্নু, ও হল আমাদের পাহারাওয়ালা। ওর কেমন জাঁদরেল চেহারা, দেখেছেন? আমি-তো রাত্তির বেলা অন্ধকারে ওকে দেখলে ভয় পাই।

আমি দিনের বেলাতেই পাই। সিগ্রেটে শেষ টান দিয়ে চোখ বুজে মোনায়েম স্বীকার করলে, তারপর মাথা নেড়ে নেহাত ভালোমানুষটির মতো বললে : আমাকে অমন ভেবো না, ছিঃ। শুধু একটি দিনের জন্যে তোমরা বায়োস্কোপ দেখতে চাইছ, আর আমি কিনা—হুঁ—।

খুঁঃ! উত্তরে লুলু নাক দিয়ে আওয়াজ করল, বলল : আহা কী চেহারাখানা বানিয়েছে দেখ না চেয়ে, যেন কিচ্ছুটি জানে না, ভেজাবিড়াল নম্বর ওয়ান।

লুলু! মারব এক চড়! এবার বুলু ভারিক্কি গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল, তারপর মোনায়েমের কানের কাছে সরে এসে ফিসফিস করে বললে :

মনু ভাই, পেয়ারা খাবেন? খুব ভালো-ভালো পেয়ারা আছে আমার কাছে, ওরা সে-খবর জানে না। মাথা নেড়ে চোখ বড় করে গোপনীয় কথা বলার ঢঙে মোনায়েমও ফিসফিস করে বললে :

খাব; কিন্তু কোথায় রেখেছ সেগুলো?

মার কাছে লুকিয়ে রেখেছি। নিয়ে আসব? খাবেন তো? ঠিক?

মোনায়েম সজোরে কয়েকবার মাথা নাড়তেই বুলু উঠে বেণি দুলিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল, চাইল না কারো পানে।

দুপুরবেলায় খাওয়া হয়ে গেলে মোনায়েম সিগ্রেট ধরিয়ে আয়েশ করে বসলে, আর তার চারপাশ ঘিরে বসল ওরা সাত বোন। মুনু বললে :

একটা ভূতের গল্প বলুন শুনি।

সবেমাত্র চোখ বুজেছিল মোনায়েম, সভয়ে তার পানে চোখ মেলে চেয়ে বললে :

এই ভরা দুপুরে ভূতের গল্প, মাথা খারাপ হল তোমার?

হ্যাঁ, বলতেই হবে। খুউব ভয়ের হওয়া চাই কিন্তু গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সেরেছে! হতাশভাবে মোনায়েম বুলুর পানে চাইলে, কিন্তু বড্ড ঘুম পাচ্ছে যে আমার?

থাক, ভূতের গল্প বলে কাজ নেই, আপনি ঘুমোন। একটু থেমে বুলু আবার বললে : আমি ভারি সুন্দর করে মাথায় হাত বুলোতে শিখেছি, দেব বুলিয়ে?

বেশ তো, দেবে। বলে মোনায়েম উঠে দাঁড়াল, বললে : এক মিনিট।

কী?

একটু বাইরে যাব, ফোন করতে। শুনে সবগুলো এক সাথে চেঁচিয়ে উঠল :

কোথায়? কোথায় ফোন করবেন?

ভয় নেই, 'দুনিয়া' আপিসে নয়, এক বন্ধুর কাছে। আজ বিকেলে ওর আমার কাছে যাবার কথা কিনা।

বুলু সন্দিগ্ধ চোখে কয়েক মুহূর্ত মোনায়েমকে দেখলে, তারপর মাথা হেলিয়ে প্রশ্ন করলে :

ঠিক আবার আসবেন তো?

নিশ্চয়ই। এই যাব আর আসব, ধর পাঁচ মিনিট। বেশ, তোমাদের যদি সন্দেহ হয় এই নাও মনিব্যাগ, তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, বলে সে পকেট হতে ব্যাগটি বের করে বুলুর হাতে দিল, তারপর দরজার পানে চলতে শুরু করে মুখ ফিরিয়ে হেসে বললে :

মনু ভাইয়ের ওপর তোমাদের এত অবিশ্বাস? আচ্ছা মনে থাকবে সব।

গলি হতে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে মোনায়েম আপন মনে হাসল। বুলুর হাতে সে খালি ব্যাগ দিয়ে এসেছে। খাবার আগে এক-সময়ে সে ব্যাগ হতে টাকা সরিয়ে রেখেছিল, ওরা জানতে পারে নি।

কিন্তু ফোন করার কথা মিথ্যে নয়, আর পালিয়ে যাবার ইচ্ছেও তার নেই। সে ফোন করল, কাছাকাছি একটা বাসায় একটি লোকের সাথে দেখা করল, তারপর এক দোকানে ঢুকে বুলুর জন্যে একটিন চকোলেট কিনে আধঘণ্টা পর যখন আবার সে রুনুদের বাসায় ফিরল তখন দেখে কী যে সারা বাড়িটাতে এক এলাহি কাণ্ড চলছে। যেমনি ওরা দেখলে যে সশরীরে ঋজু হয়ে গম্ভীর চেহারা নিয়ে মোনায়েম তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন আরেক চোট হুল্লোড় পড়ল। টুনু চেঁচিয়ে উঠল উত্তেজিতভাবে :

ওই যে!

গেছলেন কোথায়? বেশ তো খালি ব্যাগটা বুলুর হাতে দিয়ে—

আমার যা রাগ হয়েছিল আপনার ওপর, ইস্!

কিন্তু ফেরবার সুমতি হল কেন?

আবার দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে কেমন হাসা হচ্ছে দেখছিস?

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁটের কোনায় মুচকে হেসে সবার পানে চেয়ে এবার মোনায়েম বললে :

কেন পালিয়ে গিয়েছিলাম জান?

কেন? কেন?

এ-কথা বোঝাতে যে তোমাদের সাতটি মাথার যোগফলের চেয়েও আমার মাথাটি বেশি উর্বর।

কিন্তু বুলু কোথায়? ঘরের কোণে দেয়াল ঘেঁষে মুখ হাতে-ঢেকে বুলু নীরবে কাঁদছে। পেছনে মোনায়েম যে এসে দাঁড়াল, সে-কথা জেনেও সে একটুও নড়লে না। কয়েক মুহূর্ত ওকে চেয়ে-চেয়ে দেখে ওর ছোট বেণিতে মৃদু টান দিয়ে আস্তে সুর করে মোনায়েম বললে :

ছি, ছি, বুলুমণি কাঁদছে।

বুলু তবু নীরব হয়ে রয়েছে দেখে মোনায়েম আবার বললে :

কেমন ঠকিয়েছি বুলুকে, যে-বুলু রুনুর চেয়েও ন-বছরের বড়?

এবার কয়েক পলকের জন্য বুলু ফিরে চাইলে মোনায়েমের পানে, মাথায় মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে সে ঝাঁঝিয়ে উঠল সজল ভারি গলায় :

ইস ভারি-তো বায়োস্কোপ দেখানেওয়ালা হয়েছেন। সে আর বলতে পারল না, গলা জমাট হয়ে গেল, তবু ঠোঁট উল্টিয়ে যতদূর পারলে মোনায়েমকে সে ভেঙাল। মোনায়েম ওর মাথায় একবার হাত রাখতেই সে ঝামটা মেরে সে-হাত সরিয়ে দিয়ে দেয়ালের কোণে আবার মুখ গুঁজে রইল।

মোনায়েমের অন্তরে স্নেহ ছলছল করে উঠল। ওর কানের কাছে মুখ এনে আস্তে সে বললে :

দূর, বোকা মেয়ে কোথাকার! তোমাকে বুঝি আমি ঠকিয়েছি?... এ দিকে চেয়ে দেখ, দেখ না?

বুলু একচুলও নড়ল না। তাই মোনায়েম আবার বললে :

দেখ, তোমার জন্যে একটিন চকোলেট নিয়ে এসেছি। নাও, নিয়ে ছুটে গিয়ে তোমার আম্মার কাছে লুকিয়ে রেখে এস গে। এটা শুধু তুমি খাবে, কেমন?

বুলুর হাতটি ছুঁতেই সে তার হাত বুকের কাছে গুটিয়ে নিলে। দেয়ালের কোণে মুখ রেখেই সে আস্তে বললে :

আপনার চকোলেট আমি ছোঁব না।

বেশ, আমি তাহলে রাগ করে চললাম, আর কখনো আসব না।

বয়ে গেল।

ঠিক?

বুলু এবার আর কিছু বললে না। মোনায়েম আবার জিজ্ঞেস করলে :

ঠিক?

এবার মুখ ফিরিয়ে চেয়ে কেমন করে বুলু হাসল, ভারি মিষ্টি সে-হাসি। তার চোখের কোণে তখনো পানি, গালের প্রান্তে তারই রেখা। মোনায়েম সে-হাসি চেয়ে দেখলে, তারপর কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে ভারি গলায় প্রশ্ন করল :

ওটা কে আমার পানে চেয়ে অমন করে হাসছে?

বুলু আর ঘরে থাকল না, ছুটে পালিয়ে গেল।

পৌষ ১৩৪৯ ডিসেম্বর ১৯৪২

সাত বোন পারুল

[দ্বিতীয় দফা]

[১৩৪৯ সালের পৌষ মাসে আমার সাত বোন পারুল শীর্ষক গল্পটি মোহাম্মদীতে প্রকাশ পেয়েছিল। আমাকে তখন আলাপে ও চিঠিতে বহুবার প্রশ্ন শুনতে হয়েছিল এই মর্মে যে, এটা বাস্তব থেকে নেয়া কি না। তাহলেই হয়েছিল! আদালত পর্যন্ত ব্যাপারটা দৌড়ত না বটে, কিন্তু রুনু ঝুনু মুনু টুনু ছুলু লুলু বুলু—এই সাত বোনের গাট্টা খেয়ে মাথাটা আর আস্ত থাকত না। তবে একথাও ঠিক যে, এদের আমি ছাড়া-ছাড়াভাবে এখানে-সেখানে দেখেছি, এবং এদের চপলতা ও স্বচ্ছ প্রাণময়তায় বারেবারে মুগ্ধ হয়েছি।]

দোরটা ভেজানো, সেটা ঠেলে মোনায়েম সন্তর্পণে ঘরে ঢুকলে। বাইরের ঘরটা নির্জন, কেউ কোথাও নেই। কিন্তু সে দু'পা এগিয়েছে কী অমনি অনেকগুলো সরুগলার বিকট রকমের একটা হুল্লোড় তার কানে এসে লাগল। কোনো সাড়া না দিয়ে সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে মোনায়েম ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এসে যা দেখলে, তাতে সে চমকালে না বটে, তবু মনে-মনে বললে, বাপরে, এ কী দৃশ্য!

উঠোনটা সিমেন্ট করা। সে-উঠোনে কিছু-ভাঙা কালো রকমের দুটো চৌকি বিরাজ করছে এবং সে-দুটোকে ঘিরেই রুনু-ঝুনুদের পাঁচ বোন কোমরে আঁচল কষে মহাকলরবে একটা কৃচ্ছ্রসাধন-কর্মে ব্যস্ত। চৌকির পাশে বড় ধরনের একটা ডেকচি, তাতে গরম পানি ধুঁয়ো ছাড়ছে, এবং সে-পানি মগে করে তুলে-তুলে চৌকিদুটোর ফাঁকে-ফাঁকে ফেলে দেয়া হচ্ছে। ওপরে কড়া রোদ, তার ওপর কেমন ভাপসা গরম, ওদের দেহ হতে ঘাম ঝরছে দরদর করে। নিশ্চয়ই ছারপোকার বিরুদ্ধে এ-অভিযান।

মোনায়েম যখন বারান্দায় এসে দাঁড়াল, তখন ওদের মধ্যে একটা ছোটখাটো গেরিলাযুদ্ধ চলছে। মগ একটি কিন্তু তারা পাঁচজন, তাছাড়া তাদের মধ্যে কে যে সবচেয়ে সবজান্তা—সেটা চির অনিশ্চিত ব্যাপার। কাজেই—

কে যেন হঠাৎ মুখ তুলে চাইলে বারান্দার পানে, বোধহয় মুনুটা। তাকিয়েই হঠাৎ সে থম্ মেরে গেল, চোখদুটো গোল। ব্যাপার কী, মুনুটা দিনদুপুরে ভূতপেতনী দেখল না-তো? সবারই হাত থেমে গেল, চোখগুলো ছিটকে পড়ল বারান্দার দিকে—মোনায়েমের পানে।

মোনায়েম একটু হাসবার চেষ্টা করলে, হয়তো হাসল, তবে তার চোখে শুধু পলক পড়তে থাকল। কিন্তু কী আশ্চর্য, ওদের কারো মুখ থেকে 'টুঁ' আওয়াজটি বেরুল না। শুধু করলে কী, আঁচল দিয়ে মুখ ও ভেজা হাত মুছে আস্তে-আস্তে সব বারান্দায় উঠে মোনায়েমকে ঘিরে দাঁড়াল, চোখগুলো তেমনি গোল। আর মোনায়েম! অভ্যর্থনার ঢং দেখে তার বুক ধড়ফড়িয়ে বাঁচে না এবং শঙ্কিত চোখদুটো শুধু এর-ওর পানে পাক খেয়ে মরছে। সব চুপচাপ, জিরো আওয়ারের মতো অমঙ্গলসূচক ভারি নিঃশব্দতা; মোনায়েম দম ফেঁপে মরে আর কী!

অবশেষে, অবশেষে টুনুর ঠোঁটটা একটু নড়ল। নড়লই শুধু, কথা বেরুল না। বেরুল হঠাৎ ঝুনুর মুখ দিয়ে—তীরের মতো :

রুনু বুলুরা—! শিগগির, শিগগির, এই নিচে—বারান্দায়!

মোনায়েম গলায় একবার হাত বুলালে, ঘাড়ে বার-দুই, তারপর ক্ষীণ গলায় বললে : আমি বসব !

তক্ষুনি হাতল-ভাঙা একটা লকলকে চেয়ার এল, মোনায়েমও বসল। বসে হঠাৎ বেদনাদায়ক একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে, ছেড়ে চোখদুটো ব্যথাতুর করে তুললে। মনে-মনে

ভাবলে, রকম-সকম তো সুবিধের ঠেকছে না। তার এই সাত মাস পরে এদের কাছে আগমন, তা নিয়ে (অভিজ্ঞতায় বলে) এরা নিশ্চয়ই একটা এলাহি কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে। কাজেই একটা দুঃখময় সাংসারিক কথা তুলতে পারলে যদি রেহাই পাওয়া যায়। তাই আরেকটি গভীরতম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বেদনার্তকণ্ঠে কয়ে উঠল :

উঃ গাঁয়ের কী অবস্থা! লোকগুলো দুমুঠো খেতে পায় না, চারধারে বড় হাহাকার পড়ে গেছে। যদি একবার স্বচক্ষে দেখতে—উঃ!

সিঁড়িতে প্রচণ্ড ধুপধাপ আওয়াজ, আর কে যেন সিটি দিচ্ছে, বোধহয় বুলুটা। ইঞ্জিন চালাবার বাতিক তার ভয়ানক। ওরা বারান্দায় নেবেছে কী অমনি ছুলু তেড়ে গেল, ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে চোখ ভয়াল করে তুলে অসাধারণ রকমের জোরালো ফিসফিস আওয়াজ করে বললে :

আহ্! চুপ!

রুনু বুলু তো থ' মেরে গেল। সভয়ে আস্তে শুধাল :

কী?

চুপ!

তারপর ভয়ানক চুপচাপ। ওরা সাতজন গোল হয়ে মোনায়েমকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, কারো চুড়িতে পর্যন্ত টুন আওয়াজ নেই। আর মোনায়েমের চোখ নত, গভীর বেদনায় ভারি! বুলুটা উসখুস করে উঠল, প্রশ্ন করলে ব্যাপারটা কী তা জানবার জন্যে, শুনে ঝুনুটা চাপা গলায় রুখে উঠল। তারপর আবার চুপচাপ। তবে এবার শুধু থেকে-থেকে ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ শোনা যেতে লাগল—এর-ওর নাক দিয়ে সব দীর্ঘ-দীর্ঘ প্রশ্বাস পড়ছে। সুতরাং ব্যাপারটা হল এই যে, বুলুটা হঠাৎ ভয়ানক ঘাবড়িয়ে গেল, একটা অজানা দুঃসংবাদে তার মনটা কালো হয়ে উঠল। সে আস্তে মোনায়েমের কাছে ঘেঁষে এল, ওর একটি হাত হাতে তুলে নিয়ে কোমল গলায় বললে :

ও মনু ভাই, কী হয়েছে?

বুলু!

অন্য সময় হলে বুলুর গলাও বেজে উঠত, কিন্তু এবার সে লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল। হয়তো ভাবলে দুঃসংবাদ ঘেঁটে কাজ নেই, পরে এক সময়ে জানা যাবে'খন।

আবার চুপচাপ। এবার বুলুর থেকে-থেকে দীর্ঘশ্বাস পড়তে লাগল। তার অন্তরটা কচি বলে থেকে-থেকে গুমরে-গুমরে উঠতে লাগল।

আহ, কী রকম কাতর হয়ে উঠেছে মনুভাইয়ের মুখটা, কী সাঙ্ঘাতিক আঘাত না জানি লেগেছে ওর মনে...

ও-কী, ও-আবার কী হল? কিছু হয় নি, শুধু বুলু হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে।

সেরেছে, এইবার সেরেছে। মোনায়েম তক্ষুনি মনে-মনে নাকে খত দিলে। তবু, এখন সে নিরুপায়, তাই বেদনাদায়ক ভঙ্গি করে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর ক্লিষ্টমুখে বৃথা হাসি ফুটাবার চেষ্টা করে বুলুকে বললে :

ছিঃ, তুমি কেঁদ না। তারপর আর সকলের দিকে চেয়ে ম্লান গলায় বললে :

আজ তাহলে আসি। কেমন?

আচ্ছা। বলে টুনু ঠোঁটের হাসি লুকোতে আঁচল দিয়ে নাক মুছলে, চোখও।

আমার সাথে দেখা করবেন না?

থাক, তোমরাই না হয় ওঁকে বোলো সব।

মোনায়েম চলতে শুরু করলে বুলুর হিক্কি-হিক্কি ডবল বেড়ে গেল। তবু মোনায়েম নিরুপায়। ভেজানো দরজা খুলে সে বাইরের ঝাঁ-ঝাঁ রোদের পানে তাকাল একবার, তারপর চৌকাঠের ওধারে পা বাড়িয়েছে কী অমনি একটা কাণ্ড ঘটে গেল। কোনো কথা নেই মুনুটা

হঠাৎ বুলুর গালে ঠাস করে একটা চড় লাগিয়ে দিলে। গালে চড়? বিনা দোষে? বুলুর কান্নাও হঠাৎ থেমে গেল, তার যে-গালদুটো বেয়ে পানি পড়ছিল, সে-দুটো গুমট মারলে। সে মুখ তুলে সোজা চাইলে মুনুর পানে, বোশেখি দুপুরের আকাশের মতো থমথম করছে সে-মুখ। অতি শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সে প্রশ্ন করলে :

চড় মারলে যে?

তুই কাঁদছিস বলে।

আবার আরেকটা ঠাস আওয়াজ হল। এবার কে কাকে মারলে? মারলে বুলু, মুনুর গালে। দরজার কবাট ধরে ওধারে মোনায়েম পাথর বনে আছে যদিও সে থেকে-থেকে আপন মনেই বলছে : লে লুলু! লে হালুয়া।

চড় খেল এবং তার উত্তরও দিল বটে, বিদ্যুতের মতো সমস্ত ব্যাপারটার গূঢ় অর্থ বুলুর মাথায় ঝিলিক দিয়ে গেল। এবার দরজার পানে চেয়ে সে তীক্ষ্ণগলায় হুকুম দিলে :

আসুন!

শুনেই মোনায়েম আবার চোখদুটো ব্যথাতুর করে তুললে। ক্ষীণ গলায় বললে :

তাহলে এবার যাই।

আঙ্গুল দেব, হুঁ, চোখে আঙ্গুল দেব বলছি। বুলু কটমটিয়ে উঠল।

এবারো মোনায়েম নিরুপায়। তাই তার চোখ হঠাৎ ঝিকমিক করে উঠল, ঠোঁটের প্রান্তে হাসি।

একটি সিগ্রেট ধরিয়ে মোনায়েম হাসল। বললে :

যে-বারেই আসি, এমনভাবে তোমরা আমার অভ্যর্থনা কর যে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে আসে, বাপ্‌রে। একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, আমাকে তোমরা সাত হাটে সাতবার বেচতে পার।

ছুলু। কিনতেও পারি।

মোনায়েম। নিশ্চয়ই।

মুনু। তাহলে সাত দু'গুণে চোদ্দবার।

টুনু। এবং চোদ্দকে সাত দিয়ে গুণ করলে—

বুলু। আটানব্বই।

ছুলু। অর্থাৎ আটানব্বইবার আমরা আপনাকে বেচতে-কিনতে পারি। বুঝলেন?

মোনায়েম। বাস্‌রে, তাহলে এ-দেহে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে ভাব?

রুনু। একশোবার থাকবে। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে ডাক্তারনীও যে থাকবে।

মোনায়েম। সে আবার কে?

ঝুনু। টুনু! আব্বার সেই পাতা-ছেঁড়া হোমিওপ্যাথির গার্হস্থ্য-চিকিৎসাখানি ইতিমধ্যে একবার খতম করেছে।

টুনু। শুধু বুঝি খতম?

ঝুনু। ও, মুখস্থও করছে।

বুলু। মিথ্যে কথা। ব্যাপার কী জানেন—?

টুনু। বুলু!

বুলু। ইস্, হাঁক দিলেই হল বুঝি? আমি কিনা—

মোনায়েম। তুমি কিনা একটু চুপ করে থাক। অন্য কথা আছে।

সমস্বরে সকলে। কী?

মোনায়েম। অর্থাৎ, এইবার আমি ঠিক করে এসেছি বুঝলে? ব্যস্ত হয়ো না, শোন। বহু খোঁজাখুঁজি করে তিনটি দুলা পেয়েছি। এক বুলু ছাড়া তোমাদের দুজন-দুজন করে তিন দুলার

সাথে শাদি দেয়া হবে। আর নয়, কাঁহাতক আর তোমাদের আব্বা-আম্মাকে তকলিফ দেয়া যায়। আম্মার হার্টে অসুখ ধরিয়ে দিয়েছ, আর আব্বাকে এই বয়সেই ভীমরতি ধরিয়ে নাকাল করেছ—

মুনু। হাঁরে রুনু, এটা বাসা না মোহাম্মদ আলী পার্ক?

মোনায়েম। ঠাট্টা নয়। হাঁ, এই পরিস্থিতিতে একমাত্র কর্তব্য—

লুলু। মনু ভাইয়ের নৃত্য করা।

ছুলু। তা বুলু বাদ যাবে কেন? সে কী কথা?

বুলু। একশোবার বাদ যাবে। তা তোমরা ভাবছ বুঝি তোমাদের গোয়ালঘরে গিয়ে ঢুকব আমি? আহা, সাধ দেখে পিঠ চুলকোয় আমার।

ছুলু। সে যাক, পরে বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু দুলাদের বৃত্তান্ত শোনান। শুনি কার ক-টা বাড়ি-গাড়ি—কার কত মায়না আর বাপের সম্পত্তি—কে ক-বার বিলেত গেছে আর ফ্লাশ খেলতে বসে একসাথে নয় কি দশ হাজার টাকা উড়িয়েছে—বলুন শুনি।

ঝুনু। আরো আছে। কার বুকের মাপ পঞ্চাশ ইঞ্চি, আর—

মুনু। আর কে মাটি না ছুঁয়ে ডিগবাজি খেতে পারে, আর কে কত—

টুনু। আর কার মাথার চুল—

রুনু। আর কে কবে—

টুনু। আর কে কখন—

ছুলু। আর কার মনের—

লুলু। আর কে—

টুনু। আর—

মোনায়েম । ইয়া আল্লা, রহম কর! তওবা তওবা—ইস্।

মুনু। আর কখন কে—

বুলু। সাট আপ্!

টুনু । সাট আপ মানে? মনু ভাই তোমাকে চকোলেট কিনে দেন বলে তোমার সাহসখানা একশো হাত বেড়েছে বুঝি ?

বুলু। সাট আপ্!

এই ফাঁকে মোনায়েম আস্তে উঠে পালিয়ে যাচ্ছে এমনি সময় ওরা তিন-চারজন খপ্ করে ধরে ফেললে তাকে, কেউ ধরলে হাত, কেউ কোট, কেউ শার্ট। মোনায়েম নিরুপায়, তাকে আবার বসতে হল। মুনু এবার সোজাসুজি প্রশ্ন করলে :

ওয়াদা করুন বিয়ের কথা ও-মুখ দিয়ে আর কখনো বের করবেন না।

এই যে, নিজের কান নিজেই টানলাম, আর কখনো ও হচ্ছে না... ঈহ্!

অবশেষে ঘরের হাওয়া শান্ত হল।

জানেন, বুলু বললে, টুনু গান শিখছে। কোত্থেকে যেন বেলো-ফাটা রদ্দি একটা হারমোনিয়াম কুড়িয়ে পেয়েছে, বেলো করলে পেছন দিয়ে ভসভস আওয়াজ হয়।

ওহ্হো, এতক্ষণ বুঝি বলা হয় নি? শুনবেন গান, আনব হার মোনিটা?

এই দুপুরে! থাক না এখন!

থাকবে কেন ? শুনুন না—মোটে একটি। আনি?

আচ্ছা, আচ্ছা! পরেই না হয় শুনিয়ো, বুলু ঠোঁট উল্টিয়ে বললে, যা গাও তুমি! বুঝলেন মনুভাই, গায় তো মাথা-মুণ্ডু, কিন্তু বলে কত কী—খাম্বাজ, মালগুঞ্জ, ঝিঁঝিঁট। ইস! কানে একেবারে ঝিঁঝি ধরিয়ে ছাড়ে।

এই বুলু!

এই টুনু!

বাস, বাস! তাড়াতাড়ি মোনায়েম রায় দিয়ে দিলে।

আর লুলুটা কী করছে জানেন? রোজ চিলেকোঠায় (অবশ্য আম্মা যখন থাকেন না তখন) দরজা এঁটে নাচ শেখে। এইসান ধুপধাপ আওয়াজ হয় যে কী বলব! মনে হয় তখন, (দাঁত কটমটিয়ে) ইস্, যেন কল্লাটা চিবিয়ে খাই—

বুলু!

লুলু!

বাপ্‌রে, কী সব গলা! মোনায়েম বলে ফেললে। কিন্তু বুলুর সেদিকে কান নেই, সে বলে চলল :

শরীরখানা তো বোধহয় দু-মনি, সে-দেহ নিয়ে নাচে যে কী তালে। সেই ঝেন্দা ঝেনা কাটা থোড় লাগ ঝিনি ঝাঁ-তাল। বাপ্‌স!

তাহলে তোর কপালে তো ঝাঁ—অর্থাৎ ঝাঁটা। অন্যায় বলেছি? এই ধর রুনুর যদি ঝেন্দা হয় ঝুনুর যদি ঝেনা হয়—

বুঝেছি বাপু বুঝেছি, তামার মাথায় একটা গাট্টা মারতে পারলে আরো ভালো বুঝব।

আহা-হা, থাক না ওসব।

দেখুন তার সাহসখানা! ও রুনু-ঝুনু ইত্যাদি ডিভাইডেড বাই ঝেন্দা-ঝেনা ইত্যাদি করতে চায়। ইস, কথায় বলে কী যেন—

আহা-হা, কথায় কী বলে তা তোমার বলে কাজ নেই বুলু। এবার শোন।

শুনতে বলেছে কী অমনি সাত কণ্ঠ হতে একটা বিচিত্র 'গি'র আওয়াজ বের হল, যা আসলে সাতটি 'কী'র যোগফল।

না না, কেচ্ছা নয়। বলছি কী, তোমরা শুধু এই করে বেড়াও না কিছু পড়াশোনা কর?

ওহ্‌হো, মনে পড়েছে। বলে টুনু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মোনায়েমের পানে তাকালে।

কী? মোনায়েমের চোখ আতঙ্কে এই বড় হয়ে উঠল, কী মনে পড়েছে?

আপনি আমাদের মাস্টার।

অর্থাৎ?

এর একটা ইতিহাস আছে, সেটা আগে শুনুন। সেদিন আব্বা বললেন যে, তোরা বড্ড ত্যাঁদড় হয়ে উঠেছিস। ধর্মশিক্ষা পর্যন্ত-তো তোদের বিদ্যে হয়ে রইল, তার ওপর মুখে আল্লার নামটি পর্যন্ত আনিস না, এবার একটা কড়া রকমের মাস্টার রাখছি। বুলু ভালোমানুষের মতো প্রশ্ন করলে, বেত মারবে যে তেমন মাস্টার? আব্বা-তো বাজের মতো কড়াৎ করে উঠলেন, চুপ হারামজাদি! শুনে বুলু করলে কী—হিহি, করলে কী—হিহি—

বাপ্‌রে, হাসির ঢং দেখ। শুনুন আমি নিজেই বলছি। করলাম কী মেঝেতে একেবারে চিৎপাত হয়ে হাপুস-হুপুস করে এইসান কান্না জুড়ে দিলাম যে, আব্বার কলজেতে উঠ-বোস করিয়ে ছাড়লাম। আব্বা-তো আস্তে সরে পড়লেন। তখন আমাদের জরুরি বৈঠক বসল, ঠিক হল যে অ-আ ক-খ বিদ্যে নিয়ে-তো আর দুনিয়া চালানো যায় না, কিছু শিখতে হবে। এবং মনুভাই এলে তাঁকেই মাস্টার রাখতে হবে। ওঁকে খুব মেনে চলব, আবার উনি বাঁদরামি করলে চাটিও লাগাব।

আর ঠিক হল যে, আব্বার কাছ থেকে মাইনে নেয়া হবে বটে দেয়া হবে না। সেই টাকায় তাহলে আমাদের সাপ্তাহিক ভাজামাছের ভোজ বসতে পারে। আর তাছাড়া মনুভাই নির্লোভ, টাকার প্রতি তাঁর তেমন কিছু—

ঠিক বলেছ, মোনায়েম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, যথার্থ!

তবে আপনি রাজি?

একশোবার, তবে কথা হচ্ছে যে, বছরখানেকের জন্যে পরশু আমাকে আবার দেশে ফিরে যেতে হচ্ছে, নইলে—

তারা ভয়ানকভাবে হতাশ হল। কয়েক সেকেণ্ড পর হঠাৎ টুনু খেঁকিয়ে উঠল :

তবে এসেছিলেন কী করতে, গড়ের মাঠ দেখা বুঝি বাকি ছিল। গেঁয়ো বাঙাল কোথাকার!

এই টুনু! বুলু ঝাঁঝিয়ে উঠল, মারব কষে এক গাট্টা। ইস পেতনী হয়েছেন, মাছের লোভ আর ছাড়তে পারেন না।

এই বুলু! বড্ড বাড় বেড়েছে, না? তুমি সবাইকে উদ্‌বেড়াল পেয়েছ নাকি?

ব্যাপার গুরুতর দেখে সভয়ে চোখ বুজে মোনায়েম তাদের হাতাহাতির অপেক্ষায় আছে, এমন সময় ভয়ানক অবাক হয়ে শোনে কী, তারা হাসছে। হাসছে? হ্যাঁ, হাসছেই-তো।

ব্যাপার কী হে? চোখ মেলে কৌতূহলী মোনায়েম প্রশ্ন করলে।

কিছু না। তবে উদ্‌বেড়াল, অর্থাৎ ভোঁদড়।

সে আবার কী চিজ?

অনেক হাসি, অনেক কাশি, তারপর ঝুনু বললে :

আমাদের ডানধারের বাসাটাতে এক নতুন ভাড়াটে এসেছে। তাদের কালোমতো এইয়া মোটা কলেজী ছোকরাটা, আমরা বিকেলে ছাদে উঠলে তিনিও আসতেন। উদ্‌বেড়ালের মতো চোখ তার এবং সে-চোখ আমাদের ওপর সেন্টার করে শুধু ঘুরপাক খেতেন। বুলু বললে, চাঁদু, তুমি আমাদের চেন না বুঝি? করলে কী, আমাদের সব ভাগিয়ে নিয়ে গেল ওধারে। (দু বাসায় মোটে চার হাত তফাত) তারপর বুলু ভালোমানুষের মতো ডাকলে, এই খোকা শোন-তো! আর খোকা! খোকা তো লেজ তুলে ফিক করে হেসে রেলিঙের পাশে এসে হাজির। বুলু বললে, শুনলাম তুমি নাকি অ্যাথলেট? বটে! আচ্ছা, তবে কটা বুকডন দাও তো লক্ষ্মী। লজ্জার কী আছে! আমরা যে সব তোমার নানি গো। দাও, দাও। না দিলে তুমি কিন্তু ভোঁদড়। সে করলে কী, আস্তে-আস্তে সরতে লাগল নিচে যাবার সিঁড়ির দিকে। বুলু তখন আতু-তু করে ক'বার কুকুর ডেকে বললে : ধর্ ধর্ ভোঁদড়কে ধর্। বলে সে নিজেই মোটা গলায় ব্লাডহাউন্ডী ডাক ডেকে দিলে।

—বাহ্‌বা, শাবাশ। আর আসে?

—মোটেও না।

—মোনায়েম কতক্ষণ বুলুর গুণগান করলে, করে হঠাৎ বললে : শোন।

কী? কী?

অর্থাৎ, এবার যাব। বেলা হয়েছে-তো।

এবারো ওরা কেচ্ছার আশায় নেচে উঠেছিল, কিন্তু হতাশ হল আবার। মুনু দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, বললে :

ইস্, বুঝলি টুনু, ইচ্ছে করে মাথায় একটা গাট্টা মারি! বারেবারে শোন বলে ফাক্কা। দুত্তোর।

গাট্টা, চাটি, বাপরে কত কী জান তোমরা!

ঠোনা জানেন না বুঝি? প্রথমে হল গাট্টা, তারপরে ঠোনা, তারপরে তো চাটি। ঝুনুটা গাট্টা মারতে ওস্তাদ। বুলুটা শুধু চাটি মারে (বুলুর পক্ষ হতে তীব্র প্রতিবাদ), এবং ঠোনাটা এক-আধটু সবাই মারে। এখন কথা হচ্ছে যে আপনার যাওয়া হবে না—

কিন্তু যেতেই হবে যে। নইলে—উঃ। কী পড়ল বাবা মাথায়?

কিছু নয়, ঠোনা।

এইরকম বুঝি ঠোনা? গাট্টা আর ঠোনাতে তফাত? উঃ বাপরে বাপ...

এই তফাত। বারবার ঠোনা একবার গাট্টা।

অর্থাৎ, সেটা ওস্তাদী মার।

আচ্ছা, আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। কোথায় লেগেছে?

বুলুর হাতটা সরিয়ে দিয়ে মোনায়েম এবার সটান উঠে দাঁড়াল, রেগে বললে, আমি চললাম।

এঃ, রাগ দেখ সাহেবের। আমরা কিন্তু রাগের পালা করি না। ছুলু জানিয়ে দিলে।

যাচ্ছেন তাহলে? বুলু শুধাল, মোনায়েম কথাই কইলে না।

সে দোরগোড়ায় পৌঁছতেই ঝুনু হেঁকে উঠল :

একটা কথা মনুভাই। বাসায় গিয়ে যদি দেখেন যে আপনার ভেতরের পকেট খালি, তবে ভাববেন যে কাল আড়াইটের সময় আপনাকে আসতে হবে আমাদের সার্কাসে নিয়ে যাবার জন্যে কেমন?

এ অদ্ভুত ভোজবাজি যে! তার কোটের পকেটটা বিলকুল খালি, সেখানে মনিব্যাগটা নেই। মোনায়েম এবার রেগে গরগর করে উঠল, চোখ দিয়ে আগুন ছড়িয়ে বললে : তোমাদের আবার সার্কাসও দেখতে হয় নাকি?

কী হয় নাকি?

কিছু না। (তারপর ঢোক গিলে) কে কে যাবে?

বাদ যাবে আবার কে?

অর্থাৎ রুনু ঝুনু মুনু টুনু ছুলু লুলু বুলু সব্বাই কাল সার্কাস দেখতে যাবে মোল্লার হাটে মনুভাইয়ের সাথে—এই হল এশতেহার। শুনছেন?

মোনায়েম কোনো উত্তর দিলে না।

সে রাস্তায় পা দিয়েছে এমন সময় বুলু ছুটে এল। বললে :

নিন। শিগগির।

কী? ব্যাগ?

উঁহুঁ, একটি আনা। ট্রামের পয়সা।

আশ্বিন ১৩৫০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩

ছায়া

—তোমার মুখে ও কিসের আভা?

থামের আড়ালে ছায়া : সে-ছায়ায় ময়লা ও জীর্ণ সবুজ আলখাল্লা গায়ে যে-বৃদ্ধ ফকির নিমীলিত চোখে নিশ্চল হয়ে বসেছিল সে এবার চোখ মেলে চাইলে, প্রথমে দেখলে দুটি জ্বালাময় তীব্র দৃষ্টি। তার সামনে উবু হয়ে যে-ছেলেটি বসে তাকিয়েছিল তার পানে, তার কোমল মুখ রিক্ততায় প্রখর, ক্ষীণ দীর্ঘ দেহ দীনতায় চঞ্চল, আর জ্বালাময় তীক্ষ্ণ চোখদুটি পক্ষ্মশূন্য ও ছোট। তার পরনের কাপড় ময়লা, কিছুটা ছেঁড়া, আর তার মাথার রুক্ষ লালচে চুলগুলো এলোমেলো, সে-গুলো ছড়িয়ে রয়েছে কানের পাশে, ঘর্মাক্ত কপালের ওপর।

—তুমি কে?

ছেলেটির কাছ হতে সে-প্রশ্নের কোনো উত্তর এল না। তার পানে কতক্ষণ চেয়ে থেকে ফকির আবার প্রশ্ন করলে :

—কী চাও তুমি?

এবার ছেলেটির শুষ্ক নীরস ঠোঁট একটু নড়ল, একবার চোখের পাতা ফেলে সে কিছুটা রুদ্ধ ও কিছুটা কর্কশ গলায় বলে উঠল :

—আমি সত্য খুঁজতে বেরিয়েছি। একটু থেমে আবার বললে : তোমার সারা মুখে যে

আভা দেখছি ও কিসের আভা?

ফকির হাসল মধুরভাবে, স্নিগ্ধ নয়নে চেয়ে বললে :

—সেই সত্যের আভা।

—কী তোমার সত্য?

—খোদা।

—খোদা আমি মানি না। যা আমি দেখতে পাইনে, তা আমার কাছে মিথ্যে।

ফকির আবার হাসলে, স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতে ওর চোখের পানে চেয়ে বললে :

—যে-তারা তুমি দেখতে পাও না, সে-তারা তো তোমাকে আছে বলে মানতে হয়।

—কিন্তু তার জন্যে দ্বিতীয় বস্তুর সাহায্য লাগে।

—খোদাকে পেতে হলেও দ্বিতীয় বস্তুর প্রয়োজন। খোদা সত্য।

—যিনি সর্বসাধারণের নন, তিনি আমার কাছে মিথ্যে।

—ভুল বলছ তুমি; তিনি সকলের, সকল মানুষের।

ঠোঁটের প্রান্তে কেমন করে ছেলেটি হাসলে, বললে :

—মিথ্যে। তারপর ঠোঁটের যে-প্রান্তে হাসি উঠেছিল জেগে, সেখানে হঠাৎ জাগল বিতৃষ্ণা ও কাঠিন্য, চোখের ধারটা কুঞ্চিত হয়ে উঠল; ফকিরের চোখের পানে সোজাসুজি চেয়ে তীব্র ও তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল :

—যেখানে তর্ক সেখানে সত্য নেই। সত্য তর্কের অতীত, ভাষার অতীত।

তারপর ছেলেটির চোখে কেমন ছায়া ঘনিয়ে এল, তার সঙ্কুচিত আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল, বিসদৃশভাবে কেঁপে উঠে ঋজু হয়ে বসে সে ব্যথিত চোখ মেলে এধার-ওধার চাইলে, চেয়ে হঠাৎ উঠে পড়ে ঝড়ের মতো সোজা বেরিয়ে গেল, কোনোদিকে আর তাকাল না, তার হাতে লাঠি, পিঠে পুঁটলি।

ঝম্ ঝম্ ঝম্। সোনার মতো সূর্যের আলোর তলায় কোমল সবুজ ঘাসের ওপর যে-তন্বঙ্গী মেয়েটি নাচছে, তার শাড়ির রং পলাশফুলের মতো রাঙা। রাঙা শাড়ির চওড়া পাড় আবার রুপালি, যে-পাড় মেয়েটির ক্ষীণ দীর্ঘ দেহ ঘিরে সাপের মতো জড়িয়ে রয়েছে, আর ঝলমল করছে সূর্যের আলোয়। ওপাশে যে-লোকটা বাঁশি বাজাচ্ছে তার উজ্জ্বল মুখে আনন্দের ছটা, বাঁশির সুরে উন্মাদনা। তার থেকে কিছু দূরে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে যে-মোটা লোকটা খাচ্ছে আর আপন মনে হাসছে, তার নাকে কেমন খুশির একটা অস্ফুট আওয়াজ হচ্ছে থেকে-থেকে। এবার সে আড়চোখে তাকালে ঝোপটার পানে—যেখানে সঙ্কুচিত দেহে উবু হয়ে বসে রয়েছে সেই ছেলেটি, তাকিয়ে অকারণে উঁচুগলায় হেসে উঠল। তারপর জিজ্ঞেস করলে :

—খাবে?

—না। মাথা নেড়ে ছেলেটি বললে; লোকটার হাসি দেখে সে বুঝি ভরসা পেল মনে, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল তার কাছে, মোটা ভ্রূর তলে তার পক্ষ্মশূন্য চোখদুটো জ্বলছে।

—খাবে না বললে যে? ওদিকে ঝুঁকে একটা লালরঙের কাঠের বাক্স খুলতে-খুলতে লোকটা বললে, তার চকচকে নাকের ডগায় সূর্যের আলো ঝিকমিক করছে।

—না, খাব না।

—কে তুমি? অত হ্যাংলা কেন, খাও না বুঝি কিছু?... নাও, খাও।

—না।

—কী চাও তবে? আমাদের তো আর হাঁ করে চেয়ে-চেয়ে গিলতে পারবে না বাপু!

—আমি সত্য খুঁজতে বেরিয়েছি।

—সত্য খুঁজতে? বল কী, লোকটার মুখভরা খাবার, তবু সে এমনভাবে হাসতে লাগল যে তার দেহের প্রতি অংশ কাঁপতে লাগল তার ধমকে, চোখ উঠল ছলছল করে। ছেলেটি একটি

কথাও কইলে না।

লোকটার হাসি থেমে এসেছে, সে এটা মুখে দিচ্ছে, ওটা চেখে দেখছে, আর গলায় কেমন আওয়াজ করে মাথা নেড়ে হঠাৎ শিস দিয়ে উঠছে, চোখ ঘুরিয়ে সমঝদারের মতো তাকাচ্ছে।

—তোমরা আনন্দময়, না? তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে ছেলেটি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল।

—তা বৈকি, ঠিক বলেছ। মদের বোতলের ছিপি খুলতে-খুলতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠে লোকটা জবাব দিলে।

—কেন?

—কেন? এই ধর অনেক—অনেক টাকা আছে বলে, স্বাস্থ্য ও মিলন আছে বলে।

—আনন্দ সত্য? তোমার কাছে আমি উত্তর চাইছি। আনন্দ সত্য?

লোকটা আবার হাসতে শুরু করেছে, শুধু হাসছে আর হাসছে, তার হাতের বোতলের লালজলের মতো তার মনের আনন্দ যেন টলমল করছে। হাসির মধ্যেই বললে সে :

—সত্য বৈকি। তারপর স্বচ্ছ গ্লাসে বোতলের রঙিন পদার্থ ঢেলে তাতে ঠোঁটটা একবার ছুঁয়ে সে আবার বললে :

—জীবনে আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই, খালি আনন্দ আর আনন্দ।

চঞ্চল নৃত্যের ঢেউ তন্বঙ্গী মেয়েটির সারা দেহময় উত্তাল হয়ে উঠেছে, ঘূর্ণায়মান ঝলমলানো রুপালি পাড়ের তলায় ঘুঙুরের আওয়াজ তীব্র হয়ে উঠেছে; পায়ের আওয়াজ নেই। নর্তকীর রক্তিম অধরে মোহন হাসি, আর তার কালো চোখের কিনারায় বিদ্যুৎ। তাই চেয়ে-চেয়ে ছেলেটির দৃষ্টি বিহ্বল হয়ে এল, চোখের জ্বালাময় তীক্ষ্ণতা আবেগে কোমল হয়ে উঠল : তার সম্মুখে মহা-আনন্দের উন্মত্ত লেলিহান শিখা যেন দাউ-দাউ করে জ্বলছে, আর সে-শিখার দাহনে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

ওধারে লোকটা হঠাৎ মুখে কেমন দুঃখসূচক আওয়াজ করলে, ছেলেটি মাথা তুলে অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে যে তার চোখে জল, আর যে-ঠোঁট একটু আগে হাসিতে ঝিকমিক করছিল, সে-ঠোঁট বিষাদে কালো হয়ে এসেছে। তার স্থূল বুক ভেঙে আরেকটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, ছেলেটির পানে চেয়ে সে বললে :

—ওই যে দেখছ মেয়েটি নাচছে, ওর নাচ দেখলে একটা কথা মনে পড়ে। এর এক বড় বোন ছিল, যাকে আমি ভালোবাসতুম। সে-মেয়েটি ছিল ঠিক এর মতোনই দেখতে, তার নাচের ঢঙও ছিল এমনি ধারা, হাসতও ঠিক এমনি। তাকে আমি এত ভালোবাসতুম যে—লোকটি আর কইতে পারলে না, কান্নায় গলা রুদ্ধ হয়ে এল।

বাঁশি থেমে গেল, সবুজ ঘাসের ওপর বৃত্তাকারে রুপালি-পাড় ছড়িয়ে নর্তকী চুপ করে বসে পড়ল, তার সারা দেহে ক্লান্তির ছায়া, ঠোঁট হতে মোহন হাসি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ছেলেটির চোখে হঠাৎ ছায়া ঘনিয়ে এল, হাতের সঙ্কুচিত আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল, বিসদৃশভাবে কেঁপে উঠে ঋজু হয়ে বসে সে অসহায়ভাবে এধার-ওধার চেয়ে এক সময়ে উঠে পড়ে ওই ঝোপের পাশ দিয়ে কোথায় চলে গেল : তার হাতে লাঠি, পিঠে পুঁটলি।

আকাশময় প্রশান্ত গোধূলির স্নিগ্ধ ছায়া। অদূরে অশ্বত্থ-গাছের তলে একটা গরু আধা-বোজা চোখে চেয়ে জাবর কাটছে, আর তারই কাছাকাছি কতকগুলো ভেড়া সন্নিবদ্ধভাবে নিশ্চল হয়ে পড়ে রয়েছে; কোনো সাড়াশব্দ নেই কোথাও, হাওয়াও নেই। প্রশান্ত মর্মরের মেঝের ওপর আধাবয়সী যে-মহিলা বসে রয়েছে, তার দু-চোখের শেষপ্রান্ত ওপর দিকে টানা, আর সে-চোখের যে-অংশটুকু নীরবে চেয়ে রয়েছে দূরের পানে, তাতে গোধূলির ওই নিষ্কম্প প্রশান্ত ছায়া! তার পরনে ধূসর বস্ত্র।

মর্মরের মেঝেতে ছায়া পড়ল, কার যেন অতিমৃদু সাবধানী চলার আওয়াজ নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার প্রগাঢ়তায় জেগে উঠল। কোনো কথা না কয়ে ধূসর বস্ত্র পরিহিতা চোখের

প্রান্ত দিয়ে চেয়ে দেখলে যে, আবছায়ার মাঝে দুটো ক্ষুধিত চোখ জ্বলছে, যেন ভস্মের স্তূপের অগ্নিকণা; তারপর সেই বাইরের ধূসরতায় আবার চোখ ফিরিয়ে নিলে।

কেউ কিছু বললে না। ধূসর বস্ত্র পরিহিতার আধাফোটা ফুলের মতো চোখে আর আকাশের ছায়ায় এমন নিবিড় প্রশান্তি যে, ছেলেটির শুকনো ঠোঁট দুটোতে কোনো সাড়া এল না। গরুটি একবার মাথা নাড়লে বলে তার গলায় ঝোলানো ছোট ঘণ্টাটি অতি আস্তে ক'বার বেজে উঠল, তারপর আবার নীরবতা।

ছেলেটির চোখের জ্বালা আর ক্ষুধাও যেন ক্রমে-ক্রমে ধূসর হয়ে আসছে, দেহের ঋজু ভঙ্গি কোমল ও শিথিল হয়ে উঠছে, ভাষার অতীত যে-শব্দহীন চিরশান্তি তারই মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। ওই যে ধূসর বস্ত্র পরিহিতা—যার চোখে কোনো ঔৎসুক্য নেই, যার চোখ নিজের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ, তার সে-চোখের পানেই কথাশূন্য-ভাবশূন্য চোখে চেয়ে নিস্তরঙ্গ মুহূর্তের ওপর ছেলেটি ভাসতে লাগল : সে যেন ঘাটে বাঁধা নৌকো, আর তার তলা ছুঁয়ে নদীর স্রোত বয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে।

মহানীরবতার মধ্যে শুধু একবার মাত্র ছেলেটির গলার আওয়াজ শোনা গেল, তাও অতি অস্ফুট, কোমল ও পিচ্ছিল :

—তোমার এ-মহাশান্তির তলায় আমাকে থাকতে দিও চিরকাল, আমি বড় অশান্ত।

শুনে ধূসর বস্ত্র পরিহিতা শুধু একবার চাইলে তার পানে, কিছু বললে না, বা হাসলে না। তার চোখে কী আছে কে জানে, কিন্তু সে-দিকে চেয়ে-চেয়ে ছেলেটির যেন ঘুম আসছে কিন্তু চোখ বুজে আসছে না : যেন না-ঘুমিয়ে সে ঘুমের দেশে প্রবেশ করেছে, যে-দেশের রূপ কেউ জানে না, ঘুম এলে ঘুমিয়ে পড়ে বলে।

তারপর কে যেন এসে দাঁড়াল পাশে, তার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না আবছা আঁধারে; পরনে যেন তার হলদে রকমের কাপড়, আর হাতে দীর্ঘ সরু বেত। সে কথা কইল যেন নিশুতি রাতে টিনের ছাতে বড় পাথর পড়ল, আর সে কী এক রুদ্ধ আবেগে সজোরে হাত নাড়ছে বলে তার হাত-ভরা চুড়ি ঝনঝন করছে।

—তোমার ওই সাদা পাথরের মূর্তিটি ভেঙে ফেলেছে।

—কে? ধূসর বস্ত্র পরিহিতার চোখে বন্যার মতো চাঞ্চল্য এল।

—ওই যে, ও ভেঙেছে। সে আঙ্গুল দিয়ে যাকে দেখালে প্রথমে তাকে দেখা যায় নি, ওখানটায় আঁধার, আর সে-আঁধারে মিশে গিয়ে কালো কাপড়-পরা কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে বাঁকা হয়ে।

আবছা অন্ধকারে ধূসর বস্ত্র পরিহিতার চোখ পূর্ণ উন্মীলিত হয়ে হঠাৎ ঝলসে উঠল, হেলানো কোমল গ্রীবা দৃঢ় উন্নত হয়ে উঠল, আর সে কথা কইল যেন বল্‌গা-ছিঁড়ে সতেজ সবল ঘোড়া লাফিয়ে ছুটে এল :

—ওকে মার, ওকে খুন কর, ওকে পুড়িয়ে ফেল, ওকে গুঁড়ো করে ফেল! বাইরের আঁধার থেকে কারা যেন মশাল হাতে এগিয়ে এল, দূরে কারা তীব্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে খনখন করে হেসে উঠল, আর ঘনতালে দামামা উঠল বেজে, ঝনঝনিয়ে উঠল অসি।

হঠাৎ আর্তকণ্ঠে দীর্ঘসুরে ছেলেটি গোঙিয়ে উঠল, দ্রুতভাবে হাত দিয়ে মশালের উজ্জ্বল প্রখর আলো থেকে নিজের চোখদুটি ঢাকলে; তার দেহ যেন ভেঙে পড়তে চাইছে, তবু কয়েক মুহূর্ত পরে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে নিঃশব্দ চরণে সবার অলক্ষিতে বেরিয়ে গিয়ে সে বাইরের নিবিড়-নিশ্ছিদ্র আঁধারে মিলিয়ে গেল; হাতে তার লাঠি, পিঠে পুঁটলি।

সমগ্র আকাশ মেঘভারে নত ও বেদনায় ম্লান; নদীতে মৃদু ঢেউ তুলে থেকে-থেকে হাওয়া বইছে। সঙ্কীর্ণ গবাক্ষের পাশে যে-পতিহীনা পরিপূর্ণযৌবনা অশ্রুমতী নারী শুভ্র বসন-পরে অবাঙ্মুখ হয়ে বসে রয়েছে, তার অন্তর সে-হাওয়ার কোমল আঘাতে কখনো দীর্ঘশ্বাসে স্ফীত হয়ে উঠছে, কাজল চোখের পক্ষ্ম বেয়ে দুয়েক ফোঁটা অশ্রুও পড়ছে ঝরে।

সজল আকাশের তলা হতে ঝড়ের মতো এল ওই ছেলেটি, তার বিশৃঙ্খল চুলগুলো উড়ছে, মুখের রেখায়-রেখায় কেমন এক তিক্তভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। নারী তাকে চেয়ে দেখলে, দেখেই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, আর বাইরে আকাশ-ভেঙে নাবল বৃষ্টি। মুহূর্তে ছেলেটির চোখ নত হয়ে এল, তবু সে চোখ তুলে ক্রন্দনরতা নারীর পানে চেয়ে কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করল :

—কী তোমার দুঃখ?

কপালের ওপর মুখের ওপর মুক্ত চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়েছে, সে-গুলো এক হাত দিয়ে সরিয়ে মুখ তুলে অশ্রুভরা চোখে চাইলে নারী, বললে :

—দুঃখ? এত দুঃখ যে তা-জানাবার ভাষা মানুষের জানা নেই।

কতক্ষণ কেউ কিছু কইল না; ওর মনের ব্যথা না জানতেই ছেলেটির শীর্ণরিক্ত মুখ কেমন বেদনায় ভরে উঠল, নয়ন এল সজল হয়ে। এক সময় কান্না থামিয়ে চুল সরিয়ে নারী আবার বললে :

—সেই যে সেবার যুদ্ধ হয়ে গেল,—সে-যুদ্ধেই আমার স্বামীর মৃত্যু হল। সেই হল দুঃখের সূচনা, তারপর তার আসল কাহিনী আমার জীবনের প্রতিমুহূর্তে জড়িয়ে কালো বিষাক্ত জলের মতো বয়ে চলেছে, মৃত্যুর আগে তার শেষ নেই!

শুনে সমবেদনায় ছেলেটির অন্তরের গভীরতা থেকে এক বিন্দু অশ্রু বেরিয়ে এসে ঝরে পড়ল নিঃশব্দে। কতক্ষণ নীরবতার পর আবার বললে নারী :

—দু'বছর আগে ঠিক এমনি এক বর্ষণক্লান্ত দিনে এই ঘর হতেই আমার স্বামী আমার কাছ হতে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তখন কি জানতুম যে সে-বিদায়-নেয়া চিরবিদায় হয়ে দাঁড়াবে? সেদিনও আকাশে এত মেঘ, হাওয়া ঠাণ্ডা আর ভারি, দুনিয়া এমনি শ্যামল-স্নিগ্ধ; আজ সে-কথাই মনে পড়ছে আর—নারী আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, মুখ ঢেকে গেল কালো চুলে।

মুহূর্তগুলো যেন বেদনায় মন্থর, আর নীরব। অনেকক্ষণ ছেলেটির ঠোঁটে কোনো ভাষা এল না, শেষে হঠাৎ মুখ তুলে সে ঝড়ো হাওয়ার মতো বলে উঠল :

—তোমার দুঃখ আমিও বরণ করে নিলাম। দুঃখই-তো পৃথিবী, তাকে অবহেলা করতে নেই। একটু থেমে আবার বললে : আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে যাব না, আর আজীবন তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকব, আমাকে সত্যপথের সন্ধান দিলে বলে।

এলোমেলো কালো আর কুঞ্চিত চুলের রাশি সংযত করে পূর্ণ ও স্থিরদৃষ্টিতে কতক্ষণ নারী তাকে চেয়ে দেখলে, তারপর আচমকা তার কপোল রাঙা হয়ে এল, রক্তিম অধরের প্রান্তে একটুখানি মধুর হাসি ফুটে উঠল।

ছেলেটি সে-হাসি চেয়ে দেখলে তারপর সঙ্কীর্ণ গবাক্ষ দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলে যে মেঘের ফাঁকে রোদ উঠেছে, দেখে হঠাৎ উঠে পড়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল, চাইলে না কোনো দিকে, শুনলও না কোনো কথা, হাওয়ায় আবার চুল উড়তে লাগল, চোখে আগুন উঠল জ্বলে।

চলতে-চলতে শুধু বড় ফটকের কাছে সে থামলে একবার। ফটকের এক প্রান্তে যে বৃদ্ধাটি কুঁকড়ে শুয়ে ছিল আর রোগের যাতনায় আর্তকণ্ঠে গোঙাচ্ছিল, তাকেই কতক্ষণ সে নীরবে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল ও তার আর্তধ্বনিতে ভরে তুলতে লাগল তার দুটি কান। পথ চলা তার বন্ধ হয়ে গেল, বরঞ্চ সে বৃদ্ধার পাশেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল : বসার ভঙ্গিতে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সংযম। শেষে হঠাৎ সে কয়ে উঠল :

—বল, কী তোমার সত্য? যা তোমার সত্য, তা-ই আমি নির্বিবাদে মেনে নেব, আর চাইব না কোনো দিকে, শুনব না কোনো কথা।

বৃদ্ধার ঠোঁট কাঁপছে। একটা তীব্র যাতনায় ওর সারা মুখ হঠাৎ বিষিয়ে উঠল, কোটরগত

চোখদুটো বুজে সে কয়েকবার ধুঁকল, তারপর অতি ক্ষীণকণ্ঠে বললে :—দুঃখ! বাবা, দুঃখ ছাড়া দুনিয়াতে আর কিছু নেই, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু দুঃখ। পিঠ হতে ছেলেটি পুঁটলি নাবালে, তার ভেতর থেকে লাল রেশমের থলে বের করে সে-থলে হতে একটা স্বর্ণমুদ্রা তুলে নিয়ে সে বৃদ্ধার হাতে দিলে, বারেবারে তার চোখ জলে ভরে আসছে। আকাশের পানে পাণ্ডুর চোখ মেলে অস্ফুট কণ্ঠে বৃদ্ধা কী যেন বললে ছেলেটি বুঝতে পারলে না, কিন্তু তার পানে চেয়ে সে যখন কম্পমান গলায় বললে :

—আমাকে যেমন তুমি খুশি করলে, খোদাও যেন তোমাকে তেমনি খুশি করেন।

তখন ছেলেটির সজল চোখে হঠাৎ ছায়া ঘনিয়ে এল, তার বাঁকা ও শিথিল মেরুদণ্ড ঋজু হয়ে উঠল, আহত চোখ মেলে কয়েক মুহূর্ত সে এধার-ওধারে তাকিয়ে এক সময়ে উঠে পড়ে দ্রুত পায়ে পথ চলতে শুরু করে দিলে : তার হাতে লাঠি, পিঠে পুঁটলি।

পায়ের তলার জমি ক্রমশ লালচে আর ঊষর হয়ে উঠছে, তাই হঠাৎ থেমে পড়ে সম্মুখের দিগন্তবিস্তৃত তরুলতাশূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তরের পানে আবছা দৃষ্টিতে চেয়ে ছেলেটি ভাবতে লাগল। এমনি সময় কে যেন বাঁ-দিক হতে তাকে মিষ্ট গলায় ডাকলে। সে চেয়ে দেখলে অদূরে একটা পল্লবঘন ছায়াতরু, আর সে-গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কে যেন এক অবগুণ্ঠিতা। কাছে গেলে সে তাকে সবুজ গালিচায় বসালে, স্বচ্ছ রঙিন কাচের পাত্র করে শীতল পানীয় দিলে, দিয়ে চামর নেড়ে হাওয়া করতে-করতে অবগুণ্ঠনের আড়াল হতেই মৃদু মধুকণ্ঠে অচেনা কোন স্বপ্নিল সুরে গান গাইতে থাকল। আর তাইতে ছেলেটির কপালের ঘাম শুকিয়ে উঠল, জ্বালাময় দৃষ্টি এল সংযত হয়ে, অল্প বিস্ময়ের ভাব জাগল ঠোঁটের রেখায়। তারপর একসময়ে সে তার পানে শিশুর মতো চোখ মেলে চেয়ে শুধোলে :

—কে তুমি? তোমার ঘোমটা খোল, তোমাকে আমি দেখব।

অবগুণ্ঠনের আড়ালেই মেয়েটি মাথা নাড়লে; হেসে বললে :

—না, আমাকে তুমি নাই-বা দেখলে। বলে সে একটা শুভ্র কোমল ছোট হাত তার পানে বাড়িয়ে দিয়ে কেমন এক রহস্যময় শব্দে হেসে উঠল, সে-হাসি যেন পরীদের ডানার আওয়াজ, যেন ঘুমন্ত নারীর অস্ফুট স্বপ্নময় হাসি। অমনি করে সে হাসলে, তারপর বললে :

—তোমার রিক্তমুখ আর অশান্ত চুল দেখে আমার তোমাকে ভালো লেগেছে। তোমাকে আমি স্নেহসুধা দেব। তোমাকে আমি ভালোবেসেছি।

তার কথা তার ভাষা ছেলেটি যেন বুঝলে না, শুধু তার কোমল মধুর স্বপ্নিল কণ্ঠে, নরম উষ্ণ হাতের মৃদু স্পর্শে, দেহের অপরিচিত ম্লান স্নিগ্ধ গন্ধে ছেলেটির চোখদুটি মায়াময় হয়ে উঠল, তার চোখদুটিতে যেন প্রভাতের-প্রশান্ত পবিত্র অস্পষ্টতা জেগে উঠল ধীরে-ধীরে, আর কুঞ্চিত ঠোঁট ব্যাকুলতায় শিশুর ঠোঁটের মতো ফুলে উঠল। কখনো তার কানের কাছে সরে এসে অবগুণ্ঠিতা অচেনা-অজানা সেই সুরে রহস্যময় দুর্বোধ্য গান গাইছে, কখনো কোমল হাতে তার মাথার এলোমেলো চুল বুলিয়ে দিচ্ছে, কখনো-বা দূরে সরে গিয়ে অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকেই শান্ত সাগরের ঢেউয়ের মতো অতি দীর্ঘ তালে ক্ষীণতম নূপুরের ধ্বনি করে নাচছে, আর দেহের রেখা রেখায়িত হয়ে উঠছে অবগুণ্ঠনে। এবার সে আবার গালিচায় এসে বসলে, বসে ছেলেটির মাথা আস্তে কোলে তুলে নিয়ে কোমল আঙ্গুল দিয়ে একবার তার শুষ্ক ঠোঁটটি ছুয়ে হাসতে লাগল ঝরনার মতো; তারপর বললে :

—তোমার অন্তর আর আমার অন্তর এক হয়ে মিশে গেল, এ যেন দু-নদীর ধারার মিলন।

ছেলেটি বললে : তোমার কাছে আমি উপযুক্ত সাজে আসতে পারি নি, আমাকে মাপ কর।

তোমার সাথে দেখা হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত বিফলে ব্যয়িত হয়েছে।

এমনি সময়ে পূর্ব-দিগন্তে ধুলোর মতো কী উড়তে দেখা গেল, যেন মেঘ উঠছে। অবগুণ্ঠিতা হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে উঠল, ধুলো উড়িয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসছে দস্যুর দল। মেয়েটির কণ্ঠ ঘন হয়ে এল, আর তাইতে বুঝে লালিত্যও এল সংক্ষিপ্ত হয়ে, তার কোমল শুভ্র আঙ্গুলের ডগা কাঁপতে শুরু করল। কিন্তু মায়াময় চোখে দূরের পানে চেয়ে প্রগাঢ় নির্লিপ্ত কণ্ঠে ছেলেটি বললে :

—সত্য লাভ করেছি, তাই আর ভয় করিনে কাউকে; আমার আর মৃত্যু নেই। তোমার কণ্ঠে, তোমার স্পর্শে তোমার সুধায় আমি সত্য জেনেছি : তুমি সত্যরূপিণী, তুমি নির্বিশঙ্ক, তুমি অক্ষয়।

কিন্তু হঠাৎ নীরবতার মাঝে খানিক পরে নূপুরের চঞ্চল নিক্কণ জেগে উঠল, তাকে ছায়াতরুর ছায়ায় ছেড়ে দ্রুতপায়ে অবগুণ্ঠিতা চলে গেল; যাবার সময়ে তার অবগুণ্ঠন খসে পড়ে পেছনে লুটিয়ে পড়ে রইল, সেটা তুলে নেবার সময় তার হল না!

বিস্তৃত ঊষর প্রান্তরের পানে চেয়ে ছেলেটার মায়াময় চোখে হঠাৎ ছায়া ঘনিয়ে এল, কোমল গালিচা ছেড়ে সে উঠে পড়ে কয়েকবার ব্যথিত ও করুণ দৃষ্টি মেলে এধারে-ওধারে চেয়ে এক সময়ে মাথা নিচু করে ঝড়ের মতো বিপরীত পথে চলতে শুরু করে দিলে, হাতে তার লাঠি, পিঠে পুঁটলি।

রাজপথের ধুলোয় একটি শিশু গড়াগড়ি যাচ্ছে দেখে ছেলেটি থমকে দাঁড়াল। আশপাশে চেয়ে দেখলে কেউ কোথাও নেই, শুধু ওপরে বিশাল নির্মল নীলাভ আকাশ। ছেলেটিকে দেখে কোনো কথা নেই; হঠাৎ হাসলে শিশুটি—অতি মধুর সে-হাসি, আর সে যখন হাসল তখন লাল ঠোঁটের তলায় দুটো ছোট সুন্দর দাঁত উঁকি মেরে উঠল। পথের ধুলোয় তার দেহ আচ্ছন্ন, রেশমের মতো হালকা লালচে চুলও ভরে গেছে ধুলোতে।

পিঠের পুঁটলি হতে ছেলেটি একটা ভারি সুন্দর ঝুনঝুনি বের করে হাত নেড়ে ক'বার বাজিয়ে তার রাঙা হাতে তুলে দিয়ে গালটা একটু টেনে তার পাশেই ধুলোর ওপর সে বসে পড়লে। শিশুর মুখের আধো-আধো মিষ্টি কথায় তার কান আর মন ভরে এল, চোখ কোমল ও পবিত্র হয়ে এল তার মধুর হাসিতে, নিরঞ্জন চাউনিতে। ছেলেটির হৃদয় থেকে-থেকে হঠাৎ এমন আবেগে উথলে উঠতে লাগল যে সে তাকে বুকে চেপে ধরে চুমোয়-চুমোয় ওর মুখ-চোখ সিক্ত করে দিতে লাগল, আবার কখনো গভীরভাবে সমগ্র অন্তর দিয়ে শুনতে লাগল তার মুখের অর্থহীন শব্দের ঢেউ। এবার একটু হেসে শিশু উঠে পড়ল, তার পিঠের কাছে সরে এসে পুঁটলিটি নাবালে, নাবিয়ে তাতে কোমল ও কচি হাত ঢুকিয়ে এটা-সেটা বের করতে লাগল, কিছু ছড়াতে লাগল ধুলোয়, কিছু রাখল হাতে, আর তার চঞ্চল আঙ্গুলগুলোর পানে চেয়ে-চেয়ে ছেলেটি মুগ্ধ হয়ে গেল, সে-গুলোর পানে চেয়ে রইল নিষ্পলক নেত্রে।

তারপর ডান হাতের মুঠোয় কী যেন লুকিয়ে আর সব ফেলে রেখে শিশুটি হঠাৎ ছুটে দূরে গিয়ে দাঁড়াল, হাত নেড়ে মধুরভাবে হেসে জানালে যে, যা সে নিয়েছে তা আর কখনো ফিরিয়ে দেবে না! ছেলেটি হাতে ডাকলে, কাতরকণ্ঠে বললে : এস, এস আমার কাছে। আমার যা-আছে সব তোমায় দিয়ে দেব, কিছু আর চাইনে। হঠাৎ ছেলেটি যেন মানুষের মতো কথা কইতে আরম্ভ করলে, বললে :

—আমাকে শিশু ভেবেছ তুমি? আমি শিশু নই, আমি মানুষ। শিশুর দেহে মানুষের মনকে বন্দি করে রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আমার মধ্যে নিরন্তর মুক্তি প্রয়াস চলছে। মুক্তি না-আসা পর্যন্ত আমার মনের হীনতা ঘুচবে না, ঘোচাতেও চাইনে। বলে সে ছুটতে লাগল, পেছনে যে-ধুলো উড়ল সে-ধুলোতেই সে মিলিয়ে গেল, আর দেখা গেল না তাকে।

রাজপথের প্রান্তে একাকী ছেলেটির নিষ্কলঙ্ক-নির্বোধ চোখে হঠাৎ ছায়া ঘনিয়ে এল,

ব্যর্থতার আঘাতে মাথা নুয়ে এল, তবু সে জোর করে উঠে দাঁড়িয়ে নীরবে পথ চলতে শুরু করলে, পিঠের পুঁটলি ধুলোতেই রইল পড়ে : হাতে তার লাঠি, আর পিঠ খালি।

ছেলেটির চোখের সমস্ত জ্বালা সমস্ত দীপ্তি যেন ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার মুখের প্রতিটি রেখা কালো ও গভীর হয়ে উঠল, ঝড়ের মতো চলা শ্লথ হয়ে এল, দৃঢ় ও ঋজু দেহ বাঁকা ও অসংযত হয়ে উঠল।

কিন্তু প্রান্তরের প্রান্তবর্তী ছায়াতরুর সেই অবগুণ্ঠিতা যখন এল, তখন তার চোখের সেই দীপ্তিহীন নিষ্প্রভ ছায়াও নিঃশেষ হয়ে গেছে, মৃত্যুর ভাবশূন্য অর্থহীন আবরণ তাকে আবৃত করে ফেলেছে। অবগুণ্ঠিতা গুণ্ঠন মোচন করলে, ছেলেটির বুকের কাপড় সরিয়ে দেখলে সেখানে একটি ছোরা আমূল বিঁধিয়ে দেয়া হয়েছে, দেখে হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

ওপরের আকাশে ধূসরতা, বিরাট নিঃসঙ্গতার নিবিড়তা। তার তলায় মেয়েটির চোখের জল ক্রমে ফুরিয়ে এল, বেদনার ঢেউ শান্ত হয়ে এল, আঁচলে চোখ মুছে সে নীরবে উঠে দাঁড়াল; আরেকবার নিচু হয়ে শেষদেখা-দেখে যখন সে সামনের পানে মুখ তুলে চাইলে, তখন দেখলে অদূরের একটি ছোট গাছে ফুল ধরেছে অজস্র, বিচিত্র সেগুলোর রং দেখে তার অধরের প্রান্তে হঠাৎ অতি মৃদু অতি উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠল, নয়নে এল চাঞ্চল্য। দ্রুতভঙ্গিতে মাথায় অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে পায়ে নূপুরের ঝঙ্কার তুলে লঘুপায়ে সে এগিয়ে গেল সম্মুখপানে, পেছনে আর তাকালে না।

মাঘ ১৩৪৯ জানুয়ারি ১৯৪৩

দ্বীপ

কালো গভীর চোখের তন্দ্রার মতো ম্লান কোমলতা দ্বীপের সবুজ রঙে নিবিড় হয়ে উঠেছে। এখন অপরাহ্ণ : সাগরের বুকে হাওয়া থেমে গেছে, নারকেলগাছের পাতাগুলো ঝুলে পড়েছে। সৈকতে যে-নীলজল ক্ষীণ হয়ে ভেঙে পড়ছে তার আওয়াজ নম্র হাওয়ার মতো, আর তার হালকা রঙে দূর হতে দেখা বনানীর অস্পষ্টতা। প্রশান্ত মহাসাগরের অতলতা ওপরে উঠে এসেছে, তাই দূরবিস্তৃত জলরাশি যেন বরফের মতো জমাট বেঁধে গেছে, কোথাও কোনো কম্পন নেই, কোনো শব্দও নেই।

এ-বিরাট বিচিত্র মহাসাগরের প্রান্তবর্তী জলে পা ছড়িয়ে বালুর ওপরে শুয়ে ক'টা নগ্নদেহী পুরুষ ও নারী হালকা নীল আকাশের পানে চেয়ে নিশ্চল হয়ে রয়েছে। তাদের দেহের রং 'কারারা' মর্মরের মতো শুভ্র; দেহগুলো বাইরের মাটির মতো নরম, ভেতরে পাথরের মতো কঠিন। এখন তাদের শুভ্র দেহগুলোতে লালচে আভা পড়েছে, তাদের নিস্তরঙ্গ চোখগুলো হালকা হলদে হয়ে উঠেছে, কনীনিকাগুলো ধূসর। তাদের চোখ বড়-বড়, গোল ও 'লাগুনের' মতো, বাইরে ঘুরে-ঘুরে স্রোত উত্তাল হয়ে উঠলেও সেগুলো স্তব্ধ নিথর; সে-চোখের পক্ষ্মগুলো যেন নারকেলগাছের পাতা, তেমনি ঘন, সরু ও দীর্ঘ, এবং তেমনি বাইরের হাওয়ায় দোলে, কাঁপে।

পশ্চিম দিগন্ত ছুঁয়ে লাল সূর্য, পূর্ব দিগন্ত ছুঁয়ে অতি অস্পষ্ট আলো। এরা উঠে পড়ল। দীর্ঘদেহী লোকটি পশ্চিম দিগন্তের পানে তাকাল বলে তার চোখের তারায় গাঢ় লাল সূর্য সূচ্যগ্রের মতো প্রতিফলিত হল; তার চোখের মধ্যে সূর্য প্রতিচ্ছায়া দেখল, দুজনার মধ্যে কথা হয়ে গেল, যে-কথার কোনো ভাব নেই। ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি পেছনে মাথা হেলিয়ে এলোচুল নাড়ল, আর সে-কালো চুলগুলো অন্ধকারের স্রোতের মতো কেঁপে উঠল।

তারপর পশ্চিমদিকে মুখ করে ওরা জলের প্রান্তে হাঁটু গেড়ে বসল, সূর্য থেকে তাদের বরাবর যে-রক্তিম পথ সৃষ্টি হয়েছে, সে-পথ বেয়ে ওদের নিস্তরঙ্গ চোখের শূন্যদৃষ্টি চলে গেল সূর্যের কাছে, আর সূর্য তাদের কাছে পাঠিয়ে দিল বহ্নিহীন সংযত আগুনের রক্তিমতা। সূর্য তখন আধখানা ডুবল; তখন ওরাও উবু হয়ে মুখ ডুবালে সাগরের জ্বলে। সাগরের জল এগিয়ে এসে তাদের মুখ তাদের চুল ছুঁয়ে পিছিয়ে গিয়ে আবার পরক্ষণেই এগিয়ে আসছে সাগরের ভাষাহীন অতল স্পর্শ নিয়ে, মৃদুভাবে ছলছল করে উঠছে কানের কাছে, শিরশির করে ঘাড় বেয়ে পিঠ বেয়ে নেবে যাচ্ছে। কিছু তারা কইল না, কারণ তারা কথা কইতে জানে না, কোনো ভাবও তাদের অন্তরে জাগল না, কারণ তাদের অন্তরে কোনো ভাব নেই। তাদের অন্তর অসীম শূন্যের মতো শূন্য, এ-বিশাল অতল সাগরের মতো অচেতন। মর্মরের মতো সাদা সক্রিয় দেহ তাদের আছে, মন নেই।

মেয়েদের চোখ লাল হয়ে উঠল পুরুষদের ভ্রূ ঝুলে পড়ল। এবার তারা উঠে ফিরে দাঁড়াল পূর্ব দিগন্তের পানে, যে-দিগন্ত পেরিয়ে তখন অস্পষ্ট আঁধার পেছনে নিয়ে ঈষৎ লালচে বৃহৎ চাঁদ উঠেছে। ওদের চোখ আবছা হয়ে এল, ওদের নাকের নিচে ও ভ্রূর আর গলার তলায় কোমল ধূসর ছায়া জমে উঠল, দেহের রেখা অস্পষ্ট হয়ে এল। তাদের নিষ্কম্প চোখের তারা, সে-চোখের গভীরতা, আর সে-গভীরতায় পথ খুঁজছে চাঁদের অস্পষ্ট আলো, এবং সে-আলোয় পথ চিনতে পেরে তাদের দৃষ্টি তাদের অন্তরে গিয়ে পৌঁছছে, যে-অন্তর শূন্যের মতো শূন্য।

সাগরের বুকে চাঁদের রুপালি পথ ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে, চাঁদ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, আর চারপাশের ধূসরতা ক্রমে-ক্রমে হালকা হয়ে আসছে। কাছের গাছগুলোর পাতায় হঠাৎ অতি ক্ষীণ মর্মরধ্বনি জাগল, এবং সে-মর্মরধ্বনির মধ্যে দুটি মেয়ে মাথা হেলিয়ে সাগরের পানে চাইল : দূর হতে নীল সাগরের বুক বেয়ে ঘুম আসছে, আবছা তার রং, স্বপ্নময় তার বিস্তৃতি, অবসাদে মন্থর তার চলা। সে ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি পেছনে মাথা হেলিয়ে আবার চুলগুলো নাড়ল, দীর্ঘদেহী লোকটি চাইলে ওপর পানে, তারপর মাটিতে মৃদু আওয়াজ করে তারা চলতে শুরু করে দিলে। দ্বীপের ঘনবর্ণের ওপর সাদা ক্রিমের মতো জোছনার প্রলেপ, আর নারকেলগাছের ঝুলে-পড়া পাতাতে রুপালি আলোর তলোয়ার। আকাশে কুয়াশার মতো অস্পষ্টতা—বিরাট রহস্যময় অস্পষ্টতা, আর অদ্ভুত শুভ্রতা, যে-শুভ্রতায় এবার চাঁদের নীরব নিঃসঙ্গ পরিক্রমা শুরু হয়েছে, যে-শুভ্রতায় জড়িয়ে সাদা মর্মরের মতো লোকগুলো ক্রমে-ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে সেই দ্বীপের ঘনবনে, যে-বনের রং ওদের চোখের তারার মতো কালো, যে-কালো এবার আলোতে আরো নিবিড় নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠেছে।

ঘাসের ওপর শায়িত 'কারারা'-মর্মরের মতো দেহগুলো ঘুমে আচ্ছন্ন, শুধু একটি সম্মিলিত শ্বসনের অস্ফুট শব্দ প্রগাঢ় নীরবতার গায়ে বাজছে, যেন পৃথিবীর দেহ ঘিরে হাওয়া বইছে। কিন্তু সে-দেহগুলোর মধ্যে একটি দেহে ঘুম নেই, সে-দেহটি একটি কিশোরী মেয়ের। কাছাকাছি একটা বৃহৎ বৃক্ষের পল্লবঘন শাখার অন্তরালে যে-বিশাল কালো পাখিটি রাতে এসে আশ্রয় নেয়, তার ডানার আওয়াজ থেকে-থেকে শোনা যাচ্ছে। সাগরে আজ কল্লোল নেই, আকাশে আজ ভরা জোছনা। সেই চাঁদের আলো হয়তো হঠাৎ সে-অতন্দ্র মেয়েটিকে বাইরে ডাকলে, সে-বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু তার অন্তরের শূন্যতায় ঢেউ জাগল না, বিশাল রহস্যময় আকাশের ঠিক মাঝখানে যে-বিস্ময়কর বৃহৎ স্নিগ্ধ চাঁদ উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, সে-চাঁদের পানে চেয়ে ঘাড়ে মাথা হেলিয়ে ঋজু হয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল। তার নিস্তরঙ্গ শান্ত চোখে আলো চকচক করতে থাকল, তার ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে গেল; চেয়ে-চেয়ে তার ঘাড় হয়তো ব্যথা করে উঠল, তবু তার ঋজু দেহে কোনো চাঞ্চল্য নেই। স্রোতোহীন জোছনায় ও প্রগাঢ় নীরবতায় সে-বিশাল পাখিটি আবার হঠাৎ কেমন করে ডানা ঝটপটিয়ে উঠল, গাছের ডালপালা নড়ে উঠল, চাঁদের আলো কেঁপে উঠল।

তারপর মেয়েটি আবার ফিরে এল ঘুমন্ত দেহগুলোর মাঝে, যে-দেহগুলোর ওপরে পাতার

চাঁদোয়া আর নিচে কালো সরু ও কোমল ঘাস, আর প্রগাঢ় নিস্পন্দতা।

এবার ঘুম এল মেয়েটির চোখে। আর বাইরে চাঁদের আলোর গুণ্ঠনের তলে সাগরও ঘুমিয়ে রইল।

এর পরদিন অপরাহ্ণে ঝরঝরে বালুর মাঝে স্থির-পা ফেলে সে-মেয়েটি হাঁটছিল দিগন্তের পানে চেয়ে। সাগরে জোয়ার আসছে, ক্রমে-ক্রমে সৈকত ভরে উঠছে। মেয়েটি থামলে। থেমে চেয়ে দেখলে ছোট সংযত ঢেউগুলোর পানে, যে-ঢেউগুলো সাপের মতো গড়িয়ে-গড়িয়ে তার পানে এগিয়ে আসছে আর কলকল করে অতি মৃদু আওয়াজ করছে। ক'পা এগিয়ে আবার থেমে সে ঢেউগুলোর পানে চাইল। ছোট পিচ্ছিল সংযত ঢেউ, যে-ঢেউয়ের গায়ে আবার আড়াআড়িভাবে অতি সরু চিকন ঢেউয়ের মালা। অদ্ভুত সেই ঢেউগুলো, কোথাও কোনো উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু এগিয়ে আসছে অন্ধ সাপের মতো গড়িয়ে-গড়িয়ে : দীর্ঘ-দীর্ঘ সাপ, রেখান্বিত ভয়াবহ সাপ। মেয়েটি দেখছেই চেয়ে-চেয়ে, তার চোখের তারা স্থির নিষ্কম্প, তাতে কোনো বিস্ময় বা কোনো কথা নেই।

তারপর একসময়ে মেয়েটি অতি তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল, ক্ষিপ্রভাবে সরু হাতদুটি দিয়ে চোখ ঢেকে ক্ষণকাল পরে আবার সে চোখ মেলে চাইল ঢেউগুলোর পানে, যে-ঢেউগুলোর চলা সংযত আর যে-সংযত ভাবের পেছনে বিশাল প্রতারণা, বিরাট অস্তিত্ব ও বিপুল শক্তি। মেয়েটি আবার চেঁচিয়ে উঠল, তার শান্ত চোখময় এমন ভয় জাগল যে তার তুলনা নেই; তার কণ্ঠে সৈকত ভরে উঠল, অপরাহ্ণের তন্দ্রার মতো ম্লান আলো চঞ্চল হয়ে উঠল। সে আর একা থাকতে পারল না, দূরে যেখানে দীর্ঘদেহী লোকটি তার শান্ত শুভ্র দেহ কোমল ঘাসে বিস্তৃত করে অনুজ্জ্বল আকাশের পানে চেয়ে ছিল, সেখানে সে ছুটে গিয়ে তাকে দু-হাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। লোকটি তাকালে না তার পানে বা গায়ে তার হাত রাখলে না : তার 'লাগুন' চোখ নিস্তরঙ্গ; ওপাশে দুটি মেয়ে পিঠে কালো চুল ছড়িয়ে বসেছিল নিশ্চল হয়ে, তারাও তাকালে না তার পানে। মেয়েটির ভয় হাওয়া-হয়ে তার অন্তরের শূন্যতায় ক্রমে মিলিয়ে এল, কান্না তার থেমে গেল আপনা থেকেই।

ওদের মতো মেয়েটিরও চোখে নিস্তরঙ্গতা ছিল, কিন্তু এবার ভয়ের দোলায় সে-নিস্তরঙ্গতা ভেঙে গেল। ওর শান্ত চোখে এই চাঞ্চল্য তার জীবনে প্রথম, এবং এদের মধ্যেও প্রথম। ওরা কখনো ভয় পায় না, মেয়েটি ভয় পেলে; ওরা কখনো কাঁদে না, মেয়েটি কাঁদলে। ওর অন্তর আর ওদের অন্তরের মতো শূন্য রইল না, সে-শূন্যতায় তারার জন্ম হল।

রাতে যে-পাখিটি বৃহৎ বৃক্ষটির পল্লবঘন শাখায় আশ্রয় নেয় ও ডানা ঝটপট করে, সে-পাখিকে মেয়েটি উড়ে আসতে দেখল সাগরের ওপর দিয়ে। বিরাট তার কালো ডানা, তীক্ষ্ণ তার সূচাল ঠোঁট, আর তার ওড়ার আওয়াজ সাগরের মতো। দেখে মেয়েটি ভয় পেলে, তার চোখ মুদে এল।

গভীর রাতে ওদের সবার দেহে ঘুম নেবেছে, কিন্তু মেয়েটির চোখদুটো খোলা। বাইরে বিচিত্র বিশাল আকাশ অদ্ভুত চাঁদের আলোয় ঘনায়মান, আর যে-প্রগাঢ় নীরবতা সে-চাঁদের আলোয় জড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সে-নীরবতার মধ্যে অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে : সে-গোঙানি সাগরের কল্লোল। পল্লবের আড়াল হতে বৃহৎ পাখিটি তার কালো ডানা ঝটপটিয়ে উঠল, সাথে-সাথে কঁকিয়ে উঠল তীক্ষ্ণভাবে, আর তা-শুনে মেয়েটি আবার ভয় পেলে, কাছাকাছি যে-ছেলেটি নিশ্চল হয়ে ছিল গভীর ঘুমে, তার পাশে সে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেল। 'কারারা'-মর্মরের মতো শুভ্র দেহটি কোমল ও শীতল, এবং সে-দেহের ওপর মেয়েটি তার হাত রাখলে। রেখেই কেমন আরাম লাগল, পাখিটি আবার কঁকিয়ে উঠল বটে, কিন্তু এবার সে আর ভয় পেলে না।

সে-রাতে মেয়েটির চোখে ঘুম নাবল না। তার অন্তরের শূন্যতায় কুয়াশা জমেছে, ঘুমন্ত ছেলেটির দেহের ওপর হাত রেখে সে-কুয়াশার জালে আচ্ছন্ন হয়ে রইল, মন না ঘুমোলেও তার দেহ হয়তো ঘুমোল। তার নতুন জন্মলাভ ঘটেছে : এতদিন তার দেহ ছিল, মন ছিল না। এতদিন নদীর শূন্য খাদ ছিল, এবার সে-খাদ বেয়ে জলের বন্যা এল, আর সে-বন্যার কলরবে তার মন মুখরিত হয়ে উঠল। তার অন্তরে ভাবের স্রোত বইতে শুরু করল।

মনের শূন্য খাদে বন্যা এল। কিন্তু বন্যার অশান্ত দুর্বার জলস্রোতের আঘাতে ও কল্লোলে মেয়েটির মন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, তার সমস্তটা গেল গুলিয়ে। মনকে সে আর ধরে রাখতে পারলে না, সে-তীব্র স্রোতে তার মন ভেসে গেল, তলিয়ে গেল। কিন্তু ক্রমশ বন্যার জল শান্ত হয়ে এল, জলের ধারারেখা নির্ণীত হল, ধীরে-ধীরে কলরবও এল থেমে, এখন মেয়েটির অন্তরে বিস্ময়ের জন্ম হল।

সেই ভয়-পাওয়া তার শূন্য মনের বাঁধের প্রথম ভাঙন। তখন মনে এসেছিল ভয়, তারপর সুপ্ত ছেলেটির দেহস্পর্শে এল আনন্দ, আনন্দের আবর্তের পর এল বিস্ময়।

মেয়েটি বিস্মিত হল। বাইরের অসীম জোছনায় তার চোখ আপ্লুত হল বলে সে বিস্মিত হল, আশপাশের ঘুমন্ত রহস্যময় শুভ্র দেহগুলোর পানে চেয়ে সে বিস্মিত হল, অবশেষে তার চরম বিস্ময় হল নিজের দেহের পানে চেয়ে। তার যে-হাতটি ছিল ছেলেটির দেহের ওপর, সে-হাত সে গুটিয়ে নিলে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে তার সঙ্কুচিত হাত বিস্তার করে অতি আলগোছে আঙ্গুলের প্রান্ত দিয়ে ছুঁলে ছেলেটির দেহ, যে-দেহ কোমল ও শুভ্র প্রাণময় ও শীতল। সে-শীতলতা সে আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করলে নিবিড়ভাবে।

অল্পক্ষণ পর সে ধীরে-ধীরে ছায়ার মতো বেরিয়ে এল, বেরিয়ে এল, বাইরের পূর্ণ জোছনায় ও অসীম আকাশের তলে; দিগন্তে হেলে-পড়া বিচিত্র ম্লান চাঁদের পানে চেয়ে অনুভূতি-তরঙ্গিত মন নিয়ে সে নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে-আকাশের তলে, রাত্রির নিঃশব্দতায় আচ্ছন্ন হয়ে এল তার দেহ। ঘুমন্ত নিস্পন্দ রাত্রি তাকে নতুনভাবে জাগিয়ে তুলল, জাগ্রতের চেতনা এনে দিল তার মনে। চাঁদ হতে চোখ ফিরিয়ে সে দিগন্ত থেকে দিগন্তে, তারা থেকে তারায় তাকাতে থাকল, বিশ্বময় তার বিস্ময়বিভ্রান্ত দৃষ্টি পরিক্রমা করতে থাকল, তবু তার বিস্ময়ের অন্ত নেই, ক্রমে-ক্রমে বিস্ময় যেন তার মনে সাগরের মতো প্রসারিত ও গভীর হতে লাগল। আবার তার মন ভেসে গেল, বিস্ময়ের ঢেউয়ের দোলায় হারিয়ে গেল। কিন্তু উজান বেয়ে ধীরে-ধীরে উত্তরঙ্গ স্রোত ঠেলে সে-মন আবার ফিরে এল, ফিরে এল পঙ্গু-জীর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে, আঘাতে জর্জরিত হয়ে, এসে অবসাদে ধুঁকতে থাকল।

বিশাল আকাশের তলে সে আর থাকতে পারল না, চাঁদের পানে যতবার সে চোখ তুলে চাইল, তার চোখ আহত হল, অনন্ত শূন্যতার পেষণে তার সঙ্কীর্ণ মন হাহাকার করে উঠল। সে আবার ছুটে ফিরে এল পল্লব-চাঁদোয়ার নিচে, 'কারারা'-মর্মরের মতো শুভ্র দেহগুলোর মাঝে, তাদের নিস্পন্দ প্রগাঢ় ঘুমের ঘনছায়ায়। তাদের মাঝেই সে শুল, শুয়ে শক্ত করে চোখ ঢেকে রাখল তার কম্পমান হাত দুটি দিয়ে, নিচে ঠোঁট কাঁপতে থাকল।

তারপর এক-সময়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। সে-ঘুম ধূসর অস্পষ্ট পাখা মেলে এল তার দেহ আচ্ছন্ন করে, কিন্তু তার চেতনা রহস্যময় স্বপ্নের পদসঞ্চারে সজাগ হয়ে রইল : ঘুমের মাঝেও তার বিস্ময়ের অন্ত নেই।

সকালবেলায় সে চোখ মেললে, ধীরে অতি-ধীরে, পদ্মের পাপড়ি খোলার মতো; সূর্যের সোনালি আলো তার ঈষৎ রক্তিম চোখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চারধারে সে চাইলে, কাউকে কোথাও দেখতে পেল না; চাইলে বাইরের পানে, সেখানে দেখলে সূর্যের আলোর ঝলমল-করা তরঙ্গ। তারপর সে নিজের দেহের পানে চাইল, মাথার চুলগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখল, শেষে প্রশান্ত চোখে ঘাড়-হেলিয়ে তাকাল বাইরের গাঢ় নীল ও লাল রঙের 'ফুলন্ত' ফুলগুলোর পানে আর সবুজ রঙের পাতার পানে। চেয়ে হঠাৎ তার মুখের পেশিগুলো কুঞ্চিত ও ঈষৎ প্রসারিত

হয়ে উঠল, তার মুখের গর্ত হতে কেমন একটা স্বচ্ছ আওয়াজ বেরিয়ে এল, সে-আওয়াজ ঝরনার মতো। সে হাসল, হেসেই বিস্মিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল; আবার যখন হাসল তখন হেসে কেমন আনন্দ পেল, চঞ্চল সূক্ষ্ম সুড়সুড়ি-দেয়া আনন্দ। যে-দিকেই সে চাইল সে-দিকেই সূর্যের আলো ঝিকমিক করে উঠল, তুলোর মতো, ফেনার মতো আনন্দ তার অন্তরে উচ্ছল হয়ে উঠল। জগৎকে তার ভালো লাগল।

যে-অকথিত অব্যক্ত আনন্দ তাকে ঝরনার মতো ঝরঝরে করে তুলেছে, হাওয়ার মতো হালকা করে তুলেছে, সে-আনন্দ কাউকে জানাবার বাসনা জাগল। উঠে পড়ে সে ছুটল, সবুজ দ্বীপময় ঝলমল-করা সূর্যের আলোর মধ্যে দিয়ে সে শিখার মতো ছুটল। ক্ষেতের কিনারে ওরা সব যেখানে ফসল নিয়ে ব্যস্ত সেখানে গিয়ে সে দীর্ঘদেহী লোকটিকে জড়িয়ে ধরে খিলখিল করে হাসতে থাকল, মুখ চোখ সে-হাসিতে ঝিকমিক করতে থাকল। দীর্ঘদেহীর নিস্তরঙ্গ 'লাগুন' চোখদুটি তার পানে তাকাল বটে, কিন্তু তাতে কোনো ঢেউ লাগল না। মেয়েটি তার হাত ধরে টানলে, তারপর একহাত তুলে আঙ্গুল দিয়ে দিগন্তের পানে ইঙ্গিত করে হাসল, আকাশের পানে ইঙ্গিত করে হাসল, বিচিত্র বর্ণের ফুলগুলোর পানে ইঙ্গিত করে হাসল, তবু দীর্ঘদেহীর 'লাগুন'-চোখ ঢেউশূন্য, নিথর ও নিস্পন্দ। আর যারা ছিল কাছাকাছি, তারা কেউবা হয়তো মুখ তুলে চেয়ে দেখলে মেয়েটিকে, কিন্তু তাদেরও চোখ তেমনি শান্ত ও ভাষাশূন্য।

ব্যর্থ হয়ে মেয়েটির অন্তরে আরেকটি নতুন ভাবের জন্ম হল। তার মনে যেন মেঘ করে এল, যে-দিক পানেই সে তাকাল সেদিকেই সে ম্লান ছায়া দেখল : সে দুঃখ পেয়েছে। তার মনে বেদনাময় ঢেউ জাগল, সে-ঢেউ যেন আহত জন্তুর মতো কুঁকড়ে গড়িয়ে বয়ে যেতে লাগল আর যাতনায় গোঙাতে থাকল।

মেয়েটি কাঁদল। তার চোখ হতে গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, এবং সে-জল দেখে সে হঠাৎ সে-রাতের মতো বিস্মিত হল, বিস্মিত হল বলে তার কান্নাও গেল থেমে, অন্তরের ঢেউ শান্ত হয়ে এল। সে এবার আবার হাসল।

আজ সাগরে শান্ত ঢেউ জেগেছে। দূর দিগন্তরেখা অতি ধীরে উঠছে-নাবছে, যেন বিশালকায় জন্তুর বক্ষশ্বসন হচ্ছে বলে উঠছে-নাবছে। আকাশের হালকা মেঘগুলোতে সূর্যের আগুন লেগেছে, সেগুলো এমন করে ঝলসাচ্ছে যে, সেদিকে তাকানো যায় না।

মেঘগুলোর পানে ক'বার তাকাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে মেয়েটির দৃষ্টি দিগন্তরেখার পানে নাবল। সে কতক্ষণ চেয়ে-চেয়ে দেখলে দিগন্তরেখার ধীর ওঠা-নাবা, এবং দেখে-দেখে হঠাৎ মনে হল যে তার অন্তরের নদীতেও যেন এমন ঢিমেতালে ঢেউ ওঠা-নাবা করছে। সে-ঢেউ মিলতে চাইল সাগরের ঢেউয়ের সাথে। মেয়েটির হাত নড়ল, পা নড়ল, তার কোমর দুলে উঠল, এবং তার পিঠ-বেয়ে জলধারার মতো কী একটা যেন ওপরে উঠে এল; সে আনন্দ পেল, সে হাসল।

তার দেহ হাওয়ার মতো হালকা হয়ে উঠেছে। সে-হালকা দেহ সে উড়িয়ে নিয়ে চলল হাওয়ার মধ্যে দিয়ে। সবুজ কোমল ঘাসের ওপর প্রত্যেক পদক্ষেপে তার গাল পর্যন্ত নড়ছে ও কাঁপছে, আর পেছনে মেঘের মতো কালো এলোচুল উড়ছে। নীল সাগরের পানে আবছা স্থিরদৃষ্টি মেলে গাছের ছায়ায় ছেলেটি নিস্পন্দ হয়ে বসে রয়েছে, তার পানে চেয়েই সে ছুটতে লাগল। সে ছুটছে বলে তার দৃষ্টি কাঁপছে এবং সে-কম্পমান দৃষ্টি দিয়ে সে নতুন করে নবীন উজ্জ্বল আলোয় ছেলেটিকে চেয়ে দেখলে, দেখে শিউরে উঠল। তার অন্তরের নদীর ঢেউ দ্রুততায় ও প্রাণময়তায় সাগরের দীর্ঘতাল ছাড়িয়ে উঠেছে, এবং সে-দ্রুততালের চঞ্চলতায় মেয়েটি হঠাৎ অনুভব করল যে তার সত্তা অপূর্ণ, তার দেহ কোনো পূর্ণাবয়বের অংশ : যেন সপ্তমীর চাঁদ।

ছেলেটির চোখ শান্ত, শূন্যের মতো ভাষাশূন্য। সে-চোখের পানে চেয়ে তার সামনে মেয়েটি হাঁটু গেড়ে বসল, তার পিঠময় চুলের রাশি এলিয়ে রইল, তার কপাল ভরে থাকল ঘামে। চেয়ে মেয়েটি হাসল, হাসল দূরবর্তী ঝরনার আওয়াজের মতো। কিন্তু ছেলেটির শূন্য

অন্তরে বিস্ময় নেই, তাই সে হাসি শুনে বিস্মিত হল না। মেয়েটি এবার ওর কোমল হাতটি আস্তে টেনে নিলে, আর সে-হাতের স্পর্শে তার স্নায়ু-অনুস্নায়ু হঠাৎ কেমন এক নতুন সুরে ঝংকৃত হয়ে উঠল; সে-সুরে তার চোখ যেন বুজে আসতে লাগল, এবং সে-সুরেই মুগ্ধ হয়ে মেয়েটি হঠাৎ উঠে পড়ে বেলাভূমি বেয়ে ধীরে-ধীরে চলে গেল দূরে দূরত্বের মোহে, চলার আকর্ষণে। স্থির হয়ে দাঁড়াবার স্থিরতা তার মন হারিয়ে ফেলেছে; সে-মন চলতে শুরু করেছে, কখনো আকাশ বেয়ে মেঘ ডিঙিয়ে সূর্যের কিনারে, কখনো-বা সাগরের নীল জল পেরিয়ে দিগন্তের অস্পষ্টতা ও রহস্যে।

তার অন্তরের বেদনা আনন্দকে ছাপিয়ে উঠল, বেদনার অতলে আনন্দ তলিয়ে গেল চিহ্নশূন্য হয়ে। সাগরের অসীমতায় মেয়েটির অন্তর কেঁদে উঠল, আকাশের আনন্ত্যে তার অন্তর ক্ষত হল, ব্যথিত চোখদুটি দিয়ে সে ফিরে চাইল দূরে, যেখানে শুভ্র কোমলদেহী ছেলেটি নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে সাগরের পানে চেয়ে।

এবার মেয়েটির খেয়াল হল যে, সে ওদের সবার চাইতে বড়, এমন কি ওই দীর্ঘদেহী লোকটির চেয়েও সে বড়। সবার চাইতে সে বেদনায় বড়, যে-বড়ত্ব তার অন্তরের বেদনাকে নিবিড়তম ও গভীরতম করে তুলেছে। এ-বড়ত্বের যাতনাময় কবল থেকে মুক্তি নেই; মুক্তি নেই বটে, তবে উপশম আছে, সে-উপশম আসতে পারে ছেলেটির দেহস্পর্শ থেকে।

আবার সে ছুটে এল ছেলেটির কাছে, এল দেহভরে চাঞ্চল্য ও উষ্ণতা নিয়ে, এসে এবার জানতে পারলে যে, মনের অভাবে ছেলেটির দেহ মৃত; মন হল দেহের সূর্য, যা-দেহকে আলোকিত করে রাখে চুল অথবা নখের প্রান্ত পর্যন্ত। ছেলেটির মৃতক ঘিরে ঘনতমিস্রা ও জমাট অচলতা।

নীল আকাশে রোদ ঝরছে। সেদিকে চেয়ে মেয়েটি কাঁদতে থাকল; কিন্তু তার নিজের চোখের জলই তাকে অপমানিত করলে। বিরাট শূন্যতার কোলে অগাধ অতল জলরাশি থাকতে পারে, কিন্তু শূন্যতায় মানুষের এক ফোঁটা চোখের জলেরও কোনো অর্থ নেই, তাই অস্তিত্ব নেই। মেয়েটির সারাদেহে অপমানের শত-শত বিদ্যুতের অসি খেলে উঠল, অতি তীক্ষ্ণ ও নির্মম তার আঘাত। যাতনায় সে গোঙাতে থাকল, রুদ্ধ প্রতিকারহীন আক্রোশে সে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। অবশেষে সূর্যোদয়ের মতো মুক্তিপথের খবর উদয় হল তার বিস্রস্ত তরঙ্গিত আবর্তিত অন্তরে। সে-পথ কণ্টকাকীর্ণ, আর সে-মুক্তি মৃত্যু।

নীল সাগরের অতল জলে মেয়েটি তার 'কারারা'-মর্মরের মতো শুভ্র দেহ ভাসিয়ে দিল।

ফাল্গুন ১৩৪৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩

প্রবল হাওয়া ও ঝাউগাছ

সন্ধের দিকে কোত্থেকে একটা জমাট মেঘ উড়ে এল, যার অভিক্ষেপগুলো কৌণিক ও তীক্ষ্ণ। মেঘ এল আর সাথে-সাথে দুর্দান্ত হাওয়া শুরু হল, বাগানের ঝাউগাছগুলোতে প্রচণ্ড সাড়া পড়ে গেল। নওয়াজের স্ত্রী সকিনা ধূসর রঙের শাড়ি পরে ওঘর থেকে বেরিয়ে এল, বারান্দায় নওয়াজকে বললে :

—দেখেছ, কেমন হাওয়া?

—হুঁ

—ভালো লাগছে তোমার?

—হুঁ

—বাগানে যাবে? গিয়ে বসবে ওই ঝাউগাছগুলোর তলায়?

ঝাউগাছগুলোতে এমন একটা বিচিত্র শোঁ-শোঁ আওয়াজ, ওরা দুজন তার তলায় না-গিয়ে পারলে না। গিয়ে তারা একটা দীর্ঘতর ঝাউগাছের তলায় বসলে। সকিনা তার মাথার রুক্ষ চুল ছেড়ে দিলে, প্রবল হাওয়ায় বোশেখি মেঘের মতো সে-চুল উড়তে থাকল। নওয়াজ কোনো কথা না-কয়ে শুধু তার একটি হাত নিজের হাতের মুঠোয় বন্দি করলে, চোখে তার হাওয়ার আঘাতে সৃষ্ট হাওয়ার মতো চাঞ্চল্য।

সন্ধে ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে। হাওয়া যেন আরো প্রবল হয়ে উঠছে, অথচ বৃষ্টি নেই। হাওয়ার আঘাতে সকিনা চোখ মেলতে পারছে না, তবু সে একবার জোর করে চোখ খুলে তাকালে নওয়াজের পানে, তারপর চেঁচিয়ে ডাকলে :

—এই।

—কী?

—কিছু না।

একটু পরে সকিনা আবার চেঁচিয়ে উঠল :

—এমন হাওয়া দেখেছ, আর শুনেছ এমন শোঁ-শোঁ আওয়াজ? আমি যেন ভেসে গেলাম উড়ে গেলাম।...আমার হাত ধরেছ শক্ত করে?

—ধরেছি।

ক্রমে আঁধার জমল ঘন হয়ে, আর ওরা আবছা হয়ে উঠল। আকাশে অগণিত তারার মালা ঝকঝক করতে থাকল, এবং এই হাওয়ায় যেন কাঁপতে থাকল। এত হাওয়া আর এত তারা যে, ওরা ভুলে গেল পৃথিবীকে, ভুলে গেল সবকিছু—অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। ওদের ঝাঁঝানো নেশা হল, হাওয়ার চেয়েও দুর্বার স্বপ্ন এল ওদের দেহ জড়িয়ে, অসংখ্য তারার মতো তাদের হৃদয় লক্ষ শিরায় দপ্‌দপ্‌ করতে থাকল।

আবার সকিনা চেঁচিয়ে উঠল, তীব্র তীক্ষ্ণ সে-কণ্ঠ :

—আমরা জয়ী!

—কিসে?

—তা জানি না, কিন্তু আমরা জয়ী। দেখছ না, আমার চুল উড়ছে কী করে? মৃত্যুকে এই মুহূর্তে আমি তুচ্ছ মনে করি। বলে সকিনা কেমন খনখনে গলায় অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকল। হাসির মধ্যেই একবার বললে :

—আমি তারার পানে চেয়ে আছি, তোমাকে আর ভালোবাসি নে।

হাওয়া যখন থেমে গেল, আর সকিনার পিঠে ও কাঁধে রুক্ষ চুলের রাশি এলিয়ে পড়ল, তখন ওরা দুজন ঘুম থেকে জেগে-ওঠার চোখ নিয়ে পরস্পরের পানে তাকাল, মুখে কিছু বললে না। তারপর তারা উঠে আস্তে ঘরে ফিরে এল, তবু মুখে কোনো কথা নেই। প্রবল হাওয়ার ঝড়ে তারা তাদের অন্তরের কথা নিঃশেষ করে দিয়েছে।

বৈশাখ ১৩৫০ এপ্রিল ১৯৪৩

হোমেরা

দক্ষিণের জানালাটা খোলা, পর্দাও সরানো। গুমট গরমের পর বাইরে হাওয়া দিয়েছে, তার কিছু জানলা গলে ভেতরেও আসছে।

সন্ধেয় বেড়িয়ে ফেরার পর আকরমের এক পেয়ালা চা খাবার অভ্যেস। আজ বেড়িয়ে ফিরে জামা-কাপড় ছেড়ে একটা পাতলা সিল্কের লুঙ্গি পরে খালি গায়ে ইজিচেয়ারটাতে হেলান

দিয়ে বসেছে, এমন সময় হোমেরা চায়ের পেয়ালা নিয়ে আস্তে ঘরে এল। ইজিচেয়ারের পাশে টিপয়, তার ওপর সে পেয়ালাটা নাবিয়ে রাখলে। চা দেবার পর আর কোনো কাজ নেই, কোনো কথাও নেই, তাই হোমেরা দরজার পানে আবার চলতে শুরু করেছে তখন আকরম পেছন থেকে আস্তে ডাকলে :

—শোন।

—কী? হোমেরা দাঁড়াল।

টিপয় থেকে পেয়ালা তুলে তাতে আকরম এক চুমুক দিলে, তারপর স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বললে :

—আজ ও আসবে বুঝি?

—ও, ও কে? রহিমের কথা বলছেন।

—তো তুমি ভালো করে জান। এখুনি আসবে, না? তোমাকে খবর দিয়েছে?

হোমেরা চোখ বন্ধ করে হঠাৎ হেসে উঠলে। অবাক হয়ে বললে :

—আমাকে খবর দিতে যাবে কেন? সে যে গাঁ থেকে শহরে ফিরে এসেছে সে-কথাই-তো আমি জানিনে। কবে এসেছে? আপনার সাথে দেখা হয়েছিল ভাই?

আকরম কোনো জবাব দিলে না, নীরবে পেয়ালায় চুমুক দিতে থাকল। তারপর হোমেরা যখন যাবার জন্য আবার একটু নড়বার ভঙ্গি করলে, তখন আকরম চোখ তুলে সোজাসুজি চাইলে তার পানে। সংযত ও পরিষ্কার গলায় বললে :

—ওর চাকরটার সাথে পথে আমার দেখা হয়েছিল, চিঠিটা আমি পড়েছি। তোমার সাজগোজের বাহার যে চোখে পড়বে না, অতটা কানাও আমি নই।

—সাজগোজ? বা রে, সাজগোজ করেছি কোথায়?

—যাক, আমার দুটো চোখ রয়েছে। আশ্চর্য হই তোমার মিছে কথা বলার শক্তি দেখে, অনর্গল বেরোয়, কোথাও একটু বাধেও না। আচ্ছা, ও গাঁয়ে ছিল-তো দিন পনের, এর মধ্যে তার কাছে ক'খানা চিঠি লিখেছ?

—একটাও না। টিকিটের পয়সা কোথেকে পাব যে লিখব? লিখলে আপনারা বুঝি জানতেন না।

—আম্মার হাতবাক্সের খবর-তো আমি জানিনে। তাছাড়া দুয়েক পয়সার গোলমাল হলে আম্মা কখনো কাউকে কিছু বলেন না। ক'খানা লিখেছ?

—একটাও না।

—একটার উল্লেখ-তো রহিমের ওই চিঠিটাতেই রয়েছে, কাজেই অমন ডাহা মিছে কথা আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই। যাক, ও-সব কথাতে আমার প্রয়োজন নেই, আসল কথা শোন। বস ওই চেয়ারে—

—বসব না, আমার কাজ আছে। নিন, কী বলবেন ঝটপট বলে ফেলুন।

কয়েক মুহূর্ত আকরম নির্বাক থাকল, তারপর আস্তে প্রশ্ন করলে :

—রহিমের খবর তুমি জান?

—না।

—তার চরিত্রের খবর তুমি রাখ?

—না।

—আবার মিছে কথা?

—মিছে কথা নয়, সত্যি বলছি জানি না, কারণ সে-খবর রাখার দরকার আমার নেই।

—বেশ, দরকার যদি না থাকে, তবে এরপর যদি তার সাথে তোমার কোনো সম্বন্ধ দেখি তাহলে দেখে নিয়ো। কেমন?

হোমেরা চুপ করে রইল। তাই আকরম আবার বললে :

রাজি? ও কী চুপ করে রয়েছ কেন, কথা বল।

এবার শান্ত গলায় নির্বিকারভাবে হোমেরা উত্তর দিলে :

—আমার কাজ আছে, কী বলবেন বলুন। ওর কণ্ঠের শান্ততায় আকরম বিস্মিত হয়ে তাকালে তার মুখের পানে : ওর মুখ নিষ্কম্প, তাতে ঘাম জমেছে, তার চোখদুটি আকরমের মুখের ওপর স্থিরভাবে নিবদ্ধ। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে হঠাৎ নাক সিট্‌কে সে বললে :

—গেঁয়োদের মতো কত স্নো মেখেছ? ঘামাচ্ছ এমন করে যেন মুখে পানি দিয়েছ।

হোমেরা যেমনি ছিল তেমনিই রইল, শুধু দৃঢ়কণ্ঠে বললে :

—তা রহিম কী করেছে? তার কথা কী বলবেন?

জানলার বাইরে রাত্রি কালো হয়ে উঠেছে, আকাশে ঝকমকে তারার মালা। সেদিকে একবার আকরম চাইলে, তারপর বললে :

—রহিমের সাথে আমাদের বহুকালের পরিচয় বলেই শুধু তাকে এ-বাসায় আসতে দেই এবং তোমার সাথে মিশতে দেই, নইলে তার মতো লোকের কোনো ভদ্র-পরিবারে যাতায়াত থাকা উচিত নয়, এ-কথা জেনে রেখ। তুমি ভেবেছ যে সে তোমাকে ভালোবাসে, না?

—আমি তাকে ভালোবাসি। এবং এ-কথা বলতে এখন আমার আর লজ্জা নেই।

—না! আমি থাকতে তুমি কখনো যাকে-তাকে ভালোবাসতে পার না। আর ভালোবাসা যে পুতুলখেলা নয়, এ-কথা আশা করি এতদিনে শিখেছ। তাছাড়া আরেক কথা শোন। তোমার মতো মেয়ের প্রেমে পড়বে এমন ছেলে—এক নির্বোধ ছাড়া—এ দেশে কেউ নেই।

এবার হোমেরার মুখটি সামান্য কালো হয়ে উঠল, তবু তার ঠোঁট কী চোখ কিছুই কাঁপল না। কিন্তু কথা যখন সে কইল, তখন শব্দে-শব্দে রুক্ষতা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল :

—আমাকে নিয়ে কথা বলবার আপনার কোনো অধিকার নেই, আপনি আমার কেউ নন।

—সে-কথা আমি মানতে যাব কেন? গায়ের জোরে বললেই সব কথা খাটে না জেনো। তুমি আমার আপন বোন নও বটে, কিন্তু চাচাতো বোন, এবং চাচা-চাচি বেঁচে নেই বলে তোমার ওপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার।

—গায়ের জোরে কথা না খাটলে, গায়ের জোরে অধিকারও খাটবে না, বুঝলেন? রহিম আমাকে বিয়ে করবে এবং এ-বিয়েতে কেউ বাধা দিতে পারবে না।

একটুক্ষণ আকরম চুপ করে থাকল, তারপর হঠাৎ যেন গর্জে উঠল :

—আমি বিয়ে করতে দেব না, তুমি যা-ইচ্ছে তা-ই করতে পার। আর এ-কথা মনে রেখো, রহিম তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে না, বা সব বাধা কাটিয়ে জোর করে বিয়ে করবে না, বাস এখন যাও—

জানলা দিয়ে কালো রাতের পানে আকরম তাকাল, কিন্তু হোমেরা নড়ছে না দেখে সে আবার তার পানে চাইলে, ক্ষণকাল পরে বললে :

—আমার পানে ওমন কটমট করে তাকাচ্ছ কেন? চিবিয়ে খাবে আমাকে? দাও, ওই শার্টের পকেট থেকে সিগ্রেটের বাক্স আর দেশলাইটা, দিয়ে, যাও এখান থেকে।

এবার গমগম করে পা ফেলে হোমেরা আলনার কাছে গিয়ে শার্টের পকেট থেকে দেশলাই ও সিগ্রেট নিয়ে আকরমকে এনে দিল, দিয়ে তেমনিভাবে সশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় পেছন থেকে আকরম একবার বললে :

—রাগলে তোমাকে আরো বিচ্ছিরি দেখায়; অমন ধিং-ধিং করে হেঁটো না, আস্তে যাও।

আকরমের ঘরটা চিলেকোঠা। তাই তার কাছে বাইরের কোনো কোলাহল এসে পৌঁছয় না। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে নিবিড় শান্ততায় সে একটা বই পড়ছে এবং কখনো হাতের জ্বলন্ত সিগ্রেটে মৃদু টান দিচ্ছে, আর বাইরের কালো রাতের স্পর্শ নিয়ে শীতল হাওয়া থেকে-থেকে বয়ে এসে তার চুল নাড়িয়ে দিচ্ছে।

কোনো সাড়া-শব্দ নেই, এমন সময় নিচের সিঁড়ি দিয়ে কে যেন ওপরে উঠে আসছে আওয়াজ শোনা গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে দরজায় টোকা পড়ল, এবং কার কণ্ঠ শোনা গেল :

—আসব? আমি রহিম।

—এস। গলা কেশে নিয়ে আকরম সাড়া দিল।

আস্তে দরজা ঠেলে রহিম ভেতরে এল। তার সাদা হালকা সিল্কের পাঞ্জাবি, পরনে পায়জামা, পায়ে শুঁড়শূন্য জরির কাজকরা সাদা নাগরা; মাথার চুল সযত্নে ব্রাশ করা, এবং সন্ধেয় সে হয়তো গোসল করেছিল, তার স্নিগ্ধতা সারা দেহময়। ছিপছিপে গড়ন, দেহের প্রতি রেখা মাপা ও নম্র, আর সারা দেহে কেমন একটা কোমলতাময় ঝকঝকে ঔজ্জ্বল্য।

—বস। কবে এলে?

হেসে রহিম চেয়ারে বসলে, বসে জানলা দিয়ে বাইরের পানে চেয়ে হঠাৎ মধুরভাবে হাসল, ঘরের চল্লিশ পাওয়ারের বাল্‌বের আলোয় তার সুন্দর দাঁতগুলো ঝিকমিক করে উঠল। তারপর সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল আকরমের পানে, বললে :

—কবে যে এসেছি সে-খবর ইতিমধ্যে আপনি জেনেছেন। ও সব বলেছে।

টিপয়ের ওপর সিগ্রেটের বাক্স, সেটা আকরম টেনে নিলে। খুলে একটা নিজে নিয়ে বাক্সটা রহিমের পানে এগিয়ে দিলে, বললে :

—নাও।

দুজনে সিগ্রেট ধরাল। অল্পক্ষণ নীরবতা, তারপর তেমনিভাবে রহিম আবার হেসে উঠল। এবার বললে :

—সব আপনার জানা হয়ে গেছে, আর-তো লুকোবার কিছু নেই। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।

—করতে চাও, ভালো কথা। তোমার ভালোবাসা যদি খাঁটি হয়, তবে আমার কোনো আপত্তি নেই জেনো। কিন্তু, একটা কথা আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে। অর্থাৎ, তোমাতে আমার আস্থা নেই, এবং হোমেরার অভিভাবক হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব রয়েছে। তুমি আমাকে একটি কথার উত্তর দাও; হোমেরাকে কী দেখে তুমি ভালোবাসলে? তার রূপ দেখে?

—না। তার রূপ নেই এ-কথা আমি মানি।

—তবে হৃদয় দেখে!

এবার রহিম আর কিছু বললে না। ওকে নীরব দেখে আকরম আবার বললে :

—ওর হৃদয়ে এমন কিছু নেই, একথা তুমি জান, কারণ ছোটবেলা থেকে তুমি তাকে দেখছ। কয়েক মুহূর্ত রহিম নির্বাক থাকল, তারপর বললে :

—তার হৃদয় আকর্ষণকারী কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু আমার প্রতি তার যে প্রবল প্রেম, সে-প্রেম তার হৃদয়ের সমস্ত দীনতা ঢেকে ফেলেছে। তার প্রেমের প্রাবল্য অদ্ভুত, এবং সে-জন্যই আমি তাকে বিয়ে করব। এমনভাবে কেউ কাউকে যে ভালোবাসতে পারে এ-কথা আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা, এবং যে-রকমভাবেই পারি আমি তার প্রেমের প্রতিদান দেব।

আকরমের নাকটা কুঞ্চিত হয়ে উঠল। একটু রুক্ষ গলায় সে বলে উঠল :

—বড় বড় কথা বোলো না। রেজার বোনের প্রেমের প্রতিদান দিয়েছিলে?

—সে-কথা তুলছেন কেন? সে-সব আমি-তো কারো কাছে লুকোই নি। তাছাড়া আমার কীর্তির বহর আপনার অজানা নেই।

—শোন, তোমার সাথে আমার এ-সম্বন্ধে আলাপ শেষ। তোমাদের বিয়ে হতে পারে না। আর এই প্রসঙ্গে বলে দিচ্ছি এরপর তোমাদের সম্বন্ধ যদি চুকে যায় তবেই সবচেয়ে ভালো হয়। ওর বিয়ের এখনো অনেক দেরি, ওকে আমি কলেজে পড়িয়ে বি.এ.টা পাস করাব। আমার আপন বোন তো নেই ও-ই আমার বোনের মতো।

আকরম কথা শেষ করেছে কী অমনি ঘরের মধ্যে একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। প্রচণ্ড

বেগে ঘরের দরজা খুলে অগ্নিময়ী মূর্তি নিয়ে হোমেরা ঘরে প্রবেশ করল, করে পাশের টেবিল হতে একটা পেপারওয়েট তুলে নিয়ে ছুড়ে মারল আকরমের পানে, সাথে-সাথে অনেকগুলো কথা তীক্ষ্ণ গলায় অসংযতভাবে কয়ে উঠল :

—ও আমার কেউ নয়। ওর চোখের পানে চেয়ে দেখ, তাতে দেখবে শুধু হিংসে আর শয়তানি। ও আমার শত্রু। ও তোমাকে কিসের রেজার বোনের কথা শোনাচ্ছিল রহিম? শুনবে তুমি আমার কথা? তুমি ঠকিয়েছ রেজার বোনকে, আমি ঠকিয়েছি আব্বাসকে। কিন্তু তাতে তোমার আমার কী হয়েছে....?

পেপারওয়েটটি কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হয় নি। সেটা ঠিক লেগেছে আকরমের মাথার পেছনটাতে, তবে উত্তেজনার মধ্যে হোমেরা সেটা ছুড়েছিল বলে তার বেগ তেমন প্রবল হয় নি, তাই আঘাতও তেমন গুরুতরভাবে লাগে নি। এ-অপ্রত্যাশিত বিশ্রী ঘটনায় রহিম হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে পড়ল, হোমেরা যে-সব কথা বললে তার এক অক্ষরও তার কানে ঢুকল না, এমন কি সে একটু নড়লে না পর্যন্ত, যেমনি ছিল ঠিক তেমনিভাবে বসে রইল। রহিমের কানে হোমেরার কথাগুলো না ঢুকলেও আকরমের কানে কিন্তু তার প্রতি অক্ষর নির্ভুলভাবে ঢুকেছে। আঘাত খেয়ে সে বিচলিত হল না, কথা শুনেও না, জানলার বাইরে কালো রাতের পানে তাকিয়ে সে অদ্ভুতভাবে নিশ্চল হয়ে রইল। হোমেরা আবার খনখনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল :

—তুমি নিচে চলে এস রহিম, চলে এস, কাউকে আমরা মানি না।

এবার রহিম ক্ষীণ গলায় বললে :

—কিন্তু দেখেছ ওঁর মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে? যাও শিগগির পানি নিয়ে এস....

আকরম চোখ ফিরিয়ে তাকাল রহিমের পানে, তাকিয়ে অল্প হাসল, সংযত গলায় এমনভাবে কথা বললে যেন তৈলাক্ত বস্তুর ওপর দিয়ে শব্দগুলো পিছলে আসছে :

—প্রেমের মূর্তি দেখলে রহিম? তোমরা-তো এর সম্বন্ধে লম্বা-চওড়া কথা বল, উঁচু-উঁচু ভাব ছড়াও, গান গাও, কবিতা লেখ, কিন্তু দেখলে এর পাশবিক মূর্তি?

রহিম তার কথার কোনো জবাব দিলে না, ব্যস্ত হয়ে সে তাকাল হোমেরার পানে, যে পুরুষালি ভঙ্গিতে বুকের ওপর দুটি হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের পানে তাকিয়ে ছিল, বললে :

—ছিঃ ও কী! যাও! দেখছ না রক্ত পড়ছে.... এই হোমেরা!

এবার হোমেরা শুনল। কোনো কথা না কয়ে সে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, একটু পরে আবার ফিরে এল পানি-ভরা বদনা, তুলো, ন্যাকড়া, আয়োডিন ও একটি ছোট কাঁচি নিয়ে, তারপর নিঃশব্দে আকরমের মাথার আঘাতটার পরিচর্যায় লেগে গেল, মুখে শান্ত ভাব। আকরম একবারও হোমেরার পানে তাকাল না, বাইরের পানে চেয়ে গভীরভাবে সে ডুবে রইল, আঘাত সম্বন্ধে তার চেতনা রয়েছে কি না সন্দেহ। একসময়ে সে চোখ ফিরিয়ে রহিমের পানে তাকালে, চেয়ে আস্তে বললে :

—কে আর তোমাদের বিয়েতে বাধা দেবে রহিম? নিরস্ত্র মানুষ পাশবিক শক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য। এখনো পশুশক্তির রাজত্ব পৃথিবীতে অটুট, কারণ মানুষ এখনো পশু, যদিও জ্ঞানের অথবা অস্ত্রের সাহায্যে তারা কিছুটা মানুষ হতে পারে।

কেউ কিছু বললে না, ঘরের মধ্যে প্রগাঢ় নীরবতা। অল্পক্ষণ পরে মুখ তুলে আকরম হোমেরার পানে চাইলে, নাক শুঁকবার ভঙ্গি করে বললে :

—কী সেন্ট? ভারি-তো সুন্দর গন্ধ ....

হোমেরার কপাল রাঙা হয়ে উঠল, সে কোনো উত্তর না দিয়ে নীরবে একমনে কাঁচি দিয়ে জখমের চারপাশের চুল কাটতে থাকল। বাইরে আবার হাওয়া দিয়েছে; জানলার পর্দা আর দেয়ালের ক্যালেন্ডার আবার কেঁপে উঠল। এমন ঠাণ্ডা সে-হাওয়া যে আকরমের চোখ বুজে এল। কিছুক্ষণ নিবিড়-নীরবতা, তারপর আবার আকরমের কণ্ঠ শোনা গেল :

—ভারি আরাম লাগছে—হাওয়াটা আর তোমার সেবা। তোমার কাছে আমার পরাজয় হয়েছে। আমাদের পরাজয় মানতেই হবে। এবং যেমনি মেনে নিয়েছি অমনি তোমার স্পর্শ আমার ভালো লাগছে। কথা শেষ করে আকরম এবার মুখ তুলে চাইলে হোমেরার পানে, দেখলে তার চোখদুটো ছলছল করছে, দেখে সে হাসল, হাসল বাইরের হাওয়ার মতো ঠাণ্ডা হাসি। বললে :

—ভবিষ্যৎ ভেবে লাভ নেই। ক্ষণিকের জয়ের প্রাধান্য মানতেই হবে। এস .... ব্যান্ডেজ থাক, তাছাড়া তুমি ব্যান্ডেজটা করতে পারছও না। আইডিনের তুলোটা লেগেছে?

—হ্যাঁ

—তবে থাক। এস রহিম, বিয়ের আলোচনা করা যাক। তুইও থাকবি নাকি হমু?

কিন্তু এতক্ষণে হোমেরার সজল চোখে লজ্জার বন্যা নেবেছে, নতচোখে সে শুধু একবার অস্ফুট গলায় বললে :

—আমাকে মাফ করেছেন?

আকরম আরেকবার তার পানে ভালো করে তাকাল, তারপর হেসে উঠল হঠাৎ, বললে :

—অতবীরত্ব দেখিয়ে এখুনি আবার ফ্যাঁস-ফ্যাঁস কাঁদতে লাগিস নে। যা, পালা নিচে, গিয়ে আমাদের খানা দে।

তারপর আকরম জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলে তারাগুলোর পানে, কালো আকাশের পানে, চেয়ে-চেয়ে একসময়ে হঠাৎ তার চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠল, ক্ষণকাল পরে রহিমের পানে চেয়ে বললে :

—এই বিশ্বে কোথায় যে একটা বিরাট ক্ষত রয়েছে বুঝতে পারিনে। সে-ক্ষত গভীর পচা ঘায়ের মতো। মানুষের দেহের ঘা সারে, কিন্তু এ-ঘা কখনো সারবে না।।

রহিমের গলার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, তার দেহের সমস্ত ঔজ্জ্বল্য ও শাণিত দীপ্তি যেন ম্লান ও কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছে।

আষাঢ় ১৩৫০ জুন ১৯৪৩

স্থাবর

ভোর হতে সন্ধে পর্যন্ত এ স্থান ভরে শুধু খটাখট শব্দ। এতগুলো লোক, সবাই নীরব, কারো মুখে কোনো কথা নেই। এরা নৌকো তৈরি করে,—বিভিন্ন প্রয়োজনের বিভিন্ন ঢঙের নানারকম নৌকো। সাম্পান হতে শুরু করে তিনশ' চারশ' মনের সাগরে মাছ ধরবার বা মাল বইবার বড়-বড় নৌকো এরা অনায়াসে তৈরি করতে পারে এবং করে।

কর্ণফুলী নদীর এ-ধারটা ঝোপঝাড়ে ঢাকা পাহাড়, তার ঠিক নিচেই নদীর তীর দিয়ে যে-খানিকটা সমতলভূমি, সেখানে তাদের নৌকো বানাবার কারখানা। একপাশে বিরাট টিনের গুদাম, সেখানে তারা কাঠ রাখে। তার পাশেই ছোট চালার ঘর, রাতে সেখানে লোক থাকে আর পাহারা দেয়। পাহাড়টা পেরিয়ে কাছেই গাঁ। এ-গাঁয়ের লোকদের পেশাই নৌকো বানানো, পুরুষানুক্রমে এরা এ-গাঁয়েতে বাস করছে আর নৌকো তৈরি করছে। এদের দেহ শক্ত, স্বভাব শান্ত এবং স্বল্পভাষী। কিন্তু যখন ওরা রেগে ওঠে তখন তাদের মুখ দিয়ে অনর্গল খৈ ফুটতে থাকে আর চোখ জ্বলতে থাকে আগুনের মতো। লোহার মতো শক্ত দেহ হলেও তাদের মন মাটির মতোন নরম। ব্যবসা করেও তারা লোক ঠকাতে জানে না,—তারা টাকা বাজিয়ে নেয় বটে লুকিয়ে নেয় না।

আকাশে রোদ চড়া হয়ে উঠেছে। তাই ওপারের ঘন গাছগুলোর রং ফিকে হয়ে উঠেছে। সেদিকে মাসুদ একবার চোখ তুলে চাইল, তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার সহকর্মীদের পানে। আজ কাজ কম, মোটে বিশ জন লোক খাটছে, তৈরি হচ্ছে বারটা সাম্পান। মাসুদের কাজ রং লাগানো; রঙের কাজে সে ওস্তাদ। সে সূক্ষ্মভাবে নকশা কাটে, তারপর সেগুলো নানা রঙে রঙিন ও মনোহর করে তোলে।

তার বয়স তেমন বেশি কিছু নয়, হয়তো আঠার কি উনিশ। তার বাপ ছিল নামকরা রঙের মিস্ত্রি, কিন্তু সে মারা গেছে আজ বছর পাঁচেক হবে। সেই হতে মাসুদ এ কাজে লেগেছে।

রং নিয়ে তার কারবার, হয়তো তাই তার মনেও রঙের খেলা চলে। কাজ করতে-করতে সে চোখ তুলে ওপারের আবছা রৌদ্রদীপ্ত বনরেখার পানে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তার হাত নিশ্চল হয়ে থাকে, চোখদুটো ভরে আসে স্বপ্নে, এবং এমনিই সে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না বুড়ো সর্দার কেশে ওঠে। বুড়ো সর্দার একবার কেশেছে কি অমনি তার হাত চঞ্চল হয়ে ওঠে, চোখ ও মন ফিরে আসে কাজে।

আজ সে সাম্পানের পিছনে রশ্মিরেখাসুদ্ধসূর্য এঁকেছে। সূর্যে গাঢ় লাল রং দিয়েছে, রশ্মিরেখায় হালকা লাল,—হয়তো কিছুটা গোলাপি, আর বাকি স্থানে গাঢ় নীল রঙের প্রলেপ দেবে। সমস্ত নৌকোতে সেই রং—গাঢ় নীল রং, শুধু ওপরে ধার দিয়ে মোটা সাদা দাগ দেবে। এ-নৌকোয় রঙের তেমন কারুকার্য নেই।

সূর্যে সে তৃতীয় বার রং লাগাল : এইবার শেষ। নীল রঙের কাজ করবে খেয়ে এসে। তার ক্ষিধে পেয়েছে। নানারকম রঙে-ভরা চটে সে হাতের আঙ্গুলগুলো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে মুছল, তারপর বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নদীর পানে চাইল। বহুদূরে দুর্গম পর্বতে হয়তো জোর বৃষ্টি হচ্ছে, তাই নদীর পানি ফুলে উঠেছে, স্রোত খরতর হয়ে উঠেছে। নদীর পানি কেমন শব্দ করে দ্রুতবেগে বয়ে যাচ্ছে তাই চেয়ে দেখতে মাসুদের ভারি ভালো লাগে। এই যে পানি বয়ে যাচ্ছে কলকল করে, কোথাও-বা ঘুরে-ঘুরে চক্রাকারে, কোথাও-বা আঘাত খেয়ে, এ পানিরাশি গিয়ে পড়বে সাগরে, সে-সাগর সে কখনো দেখে নি।

সাগর সে কখনো দেখে নি; শুধু শুনেছে সাগরের কথা ও কাহিনী, কখনো দেখে নি। কিন্তু সাগরের হাওয়া কি লাগে নি তার গায়ে? কে জানে। নদী থেকে মুখ ফিরাতেই হঠাৎ তার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

দুপুরের রোদ চড়া হয়ে উঠলেও ওদের কাজের কোনো বিরাম নেই। চারধারে শুধু হাতুড়ি পেটার একঘেয়ে ঘটাঘট শব্দ ও করাতের শব্দ স্থানটা মুখরিত করে রেখেছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই, কারো কোনো ফাঁকি নেই, সকলের চোখগুলো নত, আর হাতগুলো ব্যস্ত।

মাসুদের পাশে যে-লোকটা আলকাতরা লাগাচ্ছে সে বোধহয় শুনেছে তার নিশ্বাস পড়ার আওয়াজ। সে আড়চোখে লালরঙের সূর্যের পানে চাইল, চেয়ে নিচু গলায় শুধোল :

—বিড়ি খাবি?

মাসুদের দৃষ্টি অলস, মুখ শান্ত। ক্ষণকাল চুপ থেকে সে হাত বাড়িয়ে লোকটির আগানো হাত হতে বিড়িটি তুলে নিল। তারপর কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব শুধু ঘন-ঘন ধুঁয়ো উঠতে থাকল। বিড়িটা নীরবে শেষ করে মাসুদ একবার থুতু ফেললে উবু হয়ে, তারপর অকস্মাৎ কয়ে উঠল :

—আচ্ছা, তুমি কখনো শহরে গেছ গো?

লোকটা আগুনের কুণ্ড আরো জোরালো করে তুলেছে। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে দরদর করে। মাসুদের কথা সে শুনল কি না বোঝা গেল না, কতক্ষণ সে কিছু বললেই না, তারপর হঠাৎ পিঠ সোজা করে আড়চোখে তার পানে চেয়ে কিছুটা কঠিন

গলায় প্রশ্ন করলে :

—কেন, শহরের কথা কেন?

—না, এমনি!

কিছুক্ষণ মাসুদ অন্তরে যেন মুষড়ে রইল। দৃষ্টি তার ওপারের ফিকে-হয়ে-আসা বনরেখার পানে। ওখানে রোদ ঝলসাচ্ছে না, ঝলসাচ্ছে জ্বলন্ত রুপো।

ওধারে কে যেন চেঁচিয়ে উঠে কর্কশ গলায় কাকে ডাকল, ক্ষণকাল পরে দূর থেকে তীক্ষ্ণ খনখনে গলায় তার উত্তর দিল। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা, তারপর বুড়ো সর্দার কার ওপর যেন হেঁকে উঠল কঠিন ভাষায় ও গলায়। মাসুদ চমকে উঠল।

তার চোখগুলো কেঁপে উঠল এবং সে-কম্পনের মধ্যে হঠাৎ সে প্রশ্ন করল :

—আর, সাগরে কোনোদিন গেছ?

লোকটি মুখ তুলল না, ঝট্ করে কিছু বললও না, তবু তার কপালে কটা রেখা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল। উত্তর সে দিলেই না, কিন্তু মাসুদ যখন নীরবে উঠে পড়ে রঙের টিন, মোটা তুলি, টিনের পাত্র ইত্যাদি গুটিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে তখন ওই লোকটি একবার কেশে উঠল। কেশে একটু থেমে হঠাৎ কেমন গলায় বলে উঠল :

—সাগরের ডাক শুনছ, কিন্তু তাতে কান দিও না। শহর থেকে লোক তবু ফেরে, সাগর থেকে কেউ ফিরতে পারে না।

একটু দাঁড়িয়ে মাসুদ শুনল সে-সব কথা, শুনল কিন্তু বলল না কিছু, আস্তে-আস্তে কর্মরত রৌদ্রদগ্ধ লোকদের মধ্য দিয়ে সে চলে গেল। হাতুড়ির খটাখট শব্দ হয়তো অশ্বের মতোই চলছে, তার কানে স্তব্ধতার পর্দা ঝুলছে ভারি হয়ে।

তার মায়ের চেহারায় কিছুটা মগের ভাব। উঁচু চোয়াল, পুরু ঠোঁট, আর চেপ্টা নাক, গড়নও বেঁটে, গলার আওয়াজও খনখনে। তবে এদের মতোই সে স্বল্পভাষী এবং সকল সময়ে কিছু-একটা কাজে লিপ্ত। তার চোখে ভাষা নেই, তার হাতে ও কাজে ভাষা।

খেতে এসে মাসুদ যখন বললে, সে সাগরে যেতে চায়, তখন তার মা শুধু একবার চোখ তুলে চাইলে তার পানে, কিছু বললে না। তার নীরবতায় মাসুদ উত্তপ্ত হয়ে উঠল, কিন্তু সেও নির্বাক থেকে খেয়ে উঠে গেল ধীরে।

কোথাও সে যেতে চাইছে, হয় সাগরে, না হয় শহরে। চাইছে বটে তবু সে-চাওয়ার গায়ে কী যে সুচ ফুটাচ্ছে থেকে-থেকে। এদের ব্যবসা নৌকো-তৈরি, এবং কর্ণফুলীর নদীর তীরে পাহাড়ের নিচে এ-কাজই তারা পুরুষের পর পুরুষ করে আসছে, এবং বিদেশে গিয়ে চাকরি করা বা জাহাজে খালাসি হয়ে যাওয়া তারা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে। যারা যায় তাদেরকে তারা ঘৃণা করে, গাল দেয়। এরা স্থাবর, জঙ্গম-হওয়া তাদের গাঁয়ের বা রীতির ধারা নয়। এরা অন্যের চলার যান তৈরি করে, নিজেরা চলে না; সারা জীবন এরা শুধু নৌকো ভাসায়, কিন্তু ভাসে না।

কর্মরত লোকদের ওপর বেলা গড়িয়ে আসছে, নদীতে জোয়ার আসবে এখুনি, ঘুঘু ডাকছে দূর পাহাড়ে।

মন্থর গতিতে মাসুদ আবার তাদের মাঝে এসে দাঁড়াল। কাঠের গন্ধ আর ঠোকাঠুকি, এসব এড়িয়ে সে ও-ধারে এগিয়ে চলল, যেখানে গাছের ছায়ায় মোড়ার ওপর বসে রয়েছে বুড়ো সর্দারটি। সর্দারের পরনে কমলা রঙের বর্মি লুঙি, কোমরে মোটা বার্নিশ করা চকচকে বেল্ট, আর গায়ে সাদা সিল্কের হাফশার্ট, যেটা অর্ধেক লুঙ্গির ভেতরে ঢোকানো—শার্ট ও ট্রাওজারের ফ্যাশনে। এরা এমনি করে লুঙ্গি ও শার্ট পরে।

বুড়োর রং ফরসা, দাড়ি-চুল ধবধবে সাদা, আর ছোট চোখ তীক্ষ্ণ—শ্যেনদৃষ্টির মতো তীক্ষ্ণ। সে-চোখকে কখনো ফাঁকি দেয়া যায় না। তেমনি তার কান; সে-কানকেও ফাঁকি

দেয়া দুষ্কর। দূরে কোনো নৌকোর পেরেক ঠোকার আওয়াজ মাত্র শুনেই সে হেঁকে উঠতে পারে এই বলে যে, কাঠ বদলাও, কাঠ ভালো নয়।

তার পাশে গিয়ে মাসুদ নীরবে দাঁড়াল। পায়ের শব্দে বুড়ো সবাইকে চিনতে পারে, তাই সে মুখ তুলে চাইল না তার পানে, ও-পাশে যেখানে কটা লোক কাঠের মাচা হতে নৌকাটা নাবাচ্ছে সেদিকে চেয়ে রইল। অবশেষে মাসুদ গলা কাশল, কেশে আস্তে বললে :

—আমি খালাসি হব। তাই শিগগিরই শহরে যেতে চাই। বুড়ো সর্দার কথা বলার কোনো প্রয়োজন হয়তো বোধ করল না, কিন্তু তবু মাসুদ পাশে দাঁড়িয়ে উসখুস করতে থাকল বলে সে হঠাৎ তীব্র-ভঙ্গিতে ফিরে চাইল মাসুদের পানে, তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। ওই আগুন-ঝরা চোখই হয়তো যথেষ্ট ছিল, তবু বুড়োর গলা একবার খনখনিয়ে বেজে উঠল :

—তোর ঠ্যাং ভেঙে ফেলব তা' হলে!

আর কিছু নয়। মাসুদ নীরবে চলে গেল সেখান থেকে। চলে গেল নদীর ধার দিয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বসতি ছাড়িয়ে দূরে কোথাও কোনো নির্জনে, গিয়ে হয়তো নদীর পানির পানে চেয়ে ভাবতে থাকল। ভাবতে থাকল হয়তো রহস্যময় মহাসাগরের কথা, যে-সাগর নিত্য এ-নদীর পানি শুষে নেয় আবার ভরে তোলে। সাগর যেন কোনো দৈত্য, বিপুল তার চিত্ত, তার নিশাস-প্রশ্বাসে নদীতে জোয়ার-ভাটা খেলে।

লোকটি বলেছে যে সে নাকি সাগরের ডাক শুনছে। হয়তো-বা শুনছে। আজ রাতে তার ঘুম নেই চোখে। নদীর ওপারে পাহাড় হতে হাতি নেবে এসেছে, তারই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে গভীর রাতে। নদীর ওপারে ঘন বন, বিরল বসতি। যারা-বা আছে তারা জাতিতে কুকি। এ-ধার থেকে লোকেরা সেখানে যায়, গিয়ে মাচা বেঁধে বাস করে জুম চাষ করে, আর পোকামাকড়ের উপদ্রবে হাতির তাড়নায় সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। কুকিদের ভয়ও কম নয়। সচরাচর খুন-খারাবি দুয়েকটা হয়েও থাকে। দীর্ঘ সরু ও শাণিত বল্লম তাদের অস্ত্র।

সে সাগরের ডাক শুনছে কোন্ কানে? মনেরও হয়তো কান আছে। সে-কানের পর্দায় সাগরের অস্ফুট কল্লোল এসে বাজছে। মনের কি চোখও আছে? হয়তো আছে, এবং সে-চোখে সে দেখছে অনন্ত নীল সমুদ্র—যার কোনো তীর নেই, যার কোনো সীমা নেই, আর দেখছে নীল আকাশ।

তার মায়ের বংশ বীর নাবিকের বংশ। তার মায়ের চিরজঙ্গম বংশ কী করে যোগ হল এসে চিরস্থবির বংশের সাথে। তাই মাসুদের রক্তে বীর নাবিকদের রক্তও রয়েছে—সেই বীর নাবিকরা, যারা জীবন-কে-জীবন নীল হাওয়ায় ও নীল সাগরে ভেসেছে। ছোটবেলায় নানির মুখে কত শুনেছে তাদের কত কাহিনী—বীরত্বপূর্ণ কাহিনী—যার মাদকতা সাগরের নোনা হাওয়ার মতো ঝাঁঝালো।

হাতির তীব্র চিৎকার গভীর রাতে অদ্ভুত শোনাচ্ছে। অতন্দ্র মাসুদের কানে হয়তো সে-আওয়াজ সাগরের মত্ত ঢেউয়ের আওয়াজের মতো ঠেকছে। না। এ হাতির চিৎকার, এ-চিৎকারই সে শুনছে। সে কোথাও যেতে চায়—যেখানে হোক। নদী পেরিয়ে ঐ গভীর বনেও যেতে পারে। সেখানে গিয়ে কুকিদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, আর হিংস্র পশুদের সাথে লড়াই করবে। এখানে কাঠের রঙের ও আলকাতরার গন্ধে তার নাক বিষিয়ে উঠেছে, আর সারাদিন ভরে ঠোকাঠুকির আওয়াজও আর কানে ও প্রাণে ভালো লাগে না।

হাতির আওয়াজ যখন একটু থেমেছে তখন মাসুদের মনে পড়ল বর্মা মুলুকের কথা। সে-দেশ সম্বন্ধে কত রোমাঞ্চকর গল্প সে শুনেছে। সে-দেশে পথে-পথে নাকি টাকা ছড়িয়ে থাকে। আশপাশের গাঁ থেকে কত লোক সে-বিচিত্র দেশে গিয়ে কত-কত টাকা নিয়ে আসছে। তাদের মধ্যে কেউ-বা অতি লোভে দেশের মায়া কাটিয়ে সেখানে বাস করছে চিরজীবন।

আবার সাগরের কল্লোল ভেসে উঠল মাসুদের কানে। সমুদ্রে মাছ ধরতেও সাধ হয়। এখানে তারা যে বড়-বড় জাল্যানি নৌকো তৈরি করে সে-নৌকোয় করে লোকেরা দিনের পর দিন সাগরের বুকে জাল ফেলে ভাসতে থাকে, কখনো উত্তাল তরঙ্গে নাচে, কখনো-বা শান্ত সাগরে স্থির হয়ে থাকে। তাদের জালে অসংখ্য মাছ আটকায়, কত বিচিত্র রকমের মাছ, অদ্ভুত-অদ্ভুত তাদের রং ও ঢং। কোনোটা হয়তো রুপোর মতো ঝিকমিক করে, কোনোটা হয়তো সোনার মতো ঝলসায়, কোনোটা হয়তো রামধনুর মতো বিভিন্ন রঙে মুগ্ধ করে। চাঁদা মাছই বেশি ধরে,—বড়-বড় রুইতনের মতো উজ্জ্বল রুপালি চাঁদা। ওদের পাটাতন যখন সব জ্যান্ত পিচ্ছিল চকচকে মাছে-মাছে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তাদের প্রাণময় তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে নাক ভরে ওঠে তখন লোকদের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, অস্বাভাবিকভাবে। চোখ উজ্জ্বল হয় বটে, কিন্তু তাদের ঠোঁটে হাসি ফোটে না, বরঞ্চ পেশিগুলো আরো চঞ্চল হয়ে ওঠে, কপাল ঘনিয়ে আসে দায়িত্বের রেখায়।

সাগরের কল্লোল মাসুদের কানে প্রবল হয়ে উঠল। কোথায় সে-সাগর? কত দূরে? সে-সাগর মাসুদ কখনো দেখে নি, সে না-দেখা সাগর তাকে আকুল করে তুলল। সে-লোকটা বলেছিল, সাগর তাকে ডাকছে, আর বলেছিল, সে-ডাকে কান না দিতে। সাগরের কণ্ঠ কি ঐ কল্লোল, যা-মুখর হয়ে ওঠে মনের কানে?

সাগর তাকে ডাকছে, এবং সে যাবে সাগরের কাছে। ফিরে আর আসতে দেবে না? নাই-বা দিল, তার উদার বক্ষে অনন্ত শান্তি ও বিশাল আশ্রয়, সে-বক্ষে সে নিজেকে নিঃশেষ করে দেবে।

ওপারে হাতির আর কোনো সাড়া নেই; ঘন বনে ঘুম নেবেছে। এ-ধারে রাতের আকাশব্যাপী সাগরের চেয়ে অগাধ নীরবতা এবং সে-নীরবতায় সাগরের কল্লোল প্রবলতম হয়ে উঠল বলেই হয়তো মাসুদ ঠিক করলে—সে এ-গাঁয়ের বদ্ধ নাগপাশ হতে মুক্তি নেবে। সে পালিয়ে যাবে ভোরের আলো ফুটে ওঠবার আগে, লোকদের ঘুম ভাঙবার আগে। সে পথ চেনে না, কিন্তু তাতে কী হয়েছে, সাগরের ডাক শুনে-শুনে সে অন্ধের মতো চলবে। বীর নাবিকের রক্ত তার ধমনিতেও রয়েছে, এবং উত্তাল সাগর হয়তো তার রক্তও উত্তাল করে তোলে।

তখন শুকতারা দপদপ করছে পশ্চিম আকাশে। সামান্য বোঁচকা কাঁধে মাসুদ বাইরে এসে দাঁড়াল। তার মায়ের চোখে ঘুম; সে-ঘুমোল চোখ দেখবার প্রয়োজন নেই। সে পথ চলতে শুরু করে দিলে ঘন আঁধারের মধ্যে দিয়ে।

গ্রামান্তের ছোট ছরার এ-ধারে কে যেন তাকে ধরে ফেললে। সে থমকে দাঁড়াল। ধরল কে তাকে? ধরল তার বিবেক, ধরল তার অন্তরকে সাপটে। তাকে যেতে দেবে না।

সাগরের কল্লোল থেমে গেছে মাসুদের কানে। এখন সেখানে বিরাট শান্তি। এই তার গাঁ, তার গাঁয়ের লোক। কানে এখন বাজল কী? বাজল অবিরাম হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজ, বাজল কর্মরত লোকদের নীরবতা আর নাকে লাগল রঙের আর কাঠের গন্ধ, আলকাতরার বিচিত্র গন্ধ। এ-গন্ধে ও এ-শব্দে তার দেহ ও অন্তর মুখরিত, এর মাঝে জড়িয়ে তার অস্তিত্ব।

মায়ের মগী চেহারা—নির্লিপ্ত চোখ তার হঠাৎ মনে পড়ল। দূর, কোথায় কোন্ সাগর? ওই চোখ—তার মায়ের ওই নির্লিপ্ত শান্ত চোখের মায়া তার চোখে পানি এনে দিল।

তার চোখে পানি এল। দূর কোথায় কোন সাগর, কোথায় তার কল্লোল? আর তার সেই অর্ধ-সমাপ্ত সাম্পান? নীল রঙের কাজ অসমাপ্ত রেখে কোথায় সে যাচ্ছিল? ভেবেছিল কী, যে, অগাধ নীল সাগরের আর নীল আকাশের তলে বাস করতে যাচ্ছে বলে ওই সামান্য নীল রঙের খেলাকে সে হেয় করে? কী মহা ভুল। আবার তার চোখে জল এল। সেই নীল সাগর আর নীল আকাশ কি ছোঁয়া যায়—সংকীর্ণতায় ও বাস্তবতায় আনা যায়? সে হল দেখবার বস্তু, আর এ-রং হোক না সামান্য আর খেলো—তবু এ-রং সে লাগাতে পারে, এ-রং দিয়ে জিনিস সার্থক করে, নিজেকেও। এই তার ব্যবসা। স্থাবর হতেই তার জন্ম, পরকে ভাসাবার জন্যেই তার অস্তিত্ব, সাগরের ছোঁয়া লাগুক অন্যের অন্তরে। পরের মুক্তিদাতা সে, বন্ধন জড়িয়ে থাক তাকে।

তখনো শুকতারা দপদপ করছে পশ্চিম আকাশে, যখন সে অস্পষ্ট আঁধার বেয়ে ধীরে-ধীরে ফিরে এল, এল পরিপূর্ণ শান্ততায়, পূর্ণতায়।

শ্রাবণ ১৩৫০ জুলাই ১৯৪৩

স্বপ্ন নেবে এসেছিল

কখনো স্বপ্ন গড়িয়ে আসে। অদ্ভুত কথা, তবু সত্যি। মনের উচ্চতম শিখরে স্বপ্ন যেন জমাট বেঁধে রয়েছে বরফের মতো, হঠাৎ কখন কিসের উত্তাপ এসে পড়ে তার শীর্ষে, সে-জমাট-বাঁধা স্বপ্ন গড়িয়ে আসে মন বেয়ে। গড়িয়ে আসে হয়তো লাভার মতো, হয়তো স্নিগ্ধ শীতল পানির মতো, কখনো-বা হয়তো পর্বত-দেহে আঘাত পেয়ে ফিরে-আসা হাওয়ার মতোই আসে। সব জীবন-তো আর এক নয়।

আকবরের স্বভাব শান্ত। শান্তভাবে চলে শান্তভাবে কথা কয়ে সে আই. এ. পাস করেছে এবং শান্তভাবেই বাপের মৃত্যু সহ্য করে শান্তভাবে কেরানিগিরি করতে শুরু করেছে। কথা সে এত কম কয় যে কখনো মনে হয় তার যেন মন নেই, সে যেন ভাবে না; অথচ এ-কথা যখন মনে পড়ে যে প্রত্যেক মানুষ প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তে কিছু-না-কিছু ভাবেই, তখন ওকে চেয়ে দেখে আরো বিস্ময় লাগে।

তার সংসার ছোট। আম্মা, একটি ছোট ভাই ও সে। ভাইটি বেশ ছোট, তার সাথে কথা কওয়া যায় না; আম্মা অতি বড়, তাঁর সাথে কথা কওয়া যায় না; সংসারে তার নীরবতার ব্যাখ্যা হয়তো এই-ই। এবং এই-ই থাকত যদি না হঠাৎ তার মনে স্বপ্ন গড়িয়ে আসত।

যুদ্ধের হিড়িকে কত ওলটপালট হচ্ছে রাতদিন। আকবরের পরিবারে তেমন কিছু হল না বটে, তবে তার ধাক্কা এসে লাগল। বর্মামুলুক থেকে তিনটি প্রাণী—তাদের কেমন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়—তার সংসারে এসে আশ্রয় নিল। একজন আকবরের চাচা, আরেক-জন চাচি আর তৃতীয়-জন তাঁদের মেয়ে। তাঁরা আশ্রয় চাইল, যা আসলে দাবি, যে-দাবির কোনো অর্থ নেই, কিন্তু শান্ত আকবর শান্তভাবেই তাদের আশ্রয় দিলে, তার মন কিছু বললে কি না সে-কথা কে জানে।

বেশ ভালো। অসহায় তারা, আশ্রয় দেয়া ভালো। এবং তারপর কিছুদিন কেটে গেল। কাটল তেমনি শান্তভাবে এবং সামনেও কাটত ঠিকভাবেই যদি-না হঠাৎ আকবরের মনে স্বপ্ন গড়িয়ে আসত।

একদিন সকালে আকবর খবরের কাগজ পড়ছে। পড়তে-পড়তে হঠাৎ এক সময়ে কাগজ নাবিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের পানে তাকাল। ভেতরের উঠোনে রোদ ঝকমক করছে, সেদিকেই প্রথমে দৃষ্টি পড়ল। তারপর হঠাৎ নজরে পড়ল ওই যে মেয়েটি—চাচা-চাচির মেয়েটি—সে বাঁশে কাপড় শুকোতে দেবার চেষ্টা করছে। বাঁশটা বেশ উঁচু, ও চেষ্টা করছে হাতের শাড়িটা ওপরের দিকে ছুড়ে দিয়ে বাঁশে আটকাতে, কিন্তু বারবার সে ব্যর্থ হচ্ছে। মেয়েটিকে এতদিন সে ভালো করে দেখে নি, আজ দেখলে, অর্থাৎ দেখবার ভয়ানক ইচ্ছে হল বলে দেখলে। আগে সে একে-তো ভালো করে চেয়ে দেখে নি, তার ওপর দেখেছে ঘরের ছায়াতে, আজ প্রথম চেয়ে দেখলে সূর্যালোকের মধ্যে এবং অসহায়তার মধ্যে। আগে তাকে সজীব পদার্থ বলে মনে হয় নি, মনে হয়েছে সে কিছু-একটা, অথচ আজ কড়া সূর্যালোকে প্রথমে চোখে পড়ল তার শীর্ণ দেহ, এবং তার হাত-পা, যা নড়ছে। এবং বর্তমানে নড়ছে এমন কাজে যে-কাজে সে বারেবারে ঠকছে।

অবশেষে শাড়িটা বাঁশে আটকাল, বিছানার চাদরটাও, তারপর সে সরে গেল ওর দৃশ্যপথ

হতে। আকবর তেমনি চেয়ে রইল বাইরের পানে; এবং চেয়ে থেকে হঠাৎ কখন তার মনে হল রোদদীপ্ত উঠোনটা যেন ফাঁকা : সেখানে কী যেন ছিল যা এতক্ষণ সমস্ত দৃশ্যটা আড়াল করে রেখেছিল এবং না-থাকা সে-জিনিসটার কথা মনে হচ্ছে বারেবারে।

ঝড় যখন জাগে তখন হঠাৎই জাগে। মেয়েটির নাম রাবেয়া এবং এ-নাম হঠাৎ বড় জাঁকালো বিজ্ঞাপনের মতো ওর অন্তরে ভাসতে লাগল। তার নাম ও দেহ ছাড়িয়ে আরো কী যেন একটা অস্পষ্ট থেকে-থেকে ধোঁয়ার মতো ছেয়ে উঠতে লাগল তার মন।

সেদিন রোববার। রোববার দিনটা বরাবর তার ভালো লাগে। (ভালো লাগে তার সব দিনই—কর্মমুখর দিনও, অবসর-স্তব্ধ দিনও)। তবে আজ কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকতে লাগল। নিজের ঘরে বসে সে খবরের কাগজ পড়লে অনেকক্ষণ, তারপর চুপচাপ শুয়ে রইল; শুয়ে রইল বটে কিন্তু থেকে-থেকে তার মনটা কেমন খাঁখাঁ করে উঠতে লাগল; কে যেন কাছে এলে ভালো হয়, আর সে যেন আসছে না, সে আসছে না। অবশেষে সে উঠে পড়ল, উঠে ভেতরের দুটি ঘর অর্থহীনভাবে ঘুরে এল। ওদিকের ঘরটায়—যে-ঘরে চাচি, রাবেয়া এবং আম্মা থাকেন—সে-ঘরে দড়িতে ঝোলানো মেয়েটির কমলা রঙের শাড়িটা দেখলে, আর সব ফাঁকা। চাচা বেরিয়ে গেছেন অন্য কোনো বর্মা-ফেরত ভদ্রলোকের সাথে দেখা করতে আর এঁরা সব রান্নাঘরে, তাঁদের কথাবার্তাও মাঝে-মাঝে এক-আধটুকু ভেসে আসছে তার কানে।

আবার শান্তভাবে সে তার ঘরে এসে বিছানায় শুল। বাইরে তার তেমনি শান্তভাব কিন্তু ভেতরটা কিসের প্রবল ধাক্কায় হঠাৎ চমকে উঠল। কোনো কথা নেই, তার অন্তর গর্জে উঠল এবং হিংস্র শ্বাপদের মতো লেজ আছড়াতে লাগল। এত ক্রোধ? এত ক্রোধ যে ছিল তার অন্তরে এ-কথা তো তার জানা ছিল না।

কিছু ভালো লাগছে না। চোখ বুজে সে ঘুমোতে চেষ্টা করলে, এবং খানিক পর একটু তন্দ্রাও এল। কিন্তু সে-তন্দ্রা ভেঙে গেল কাকের অবিশ্রান্ত কর্কশ ডাকে। সে রাগে গরগর করে আপন মনে বললে, সারাদিন জেগে থাক, কাকের বা চিলের চিৎকার হয়তো একবারও তোমার কানে প্রবেশ করবে না, অথচ একটু তন্দ্রা এসেছে কী অমনি সে-চিৎকার তোমার কানের পর্দায় তীক্ষ্ণ ও তীব্রভাবে বাজতে থাকবে।

অবশেষে কণ্ঠ দিয়েও গর্জে উঠল। রান্নাঘরের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, বেলা দেড়টা হল, তবু রান্না হল না আম্মা?

আবার চুপচাপ। এত চুপচাপ আকবরের হঠাৎ প্রবল ইচ্ছে হল যে সে লাফিয়ে ওঠে, ওই যে দূর দিয়ে বেড়ালটা যাচ্ছে সন্তর্পণে আস্তে-আস্তে, তাকে সবল লাথি দিয়ে দূরে কোথায় ছুড়ে ফেলে দেয় যাতে তার হাড়গোড় সব গুঁড়ো হয়ে যায়। আর রাবেয়া? রাবেয়ার ক্ষীণ দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তার ক্ষীণ দেহ কেমন দুর্বল যেন।

খাওয়া হল, নিদ্রাও কিছু হল। ঘুম থেকে জেগে উঠে সবচেয়ে আগে কানে যা-বাজল তা দূর আকাশের চিলের তীক্ষ্ণ চিৎকার। অতি দূরে—হয়তো প্রায় দৃষ্টির বাইরে থেকে ডাকছে সে-চিল, কিন্তু তার চিৎকার তীক্ষ্ণ বল্লমের মতো নিস্তব্ধতার সাগর কেটে চলেছে। তাহলে এই নিস্তব্ধতার বর্তমান যবনিকার অন্তরালে খোলা হাওয়া আর দূরদিগন্ত রয়েছে।

ওর মন বেয়ে তাহলে স্বপ্ন গড়িয়ে নাবছে, স্বপ্ন গড়িয়ে নাবছে তার মন বেয়ে। ঘরময় স্তব্ধতা, ওরা হয়তো সবাই ঘুমে। রাবেয়াও কি? কে জানে। তারপর এক-সময়ে আকবর উঠে পড়ল, উঠে ও-ঘরটা ঘুরে এল। হ্যাঁ, ওরা সব ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু রাবেয়া নয়। কোথায় সে? সে যে ঘুমিয়ে নেই, এ-কথাটা তার মনে হঠাৎ ছলছল করে উঠল আর এত ভালো লাগল তার।

রান্নাঘরের পেছনে যে ছোট বাগানের মতো, সেখানে তখন রাবেয়া পেয়ারা গাছের তলে দাঁড়িয়ে ওপরটা গভীরভাবে লক্ষ্য করছে আর মুখে অনবরত কী চিবোচ্ছে। তার হাতে পেয়ারা, আর কোঁচড়ভর্তি পেয়ারা। নির্জন বাগানে স্তব্ধ দুপুরে রাবেয়ার মন সম্পূর্ণভাবে কাজ করছে আপন নিজস্ব পথে (যা অন্যের সামনে সাধারণত নষ্ট হয়), এবং এ-অসতর্ক মুহূর্তে আকবর

যখন পেছন থেকে বললে : পেয়ারা খাচ্ছ? তখন ভয়ানকভাবে চমকে উঠল সে, এত চমকে উঠল যে তার আঁচল হতে পেয়ারাগুলো সব পড়ে গেল মাটিতে।

—ও কী, তোমার পেয়ারাগুলো সব পড়ে গেল যে!

রাবেয়া নিচের পানে তাকাল বটে তবে সেগুলো তুলবার কোনো চেষ্টা করলে না। আকবর আর কথা বললে না, একটু ইতস্তত করে থেমে গেল। তারপর হঠাৎ এক সময়ে হেসে উঠে সে বলল : তোমার একটা পেয়ারা দেবে আমাকে?

রাবেয়া কিছু বললে না, যেমনি দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি রইল। অবশ্য এর কারণ আছে। আকবরকে সে দেখেছে স্বল্পভাষী, গম্ভীর এবং শান্ত। তার অস্তিত্ব মন স্বীকার করেছে বটে কিন্তু তার সম্বন্ধে কোনো কথা কয় নি। এবং যেটুকু বলেছে তা হল এই যে, এ-লোকটি দেয়ালে টাঙানো ফোটোর মতো, কথা কয় না, হাসে না। এবং এখন সে যখন বাগানে এসে তার সাথে কথা কইতে এবং হাসতে শুরু করলে, তখন তার কেমন যেন মনে হতে লাগল, দেয়ালে-টাঙানো ফোটোটা হঠাৎ নিচে নেবে এসে রক্তমাংসের মানুষের মতো কথা কইছে। একটা অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য : এ-দুটিতে মিল টানা যাচ্ছে না।

কিন্তু আকবরের মন বেয়ে স্বপ্ন গড়িয়ে নাবছে এবং তার গতিও দুর্বার। তাই হঠাৎ রাবেয়ার হাত ধরে সে বললে : দেবে না, সত্যি দেবে না!

রাবেয়া বিমূঢ়। কিন্তু আকবরের অন্তর আবেগে দুর্বার হয়ে উঠল। হঠাৎ হাতটা টেনে তাকে কাছে আকর্ষণ করে উত্তেজনাময় কণ্ঠে বললে : তোমাকে আমি ভালোবাসি, অত্যন্ত ভালোবাসি!

বিমূঢ় রাবেয়ার চোখদুটি হঠাৎ এবার লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, একবার চোখ নত করে আবার সে আকবরের চোখের পানে সোজাসুজি চেয়ে কিছু কম্পিত অথচ সত্য কথার দৃঢ়তা নিয়ে বললে : ছি, আপনি এত ছোট?

রাবেয়া চলে গেল, পেয়ারাগুলো মাটিতে তেমনি রইল পড়ে।

তারপর আকবরের অন্তর আবার হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে উঠল : স্বপ্নের ধারা বন্ধ হয়েছে, এবং আবার তার মনের উচ্চতম শিখরে স্বপ্নের স্তূপ।

এমনি মাঝে-মাঝে মানুষের মন বেয়ে হঠাৎ স্বপ্ন নেবে আসে। নেবে এসে কখনো সফল হয়, কখনো বিফল হয়। কখনো দেখে তলায় কোনো সাগর নেই যেখানে সে মিলতে পারে, কখনো দেখে অসীম অকূল সাগর। প্রথম ক্ষেত্রে স্বপ্ন-নাবা ব্যর্থ হয় চরমভাবে, কিন্তু যাদের চরিত্রের ওপর হাত আছে তাদের অন্তর তখন এত শীতল হয়ে ওঠে যে তার শৈত্যে সে-ধারা আবার স্তব্ধ হয়ে ওঠে কিন্তু যাদের নেই তারা ধ্বংস হয় : স্বপ্ন শুধু বেয়ে-বেয়ে ঝরে পড়ে, ক্রমশ নিঃশেষিত হয়ে আসে, এবং সে-মানুষ সর্বস্বান্ত হয়।

হবার কথাই। কারণ স্বপ্নশূন্য মানুষের অর্থ মৃতক।

পৌষ ১৩৫০ ডিসেম্বর ১৯৪৩

ও আর তারা

[ওর পরিচয় : ওর বয়স পঁচিশ। চেহারা ধারালো, ক্ষুদ্র উজ্জ্বল চোখদুটো অগ্নিতাময়। জীবনে ওর অখণ্ড অবসর, এবং ব্যাংকে অজস্র অর্থ। তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই : কেউ গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে অর্থহীন পুলকে প্রেমিকার খোঁপায় গুঁজে দিলে ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।]

সহজ গতি :

ওর ভাষায় আজ সন্ধ্যার কথা :

সায়ন্তন শান্ত অথচ উজ্জ্বল আকাশে রঙের অসংখ্যতা ও সীমাহীনতা। এবং সে-বর্ণঝর্না যেন আজ অত্যুজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে গুঞ্জনময় কোলাহলমুখর আলোকিত শহরের বুকে। চারধারে ঝলমলানি, অস্ফুট সৌন্দর্যের মৃদু অথচ কঠিন অভিব্যক্তি, প্রাণ-স্নাত নরনারীর সংসৃতি-তরঙ্গের অনাবিল ঝিকিমিকি, এবং সে-ঝিকিমিকির একান্ত অন্তরালে ও নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে—হঠাৎ ফুটন্ত অস্বাভাবিক উত্তুঙ্গ পুষ্পটির পাপড়িগুলো হতে দূরে, ধূসর-স্নিগ্ধ-নির্জনতার একান্তে। (সেটা দোতলার দক্ষিণ-দিকের ছোট ঘরটি।)

এ-সন্ধ্যাটি ওর লেগেছে ভালো। তাই ঠিক করলে যে সন্ধ্যার ঘনায়মান ধূসরতার পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নীরবে সে আজ ভাববে, হাতে জ্বলবে সিগ্রেট, এবং ঘরে থাকবে অনুভূতিময় নিস্তব্ধতা—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না।

হল না তার কারণ এই যে, ঠিক এমন সময়ে হঠাৎ নাক-উঁচু মেয়েটির আগমন ঘটল।

আপনার কবি হওয়া উচিত ছিল, সত্যি।

অযাচিত মন্তব্যে ও সচকিত হয়ে উঠল।

বসুন।

কিছুক্ষণ পর :—কী ভাবছেন?

—কৈ, কিছু না-তো? (ও ভাবছে—[ভাষা তার] : আদি যুগ হতে কবিদল—নানা ভাষায় নানাভাবে, আবিষ্কারে ও গবেষণায় নারীর চরণে তাদের স্তুতি-অর্ঘ্যমালা নিবেদন করে আসছে, এবং সাথে-সাথে গদগদ কণ্ঠে চিরকালই বলে আসছে যে তারা চির দুর্জ্ঞেয়, এবং সাথে-সাথে তাদের চটুল কটাক্ষে চিরকাল ধরে শুধু বিভ্রান্তই হচ্ছে। তাই তারা ওর কাছে সর্বদিক হতে—আকাঙ্ক্ষা, বিকাশে ও ব্যর্থতায় হীন ও দীন। আহা তাদের প্রৈতি ও প্রতিভা যদি অমনি বিপথে নিষ্ফলভাবে ব্যয়িত না হত, তবে এতদিনে মানবজাতি অনুভূতিতে অভিব্যক্তিতে ও বিচিত্র প্রকাশে ঋদ্ধির উচ্চতম শিখরে পৌছতে পারত।)

বা, কিছু না-তো মানে?

তা ভাবছি বৈকি। ভাবছি—

থামলেন যে?

অসমাপ্ত কথাটা নাক-উঁচু মেয়েটির অন্তরে যে তুমুল তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে ও বুঝতে পারল। এবং সে-তরঙ্গ মুহূর্তে নিস্তরঙ্গ করবার কৌশলও তার জানা আছে। তাই বলল :

—বাঃ, আপনাকে আজ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। ঐ রুপালি পাড়, আর গাঢ় কমলা রঙের শাড়ি, তাছাড়া আপনি-তো শরদিন্দুনিভাননী...

—আহা, ভারি তো! মেয়েটির আনন্দের তীব্রতা তাচ্ছিল্যের রূপে প্রকাশিত হল। মনের ভাব ঠিক উল্টো আলোয় প্রকাশ করতে সে অত্যন্ত ভালোবাসে, এবং এটা আসল ভাব দূরীভূত করবার একটা অভিনব প্রচেষ্টা। (ওর ভাষায় : এ-প্রচেষ্টা আধুনিক শিল্প উৎপাদনের মতো ঘোরালো ব্যাপার।)

আপনি সব দিক থেকে ভয়ানক আকর্ষণময়, শুধু—মেয়েটি হেসে ফেলল।

বলুন।

শুধু একটু নীরস।

(তবু নীরস? আশ্চর্য। কৌশল সম্পূর্ণ সফল হয় নি তাহলে।)

তা একটু বৈকি—ও হাসল, কারণ আপনাদের পানে চোখ মেলে তাকাতে পারি কোথায়? কিন্তু মজা এই, তবু মেয়েরা দিনরাত আমার চারপাশে ব্যূহ রচনা করে থাকবেন (কারণ আমার হাতে অর্থের অজস্রতা, যা মেয়েদের কাছে ভয়ানক আকর্ষণময়), বাকিটা সে মনে-মনে ভেবে নিলে।

তারপর ওর একটা অদ্ভুত খেয়াল হল, অতি সস্তা খেয়াল। তাই হঠাৎ বললে :

—জানেন, এমন সময় আমি এ-ঘরে কাউকে আসতে দিই না।

—অর্থাৎ, (মেয়েটি ক্রমশ ফুলে উঠছে) অর্থাৎ আমাকে জানাচ্ছেন যে আপনার এখানে আমার অনধিকার প্রবেশ হয়েছে?—এক মুহূর্তে মেয়েটির কণ্ঠ অভিমানে জমাট হয়ে গেল, আর কখনো, কখ্খনো আমি আপনার কাছে আসব না। জানি, আমার সান্নিধ্য আপনার মোটেই ভালো লাগে না, তবু—যাক।

মেয়েটির ভ্রমরকৃষ্ণ-করা চোখ ছলছল করে উঠল, আর রক্তিম ঠোঁটের পাশে কম্পমান রেখা জাগল। ও তার অনুপম মুখভঙ্গি দেখে মুগ্ধ ও মোহিত হবার চেষ্টা করল, কিন্তু খোদা তাকে তেমন প্রাণ দিলে তো! আহা, এমন একটি মুহূর্ত—বহু তৃষিত-হৃদয় আকাঙ্ক্ষিত পরম-চরম একটি মুহূর্ত, তার হৃদয়ের প্রচণ্ড শুষ্কতায় অনাদৃত, যেন লাঞ্ছিত হল।

কথাটা যেন, হঠাৎ ও বলে উঠল, গেঁয়ো মেয়ের মতো হল। আপনার মতো এমন বিদুষী—এমন প্রগতিশীল মেয়ের মুখে—

সব বিষয়ে বিদ্যের স্পষ্ট প্রভাব থাকে, গ্রীবা উন্নত করে সমুখ পানে চেয়ে দৃঢ়কণ্ঠে মেয়েটি মন্তব্য করল (অবশ্য সজল চোখে, কারণ এখনো তার চোখে রুমাল ওঠে নি), শুধু থাকে না একটি বিষয়ে—

—বুঝেছি সেটি। কবিদের ভাষায় সেটি অতি গুরুতর, কিন্তু যেন আসলে অতি হালকা ও সহজ, এই ধরুন আমার সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়ার মতো।

এবার হাসা উচিত, কথাটায় যেন একটু গুরুত্ব এসে পড়েছে। তাই ও হাসল, হাসল উঁচু গলায়, নাক-উঁচু মেয়েটি হাসল, মেঘ গেল কেটে।

সহজ সরলভাবেই তোমাকে পেতে চাই, বুঝলে?—মেয়েটি আবেশময় কণ্ঠে বললে।

ঝড় :

তন্বঙ্গী মেয়েটি সত্যি অসহনীয়। তার নৈকট্য তীব্র ও উষ্ণ, এবং মদের মতো ঝাঁঝালো। তার দেহময় প্যারির উগ্র-স্নিগ্ধতা, চোখে চৈনিক নারীর স্বপ্নিল ছায়া, এবং তার চলার গতি নিউইয়র্কের সবচেয়ে প্রধান ও জন-সঙ্কুল একটি পথের কথা মনে করিয়ে দেয়। নির্জন পথে হাঁটতে গেলে সে হাঁপিয়ে পড়ে, ঠোঁট গোল করে বলে : তাহলে আমার মনে হয় যেন পৃথিবী হঠাৎ থেমে গেল—অচল হয়ে পড়ল, মনে হয় যেন আমার চারধারে মৃত্যুর মতো অসহনীয় ঠাণ্ডা স্তব্ধতা—ইত্যাদি। প্রায়ই তাকে সন্ধ্যার উজ্জ্বল আলোয় চৌরঙ্গীর এধার-ওধার উত্তাল-ঢেউ-তোলা গতিতে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। না হলে, সে বলে, আমার মাথা ধরে। আরো বলে, কোথায় প্রাণ? আশ্চর্য সব মানুষরা। মৃত্যু আসবার আগেই তারা দেহে মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে তোলে নিবিড়ভাবে। মৃত্যু, মৃত্যু! মৃত্যুকে সে ঘৃণা করে, বার্ধক্যকেও সঙ্গে-সঙ্গে। প্রায়ই সে বলে (পলিন হতে ধার কথাটা) : আমার মৃত্যুর পর তোমরা যেন কেউ আমার মুখ দেখো না, এ-আমার একান্ত অনুরোধ।

এবং সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, সেই তন্বঙ্গী মেয়েটিকেই মাঝে-মাঝে ওর মৃত্যুর মতো স্তব্ধ ঘরে (তুলনাটি সে-মেয়ের) দেখতে পাওয়া যায়, এবং মনে হয়, সেখানে যেন তার উদ্দাম উগ্র রূপটি কিছু শান্ত হয়ে আসে।

তেমনি আজও সে এসেছে—মধ্যাহ্নের প্রখর উত্তাপ দেহে জড়িয়ে।

: আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আপনার প্রাণহীনতায় প্রাণ আছে। অকস্মাৎ একটা হেঁয়ালি মন্তব্য করে বসলে মেয়েটি। হেঁয়ালিময় রহস্যময় কথা (তার ওপর অর্থহীন হলে আরো ভালো)—বলতে ভয়ানক ভালোবাসে সে! কারণ এটুকু তার জানা আছে যে, যে-কথাটা—হোক-না তা অর্থহীন, লোকে বোঝে না, সেটা মানুষের মনে ভয়ানক বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সৃষ্টি করে। এবং তন্বঙ্গী মেয়েটির এ-চেষ্টাটি প্রায়খানে সফল হয় অপ্রত্যাশিত ফল

দিয়ে। এবং আপনার প্রাণময়তায় যথেষ্ট প্রাণহীনতা আছে। ও বললে।

নিশ্চয়ই (কিন্তু মনে-মনে ভয়ানক ক্ষুণ্ন হয়েছে মেয়েটি, তবু বাইরে সমর্থন করবার ঔজ্জ্বল্য!) কারণ আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে যেরূপে যে-জিনিসটিকে দেখি, আসলে সেটি ঠিক তার বিপরীত।

এক বিজ্ঞানী নাকি প্রমাণ করতে চাইছেন যে আমরা মাথা দিয়ে হাঁটি, পা দিয়ে নয়। যুগান্তর আনবে বৈকি সে-বিজ্ঞানী।

দিগন্ত :

দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি একটি ক্রিয়েশন (অবশ্য ওর মতে)। আর মেয়েটির মতে এবং তার পণ্ডিত বন্ধুদের মতে সে সর্বমুখী প্রতিভাময়ী, এবং গোটা ভারতের মধ্যে বিশিষ্ট নারী। রূপের চকমকি আছে তার, তার ওপর আবার সযত্ন কারুকার্যের ঝলমলানি, আর আছে সব অদ্ভুত ভাবের অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য, যাতে সে নিঃসন্দেহে মৌলিকত্ব দাবি করতে পারে। কিন্তু ওর ভাষায় সে-সব : উলঙ্গ, বিদ্‌ঘুটে, খাপছাড়া : কানে-কানে মৃদুগুঞ্জন করতে এসে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠার মতো।

আরো, আরো আছে। দীর্ঘাঙ্গী সাহিত্যিক। বছরে একবার সে কবি ও লেখক-লেখিকাদের লেখা সঙ্কলন করে (অবশ্য তাতে রবিবাবুর লেখা ঢোকাতে সে ভয়ানক ঘৃণা করে। ওঁর লেখা দেখলেই নাকি তার বিষাক্ত সাপের কথা মনে পড়ে) মাঝে-মাঝে সে ঠোঁট কুঁচিয়ে বলে : ঐ বুড়োর হাওয়া লাগলে, সেরেছে, আমার পত্রিকাও যাবে বুড়িয়ে। তার মতে : বাঙলার তরুণের তারুণ্য তিলে-তিলে হরণ করছেন তিনি। বন্ধুরা শুনে শিউরে ওঠে। একটা বার্ষিক পত্রিকা বের করে, যা নাকি ভারতবর্ষ পেরিয়ে দূরে বহুদূরে ভেসে যায়। বিদেশীরা যান্ত্রিক ঘোরপ্যাঁচে ঘুরে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, তারা মেঘমল্লার গান চায়। চায় নতুন গন্ধ, নতুন ছন্দ, আর চায় স্নেহ, আর তার জন্যে তারা চাতকের মতো চেয়ে রয়েছে দীর্ঘাঙ্গীর পানে। (গোপনে একটি কথা : আমেরিকার এক ধনকুবের আকাঙ্ক্ষা করেছিল আরো ঢের বেশি। দার্ঘাঙ্গী বলে : তার আশায় প্রচণ্ডতা ছিল।)

আকাশ যেন ফেটে যায় হঠাৎ। মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠেছে :

—বিয়ে, বিয়ে! বিয়ে কী? অতি কুৎসিত কথা—বর্বর যুগের কথা। বিয়ে আর চরিত্র—এ-দুটি শব্দ আমার কানে যেন তীর ছোড়ে। যত সব ঝুনো হাড়-চিবোনো কথা, অদ্ভুত, নোংরা, জঘন্য, ড্রেনের পচা সব আইডিয়া—। এবং এ-আইডিয়ার জন্যে সে বিশেষ বিখ্যাত হয়ে পড়েছে রঙিন যুবকমহলে। সেখান হতে প্রতিধ্বনি আসে : সত্যি তো! বিয়ে, বিয়ে! বিয়ে কী?

ওর কাছে মাঝে-মাঝে তার আগমন ঘটে। কারণ ওর নিঃসঙ্গতা সে পছন্দ করে, উত্তেজিতভাবে সমর্থন করে। আর বলে : তোমার নিঃসঙ্গতা যে চুম্বক।

চাঁদ ও আকাশ :

জীবন কিছু নয়, শুধু একটি রঙ্গমঞ্চ। এই হল স্বপ্নিল মেয়েটির মত। এবং এ-মতকে সে নানা বিচিত্র ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ ও বিকাশ করতে সদা ব্যস্ত। দেশী ও বিদেশী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকে নাকি তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, দেশীরা যাতায়াতে, বিদেশীরা পত্রালাপে। তার সব সময় এমন একটি ভাব যেন পেছনে কোনো ক্যামেরাম্যান ওত পেতে ছবি তুলে চলেছে। প্রায়ই তাকে তার ঘরে (তার মামাতো ভাই গোপনে সংবাদটি প্রচার করে) একাকী কখনো কথা কইতে, কখনো হাসতে, কখনো-বা কাঁদতে দেখা যায়। তার সম্বন্ধে একটি ভারি মজার কথা ইদানীং রটেছে। ওর বান্ধবীর মা মারা গেলেন। খবর পেয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে গেল স্বপ্নিল মেয়েটি। তার বান্ধবীর মা, তাই তার দুঃখের সীমা

নেই। অত্যন্ত বিষাদময় কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে সেখান থেকে ফেরবার পথে ওর মামাতো ভাইকে প্রশ্ন করলে : কেমন হয়েছিল? মামাতো ভাই বললে : পারফেক্ট। কোনো খুঁত নেই। শুনে সে তৃপ্ত হল। কে যেন এ-সম্বন্ধে পরে প্রশ্ন করেছিল। সে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলল : অভিনয় একটা উঁচুস্তরের সাধনা। অভিনেতা বা অভিনেত্রী তখন পরাকাষ্ঠা লাভ করবে যখন সে নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারবে। নিজে ব্যথা দুঃখ আনন্দ ইত্যাদি পেলে চলবে না। (যেমন আমি সেদিন—।)

জীবন আমার দিন-দিন যেন অসহনীয় হয়ে উঠছে। হঠাৎ দেহে একটা শান্ত ঢেউ তুলে জানলার ধারে গিয়ে হাওয়ার মতো বললে স্বপ্নিল মেয়েটি। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতা। তারপর তার চোখে ব্যথার ছায়া ঘনিয়ে উঠল (ক্লোজ-আপ হলে ভালো হয়), ছলছল কণ্ঠে সে বললে : আকাশের নীলিমা, সাগরের কানাকানি, দমকা হাওয়ার উদ্দাম সুর—(থেমে রিক্ত হাসি হাসল সে, চোখ ঘুরিয়ে, তাকালে দূরে। তারপর), সবকিছু যেন ফাঁকা আবছা হয়ে আসছে। একটু স্তব্ধতা। তারপর (মিডিয়াম সট্ হলে ভালো হয়) হঠাৎ সে বিদ্যুদ্বেগে ফিরে দাঁড়িয়ে বিভ্রান্ত চোখ মেলে তাকালে ওর পানে। (ক্লোজ-আপ হলে ভালো হয়।) তাকিয়ে হঠাৎ সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল :

—কেন, কেন? এর একটা কারণ বলে দিতে পার তুমি?

—কারণ? ওর চোখ কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকল। কোনো উত্তর নেই।

—না হলে অন্তত একটা উপায়?

—উপায়? ওর চোখ কড়িকাঠ হতে নাবাল। তারপর সে নিরুত্তর।

—বল না! মেয়েটির চোখে মিনতি। (অদ্ভুত এক্সপ্রেশন। আলবৎ ক্লোজ-আপ।)

—আমি! ও হাসল : আমি কী বলব?

(মিডিয়ম সট্) স্বপ্নিল মেয়েটি হঠাৎ বহ্নিশিখার মতো দীর্ঘ ও লেলিহান হয়ে উঠল। ধারালো কঠিন গলায় সে বললে :

—নিষ্ঠুর হয়ো না।

ও চুপ। আর ভাষা জুটছে না।

—বল! আবার একটা আর্তনাদ।

ও চুপ।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে হঠাৎ আবার সে ক্ষিপ্রগতিতে ফিরে দাঁড়াল। ঘাড় নত, সমস্ত দেহ শক্ত ও দীর্ঘ। যেন একটা বজ্রাহত দেহ। (তারপর ডিজল্ভ টু হলে ভালো।)

অল্পক্ষণ পর। ধীরে ঢেউয়ের গতিতে স্বপ্নিল মেয়েটি এগিয়ে এল, দেহে অবসাদ। আলগোছে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে আড়চোখে সে ওর পানে তাকাল, শুধাল :

—কেমন?

—অদ্ভুত অদ্ভুত! ও হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

স্বপ্নিল মেয়েটির ঠোঁটে একটু হাসি।

উড়ন্ত পাখি :

: অতল সমুদ্রের মতো গভীর আপনি—এ-কথাটি বললে ক্ষীণ-কটি লালচে মেয়েটি যত খুশি হয়, তার চেয়ে খুশি হয় যদি তাকে বলা হয় : সূর্যের মতো প্রচণ্ড আপনি, সূর্যের মতো ধাঁধা-লাগানো আপনি। মন্তব্যটি অবহেলায় গ্রহণ করে তার চোখ উদাসীনতায় ধূসর হয়ে ওঠে।

যারা তার দুর্বলতার স্থানটুকু জানতে পেরেছে তাদের অনেকেই ক্ষীণ-কটি মেয়েটিকে সে-কথা যখন-তখন বলে থাকে। এবং সেটা শুনে-শুনে মেয়েটির ধারণাটুকু দৃঢ় হয়ে গেছে যে,

যেখানে তার গমন ঘটুক না কেন, সবখানেই সে সবার চোখ সূর্যের মতো ঝলসে দেয়।

(ও আরো বেশি বলে : বলে, আপনার উত্তাপে আমি গরম হয়ে উঠি।) পথ দিয়ে যখন চলে তখন কারো পানে সে তাকায় না, কারণ এটুকু সে জানে যে সবাই তার পানে চেয়ে রয়েছে। (এ-পন্থাটি সে বিখ্যাত লোকদের লক্ষ্য করে শিখেছে, এবং যেন নিরুপায় হয়ে অবলম্বন করেছে সেটা।)

ও ভাবে : ক্ষীণ-কটি লালচে মেয়েটি যেন এন্ডারসন বা লেড্‌ল'র বাড়ির শো-কেসের পুতুল : যেন একটি জীবন্ত এডভার্টিজমেন্ট।

কারণ বেশভূষায় ও প্রসাধনের ওপর তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ও বলে : দিনের অন্তত আটটি ঘণ্টা আমি ব্যয় করি সব রকমের দৈহিক প্রসাধনে। তার যা আসল বিশেষত্ব তা হচ্ছে এই যে, কাপড়ের স্বল্পতা সে ভয়ানক পছন্দ করে (অবশ্য দেহে)। হাঁটুর কয়েক আঙ্গুল মাত্র নিচে পর্যন্ত সে পেঁচিয়ে পরে সংকীর্ণ শাড়ি, কোঁচানো ইত্যাদি অতিরিক্ত কোনো রকমের অযথা খরচ থাকে না তাতে। প্রায়ই তাকে বিভিন্ন দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিকে জুতো পর্যন্ত ঝুলিয়ে-লতিয়ে শাড়ি পরার বিরুদ্ধে লিখতে দেখা যায়। সবাই পূর্ণ-স্বাধীনতা—পূর্ণ-স্বাধীনতা করছে, এক জায়গায় সে লিখেছিল, কিন্তু শাড়ির এই অর্থহীন ঝুল যে কতখানি তার অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, সে-কথা আজ পর্যন্ত কোনো মনীষী ভেবে দেখলেন না দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত।

তাছাড়া শিরস্ত্রাণ ব্যবহারের পক্ষপাতী সে। কোনো মাসিকে সে একবার লিখেছিল : আশ্চর্য, আশ্চর্য। গরমের দেশে আমাদের বাড়ি, অথচ দেখ না, আমরা কোনো মস্তকাবরণ ব্যবহার করি না। (ও বলে : মস্তকাবরণের আসল হেতু মেয়েটির জানা নাই।) আমাদের দেশে মস্তকাবরণ ভয়ঙ্করভাবে প্রয়োজনীয়। এবং সম্প্রতি ভারতীয়দের জন্যে সে একটা নতুন ধরনের মস্তকাবরণ আবিষ্কার করেছে, যা নিয়ে নানা পত্রিকায় এবং পুরুষ ও নারী মহলে জোর সমালোচনা চলছে।

ওর কাছে সে মাঝে-মাঝে আসে। তবে ওর কাছে আসে সূর্যের জ্যোতি নিয়ে নয়, স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক নিয়ে। তার কারণ আছে। একবার ও সঙ্গোপনে তাকে বলেছিল যে, আপনার কটি এত ক্ষীণ যে মনে হয় আমার বায়রনী-অসূয়কতাকে গলা টিপে ধরা হয়েছে। সেদিন কী যেন একটা উচ্ছ্বাস এসেছিল ওর মাঝে, বলে ফেলেছিল এমন একটা অদ্ভুত কথা, এবং সেই থেকে ক্ষীণ-কটি লালচে মেয়েটির তার কাছে আগমন একটা নির্ধারিত ব্যাপার হয়ে পড়েছে। (এর আরো একটি কারণ আছে। সেটা হচ্ছে : এই সে-আকস্মিক উচ্ছ্বাসের পর হতে ও ক্ষীণ-কটি লালচে মেয়েটি সম্বন্ধে একেবারে চুপ।)

: আপনার বয়স কত?

: ছি ছি ও কী কথা! মহিলা ক্ষুণ্ন হলেন।

: দুঃখিত। কিন্তু কত?

: পঁয়তাল্লিশ।

ও দেখলে, মহিলার কপাল লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। সে বিস্মিত হল, মুগ্ধ হল। অবশেষে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললে :

—কী সুন্দর আপনি!

—বাঃ ।

—সত্যি ওই লাল-হওয়া—অকৃত্রিম রং। দেখি নি কখনো। (হঠাৎ) আমাকে বিয়ে করবেন? মহিলা অপাঙ্গ দিয়ে একটা অদ্ভুত কটাক্ষ করলেন। (সেটা ওর পছন্দ হল না।)

তবু ওদের বিয়ে হল। হল এক শান্ত সন্ধ্যায়, এবং তার পরদিন প্রশান্ত নির্মল সকালে সে-সংবাদ সারা শহরে সম্প্রচারিত হয়ে পড়ল। সংবাদটি কৌতুকের একটা প্রচণ্ড সংক্ষোভ সৃষ্টি করলে বান্ধবী-মহলে। মন্তব্যের পর মন্তব্য, বাক্যের ঢেউয়ের পর ঢেউ (অভিনন্দনও), উচ্ছ্বসিত হাসি, বক্র হাসি, গোল হাসি ও তীক্ষ্ণ হাসিতে ভরে উঠল সে-দিনটি।

ও-ও হাসল। হাসল স্ত্রীর স্থূল মুখের পানে চেয়ে। এবং তার ভাষায় : স্নিগ্ধ শান্ততায় একটি সিগ্রেট ধরিয়ে সে ছাড়তে লাগল তৃপ্তিময়, স্নেহের মতো কোমল এবং তুলোর মতো হালকা নীলাভ ধোঁয়া।

পৌষ ১৩৫০ ডিসেম্বর ১৯৪৩

সবুজ মাঠ

সামনের মাঠটা উঁচু হয়ে উঠে গিয়ে কিছু দূর হতে আবার নেবে গেছে। নেবে গেছে অনেকখানি। এতখানি নেবে গেছে যে, দূরের সুপুরিগাছ দুটোর শুধু আগা দেখা যায় এখান থেকে।

আকাশটা আজ নীল—ঝকঝকে নীল। এবং সে-আকাশের তলে সবুজ মাঠটি মানিয়েছে ভালো। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রাবেয়া সেদিকে চেয়ে আছে বটে কিন্তু তাঁর মন নেই সেখানে। নির্দিষ্টভাবে নেই কোথাও, কিন্তু সামনের মাঠটার নেবে-গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মধ্যে যে কেমন একটা নীরব উদাসীনতা, তাতে তার মনটা থেকে-থেকে বেদনায় ছলছল করে উঠছে।

ওপাশে ইজিচেয়ারে আধ-শোয়া হয়ে আকবর খবর-কাগজ পড়ছিল, হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল রাবেয়ার পানে। ক্ষণকাল পরে শুধাল :

—কী দেখছ অত?

—মাঠ—মাঠ দেখছি গো? একটু থেমে আবার বললে, আচ্ছা, ওই পথ দিয়ে সেদিন আমরা এলাম, না?

—হুঁ। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা, তারপর আবার : কিন্তু কেন?

—এমনি। আচ্ছা দেখেছ, এ-দিকের মাঠগুলো কেমন সবুজ? আমাদের ওধারের মাঠগুলো যেন খাঁখাঁ করে। এমন খাঁখাঁ করে যেন মায়া লাগে। পোড়াকপালে মাটি!

আকবর আবার কাগজে চোখ নত করলে, করে হাসল। একটু থেমে বলল :

—তোমাদের ওধারের জন্যে মনটা শুধু কেমন করে, না?

—যাঃ, তা করবে কেন? এমনি বলছিলাম।

তারপর চুপচাপ।

রাবেয়া শুধু চেয়ে-চেয়েই দেখছে। এবার সে দিগন্ত থেকে আকাশে দৃষ্টি তুললে। ওই ওটা কী উড়ছে? শঙ্খচিল? বোধহয়। কেমন ধীরে-ধীরে ওড়ে তারা, দেখে মনে হয় যেন কত ওদের বিদ্যেবুদ্ধি আর বয়স। শ্রদ্ধা হয় দেখে। পাখিকে দেখে তা হলে শ্রদ্ধাও হয় মানুষের। তা হয় বৈকি? শ্রদ্ধাও হয় মায়াও হয়। যেমন চড়ুইগুলোকে দেখে মায়া হয়।

শঙ্খচিল উড়ছে আর উড়ছে। আর চেয়ে দেখছে ধরণীর পানে। দেখছে কি এই মাঠের পানে—সবুজ মাঠের পানে? কে জানে।

রাবেয়ার চোখে ঘোর লেগেছে। এবং সে-চোখের পানে আকবর আবার তাকালে।

—এই।

—উঁ?

—শোন। এস, এ-ধারে এস।

হয়তো রাবেয়ার মনের উদাসীনতা হাওয়া হয়ে ভেসে এসে আকবরের মনে লেগেছে। জানলা দিয়ে দিগন্তের পানে চেয়ে তার মনটাও কেমন করে উঠল। রাবেয়া তখন কাছে এসে

বসল, তখন তার চোখের পানে চেয়ে হঠাৎ সে হাসল, হেসে ওর হাতটি ধরে বলল :

—জান, ফেলে-আসা পথ দেখে আমার মনটাও কেমন যেন হয়ে উঠত। সে অনেক আগে। এখন আর করে না, রোদে-জলে শক্ত হয়ে গেছে সে-সব।... এই!

—উঁ?

—তাকাও আমার দিকে—। কেন, এই যে, আমি চাকরি পেয়েছি, দুজনায় এখানে এসে ছোট সংসার পেতেছি—এসব তোমার কিছু ভালো লাগছে না?

—লাগছে।

—তবু মাঠের পানে চেয়ে মনটা কেমন-কেমন করে ওঠে, না?

তারপর আকাশে কখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, ঝিটা কখন ঘরে আলো দিয়ে গেল, মনের নিবিড় স্তব্ধতার মধ্যে তা তারা জানতে পেলে না। এক-সময়ে আকবর চমকে উঠল, হেসে বলল :

—দেখেছ?

রাবেয়া চোখ তুলে চাইল।

—আমার চোখে জল।

আকবর বললে তার চোখে জল, সময়, ঘর ও মনোময় এ-বিস্তৃত ও নিবিড় নীরবতার পর আকবর শুধু বললে যে, তার চোখে জল। কিন্তু কেন? কোন সে-ব্যথায় অন্তর-নিংড়ানো এ-জল?

তার উত্তর আকবর নিজেই দিলে।

—জান, এ-দুনিয়ার কত পথ অতিক্রম করেছি, কখনো হয়তো পেছনে ফিরে চেয়েছি কখনো-বা তাকাই নি, সে-সব ফেলে-আসা আবছা-হয়ে-ওঠা পথের জন্যে আজ চোখে হঠাৎ জল ছেপে এল।

তারপর নীরবতা। কিছুক্ষণ সে-নীরবতার মধ্যে হঠাৎ একটা হাসির আওয়াজ ফিসফিস করে উঠল।

—হাসছ কেন, এই, হাসছ কেন?

হাসছিল কেন-যে, তা আকবর নিজেই জানে না।

—হাসছিলাম বুঝি? হাসে, লোকে এমনি সময়ে হাসে। স্মৃতির ব্যথায় চোখে জল এলে সে-জলের ব্যথায় আমার হাসি আসে।

রাবেয়া স্তব্ধ হয়ে রইল।

গভীর রাতে হঠাৎ ঝড় এল। মানুষের চোখে যখন ঘুম, তখন হঠাৎ ঝড় এল। ঘুম হতে জেগে উঠে রাবেয়া জানলা বন্ধ করতে গেল। গেল বটে কিন্তু জানলা বন্ধ করা তার হল না, সেখানেই সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বৃষ্টি নাবল, তীরের মতো তীক্ষ্ণ তার ফোঁটাগুলো। বৃষ্টির ঝাপটায় রাবেয়ার দেহের অর্ধাংশ ভিজতে লাগল, এবং টিনের ছোট ঘরটার কম্পনের সাথে-সাথে তার অন্তরও কাঁপতে লাগল। আকবর জেগে উঠে তাকে শাসন করলে না, বরঞ্চ সেও উঠে গিয়ে তার পেছনে দাঁড়াল কাঁধে হাত রেখে।

—ভয় পেয়ো না, আমি। ঝড় দেখছ?

রাবেয়া মাথা নাড়ল।

—দেখ, এই আমাদের পৃথিবীর ঝড়। তোমার চোখ আছে বলে শান্ত তুমি, ওর নেই বলে ও অমন প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।

কেউ কোথাও নেই। নিশুতি রাতে এই বিচিত্র ঝড়। বাইরের পানে রাবেয়া যে-বড় তাকিয়ে আছে, সে দেখছে নাকি কিছু? কিছু না। এবং তাই তার মন অমন অভিভূত হয়ে পড়েছে।

—কোথায় তোমার সে-পথ রাবেয়া?

রাবেয়া নীরব। দুজনার মাঝেই তারপর হতে প্রকাণ্ড নীরবতা। মানুষের কষ্টের জগৎ এখানে নীরব। এক-সময়ে রাবেয়া ফিরে তাকাল আকবরের পানে, কয়েক মুহূর্ত চেয়ে-চেয়ে দেখল তাকে, তারপর কেমন এক ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করল :

—তোমার চোখ অমন জ্বলছে কেন, এই?

রাবেয়া ভয় পেয়েছে কি? মানুষকে দেখেই মানুষের অনেক সময় ভয় করে, ভয় করে মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে।

রাবেয়া এবার আর্তনাদ করে উঠল :

—কে, কে তুমি?

এ আবার কেমন প্রশ্ন? তবু সে-জগতে—যে-জগতে মানুষের কণ্ঠ একেবারে নীরব—সে-জগতে ঝড় প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে বলে আকবর চঞ্চল হল না, শান্ত-কোমল গলায় উত্তর দিলে :

—আমি মানুষ।

অত তরঙ্গশূন্য স্থির গলায় লোকে কথা কইতে পারে নাকি? বাইরে ঝড় হলেও তার অন্তরে হয়তো ঝড় নেই। সেখানে মানুষের কণ্ঠ নীরব হয়ে রয়েছে। তারপর এক-সময়ে মানুষের সে-কণ্ঠ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। রাবেয়াকে আকবর কাছে আকর্ষণ করলে, তার মুখপানে চেয়ে দেখলে, তারপর জানলাটা বন্ধ করে দিলে।

ছোট ঘরটা হঠাৎ শান্ত হয়ে উঠল। লণ্ঠনের শিখাটি আর কাঁপছে না। আকবর ডাকলে : ভুল পথে যাচ্ছিলে, এবার এস।

কিন্তু কোথায় আসবে? আসবে আকবরের বুকের কাছে, তার আশ্রয়ে।

বাইরে অবিশ্রান্ত বর্ষণ। রাবেয়ার স্তব্ধ দেহের সাথে দেহ ঠেকিয়ে আকবর হেসে ফেললে, বললে :

—এই পৃথিবীর ঝড় দেখছিলে, এবার মানুষিক ঝড়ের গল্প শোন। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা, তারপর : তুমি তখন ছোট, ফ্রক পরে বেড়াও। সেই মায়াবিনীর কথা বলেছিলাম তোমাকে, সে এমনি এক কালো রাতে—এমনি এক ঝড়ো রাতে নৌকোডুবি হয়ে মারা যায়। দেখি নি কেমন কালো হয়েছিল সে-রাতটি, জানি না কেমন উত্তাল হয়ে উঠেছিল ঝড়, শুধু শুনেছি আর কল্পনা করেছি। যখন তার মৃত্যু-সংবাদ আমার কানে এসে পৌঁচেছিল তখন দিনটি শান্ততায় মৌন ও উজ্জ্বল রোদে ঝকঝকে। মায়াবিনীর—

—কী নাম ছিল?

লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় এবার আকবর রাবেয়ার পানে তাকাল। ওর চোখে যে-ছায়া ছিল, সে-ছায়া কেটে গিয়ে চোখে এখন স্বচ্ছতা, এবং সে-স্বচ্ছতায় সাধারণ কৌতূহল।

—মোমতাজ।

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। শেষে রাবেয়াই বললে :

—কই, বল?

আকবর আবার শুরু করলে : বলছিলাম কী, আমি ভাবি মায়াবিনীর চোখের মায়া তখন কি মুছে গিয়েছিল? সে-চোখে মরণভীতি কি ফুটেছিল? আমি ভাবি।

আকবর থামল, থেমে আবার বলল : আরো ভাবি।

ক্ষণকাল, চুপচাপ। তারপর আস্তে রাবেয়া শুধাল :

—কী ভাব?

—ভাবি, তাকে আর এখনো ভালোবাসি কি না?

—এখনো ভাব?

—তাকে আমি ভালোবাসি।

—এখনো?

—হ্যাঁ।

বর্ষণের আওয়াজে আর মোহ নেই। মোহ কেটে গেছে। কোথা হতে একটা পিচ্ছিল সাপ কিলবিল করে উঠল, গর্ত খুঁচিয়ে কে তাকে বার করলে? রাবেয়া হঠাৎ মাথা তুলে তাকাল আকবরের পানে। ওর নাকটা কেমন টিয়ের ঠোঁটের মতো বাঁকা। কিন্তু তাতে হয়েছে কী? না, হয় নি কিছু, তবে সে-বাঁকা নাকের পানে চেয়ে রাবেয়ার অন্তর কালো হয়ে ঘনিয়ে উঠল।

আবার বালিশে মাথা রেখে রাবেয়া চোখ বুজে পড়ে রইল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যে। আবার সে মাথা তুলে চোখ মেলে তাকাল ওর পানে। সে-বাঁকা নাকের দুপাশে চোখদুটো নিস্তেজ হয়ে উঠেছে, মন দূরে কোথাও উড়ে গেছে বলে তার চোখে ভাষা নেই।

চোখে ভাষা নেই, তবু তার গলায় কেমন যে আওয়াজ করে উঠল। ঘড়ঘড় করে সে-আওয়াজ হল, সে কথা কইল।

—সে-সন্ধের কথা মনে পড়ে। চারজন বেহারার কাঁধে হলদে রঙের পালকিটা আস্তে-আস্তে সেই কলাবনের ধার দিয়ে—দূরে সরে যাচ্ছে। আর আকাশে সন্ধে ঘনিয়ে উঠছে—অশুভ কালো সন্ধে নিবিড় হয়ে উঠছে আকাশে।

রাবেয়ার মন প্রশ্ন করল, কে ছিল গো সে-পালকিতে? তবু মুখে সে বলল না কিছু। তারপর চুপচাপ। এবং সে-নীরবতার মধ্যে রাবেয়া শুধু চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল আকবরকে। ওই চোখদুটি অমন নিস্তেজ কেন? মনে হয় যেন মরা মানুষের চোখ— ওতে প্রাণ নেই। প্রাণ তো নেই-ই। কোথায় কোন্ সাঁঝের আবহাওয়াতে মায়ার সন্ধানে হারিয়ে গেছে।

রাবেয়া অকারণে লণ্ঠনটার পানে তাকাল। ইস্, চিমনিটা কী কালো! ঝিটা কিছু কাজ করে না। কাল সকালে তাকে ধমকে দিতে হবে। ভেবে দেয়ালের পানে সে দৃষ্টি ফেরাল। সে-দেয়ালে একটা ছায়া—ছায়াটা এমন যে মনে হচ্ছে ঠিক একটা বুড়োর মুখ। লণ্ঠনের পাশের চেয়ারটিতে তার ছাড়া ময়লা শাড়িটা, সেই শাড়িরই ছায়া ওটা। ওটা বুড়োর না বুড়ির মুখ? ওধারে আর সে চাইবে না।

কিন্তু বর্ষণ থেমে গেছে বলে ভালো লাগছে না; মনের মধ্যে কী যেন থেমে গেছে, চলতে পারলে হয়তো ভালো লাগত। অবশেষে রাবেয়া ডাকলে :

—এই?

ওর গলার আওয়াজ শুনে আকবর হঠাৎ হেসে উঠল। ক্ষণকাল চুপ থেকে বললে :

—দেখেছ, আমার চোখে জল।

শুনে রাবেয়া আবার বালিশে মাথা গুঁজল। তারপর কী ভেবে ধাঁ করে মাথা তুলে খনখনিয়ে উঠল :

—এসেছে-তো আবার হাসছ কেন? বলেই আবার নিবিড়ভাবে মাথা গুঁজলে। সব শান্ত।

কিন্তু তার কণ্ঠটা অমন খাঁখাঁ করে উঠেছিল কেন? অশ্রুসজল চোখে আকবর ওর পানে তাকাল, দেখলে শুধু দুলের নিচে কানের কোণটা, দুলটা, আর গালের প্রান্ত। দেখলে শুধু ওইটুকু। এবং দেখে হঠাৎ তার মনে হল রাবেয়ার মনটা যেন উপুড় হয়ে রয়েছে, ভাবলে আকবর বারেবারে, তারপর তার মনটা হঠাৎ হাওয়া হয়ে উড়তে লাগল : দেখল আকাশ, আর সে-আকাশে কত-কত তারা। উড়তে-উড়তে কোনো তারায় হয়তো মনটা বাদুড়ের মতো ঝুলে পড়ল লট্‌কে, তারপর দুলতে লাগল আর চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল সে, বহু-বহু নিচে একটা নিঃসঙ্গ মন উপুড় হয়ে রয়েছে। বাদুড়ের মতো ঝুলছে আর ঝুলছে, আর শুধু চেয়ে-চেয়ে দেখছে...। তারপর একসময়ে হঠাৎ ডানার ঝট্‌পট আওয়াজ, উপুড়-হয়ে-থাকা মনের কাছে সে-বাদুড়-মনটা ঈগল পাখির বেগে নেবে আসছে। পেছনে কত-কত তারা, কী বিশাল আকাশ... তবু।

তারপর শান্ত পুকুরে কিছু পড়ার আওয়াজ। না, পড়ার আওয়াজ নয়, সে-আওয়াজ

আকবরের কণ্ঠের। সে ডাকলে :

—এই। তার কণ্ঠ কোমলতায় বর্ষার ভরা-পুকুরের মতো টলমলে হয়ে উঠেছে।

কোনো উত্তর নেই। আবার :

—এই। আকবর অপরাধীর হাসি হাসল। বললে, তোমাকে ভুল পথ হতে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে আমিও পথ ভুল করলাম। সাধে কি আর মানুষ!....

—এই, কথা কও না কেন?

ও কথা কইবে না।

—এই, তাকাও আমার পানে।

ও তাকাবে না।

হাত দিয়ে ছুঁয়ে আকবর জানতে পারলে যে তার বালিশটা প্রায় আধখানা ভিজে উঠেছে চোখের জলে। কয়েক মুহূর্ত আকবর স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর ওর মাথার ওপর ঝুঁকে, তীক্ষ্ণ নাকটি ওর নাকের সাথে ঠেকিয়ে কেমন এক গলায় শুধাল :

আচ্ছা, অমন করে তুমি কাঁদ কী করে, ঠোঁটের পাশটাও একটুখানি নড়ে না!

ঘুম হতে জেগে জানলা খুলে ওরা বাইরের পান তাকাল : বর্ষণসিক্ত মাঠটা স্বচ্ছ সূর্যালোকে ঝকমক করছে। ইস্, মাঠের সবুজ রঙটা কী খুলেছে, যেন চৈত্রের নতুন পাতার মতো রং। তারপর রাবেয়া পথটার পানে তাকাল, এবং সে-পথের মধ্যে ঔদাসীন্যের চিহ্ন পেলে না। আর হয়তো তাই তার মনে এমন একটা আনন্দ নিবিড় হয়ে উঠল যে, নীল আকাশের যে-দিকেই সে তাকাল, তার মনে হল যে, মোহমুক্ত সে-স্বচ্ছ নীলিমায় অন্তর শুধু ভরে উঠছে।

আর, আকবরের শুধু একটি কথা বারবার মনে হতে লাগল যে, তবু ভালো, সবুজ মাঠের প্রান্তে তারা জীবনের প্রথম নোঙর ফেলেছে।

চৈত্র ১৩৫০ মার্চ ১৯৪৪

স্বগত

কত গভীর রাতে আফজল রাতের নিঃশব্দতায় কান পেতে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এবং কখনো-কখনো মনে হয়েছে রাতের উত্তুঙ্গ শিখরে দাঁড়িয়ে তারাময় দেয়ালে হেলান দিয়ে সে চেয়ে রয়েছে নিশ্ছিদ্র অতল অন্ধকারের পানে, তারপর মনটা শূন্য হয়ে উঠে ঐ অন্ধকারের, যে-অনুবন্ধী অন্ধকার চিহ্নশূন্য অথচ অবান্তর নয়, সে-অন্ধকারের ক্ষুদ্রতম কণাতম অংশই যথেষ্ট তার সীমাহীনতার প্রমাণ দিতে—সে অন্ধকারের মতোই হয়ে উঠেছে।

অথচ তারাময় দেয়ালে হেলান দিয়ে অন্ধকারের পানে সে চেয়ে দেখছে। পেছনে তাহলে বিন্দু-বিন্দু যে-আলোর কণা ছড়িয়ে ছিল, তা কি মহাআলোর বিনয়? থেকে-থেকে কাঁটার মতো বিদ্রোহী মনোভাব খুঁচিয়ে উঠেছে। কী একটা সংগ্রাম। সংগ্রাম।

এবং অনেক রাত ঠেকেছে বিভীষিকাময়।

অথচ সে-বিভীষিকায় নেশা।

শারদীয় রোদ নীল আকাশের তলে ঝকঝক করছে। আফজল চেয়ে দেখল নবাগতার পানে। গতকাল সায়ন্তন নিষ্প্রভ আলোতে তাকে কেমন নিষ্প্রভ মনে হয়েছিল, অথচ আজ সকালের নির্মল উজ্জ্বল সূর্যালোকে তার দেহের ও মুখের রক্ত কী উজ্জ্বল কী প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে।

নবাগতা হাসল আর বলল—আমাকে তোমার মনে আছে?

—কিছু-কিছু। সেই কবে দেখেছি—

—হ্যাঁ, তখন তুমি বেশ ছোট ছিলে। একটু থেমে নবাগতা আবার হাসল, হেসে বলল—ছেলেবেলায় তুমি দেখতে কিন্তু ভারি মিষ্টি ছিলে—

তারপর আফজলের শৈশবকাল নিয়ে অনেক আলাপ হল। বলতে-বলতে নবাগতা একবার জানলা দিয়ে উজ্জ্বল সবুজগাছের পানে তাকাল, তাকিয়ে হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে উঠল।

আফজল একবার আড়চোখে ওর পানে তাকাল। ওর মুখের পার্শ্বচিত্র শুধু দেখা যাচ্ছে। তাতে কেমন যেন কাঠিন্য। কিন্তু সে-কাঠিন্যের কথা ভুলে যেতে হয় তার চোখের পানে চেয়ে। অতীতের কোন স্পষ্ট দৃশ্যে তার মন হারিয়ে গেছে, তাই মনে হচ্ছে যেন তীক্ষ্ণ এবং সুচাগ্র-নিবদ্ধ হয়ে-ওঠা চোখের তারা ভাসছে শুভ্র শূন্যতায়।

তারপর সে-চোখ হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। নবাগতা ফিরে তাকাল আফজলের পানে, তাকিয়ে আস্তে হেসে বলল : ছেলেবেলায় মনে হত বছরগুলো কত দীর্ঘ, অথচ এখন মনে হয় তার ঠিক উল্টো, শুধু ছেলেবেলায় মানুষের কাছে জীবনটা অতি বড় ঠেকে, তারপর থেকে সে-ধারণা ভাঙতে থাকে, তাও ক্রমশ। কারো-কারো বা হঠাৎ। যেমন আমার। যেদিন আমার জীবনে বিয়ের বাজনা বেজে উঠল সেদিনই যেন স্বচ্ছ পরিষ্কার দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম কী সংকীর্ণ এই আমাদের জীবন। মানুষের যৌবনে প্রৌঢ়ত্বের ছায়া, প্রৌঢ়ত্বে বার্ধক্যের। আর বার্ধক্যে? মৃত্যুর। হয়তো।

কেমন-কেমনভাবে খাপছাড়া ধরনে ও কথাগুলো কইল। আফজল বললে না কিছু, শুধু চেয়ে দেখল নীল আকাশে চিল উড়ছে। আর মনে-মনে ভাবল যে, লক্ষ-লক্ষ বছর আয়ু পেলেও এ-জীবনের পূর্ণ বিকাশ হয় কি না সন্দেহ। ভেবে তক্ষুনি আপন মনেই হাসল, ভাবল, সে কী কথা?

কারণ গত সন্ধ্যায় সে নবাগতার মুখের পানে চেয়ে অকারণে ভেবেছিল যে অধিকাংশ মুহূর্তেই শুধু পুনরাবৃত্তির একঘেয়ে কাহিনী।

হয়তো নবাগতার মুখ তখনো নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল বলেই তার মনে অমন কথা জেগেছিল। আর সে বললে : যতদিন পর্যন্ত না মানুষ তার জীবন সম্বন্ধে ভাবা বন্ধ করবে ততদিন মানুষের মুক্তি নেই। বলে ভাববে যে, এটা সে কী বললে যার কোনো অর্থ নেই। জীবনের মুক্তি কী? এবং স্বজীবনের কথা ভাবা ছেড়ে দিলে কোন সে-মহৎ কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করবার বাসনা সে রাখে।

সে ভাববে না কিছু। তাই জানলা দিয়ে তাকাল নারকেল গাছগুলোর পানে, দেখলে সরু-সরু পাতায় সূর্যালোক রুপালি রেখার মতো ঝলসাচ্ছে, আর পেছনে স্বচ্ছ আকাশটা কত গভীর নীল।

নবাগতাও কিছু বললে না। হয়তো এই জন্যে যে, অর্থহীনতার স্তূপ এ-মানব সমাজের অন্যতমা কণা সে, এবং আমরা একথা মানি যে, নিজের দোষ সাধারণ্য দেখতে অক্ষম।

—গোসল করবেন না?

নবাগতা প্রথমে চমকে উঠল। তারপর বললে : করেছি। সকালে করেছি।

আফজল এবার চেয়ে দেখলে যে তার মাথার চুল ভেজা।

ঘরময় অবসাদ। কেমন একটা বিষণ্ন হাওয়ায় ঘরের হাওয়া যেন ভারি হয়ে উঠেছে। আফজল এবার নবাগতার পানে তাকাল। সে নতমুখে তাকিয়ে আছে মেঝের পানে, তার চোখ হতে ঝরছে যেন ম্লানিমা। তারপর এক-সময়ে মুখ তুলে চেয়ে সে হাসল, ম্লানিমা কেটেছে চোখ থেকে, বা লুকিয়ে গেল কোণে-কোণে, পক্ষে-পক্ষে।

—তোমার বিরক্তি লাগছে বুঝি?

আফজল উত্তর দিলে না। কিন্তু বিরক্তি একটু লাগছে বৈকি। নবাগতার শ্বশুরালয়ের নীরস রঙচটা কথায় মনটা কেমন তেতো হয়ে উঠেছে।

নবাগতা আবার হাসল। বললে : অবশেষে তোমাদের এখানে এসে আশ্রয় নিতে হল। জান-তো স্বামীহীনা মেয়ের দাম পাটখড়ির দাম।

ভুল, আফজল ভাবলে। হয়তো-বা বিনয়। আর সে-বিনয় যেন রাত্রির তারাময় আকাশ। অর্থাৎ ছড়িয়ে থাকা বিন্দু-বিন্দু মহাআলো।

—আচ্ছা, তোমার চেয়ে আমি বেশ বড় হই, না?

—হয়তো।

নবাগতার মুখটি হঠাৎ একটু কালো হয়ে এল। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে। তারপর সে হাসল, যদিও সে-হাসিতে বেদনার প্রাধান্য।

—তুমি অমন কেন? একটু থেমে আবার, আমি-তো তোমাদের পর নই—

—ছিঃ, পর হতে যাবেন কেন?

কিন্তু প্রশ্নবোধক সুরটা তেমন জোরালো হল না, এবং হল না বলে কথা সেখানেই থেমে গেল। নবাগতা যখন ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন আফজল তার পানে চেয়ে হঠাৎ ভাবল, রাতের তারাময় আকাশের পানে ও কি কখনো অতন্দ্র চোখ মেলে ধরে নি? আমরা তাকাই বলে সে-মহারাত্রি ও মহাকাশ আমাদের চোখের মতো সংকীর্ণ হয়ে আসে : আকাশকে তাকাতে দাও তোমার চোখের ভেতর দিয়ে তোমার চোখের পানে। হয়তো তা সে কখনো করে নি। নইলে ওর প্রতিটি অঙ্গ অমন সঙ্গ চাইবে কেন? ওর আঁচল পর্যন্ত যেন কথা কয়।

তারপর নির্জন ঘরে নিঃসঙ্গ বসে-বসে হঠাৎ তার মনে হল যেন দেহটি ক্রমশ ভরাট হয়ে আসছে। শেষে মনে হল, দেহ তো নয়, এ যেন মন : মন ভরাট হয়ে আসছে। তার চিন্তাস্রোত অবিরাম পলিমাটি নিয়ে এসে তাকে ক্রমশ ভরাট করে তুলছে।

জানলা দিয়ে ঝকঝকে নীল আকাশের পানে তাকাল সে, তাকিয়ে ভাবল : একদা এমন ছিল যে তার মধ্যে দিয়ে আলো বর্ণালি হয়ে ছড়িয়ে পড়ত। কবে ছিল সেদিন?

হয়তো সংগ্রাম শুরু হবার প্রাক্-পর্যন্ত। এবং এ-সংগ্রাম বিদ্রোহী সংগ্রাম, যে-সংগ্রাম শুধু অর্থহীন বিরাট প্রতিবাদ, অথবা মহাআলোর কণা-কণা বিনয়ের সাথে ধূর্ত অবিনয়।

আফজলের ঘর দোতলায়। হার্ট দুর্বল বলে তার আম্মা থাকেন একতলায়। দোতলা নির্জন। হয়তো এ-নির্জনতা নবাগতার ভালো লাগে, নয়তো আফজলের যৌবনের উত্তাপ ভালো লাগে, তাই সে বারেবারে আসে এ-তলায়। তাছাড়া একতলায় আফজলের আম্মার অস্থিতে অভিজ্ঞতা জমাট বাঁধা, তাঁর চোখে নিঃশেষিতপ্রায় জীবনের নীরব কাহিনী : সেদিকে চেয়ে বা সে-দৃষ্টির তলে বেশিক্ষণ থাকা যায় না।

সে-সময়ে নবাগতা মৃদুস্বরে বললে : জান বোধহয় যে এককালে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছিলাম। তোমার জানাশোনা কোনো ছোট মেয়ে-স্কুলে আমাকে ঢুকিয়ে দিতে পার?

আফজল হঠাৎ চেয়ে দেখল মন দিয়ে, শুধু চোখ দিয়ে নয়, নবাগতাকে দেখে মনে হল একটা উপমা। উপমাটি হল সাপের মাথা।

তারপর থেকে নবাগতাকে তার ভালো লাগল। ভালো লাগল বলে আরো ভালো করে সে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল তাকে। দেখলে তার দেহটা কেমন ঈষৎ স্থূল, মেদের সঞ্চার হয়েছে তার দেহে চুপি-চুপি হয়তো তার অলক্ষ্যেই।

—ছিঃ, মাস্টারনিগিরি করতে যাবেন কেন?

—তবে খাব কী করে? কে খাওয়াবে আমাকে?

হঠাৎ তার কথায় গোগ্রাসে খাওয়ার কুৎসিত ছবি ভেসে উঠল আফজলের মনে, তাই সে কোনো কথা বললে না, তারপর দুজনেই নির্বাক।

নির্বাক অনেকক্ষণই থাকল তারা, এবং মন এ-নীরবতার সুযোগ নিয়ে দৃঢ় আকাশে অস্পষ্ট-হয়ে-ওঠা চিলের মতো কেমন উড়ে-উড়ে বেড়াতে লাগল। বেড়াল বাস্তব নীল আকাশে নয়, মনের অবাস্তব রঙশূন্য আকাশে, আর শারদীয় শান্ত রোদ কেমন নেপথ্যে ঝিমিয়ে-পড়া বাজনা বাজাতে লাগল। কঠিন সত্যের মাঝেও অসত্যের ঝিকিমিকি। একটু-না-একটু হাওয়া বইতেই গাছের পাতার ফাঁকগুলো দিয়ে যে-টুকরো-টুকরো আলো ছড়িয়ে পড়েছে নিচে, তা ঝিকমিক করবেই। জীবন হল মঞ্চ : শুধু পরের কাছে নয়, নিজের অন্তরে যে-দর্শক আছে তার জন্যে। তার জন্যে যেন অভিনয় না হলে নয়। নির্মম বেদনায় আপ্লুত হৃদয়েও ভেতরে কে যেন আবার বেদনার কথা ভাবে।

সুন্দর ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে নবাগতা হাসল, হেসে বলল : সত্যি, দেখো একটা চাকরি।

নবাগতার হাসাটা অভ্যাস। কথারম্ভের আগে কটা একরকম ঘোষণা। হয়তো তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, তাই কথার সঠিক ওজন ধারণা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, এবং এ-জন্যে সে অমনি করে হেসে ওঠে প্রত্যেক কথার আগে।

আফজল হাসল না, কথাও কইল না। অথচ তার দৃঢ়-কঠিন উদ্ধত অন্তর নবাগতার দ্বিধা-সংকোচময় দুর্বল অন্তরের পানে চেয়ে করুণার হাসি হাসল, আর বাইরের স্থূল দেহ ছাড়িয়ে ভেতরে একটি শীর্ণ অসহায় দেহ আবিষ্কার করে ফেলল। শেষ পর্যন্তও সে নীরবই থাকল।

তবু অন্তরে-অন্তরে সে যে অনেক কথাই তখন বলেছিল তার প্রমাণ পেল সন্ধ্যায়, যখন সায়ন্তন নিস্তেজ ধূসর আলোয় বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকা নবাগতার পানে চেয়ে তার সারা অন্তর দুর্বার হয়ে উঠল। অথচ এখনো সে বললে না কিছু, শুধু তাকিয়ে দেখল যে তার দেহের রেখাগুলো এ-ম্লান আলোয় কেমন অস্পষ্ট, আর আলোছায়ায় তার স্থূল দেহ কেমন ক্ষীণ হয়ে উঠেছে।

একটু পরে এ-সম্বন্ধেই সে আবার ভাবল যে, যদিও সে জানে নবাগতার দেহ ঈষৎ স্থূল, তবু তার বিশ্বাস হচ্ছে যে, সে ক্ষীণাঙ্গী। বিশ্বাসটা এমন তীক্ষ্ণ যে তার প্রচেতা মনে সে-বিষয়ে একটু প্রশ্নও জাগছে না।

সে-রাতে আফজলের কেমন ভালো লাগল। কালো আকাশ আর ঝকঝকে অসংখ্য অগুনতি তারা—

তারা আর তারা। এবং কী বিরাট অসীম কালো আকাশ। এবং সে-আকাশের পানে চেয়ে সে অবাক হয়ে ভাবলে যে, কত সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত হয়ে এল সে, যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে সে, যেন সে ছিল বিরাট ফানুস—হঠাৎ হাওয়া-শূন্য হয়ে শীর্ণ হয়ে উঠল, যেন সে শুধুমাত্র দু'চোখ দিয়ে চেয়ে রয়েছে অসংখ্য অগুনতি তারার পানে...

রাত কি বিভীষিকাময়?

আর নয়। আর বিভীষিকাময় নয়! কিন্তু এবার অন্তর যেন বিভীষিকাময় হয়ে উঠল : তার অন্তর যেন সাইট্রিক এসিড দেয়া দুধের মতো ফেটে-ফেটে গেল, খণ্ড-খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ল, খাপছাড়া হয়ে গেল। আর যে-তন্নিষ্ঠ সদাসচেতন দর্শক মন তার অন্তরে সমাক্রান্ত, তার দয়া হল, ভয়ও হল। দয়া হল দীর্ণ মানুষকে, ভয় হল দুর্বল মানুষকে।

তবু এমনিই-তো ধারা। প্রতি মুহূর্তে মানুষের অন্তর কোনো-না-কোনো প্রত্যয় হারিয়ে অমনি খণ্ড-খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়বে, আবার জমাট বেঁধে আসবে অন্য কোনো বিশ্বাসে। গড়ছে ভাঙছে, ভাঙছে গড়ছে, এবং এ ভাঙা-গড়ার তফাতে তীরে বসে দর্শকমন হয়তো সেই স্থিতীয় হালের অপেক্ষায় শকুনির মতো বসে রয়েছে, এবং সে-রূপায়ণ গড়ে উঠবেই একদা পলিমাটির ভারে। চড়া পড়বে, গতির ওপর মৃত বালু ধু-ধু করবে, আর জয়ী দর্শক-মনের চোখ চকচক করবে সে-বিস্তৃত ঝিকিমিকিতে।

কী সর্বংসহা এ-দর্শক মন। তার নবপরিচয়ে আফজল ভুলে গেল যে একটা সুর তার

মনের কোণে গুনগুনিয়ে উঠছিল আর ভুলে গেল যে অন্তরের সংহতিহীন দৌর্বল্যে তার শংকা হয়েছে। অত সব সে ভুলে গেল তার হেতু এই যে : শংকার চেয়েও আরো প্রবল যা হয়েছে তা হল লজ্জা, এবং এ-লজ্জা দর্শক-মনের কাছে।—দর্শকমন অত ঘনিষ্ঠ হলেও তাকে সে চেনে না ভালো করে, এবং সে-মন সর্বংসহা বলে আরো অপরিচিত। এবার আফজল এ-অপরিচিতের কান ঘেঁষে অথচ জনান্তিকে রক্তের তালের দামামা বাজিয়ে আশ্বাস দিলে যে, লৌহ-কঠিন কারাগারে সে বন্দি করে ফেলবে লঘুচিত্ত সদাসচঞ্চল সর্বজ্ঞ অন্তরকে।

তার লজ্জা কি তাতে কাটল? সে তো ভাবলে যে কাটল। তাই সে এবার কালো আকাশের ঝকঝকে তারার পানে চেয়ে ভাবলে যে ঐ অসংখ্য তারার দল মহাআলোর কণা-কণা বিনয় নয়, শুধু মহাতমিস্রার সাগর তীরে ছড়ানো বালুকারাশি।

এবার আফজল তার অন্তর—যে-অন্তর সাপের প্রাণময়তায় ও অস্থিহীন পিচ্ছিলতায় কিলবিল করে উঠেছিল—তাকে ঝাঁপ-চাপা দিয়ে সে গর্বিত, সাপুড়ের মতো তাকাল দর্শকমনের পানে।—আরো চাই? সে-সাপকে হাতের লাঠি করে তাতে শামা পরিয়ে সে কৃতার্থ হল এবার।

আবার এল—আবার এল সেই রাত্রি। সেই রাত্রি—শুধু একটি রাত্রি : বহুরাত্রির কোনো কথা নেই, সময় ও কালের কোনো কথা নেই— শুধু একটি মাত্র রাত্রি—যা গত বা অনাগত, দেখা বা না-দেখার কোনো প্রশ্ন তোলে না।

নবাগতার শরীরে মেদ। তার মুখময় শ্বশুরবাড়ির ঘৃণিত দূষিত আবহাওয়ার স্পষ্ট কালিমা। তার বীতজ্যোতি চোখে অস্বাস্থ্যকর ক্ষুধা। তার গোগ্রাস ভক্ষণ। তার প্রতি অঙ্গের সঙ্গ কামনা।—ঘৃণ্য, ঘৃণ্য সব স্মরণ।

আবার আফজলের দেহ জমে উঠল। ফানুস আবার ফুলতে-ফুলতে এত বড় হয়ে উঠল যে আকাশ প্রায় ছোঁয়-ছোঁয়। অবশেষে ছুঁল-ই, তারপর আবার সেই রাত্রির কথা : তারাময় আকাশে হেলান দেয়া, নিচে অতল অসীম অন্ধকার, বিদ্রোহ আর সংগ্রাম। আর রাতময় বিভীষিকা।

হোক বিভীষিকাময়, দর্শক-মনের কাছে পরাজয় মেনে নেয়া চলে না, তাকে সে নাই-বা চিনল, নাই-বা জানল, তবু সে তো সত্য : জনান্তিকে কথা কইলেও তার সাথে কোনো অভিনয় নয়। সবার সঙ্গে অভিনয় সম্ভব, শুধু সম্ভব নয় এর সঙ্গে।

এত করেও দর্শক-মনের ভাস্কর-মুখে জাগল না একটু কম্পন? একটু প্রাণ-স্পন্দন?

তবু হোক জয়, প্রাণশূন্য প্রস্তরেরও হোক জয়, কেন-না জমাট বাঁধা বিপুল শক্তি সে-অচল প্রস্তর।

আশ্বিন ১৩৫১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪

মানসিকতা

ক-দিন হল সামনের বাগান ও লনওয়ালা দোতলা বাড়ির মালিকরা বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে। তাদের আগমনে খালি-পড়ে-থাকা মৃতপ্রায় সে-বাড়িটা হঠাৎ প্রাণ পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠল। শুধু প্রাণ তো নয়, দীপ্ত যৌবনেরও আবির্ভাব ঘটেছে বলা যেতে পারে। রাতারাতি আচমকা পরিবর্তন ঘটে গেল সে-বাড়িটায়। দরজা-জানলায় ঝুলতে লাগল রঙিন পর্দা, মোটা ও ভারি এবং আমেঝে পর্যন্ত ঝোলানো, আবার কোনোটা পাতলা ঝিরঝিরে। সিঁড়ি, রেলিং ও বারান্দার প্রান্তের ওপর-নিচ পূর্ণ হয়ে উঠল নানারঙা ফুল ও পাতাগাছের টবে-টবে। তাছাড়া

কখনো পিয়ানোর ও রেডিয়োর আওয়াজে, কখনো উচ্চকলহাসিতে অহরহ মুখর হয়ে উঠল গোটা বাড়িটা।

মালিকদের প্রত্যাবর্তনের পর থেকে সেলিমা উত্তরের গরাদ-দেয়া কিছু-ভাঙা জানলাটার পাশে কাজের ফাঁকে বারেবারে এসে দাঁড়াতে শুরু করেছে। তার জন্যে এখন সে-বাড়িতে আকর্ষণের বস্তুর অভাব নেই, মাথায় ফেটি-বাঁধা বেয়ারা-খানসামাদের সতর্ক সাবধানী ছুটোছুটি থেকে শুরু করে সুদৃশ্য সব মোটরের নিঃশব্দ আনাগোনা—সবকিছু আকৃষ্ট করে, কিন্তু চরম আকর্ষণ হল তিনটে মেয়ে। এখন কার্তিকের মাঝামাঝি, শীত পড়তে আরম্ভ করেছে। তাই যখন-তখন ওই মেয়েরা দোতলার খোলা বড় বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে হয়তো রোদ উপভোগ করে, আর কথা কয় ও হাসে। যদিও তারা সেলিমার কাছে দুর্দমনীয় আকর্ষণ এবং যে-আকর্ষণের জন্যে তাকে দিনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বারেবারে এসে দাঁড়াতে হয় জানলাটার পাশে, তবু তারা আবার তার অন্তরে সৃষ্টি করে একটা অস্পষ্ট জ্বালা, যে-জ্বালা কখনো-কখনো এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তার অসহ্য ঠেকে। মেয়েদের ফুলন্ত সজীবতা, গায়ের উজ্জ্বল রং, তাছাড়া চমকপ্রদ শাড়ি-ব্লাউজ পর্যন্ত তার মনে আগুন ধরিয়ে দেয়।

কিন্তু আজ সকালে সেলিমার মন অপেক্ষাকৃত শান্ত। জানলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে, ওধারে সামনের বারান্দায় দুটি মেয়ে রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কেবলি কথা কইছে, অথচ তার মনে এতটুকু জ্বালার স্পর্শ নেই : আজ তার অন্তরভরে কী একটা অস্পষ্ট সুরের গুঞ্জন।

এ-গুঞ্জনের কারণ গতকালের একটি বিচিত্র ঘটনা।

তখনো সন্ধ্যা হয় নি, এ-জানলায় এমনিভাবে সে দাঁড়িয়ে আর ওই মেয়েরা চমকপ্রদ শাড়ি পরে নিচে বাগানের কেয়ারি দেখে-দেখে মন্থর গতিতে পায়চারি করছে। তাদের পানে চেয়ে সেলিমা মগ্ন হয়ে ছিল, হঠাৎ এক সময়ে সাইকেল-বেলের শব্দে চমকে উঠল, ওধারে চেয়ে দেখলে যে সুন্দর চেহারার একটি ছেলে সাইকেলে করে এদিকে আসছে। এমনি কত লোক আসে-যায়, হেঁটে, সাইকেলে, মোটরে। সেলিমা চোখ সরিয়ে নিল তক্ষুনি। ছেলেটি যখন ঠিক জানলার সামনে তখন আবার অকারণে সে তাকাল তার পানে এবং এবার তাকিয়ে হঠাৎ বিস্মিত হল : ছেলেটি কেমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার পানে। তারই পানে। ওধারে সুন্দর বাড়ি, বাগান আর চমকপ্রদ শাড়িপরা মেয়েরা। এক পলক। বুকটা একটু কাঁপল, তারপর দৃষ্টি নত করল সেলিমা। আবার যখন সে চোখ তুলে তাকাল তখন ছেলেটি বাঁকের ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেছে আর বাগানের মধ্যে মেয়েরা কথায়-কথায় উঁচু ও তীক্ষ্ণকণ্ঠে হেসে উঠেছে।

এই তো ঘটনা। তবু সেই যে বুকটা একটু কাঁপল, সে-কম্পন থেকে সেলিমার অন্তরময় জাগল কেমন একটা অস্পষ্ট সুর—যে-সুরে আজ সকালেও তার অন্তরটা গুঞ্জিত। ঘটনাটা সামান্য বটে, তবু বিচিত্রও কম নয়। মেয়েরা বাইরে থাকলে-তো কথা-ই নেই, আর না-থাকলেও সে-বাড়ির সবকিছু এ-ধারের আস্ত শূন্য ইট-বের-হয়ে-থাকা ঝুনো বাড়িগুলো থেকে ঢের আকর্ষণীয় বলে পথচারীদের পক্ষে সেদিকে না-তাকানো দুষ্কর, আপনা থেকেই তাদের চোখ ঠিকরে পড়ে সেদিকে। কাজেই ছেলেটির ব্যবহারটা বিচিত্র বৈকি : এদিক দিয়ে গেল, অথচ তাকিয়ে গেল জরাজীর্ণ বাড়িগুলোর পানে—একটা জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা সেলিমার পানে।

রোদ ঝলমল করছে। নীরবতায় কাক ডাকছে। একটা রিকশা গেল ঠুনঠুন করে। কিন্তু সেলিমার অন্তরের সুর-স্রোতের মধ্যে বারেবারে ভেসে উঠছে পদ্মের মতো ছোট চোখ, এবং মনের চোখ দিয়ে সে-চোখ দেখে মুগ্ধ হচ্ছে সে। পদ্মের মতো সে-চোখ তারই। সুন্দর তার চোখ, এবং সে-কথা এ-মুহূর্তে নতুনভাবে ও বিচিত্র স্নিগ্ধতায় জেগে উঠছে তার মনে। টানা, কোমল ও নিবিড় তার চোখ : তার চোখ সুন্দর। ও বাড়ির কথা সে ভুলে গেল, বারান্দায় দাঁড়িয়ে-থাকা মেয়েরা মুছে গেল দৃষ্টিপথ থেকে, হঠাৎ ছলছল-উচ্ছল আনন্দে তার ভেতরটা পূর্ণ হয়ে উঠল আর একটা ঝংকার জাগল সারা দেহে।

চোখের সৌন্দর্যের কথা সেলিমা ভুলে গিয়েছিল। এই চোখ দিয়েই সে তাকিয়েছে সামনের বাড়ির পানে, তাকিয়ে তার অন্তর জ্বলেছে। অথচ এখন সে-স্মরণ তাকে জয়ীর আনন্দে বিহ্বল করে তুলল। এই চোখ ঘিরে এখন কত কথা মনে পড়ছে। পড়ছে বাড়ির কথা। বাড়ির পেছনে গোয়ালঘরের ওধারে গিয়ে দাঁড়ালে গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে আকাশ-স্পর্শ-করা কাজল-ঝিলটা দেখা যায়। সেখানে সে কতদিন গিয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু দূরদিগন্তের পানে তাকাবার জন্যে। কতদূরে কত বড় ঝিল পেরিয়ে স্বপ্নের মতো আবছা দিগন্তে তার দৃষ্টি গিয়ে ঠেকত, এবং তার মনে হত : চোখে কি দূরত্বের অস্পষ্টতা, চোখে কি অসীমতার স্পর্শ? এমন করে তাকাতে তার ভালো লাগত, দূরত্বের অসীমতা ও অস্পষ্টতার ছোঁয়ায় চোখ যে ভারি হয়ে উঠত, সে-ভারিত্ব ঘন-মাধুর্যে নিবিড় করে তুলত তার অন্তর। কখনো-কখনো একটা কথা সে ভাবত : আহা, দূরে তাকিয়ে-থাকা চোখদুটি যদি সে দেখতে পেত! আয়নায় তাকালে চোখে দৃষ্টির নৈকট্য-সজাগ বাস্তবতা। কিন্তু যদি সে দেখতে পেত দূরে বহু-দূরে—আবছা অস্পষ্ট দিগন্তের পানে বা তারার পানে শূন্য আকাশের পানে তাকিয়ে থাকা তার টানা, কোমল ও নিবিড় চোখদুটি.....

ঝলমল করছে সূর্য, আর আকাশে নীল প্রশান্তি। নৃত্য জাগল সেলিমার দেহময়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেয়েদের উদ্দেশ করে তার মন বিজয়ীর মতো যেন বললে : যে নৃত্য আমি জানি, সে-নৃত্য তোমরা জান না।

কিন্তু সেলিমার মনের এই নৃত্যোচ্ছল আনন্দ স্থায়ী হল না। তার সে-মনে কোত্থেকে হঠাৎ ঘৃণা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠতে লাগল, এবং সে-ঘৃণা ক্রমশ আনন্দের সে-তীব্রতার মতো তীব্র হয়ে উঠল। এবং এ-ঘৃণা তার ঘরের প্রতি।

আশ্চর্য, আম্মাকে দেখেও ঘৃণা হয়। তার চিররুগ্ণা আম্মা ইদানীং আরো রুগ্ণা হয়ে উঠেছেন, হাতের চুড়িগুলো বিশ্রীভাবে ঢলঢল করে। তাঁর চোখে কালি, মেজাজ খিটখিটে। দুর্বল দেহ নিয়ে তিনি সারাটা দিন সংসারের কাজকর্ম করেন, আবার রাতে কোলের ছেলেটার কান্নায় জাগেন। যখন-তখন তিনি ছেলেমেয়েদের ওপর ঝাঁঝিয়ে ওঠেন; কিন্তু ওদের কান দিয়েও তা প্রবেশ করে না, পিঠে কিছু পড়লেও তারা হাসে। মা যে দুর্বল, মা যে অক্ষম—এতদিনে একথা তারা ভালো করে বুঝেছে, এবং আরো বুঝেছে যে তাদের শক্তির গতি অপ্রতিহত। তাই দুর্বলের শাসনের ব্যর্থ চেষ্টায় ওরা আরো এ-ওর পানে আড়চোখে চোখে চেয়ে বিজ্ঞের হাসি হাসে।

আম্মা যে তাদের মনোভাব না-বোঝেন তা নয়, বরঞ্চ বোঝেন বলেই সামান্য কিছুতেই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, তবু বারবার তাঁর পরাজয় হয়। ছেলেমেয়েরা তোয়াক্কা না করার শূন্য দুর্গে যেন নিজেদের আবৃত করে রেখেছে, ওদের কেশাগ্র স্পর্শ করারও ক্ষমতা তাঁর নেই। তবে তাঁর সে-নিষ্ফল ক্রোধের গতি হয় একখানে। দ্বিগুণ তীব্রতায় সে-ক্রোধ ফিরে আসে সেলিমার ওপর, যাকে এখনো কথা দিয়ে ঘায়েল করা যায়। ভারি কথা দিয়ে তার দেহ যেন থেঁতলানো যায়, তীক্ষ্ণ কথা দিয়ে সে-দেহ কাটা যায় এবং তাই হয়তো আম্মার চোখে এখনো প্রাণের কম্পন।

জানলা থেকে সরে সেলিমা যখন এ-ঘরে এল, তখন আমুরা বোঁ করে ছুটে পালিয়ে গেল সে-ঘর থেকে, পেছনে রেখে গেল তাচ্ছিল্য-করা হাসির ধোঁয়া। সেলিমা নীরবে চেয়ে দেখল, ক্ষীণ শিখার মতো আম্মার সারা দেহ কাঁপছে আর চোখ দিশেহারা। অবশেষে দিশা মিলল, খনখনে গলায় হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন :

—সেলি!

সেলিমা নিরুত্তর।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তুই করিস কী?

সেলিমা পূর্ববৎ। এদিকে মনের মধ্যে ঘৃণা আরো জোরালো হয়ে উঠছে শুধু। দুর্বলতমার

আবার কেন শক্তি-প্রয়োগের এমন হাস্যকর প্রচেষ্টা? কিন্তু আম্মা আবার চেঁচিয়ে ওঠেন, গলাটা এবার কাঠ-কাঠ, তাই আওয়াজটা তীক্ষ্ণ ও ধারালো।

—সেলি!

তারপর ঘরটা কেমন স্তব্ধতায় ভরে উঠল, এবং কয়েক মুহূর্ত পর সে-স্তব্ধতার মধ্যে তার আম্মা হঠাৎ কেঁদে উঠলেন, কেঁদে উঠলেন জীবনে ব্যর্থ রিক্ত অসহায়ের মতো। সেলিমা এবারো কিছু বললে না, বরঞ্চ নিশ্চিতভাবে হারানো কোনো কিছুর সন্ধানে উবু হয়ে চৌকির তল পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। তারপর হঠাৎ সে কান্নার আওয়াজ তার অন্তরে গিয়ে লাগল, এবং লাগল যেন কেমনভাবে, আর তাই তার সে-অন্তর ছলছল করে উঠল বেদনায়, আহতের মতো ব্যথিত রিক্ততায় চেঁচিয়ে উঠল বারেবারে : তার আম্মা অমনভাবে কাঁদবেন কেন, কেন কাঁদবেন এমনি অসহায়ার মতো?

—তোরা জাহান্নামে যাবি, বুঝলি, জাহান্নামে যাবি, খোদার গজব পড়বে তোদের ওপর—আম্মা হাঁপাচ্ছেন, চোখে তাঁর ক্রূর হিংস্রতা।

সেলিমার মন আবার জমাট বেঁধে গেল : যে-মন কয়েক মুহূর্ত আগে আম্মার জন্যে বেদনায় ছলছল করে উঠেছিল, সে-মন আবার বিরূপতায় জমাট বেঁধে গেল। কী হিংস্র আম্মার চোখ! মানুষের চোখ কি অত হিংস্র হয়? আর তাঁর জিহ্বা দিয়ে যেন বিষ ঝরছে, তার স্পর্শে হয়তো মৃত্যু নিশ্চিত।

সেলিমা নীরব হয়েই রইল, এবং এমন কি একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালও না আম্মার পানে।

যুদ্ধের বাজার। ছেলেমেয়েদের অনেকদিন আধপেটা থাকতে হয়। ছ-বছরের ছেলে আমু—যার মুখে এখনো ভালো করে কথাই ফোটে নি, সে গলা ফাটিয়ে কাঁদে আর বলে, আম্মা ডাইনী; সে-কথার সুর ধরে আমুর বড় কামুটা বলে, ডাইনীই-তো বটে, নিজে লুকিয়ে-লুকিয়ে এই এ্যাত্ত-এ্যাত্ত খায়, আর আমাদের দেয় না। কামুর বড় জামু হয়তো বয়সের জন্যে জোরে কথা কয় না, ঘাড় নিচু করে আড়চোখে চেয়ে ফিসফিস করে বারেবারে বলে : খোদার গজব পড়বে, খোদার গজব পড়বে।

সেলিমার এক-এক সময়ে ইচ্ছে হয়, হিংস্রতায় মত্ত আমু-কামুদের টুঁটি টিপে মেরে ফেলে, কিন্তু হয়তো আম্মার হাতে চুড়ি ঢলঢল করে বলে অথবা সামনের বাড়ির মেয়েরা ফোটা ফুলের সজীবতায় হাসে বলে সে কিছুই করে না, বলেও না কিছু।

কখনো হঠাৎ তাদের এসব কথা আব্বার কানে যায়। শুনে তিনি শুধু একবার বাজখাঁই গলায় ধমকে ওঠেন, এবং ছেলেরাও ভয় পাবার ভান করে নিরীহ হয়ে থাকে। কিন্তু একদিন তিনি প্রচণ্ড ক্ষিধে নিয়ে বাড়ি ফিরে শুনলেন যে চালের অভাবে তখনো ভাত চড়ে নি, শুনে তিনি গুম হয়ে রইলেন কতক্ষণ। তাঁর চেহারা দেখে জামুরা আস্তে-আস্তে সটকে পড়ছিল, দেখে হঠাৎ তিনি ক্রুদ্ধতায় সজাগ হয়ে উঠলেন। হাতের নাগালে ছিল আমু তাকে বেকায়দায় ধরে মেঝেতে আচমকা আছাড় দিয়ে ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন : বল, বল কে হয় সে? তোর মা, না কে? ছেলে চুপ, কাঁদলও না পর্যন্ত; হয়তো আব্বার আক্রমণটা এত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে তার কণ্ঠ থমকে গেল, এতটুকু আওয়াজ পর্যন্ত বের হল না। কিন্তু ছেলে না-কাঁদলে কী হবে, ওধারে আম্মা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন সর্বহারার মতো আকুলিতভাবে। শুনে আমুর গলা দিয়েও এবার কান্না চিরে বেরুল : নিমেষে চোখ বুজে ফেলে, মুখ উঁচু করে নাকী ও দীর্ঘ সুরে সে কাঁদতে শুরু করল, আর তার মুখের হাঁর মধ্যে জিহ্বাটা লকলক করতে লাগল কুৎসিতভাবে। আব্বার আচমকা এ-আক্রমণে সেলিমার মন চমকে উঠে বেদনার্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আমুর সে-লকলকে জিহ্বা নজরে পড়তেই তার মন বিষিয়ে উঠল, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সে নিশ্চল হয়ে রইল। আব্বা তারপর আশ্চর্য কাণ্ড করলেন। হঠাৎ এগিয়ে এসে

আম্মার পায়ের কাছে বসে পড়ে ঘন-ঘন কবার নাকে খত দিয়ে লুঙ্গি পরেই দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আম্মা সে ব্যাপার লক্ষ্য করলেন কি না কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, যেমন কাঁদছিলেন তেমনি কেঁদে চললেন। কাঁদতে-কাঁদতে তাঁর কান্নার সুর ক্রমশ নরম ও কোমল হয়ে উঠল, এবং তিনি সে-কোমল নরম কণ্ঠে অন্তর হতে বেদনার স্রোত ঢেলে স্বপ্নময়—আশ্চর্য, যেন স্বপ্নময় আওয়াজেই কাঁদলেন বহুক্ষণ।

এবং, সেলিমার মন যদি অসময়ে অমন বিষিয়ে না-উঠত তবে সে-কান্নার এমন আওয়াজে তার মন হয়তো আর্দ্র ও বেদনার্ত হয়ে উঠত, হয়তো-বা চোখও উঠত সজল হয়ে। কিন্তু তার মন নীরব হয়ে থাকল শুধু, এবং দীর্ঘ অপেক্ষার পর আম্মার কান্না থামলে সে আস্তে একবার তাঁর পানে তাকাল, দেখল, অশ্রুর বন্যায় তাঁর হলদে ও ফ্যাকাসে চোখ কিছু স্বচ্ছ কিছু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর, কে জানে, তাঁর অন্তরে হয়তো এমন ঘুমন্ত শান্তি নেবেছে।

মোটমাট তাদের ঘর তিনটে। বাইরের প্রায়ান্ধকার ঘরটা, বৈঠকখানা ও আব্বার শোবার ঘরও। উপরন্তু সেটি জামু-কামুর পড়বার ঘর। ভেতরের দুটি ঘরের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বড় সে-ঘরে ছেলেমেয়েরা শোয়। তাছাড়া বাক্স-পেটরা আর যত জঞ্জালের স্তূপ সেখানে। দেয়ালঘেঁষে দুটো নড়বড়ে চৌকি জোড়া লাগানো, তার ওপর শুয়ে ওরা গরমকালে আইঢাই করে, এবং ঘুমিয়ে গেলে কেউ-না-কেউ চৌকি থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়ে বাকি রাতটা সেখানেই কাটায়। তাতে অবশ্য এক সুবিধে : কারো লাথালাথি আর খেতে হয় না। এবং শীতকালে একটা মাত্র লেপের তলে সবকটি গুটি মেরে শোবার চেষ্টা করে। শুয়ে প্রথমটায় রোজ গোলমাল চলে। লেপের প্রান্ত চায় না কেউ, কারণ লেপের প্রান্ত নিয়ে শোয়া মানে লেপ ছাড়া শোয়া। জেগে থাকলে প্রান্তটি টেনে গায়ে রাখা যায়, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে সেটা সরে যাবেই। কাজেই গোলমাল চলে, টানাটানি, বকাবকি কোনো-কোনো দিন মারামারিও। অবশেষে এর মীমাংসা হয় আব্বার উগ্র গলার ধমকে, (মাকে কে তোয়াক্কা করে?) নয় দেহ-ভাঙা ঘুমে। আর রাতে, যাদের দেহ হতে লেপ সরে যায়, তারা কাশে খকখক করে।

পাশের ঘরটা—যাকে অর্ধেক ভাঁড়ার ঘর বলা যেতে পারে, সে-ঘরে সেলিমা তার আম্মার সাথে শোয়। সারারাত চাল-ডালের লোভে ঘরময় ইঁদুর ছুটোছুটি করে, ছুঁচো কিচকিচ করে, আর আরশুলাগুলো নিশ্চিন্ত মনে দেহময় দাবড়ে বেড়ায়। তাছাড়া কোলের ছেলেটির থেকে-থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠা চাই-ই।

সেলিমার ঘুমটা কম হয়। রাতের অধিকাংশ অংশ তন্দ্রায়-তন্দ্রায় কাটে। আজ শুতে দেরি হয়েছে। মাথাটা অকারণে কেমন গরম হয়ে রয়েছে বলে তন্দ্রারও কোনো লক্ষণ নেই। এবং এ-নির্ঘুম মনে বারেবারে ওই ছেলেটির দৃষ্টির কথা তার মনে পড়ছে : সাইকেলে যেতে-যেতে সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে রয়েছে তার পানে। এবং সে-দৃষ্টির কথা স্মরণ করে সে দীনতায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠল : তার ঘরের কথা জানলে কি তার পানে এমনভাবে তাকাবার প্রবৃত্তি হত ছেলেটির?

তারপর সেলিমার মন স্তব্ধ হয়ে গেল। স্তব্ধ নয়, যেন ডুবে গেল, এবং অনেকক্ষণ পর চেতনায় ফিরে এল আরেক জোড়া দৃষ্টি নিয়ে, যে-দৃষ্টির পানে চেয়ে-চেয়ে হঠাৎ সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

কী স্পষ্টভাবে মনে পড়েছে সে-দৃষ্টি। কিন্তু, তেমন বেশি দিনের কথা কি। তবে অনেক দিনের বিস্মৃতির পর আচমকা পূর্ণ স্মরণে সে-কথা নতুন-নতুন ও স্পষ্টোজ্জ্বল ঠেকছে।

আর বছর বাড়ি থেকে তারা ফিরছিল। তখন এমনি শীতের প্রারম্ভ। সন্ধ্যার একটু আগে ছোট একটা স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। বাইরের পানে তাকিয়ে সেলিমা প্ল্যাটফর্মের লোকদের আসা-যাওয়া দেখছিল চেয়ে-চেয়ে, হঠাৎ নজরে পড়ল বেশ খানিকটা দূরে ল্যাম্প-পোস্টটার পাশে দাঁড়িয়ে একটা ক্ষীণদেহ ছেলে তাকিয়ে রয়েছে তার পানে, যেন কেমনভাবে। কেমনভাবে যে তা স্পষ্ট করে বলা যায় না, শুধু বলা যায় : যেন কেমনভাবে। এবং সে-দৃষ্টির

স্পর্শে হঠাৎ তার সারা দেহে কী যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল, দৃষ্টি এল ঝাপসা হয়ে। আবার যখন সে স্বচ্ছ চোখে তাকাল তখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে আর ছেলেটি চলে গেছে দৃষ্টির বাইরে। তারপর সে তার টানা কোমল চোখ পূর্ণভাবে মেলে তাকাল সন্ধ্যাকাশের পানে, যেখানে বেদনার ছায়া ঘনিয়ে উঠবে ধীরে-ধীরে। আর সেই বেদনার ছায়া থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই কি ট্রেন ছুটছে, কেবলি ছুটছে? হয়তো। কিন্তু তাহলে আরো দ্রুতি চাই, আরো। দ্রুতি আর বাড়ল না, তাই তার অসহ্য লাগল, এবং কোনো কথা না-কয়ে হঠাৎ উপুড় হয়ে সে শিশুর মতো আম্মার কোলে মাথা গুঁজল। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়েছিল কি? নইলে অমন মনে হল কেন? আম্মার প্রশ্নে সে-যখন মাথা তুলে তাকাল তখন মনে হল যেন সে ঘুম হতে জাগল। আম্মা প্রশ্ন করলেন; ঘুম পেয়েছে? সে মুখ তুলে তাকিয়ে শুধু মাথা নাড়ল, তারপর আবার মাথা গুঁজল তাঁর কোলে। কিন্তু ঘুম এল না, যে আবেশ এসেছিল মনে তা-ও কেটে গেল, বরঞ্চ কেমন একটা তীব্রতায় তা ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকল।

এখনো মনে রয়েছে পাশের মহিলাটির আলাপের কিছু অংশ। হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন :

—আপনারা বুঝি খেস্টান? মাথায় সিঁদুর নেই কিনা তাই শুধোচ্ছি—

—না, আমরা মুসলমান।

—ও। আর কোনো কথা বললেন না তিনি।

কিন্তু হঠাৎ সেলিমার মন ঘৃণায় তিক্ত হয়ে উঠল, সবকিছু নোংরা মনে হতে লাগল। মনে হল, কী নোংরা সিঁদুর, কী নোংরা আম্মার সিঁথির শুভ্রতা। তারপর আম্মার কোল গরম ও কাঠ-কাঠ মনে হতে লাগল, আর এতক্ষণ পরে তাঁর দেহের স্বেদের গন্ধ নাকে লাগতে লাগল জোরালোভাবে। আশ্চর্য সে-গন্ধ, একবার নাকে ঢুকলে যেন ফুসফুসের গায়ে লেগে থাকে, প্রতি নিশ্বাসে নাকে ঠেকে।

হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল সেলিমা, তারপর তাকাল বাইরের পানে—যেখানে এরই মধ্যে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। মুখটা একটু বাড়িয়ে সে অনুভব করল হাওয়াময় ছুটন্ত অন্ধকার, আর আকাশে দেখল ঝকঝকে নীরব তারা, কী হাওয়া, আর কী শীতলতা! হয়তো শূন্য প্রান্তর-ভরে ও ঘুমন্ত গ্রামগুলো-ভরে এমনি ঝোড়ো হাওয়া। আর সেখানে সে-হাওয়ায় মুক্তি : মনের ঝাঁঝালো তীব্রতা থেকে মুক্তি, মায়ের ফ্যাকাসে দৃষ্টি হতে মুক্তি, আর তাঁর দৈহিক স্বেদের গন্ধ হতে মুক্তি, এবং তা-যেন শুধু হাওয়া নয়, প্রেমের হাওয়াও।

জানলায় সেলিমা মাথা রাখল; চোখ নিবিড়ভাবে বুজে ওর মন আহ্লাদী সুরে অন্তরকে শুধাল : উঁহুঁ, প্রেমের হাওয়া আবার কী? অন্তর মনকে শিশু-বোঝানো বোঝাল : ওই হল আর কী। কিন্তু একটু পরে সঠিক উত্তর পেয়ে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললে : প্রেমের হাওয়া বোঝ না মেয়ে? ঝোড়ো বেগে ধরণী ছুঁয়ে তৃণাগ্র ছুঁয়ে, আকাশের অসংখ্য অগুনতি তারা শূন্যতার সাথে তোমার হৃদয়কেও ছুঁয়ে যে-হাওয়া প্রবল বেগে ছুটে বেড়ায়,—শুধু ছুটে বেড়ায়, সেই তো প্রেমের হাওয়া।

কিন্তু ঘরে ছুঁচো ঢুকেছে; এখন পর্যন্ত কোনো আওয়াজ করে নি বটে, তবে তার গায়ের তীব্র গন্ধ সেলিমার নাকে লাগল বলে হঠাৎ পাশবিক জাগতিকতায় সে জেগে উঠল। এবং ধাঁ করে জ্বলে উঠল তার ভেতরটা। জ্বলে উঠল ক্রোধে, ছুঁচোর গন্ধ ছাড়া আর কোনো কারণ নেই বটে, তবু তার সারা মন অর্থহীন বিপুল ক্রোধে দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকল। ওধারে আম্মার দেহে ঘুম : হ্যাঁ, মৃত্যুর মতো নিস্পন্দ ঘুম। আর ও-ঘর থেকে আব্বার নাক-ডাকানো একটানা ভারি আওয়াজ ভেসে আসছে এদিকে। ক্রোধের কারণ কী? ছুঁচোর গন্ধ, মায়ের ঘুম, আব্বার নাক ডাকার আওয়াজ? সেলিমা প্রশ্নের উত্তর পেল না, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একটা দৃশ্য জেগে উঠল তার মনে :

আজ রাতে আব্বার খাওয়া ভালো হয়েছিল। আম্মা যেন কী করে দোপিঁয়াজা করেছিলেন। পূর্ণ তৃপ্তিতে খাওয়া সাঙ্গ করে তিনি কেবলি ঢেকুর তুলতে লাগলেন, হয়তো ভুক্ত দোপিঁয়াজার

পূর্ণস্বাদ লাভের জন্য; এবং সঙ্গে-সঙ্গে গলিত আনন্দে কথার পাহাড় তুলতে লাগলেন। অবশেষে চোখে কেমন দীনতা দেখিয়ে দাঁতের ফাঁকে হেসে তিনি বলতে থাকলেন, অমুক পাড়ার অমুক লোক ধরতে গেলে ছিল ভিখিরি, অথচ আজ সে কন্ট্রাক্টরি করে লাল হয়ে উঠেছে, আর অমুক পাড়ার তমুক-তো এরই মধ্যেই পাঁচখানা বাড়ি তুলে ফেলেছে...

পরের ধনলাভের বৃত্তান্ত কইতে গিয়ে তার কণ্ঠ রসালো হয়ে উঠল, হারিকেনের মৃদু আলোয় জ্বলতে থাকল তার চোখ। কিন্তু ওধারে সেলিমা কাঠ হয়ে বসে রইল।

ছুঁচো কিচকিচ করে উঠল এবার। তা করুক। কিন্তু কিসের আবার প্রেম? আশ্চর্য তিক্ততায় ও ঘৃণায় সেলিমা মনের প্রাঙ্গণে যেন আছড়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠল : প্রেম আবার কী? তাও প্রেমের হাওয়া? তার চোখ দিয়ে জল ছুটে এল : এ-চোখ গেলে ফেলব একদিন, গেলে ফেলব? জীবনময় কদর্যতার মধ্যে চোখের এ-সৌন্দর্য অমুকের লাল-হবার খোশগল্পের মতোই বীভৎস কুৎসিত।

তবু দেহময়-তো যৌবন। নতুন যৌবন। কখন এক সময়ে মনে তিক্ততা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে দেহ সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়ে গেল, এবং নিজের দেহের রেখায়-রেখায় ঘুরে-ঘুরে আস্তে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখল :

ওটা কার পাঁজর? আম্মার হয়তো। কিছুটা পর সে আম্মাকে দেখল। তিনি এলিয়ে পড়ে রয়েছেন মেঝের ওপর, আর তাঁর চারধারে কামুরা নির্মম উল্লাসে বিজয়ীর মতো হাসছে, লাফালাফি করছে। কী হয়েছে তাঁর? সেলিমা এগিয়ে গেল, গিয়ে অবাক হয়ে দেখল যে তাঁর বুক অনাবৃত, আর স্তন দুটি আধমরা কেলো গাইয়ের পালানের মতো রুক্ষ, শীর্ণ ও চর্মসার দেখাচ্ছে। ব্যাপারটার আগাগোড়া কিছুই বুঝলে না সে। অবাক হয়ে ভাবল, কামুরা যে-উগ্র উল্লাসে অমন যে দাপাদাপি করছে, এই কি তার হেতু? তারপর কী হল, সেলিমা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, মায়ের দেহের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ত্রস্তভঙ্গিতে ব্লাউজ খুলে ফেলে বললে : তাতে কী হয়েছে আম্মা, কী হয়েছে? আমি যে বড় হয়েছি, দেখছ না আমার বুক কেমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে? আম্মার চোখ মৃতের মতো নিমীলিত ছিল, কিন্তু এ-কথা শুনে হঠাৎ তিনি উঠে পড়ে শাড়ি সম্বৃত করলেন, তারপর একটা বিচিত্র হাসিতে ভরে উঠল তাঁর সারা মুখ। আহা, তাঁর মুখের তেমন হাসি সেলিমা বহুদিন—বহুদিন দেখে নি, বড় হয়ে আর একদিনও দেখে নি। শিশুচোখে দেখা আম্মার হাস্যোজ্জ্বল মুখ আবার সে দেখল, এবং দেখল, একটা কুৎসিত ঘটনার পর। সেলিমা কী আর করে, কাঁদল সে, কাঁদল নির্মল আনন্দে। কোনো দুঃখ বেদনা আর যখন নেই তখন সে কাঁদবে না তো করবে কী? কিন্তু কাঁদতে-কাঁদতেই এক সময়ে সে হাসল (কারণ সময় যে সঙ্কীর্ণ : হাসি-কান্না আলাদা করবার মতো যথেষ্ট সময়ের অভাব) হেসে আব্দারে গলায় বললে : আম্মা, ও আম্মা, ওই জামদানি শাড়িটা একবার পরো না। কেন পরবে না, বারে? তোমার শরীর না সেরে উঠেছে, তুমি না আবার সুন্দর হয়ে উঠেছ। বুঝলে, ওই শাড়িটা পরে তুমি যদি একবার উত্তরের জানলাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াও, তবে সত্যি বলছি আম্মা, ওই মেয়েরা তোমাকে দেখে হিংসায় জ্বলে উঠবে—

সেলিমার এত সুখ কার যেন সইল না, সে-সুখে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে হিংস্রভাবে আর্তনাদ করে উঠল। কে? না, কোলের শিশুটা হঠাৎ কেঁদে উঠেছে।

কিন্তু ও কি সেলিমার শত্রু? হ্যাঁ, শত্রুই যেন; আর সে কোলের শিশু হলে কী হবে, তার মধ্যে শত্রুতা ও বিরুদ্ধতার প্রচণ্ড শক্তি জমাট হয়ে রয়েছে।

আম্মা তন্দ্রায় জেগে উঠে শিশুর মুখে মাই দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং শিশুও নীরব হল। তারপর নীরবতা, আর সে নীরবতার মধ্যে শিশুর মাইচোষার অস্পষ্ট আওয়াজ বিচিত্র শোনাতে লাগল। সেলিমা ভাবছিল স্বপ্নটির কথা, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর তার মনে হঠাৎ একটা শংকা জাগল : ক্ষুধার্ত বিষাক্ত জোঁক যেন আম্মার বুক থেকে রক্ত চুষে নিচ্ছে!

ভয়াবহ ধারণা। সেলিমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হল এবং যতক্ষণ-না শিশুর তৃপ্ত ও ঘুমে অবসন্ন ঠোঁট মাই থেকে সরে পড়ল আস্তে—কেমন একটা আশংকায় সে উৎকর্ণ হয়ে থাকল। তারপর আবার নীরবতা : বেদনার মতো নিঃসঙ্গ নীরবতা।

ঘুম আর আসবেই-না যেন। অতন্দ্র সেলিমার মনে কল্পনার স্রোত বয়ে চলল : সামনের দোতলা বাড়ির মেয়েদের মুখে হয়তো আশ্চর্য শান্তি, যে-শান্তি আগামী প্রভাতে শতধা হয়ে পড়বে উজ্জ্বল ও ধারালো আনন্দে। অমুক পাড়ার তমুকের অর্থে লাল-হয়ে-ওঠা-মন হয়তো রঙিন ফানুসের মতো ভাসছে প্রশান্তির নীল নির্মল আকাশে। আর পাশের বাড়ির নববিবাহিতা মেয়ে হয়তো স্বামীর বুকের উষ্ণতায় প্রগাঢ় ঘুমে তলিয়ে রয়েছে।

কিন্তু কল্পনা-স্রোতে বাধা দিয়ে হঠাৎ সে অদ্ভুত কাজ করল। ধীরে-ধীরে আবছা অন্ধকারে আম্মার পা-দুটো খুঁজে নিল, তারপর তাতে মাথা রাখতেই তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল এবং রাতের মতোই নীরব থেকে সে কাঁদতে থাকল অঝোরে।

ভালোই-তো। শান্তি ঝরছে, শান্তি!—

মাঘ ১৩৫১ জানুয়ারি ১৯৪৫

কালচার

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি নাবল দেখে কামরুল হাসান পা-দুটো গুটিয়ে বসল, তারপর একটা সিগ্রেট ধরিয়ে হঠাৎ বললে : বুঝেছ, কালচার জিনিসটার যেন একটা গন্ধ আছে যা নাকে এসে লাগে। আর সে গন্ধ রজনীগন্ধার বা হাস্‌নাহানার গন্ধ নয়, অনেকটা যেন ভালো পাতিনেবুর গন্ধের মতো। আর রং? রংটাও বসরা-গোলাপ, সূর্যমুখী-রক্তজবা ইত্যাদির মতো অমন চোখ-ধাঁধানো জলুস তীব্র গোছের নয়, অনেকটা যেন, চাঁদনিরাতের আকাশের বিচিত্র নীলিমার মতো।

বলে কামরুল চোখ বুজল, বুজে আরেকটা কড়া-টান দিলে সিগ্রেটে। আসর আজকে জমল না; অসময়ে হঠাৎ বর্ষার জন্যেই এল না কেউ। তবু কামরুলের ভাগ্য ভালো যে, রাসেল (অর্থাৎ রসুল) এসেছে। রসুলের নাম রাসেল হয়েছে তার ঘোরতর চার্চ-প্রীতি থেকে। এবং এ-চার্চ-প্রীতি ধর্মের মাহাত্ম্য বা চার্চ-গৃহের সৌষ্ঠব কারুকার্য থেকে উদ্বুদ্ধ হয় নি, হয়েছে চার্চগামিনীদের আকর্ষণে। কালো হাঁদা-ভোঁদা যত নেটিব খ্রিস্টান মেয়েরা রোববার দিন যখন দল বেঁধে যাবে চার্চে, রাসেলও চুল শট করে ধোয়া সুটটি পরে গদগদ ভক্তের মতো গিয়ে যোগ দেবে আসরে এবং এর ব্যতিক্রম হবে না কখনো। হাঁদা-ভোঁদা মেয়েদের মধ্যে কোনটি যে তাকে ভেড়া করেছে তা জানা যায় নি আজ পর্যন্ত, এবং সেও এ-প্রসঙ্গটা চাপা রাখে বরাবর। কারো-কারো মতে সে বাছাই-ছাঁটাই করছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত একাজে সক্ষম হতে পারে নি এই কারণে যে, ওর চোখে ওরা সবাই সুন্দরী, কেউ কারো চেয়ে কম নয়।

রাসেল কালচারের ব্যাখ্যা শুনলে, শুনে নীরবই থাকল। বড়-বড় কথা শুনবার তার ভয়ানক শখ কিন্তু আবার সেসব কথা শুনলে ভেতরটা একবার কেঁপে ওঠে। কাঁপলেও তবু শোনে, শোনে প্রগাঢ় ধৈর্য নিয়ে। ধৈর্যের সে বিরাট পাহাড়।

কামরুল একটু পরে আবার মুখ খুলল, খুলে বললে : মনীষী পাস্কাল বলেছেন যে, ক্লিওপাট্রার নাকটা যদি একটু ছোট কি একটু বড় হত, তবে দুনিয়ার ইতিহাস লেখা হত অন্যভাবে।—ও রাসেল?

—বল। ক্ষীণকণ্ঠে রাসেল উত্তর দিলে।

—কালচার আর ক্লিওপাট্রার নাকের সাথে সাদৃশ্য দেখছ?

—না। একটু থেমে আরো ক্ষীণকণ্ঠে রাসেল উত্তর দিলে।

—এমন অদ্ভুত জিনিস এই কালচার যে, চুলমাত্র এধার-ওধার হলে সেটা হয়ে যাবে সম্পূর্ণ আলাদা কিছু। বুঝলে?

—ভয়ঙ্কর ডেলিকেট তো, ইস্! রাসেলের চোখে বিস্ময় এবং কিছু একটা বলতে পেরেছে বলে ভেতরটা স্ফীত। আর শুনে কামরুল হাসল, হেসে আবার চোখ বুজল। তার কথা শেষ।

পরদিন রোববার। যথাসময়ে রাসেল চার্চে হাজির। ওটাকে চার্চ না বলে গুদামঘর বললেই ভালো। শুধু যোগচিহ্নের মতো একটা লোহা খ্রিস্টধর্মের ইঙ্গিত হিসেবে রয়েছে ওর শীর্ষে (তা-ও একটু বাঁকা হয়ে)।

গতকালের কালচার শব্দটা আজও রাসেলের মাথায় ঘুরছে, এবং থেকে-থেকে সে শিউরে উঠে ভাবছে, ইস্ কী ডেলিকেট। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। চিন্তার গতি আর এগোতে চায় না, ওটুক বলেই হঠাৎ যেন হারিয়ে যায় শূন্যে। এদিকে কত মেয়ে আসছে কেউ তাকাচ্ছে না তার পানে, এবং কেউ তাকাচ্ছে কি না-তাকাচ্ছে—তা লক্ষ্য করবার অবসর আজ তার নেই, সে কালচার নিয়ে আত্মস্থ। তবু শত কালচার ভেদ করে একটি কথা বারবার উঁকি মারছে মনের কোণে, আর সে-কথাটি হল এই, এতদিন ধরে তার যাতায়াত এই চার্চে, এবং এ-গতায়াতের ফলে কী লাভ করেছে সে? লাভ করেছে শুধু স্থূল দেহ পাদরিটির চুরোটের ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় খয়েরিবর্ণ-হয়ে-ওঠা দাঁতগুলোর বিগলিত বিকাশ। কিন্তু ঐ অতগুলো মেয়ে, আশ্চর্য অতগুলো মেয়ে? আশ্চর্য, ওদের দাঁত দেখলে না একদিনও। কিন্তু যাক সে কথা। অর্থাৎ যদিচ সেকথা নিয়ে মনটা কখনো-সখনো কেঁদে ফেলে, কেঁদে ফেলে সইতে না পেরে, তবু কালচারটা কী ডেলিকেট, ঐ সইতে না-পেরে হঠাৎ কান্নার মতোই যেন। কামরুলটা পণ্ডিত। ক্লিওপাট্রার নাক যদি... আর থামের পাশে বসা ঐ মেয়েটির নাক যদি—?

আর যাই হোক, খ্রিস্টান ধর্ম ডেলিকেট নয়। বরঞ্চ লোহার মতো কঠিন। কামরুল একবার বলেছে যে, বার্নার্ড'শ বলেছেন যে, বর্বরদের খ্রিস্টান করে খ্রিস্টানধর্মই বর্বর হয়ে পড়েছে। শ পণ্ডিত লোক। তাই ঠিক কথা ধরেছেন। ধর্মটা ডেলিকেট-তো নয়ই বরঞ্চ বর্বরতার শক্ত মৌলিক পিরামিড। না হলে, আশ্চর্য, না হলে অতগুলো মেয়েদের সজীব প্রাণ অমন শক্ত অমন কঠিন (আর অমন অভেদ্য) করে তুলতে পারে? কিন্তু সেকথা যাক। পাদরির ধর্মকথা শোন। আহা, যীশু যা ছিল, অবক্তব্য। অমনটি আর হয় না। তাঁর কথা শুনতে-শুনতে কখনো কি চোখ ছলছল করে ওঠে না? ওঠে, ওঠে, না-উঠে পারে না। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় আসরে বসে রাসেল আর পারল না, কেঁদে ফেললে। কামরুল কী একটা লম্বা বাক্য ছাড়তে যাচ্ছিল, হঠাৎ চমকে থেমে গেল, অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে : কী হল রাসেল? ও রাসেল?

রাসেল সে-কথার কোনো উত্তর দিলে না, শুধু আঙ্গুল দিয়ে শাসিয়ে কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে কাকে যেন বলতে লাগল : আজ বলবই বলব। বলবই বলব।

—বলবে না কেন, বলবে।

—হ্যাঁ, বলব-ই বলব।

—বল।

প্রথমে রাসেল একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে। বলবে বটে, তবে কাকে বলবে? কিন্তু কামরুলের স্থির চোখের পানে চেয়ে স্থির হল তার মন। একটু ইতস্তত করে অস্বাভাবিক ক্ষীণ গলায় এবং ভীতু গলায় প্রশ্ন করল : বলব?

—বল।

একটু থেমে অবশেষে অদ্ভুত গলায় স্বীকার করলে সে : আমি ভালোবাসি।

কিন্তু কামরুল ভালোবাসার কথা শুনলে খেপে যায়। ভালোবাসা? ভালোবাসা আবার কী? ভালোবাসা হল এনড্রিন ও জিনেসিনের বিষণ : তাদের বিষণ থেকে ভালোবাসা জাগে মানুষের

মনে : এবং, অতএব ভালোবাসা বিষাক্ত। আর তাছাড়া ঐ ছুঁচোগুলোর প্রতি ভালোবাসা? ও-গুলো ছুঁচো, বিলকুল ছুঁচো। দেখ না কিচকিচ করে কেমন!

রাসেলের আর গতি নেই। শুধু কাঁদল সে। এবং তার কান্নায় সন্ধ্যার আসরটা কাদা-কাদা হয়ে গেল যেন। যাবার সময় একবার কামরুল তার সাথে কথা কইল, কইল নিচু গলায়। রাসেল উত্তর দিলে :

—কোঁকড়ানো চুল যার মাথায়।

—আরে নাম কী? কামরুল গর্জে উঠল।

কিন্তু সবকিছুর একটা সীমা আছে। সীমা ছাড়া সবকিছু অসহ্য। তাই এবার রাসেল বিদ্রোহ করল, চোখ বিস্ফারিত করে চেঁচিয়ে বললে (কামরুল ভেবেছিল কী না জানি বলবে সে) : আমি জানি না।

ওর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে কামরুল আস্তে বললে :

—বেশ।

পরদিন কামরুল আবার গর্জে উঠল :

—ঐ কোঁকড়ানো চুল যার মাথায়!

রাসেল নিশ্চল।

—ভালো হবে না বলছি, রাসেল। রাসেল! হয় তুমি আমাদের ছাড়, নয় ধুন্দুলমুখো ছুঁচোটির ওপর দরদ ছাড়।

রাসেল এবারো চুপ। মিয়া হেছাবুদ্দিন কিন্তু তার পক্ষ নিলে। বিগলিত ভক্তিময় কণ্ঠে কামরুলকে বোঝাতে লাগল মহব্বতের আসল রূপ-সম্বন্ধে। বললে, আশেক-মাশুকের হেরফের। এমনও বললে যে, আশেক-মাশুকের পারাপার হবার যে সেতু অর্থাৎ এশক, সে-এশকের ওপর এখন দাঁড়িয়ে রাসেল, এমন সঙ্কটময় অবস্থায় ওকে নিয়ে নাড়া-চাড়া করলে একটা ভয়ঙ্কর রকমের এস্পার-ওস্পার হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অতএব, সে কোঁকড়ানো চুলওয়ালী—

—সেই ধুন্দুলমুখো ছুছুন্দরী—? রাসেল!

রাসেল আবার কেঁদে ফেললে।

—রাস্কেল! দাঁতের ফাঁকে আওয়াজ করল কামরুল।

কিন্তু রাসেলও মানুষ, কামরুলও মানুষ এবং মানুষে-মানুষে প্রেম হয়। যাবার সময় তাই আস্তে ওর কাঁধে হাত রেখে কামরুল নিচু গলায় বললে শুধু :

—আচ্ছা, আমি দেখি।

পরদিন কামরুল আবার গর্জে উঠল। দেখবে সে, কিন্তু কী করে দেখবে? ঐ ছুছুন্দরীটার সাথে পরিচয় করবার কোনো পথ নেই, অন্তত প্রত্যক্ষভাবে। মিয়া হেছাবুদ্দিন বোঝাল অনেক, রাসেলও কাঁদল প্রচুর, অবশেষে যাবার সময় কামরুল শুধু রাসেলের কাঁধে মৃদু একটা চাপ দিলে। তার পরদিন ভোর থেকে কামরুল গর্জাতে লাগল, চা খেতে-খেতে হুমকি দিলে ক-বার। অবশেষে সাদা ট্রাওজার ও সাদা শার্ট পরে মাথায় হ্যাট চাপিয়ে পাদরির ঘরের উদ্দেশে সে বেরিয়ে পড়ল। হ্যাটের তলে মুখটি কিন্তু ভয়ঙ্কর।

মেয়েগুলো সব এতিম (ভাবতেই কামরুলের ভেতরটা গর্জে উঠতে চায়)। একটা মিশনারি উইভিং স্কুলে তারা কাজ করে আর সংলগ্ন বোর্ডিঙে থাকে। পাদরিটার বাসাও কাছাকাছি। তবে এ-দুয়ের মাঝে ম্যাট্রনের একটা বাসা আছে বলে সে-বিষয়ে কামরুলের মন ঘোলাটে নয়। আর তাছাড়া তার মনটাও নরম হয়ে এসেছে যথেষ্ট। না-হয়ে তো আর উপায় নেই। রোজ-রোজ যদি কেউ অমন হাপুস-হুপুস করে কাঁদাকাটি করতে থাকে, আহা বেচারা! যা হোক, লোকটা নেহাত বেচারা। মাথায় একটু ইয়ে থাকলেও লোকটাকে মায়া লাগে।

একটা মাঠ। মাঠের ধারে ছোটখাটো একটা জঙ্গল। নানা রকম ঝোপঝাড়ে ও

গাছে-গাছে ভরা স্থানটা, আর তার ওপাশেই ওদের বোর্ডিং, পাদরির বাসা। গাছের ফাঁকে-ফাঁকে লাল-টালির ছাদ চোখে পড়ে। পথটা জঙ্গলটার ধার দিয়েই অর্ধচন্দ্রাকৃতি হয়ে ঘুরে গেছে ওদিকে। একবার লাল-টালিগুলোর পানে চেয়ে একবার পথের পানে চেয়ে কামরুল তার চলার গতি কিছু শ্লথ করল, করে পাদরির কাছে ব্যাপারটা কী করে পাড়বে মনে-মনে সে কথার শেষ মহড়া দেবার উদ্যোগে প্রথমে বললে, আহা বেচারা সত্যি বেচারা!

কিন্তু ভাবা আর হল না। হঠাৎ পথের পাশে একটা ঝোপের পানে চেয়ে সে বজ্রাহতের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝোপের আড়াল দিয়ে একজোড়া চোখ দেখা যাচ্ছে, আর সে-চোখ রাসেলের। রাসেলও হয়তো ধরা পড়ে গিয়ে বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত, তাই নড়তে পারল না একচুল। ক্রমে-ক্রমে শুধু চোখদুটি তার বিস্ফারিত হয়ে উঠতে লাগল। কামরুলের চোখ লাল কি নীল হয়েছিল কে জানে কিন্তু নীরবে ঝোপের মাঝে ভাসন্ত-প্রায় চোখদুটোর পানে সে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর হঠাৎ পেছন ফিরে চলতে লাগল জোর পা ফেলে, চাইল না আর কোনোদিকে, হ্যাটের তলে মুখটি তার আরো ভয়ঙ্কর।

ভয়ও হয়েছিল মনে। রাসেল এসে কী কীর্তি না করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কামরুলকে সে বিস্মিত করলে অর্থাৎ সে এলই না। আজ এল না, কাল এল না, এবং আর এলই না। কামরুল বলে, আহা বেচারা! বেচারা লজ্জা পেয়েছে ভয়ানক। তারপর চুপ থাকে।

অবশেষে কামরুলের মনে শ্রদ্ধাও হল তার ওপর। এক সন্ধ্যায় গুলজার আসরে বসে সিগ্রেট ধরিয়ে সে কতক্ষণ চোখ বুজে রইল। একটু দূরে আমজাদ কালোয়াতি গান ধরেছিল হয়তো তাই শুনছিল নীরবে। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমজাদ মুখটা বিকৃত করে একটা গিটকিরি ছাড়তে যাবে, ঠিক সে-মুহূর্তে কামরুল চোখ খুললে, খুলে বললে যে, ছোঁড়াটার একটু কালচার ছিল।

—কার?

—ওই রাস্কেলটার। রাসেলটার। ছোঁড়াটার একটু কালচার ছিল যেন। এরা কেউ ওর কালচারের বর্ণগন্ধব্যাখ্যা জানত না, তা-ই সেসব নিয়ে কোনো কথা উঠল না, কামরুলও বললে না কিছু।

আমজাদ আবার মুখটা বিকৃত করে বিকট গিটকিরি ছাড়লে।

বৈশাখ ১৩৫২ এপ্রিল ১৯৪৫

সূর্যালোক

একটু ঘুম এলেই গলায় শ্লেষ্মা ঘন হয়ে ওঠে। আবার কালুর ঘুম ভেঙে গেল, একটা বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ করে সে চোখ মেলে তাকালে অন্ধকারের পানে। কেমন ঘুটঘুটে ঘন অন্ধকার, তাকালে মনে হয় যেন চোখই নেই, কোটর দুটো শূন্য—ওই অন্ধকারের মতো কালো।

মশার আওয়াজ তীক্ষ্ণতম হয়ে উঠেছে, ওদের রাজ্যে যেন হিংস্র-উল্লাসের বন্যা এসেছে। কিন্তু তবু ঘুমোতে হবে, ঘুমোতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আবার গলা বেয়ে শ্লেষ্মা ঠেলে উঠে শ্বসনে ব্যাঘাত জন্মায়। কালু এবার ওপাশ ফিরে শুল। কিন্তু পা-দুটো টেনেছে কী অমনি তাতে কী যেন ঠেকল, ঠাণ্ডা আর কিছু নরম।

—কে ওখানে, কে?

কে কখন পায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছে, কুষ্ঠরোগী না ক্ষয়কাশরোগী—খোদা জানেন। কোনো উত্তর নেই দেখে আবার কালু হুমকি দিয়ে উঠল। তারপর নিস্তব্ধতা : এবং

সে-নিস্তব্ধতার মধ্যে এবার একটা গলা ঘড়ঘড় করে উঠল।

—কোন শালা লাথি মারছে?

—আমি শালা, তুমি কে?

—চোপ!

ঝুনো পোড়ো বাড়ির অন্ধকার বারান্দায় এবার দুটি মানুষ ঘেয়ো-কুকুরের মতো ঘেউ-ঘেউ করে উঠল : কেমন একটা উত্তাপে তাদের মাথা গরম হয়ে উঠেছে। নাকদুটি ক্রুদ্ধ কুকুরের নাকের মতো ফুলে উঠল, আর দাঁতগুলো হয়তো নেকড়ের দাঁতের মতো হিংস্র হয়ে উঠেছে; এবং তারা দুজনেই উঠে সোজা হয়ে বসে উন্মুখ অধীরতায় পরস্পরের আবছা মূর্তির পানে চেয়ে ফুলতে থাকল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না, কেউ কারো গায়ে হাত তুললে না। আবার তারা নীরবে শুয়ে পড়ল, যদিও এবার একটু তফাতে। তারপর চুপচাপ।

মেঝেটা স্যাঁতস্যাঁতে, আর কালো রাত্রিময় কেমন একটা ভাপসা গরম, ভাদ্রের ভাপসা গরম। আকাশের স্তব্ধ কালো মেঘের পানে চেয়ে মনে অস্বস্তি লাগে : ওই ঝুলে-পড়া ভারি-হয়ে-থাকা মেঘগুলো যদি সরিয়ে দেয়া যেত...

কালুর পেট জ্বলছে। ক্ষুধা একটা অদ্ভুত জ্বালা। এবং এ-জ্বালা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল বলেই হয়তো সে মুখ তুলে তাকাল লোকটার পানে, একটা নিষ্ঠুরতম ক্রোধে ভেতরটা জ্বলে উঠল দাউ-দাউ করে। কিন্তু ওধার থেকে সাড়া না পেয়ে আবার সে শান্ত হয়ে আস্তে মাথা নাবাল।

রাত্রি হয়তো গভীর, হয়তো-বা শেষ হতে চলেছে, কিন্তু ঘন কালো মেঘে আকাশটা নিশ্ছিদ্র বলে তা জানবার উপায় নেই। মনটা শান্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু কালো জমাট আকাশের পানে তাকিয়ে আবার কালুর অন্তর ফণা খাড়া করে দাঁড়াল, বিষ যেন ঠোঁটের প্রান্তে ঝুলছে। কিন্তু মেঘকে নয়, পাশে শুয়ে-থাকা লোকটাকে ছোবল মারবার জন্যে প্রাণে আবার দুরন্ত বাসনা জাগল। তার ওপর ক্রোধ থেকে-থেকে উত্তাল হয়ে উঠছে সে মানুষ বলেই, আবার সে মানুষ বলেই ক্রুদ্ধ মন সংযত হয়ে উঠছে। সে মানুষ, তাই তাকে বাধা দেবে, নির্বিবাদে আঘাত সহ্য করবে না। ওই যে-দেহটি এখন নিশ্চল হয়ে রয়েছে—হয়তো ঘুমে হয়তো-বা ভাবনায়, সে-দেহটি আঘাত পেয়ে এক সময়ে সিংহের মতো গর্জে উঠবে, প্রচণ্ডভাবে বাধা দেবে বিপক্ষের জ্বলন্ত বাসনায়।

তেমনি নীরবতা। কেমন একটা সোঁদালো গন্ধ আসছে, হয়তো এই মেঝে থেকে, অথবা বারান্দার শেষে যে-ঝোপঝাড় ঘন হয়ে রয়েছে—সেখান থেকে আসছে সে-গন্ধ। কোথেকে আসছে সেকথা জানবার তাগিদ নেই কালুর, শুধু সে-সোঁদালো গন্ধে যে ঈষৎ ঝাঁঝ রয়েছে, সে-ঝাঁঝ তার শ্রান্ত নাকে লাগছে ভালো—

দেহ হতে ঝাঁঝালো অনুভূতি জাগছে, তাই হয়তো এই ঈষৎ ঝাঁঝালো গন্ধ তার নাকে লাগছে ভালো। তারপর কালুর মনে কোনো কথা নেই, হঠাৎ কেমন গোঁয়ারের মতো সে-মন স্তব্ধ হয়ে গেল, এবং মস্তিষ্কের যে-কারখানা, সে-কারখানার সদর দরজায় গ্যাট হয়ে বসল—কোনো চিন্তা তাতে ঢুকতে দেবে না। তাতে কী লাভ সে জানে না, কিন্তু তবু বাধা দেবে, বাধা দেবে তার স্বচ্ছন্দ গতিময়তায়। মস্তিষ্ক-কারখানাকে নিষ্কর্মা বসিয়ে রেখে তার মনের সে কী বিচিত্র তৃপ্তি : সদর-দরজায় গ্যাট হয়ে সে বসে হাসতে লাগল, হাসতে লাগল নির্মম পুলকে।

কিন্তু অল্পক্ষণ পর কালুর সে-মন সব ভুলে গিয়ে ফণা উদ্যত করে গর্জে উঠল। গর্জে উঠে বললে, অস্ত্র চাই অস্ত্র চাই, কঠিন ইস্পাতে তৈরি সে-অস্ত্র এমন ধারালো হবে যে, আঘাতের পর প্রতিঘাতের সময় যেন না-পায় বিপক্ষ!

পাশের লোকটা তেমনি নিশ্চল, হয়তো ঘুমে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কালু তাকে

দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু দেখলে অন্ধকার হতে আরো অন্ধকার তার নিশ্চল দেহটি। সে নিশ্চল হয়ে রয়েছে পরাজয়ের দীনতায় কি? হ্যাঁ, পরাজয়ের দীনতায়...। কালুর ভেতরটা বিজয়ের মত্ত উল্লাসে গমগম করে উঠল।

কোথেকে যে শিশুর কান্নার মতো একটা আওয়াজ থেকে-থেকে ভেসে আসছে, সেদিকে কালু এবার কান দিলে তারপর তার মনটা হঠাৎ ভালোমানুষ হয়ে উঠল, কেমন হাসল, হাসল সহৃদয় বিজ্ঞের মতো। শিশুর কান্নার মতো একটা আওয়াজ যে ভেসে আসছে ও কি শিশুর কান্না?—ওর মন আবার হাসল, বিজ্ঞের হাসি। হ্যাঁ, শিশু বটে সেটি কিন্তু মানুষের নয়, শকুনের। তারপর কালু কেমন একদৃষ্টিতে অন্ধকারের পানে চোখ মেলে তাকাল। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার, তবু কেমন একটা ক্ষীণ আলো যেন সে-ঘন অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ ঝিলমিল করে উঠল : বিস্মৃতি-ঘন অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ স্মৃতির আলো ঝিলমিল করে উঠেছে।

কবে-কোথায় কোন প্রান্তরের প্রান্তে কালু একটা বিরাট অশ্বত্থগাছ দেখেছিল—যার খোদলে বাসা বেঁধেছিল শকুন-শকুনি, সে-কথা আচমকা মনে পড়ল তার। শুধু এই। মনে পড়ল এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে যাবার সময় পথে পড়েছিল সে-বিরাট অশ্বত্থগাছটি, এবং হয়তো ঠাণ্ডা হবার জন্য সে বসেও ছিল তার তলে, কিন্তু সেকথা আজ মনে নেই।

এবং ফেলে-আসা দিনের একটি নগণ্য কথা স্মরণ হল বলে হঠাৎ তার মনটা ঝির-ঝিরে হয়ে উঠল। এতক্ষণ কী যেন করোটির দেহ-ঠেলে ফুলে ছিল আর দপদপ করছিল ধমনির তালে-তালে, তা হঠাৎ সংকুচিত হয়ে এল, কেমন মুক্ত হাওয়ায় খেলে উঠল তার মাথার ভেতরটা।

কালু হাসল হঠাৎ। তার ইচ্ছে হল কাঁদতে-থাকা শকুনের বাচ্চাটিকে বুকে নিয়ে চুমো খেতে। সে জানে যে সে-বাচ্চাগুলো কেমন কুৎসিত হয় দেখতে, কিন্তু কেমন করে যে কাঁদছে সেটি, আহা...

এবং এমন ধারা ইচ্ছে হল তার সে-অশ্বত্থগাছটির কথা স্মরণ হয়েছে বলে। প্রান্তরের প্রান্তে একটা অশ্বত্থগাছ : তার খোদলে ছিল শকুনের বাসা, কিন্তু তাছাড়া কী ছিল সে-গাছে? কিছু না, তবু সেটা আজ তার মনের স্মৃতির ঘরে আটকা পড়েছে বলে কেমন পূর্ণ প্রভুত্বে তার অন্তর ভরে উঠেছে। এবং এ-প্রভুত্বের আনন্দে সে হেসে উঠল অতি নির্মল হাসি। এমন ধারা আনন্দেই-তো মানুষের মুখে ফোটে নির্মল হাসি। যত নিঃসম্বল রিক্ততা, যত পঙ্কিল ক্লেদাক্ত হাসি।

নীরবতা অত্যন্ত প্রগাঢ় হয়ে রয়েছে, এবং সে-নীরবতায় এবার কেমন শিরশির আওয়াজ জেগে উঠল। প্রথমে কালু চমকে উঠল, তারপর বুঝলে যে বৃষ্টি নেবেছে। বৃষ্টি নাবল, একটু হাওয়াও বইল—শীতল স্নিগ্ধ হাওয়া। এবং সে-হাওয়ার স্পর্শে জাগতিকতায় জেগে উঠে কালু পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালে আঁধারের পানে, বৃষ্টির অস্পষ্ট ফোঁটাগুলোর পানে, ঘুরে-ফিরে এধারে-ওধারে তাকাল, তাকিয়ে ভালো লাগল তার।

কিছুক্ষণ পর পায়ের কাছে টুক করে একটা আওয়াজ হল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে আলো জ্বলে উঠল। লোকটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ধরেছে বিড়ির মুখে। কালু তাকাল : সে-ক্ষীণ আলোর পানে তাকিয়ে আর লোকটির কিছু দীপ্ত কিছু সুষ্ঠু ঘুমের পানে তাকিয়ে তার আরো ভালো লাগল, এবং তাই কেমন কোমলতা ঘনিয়ে এল মুখে।

—এই, একটা বিড়ি দেবা? জবর নেশা ধরেছে গো—। ফুঁ দিয়ে কাঠিটি নিভিয়ে সেটা দূরে ছুড়ে ফেলে লোকটা বিড়িতে ঘন-ঘন টান দিতে থাকল, কোনো কথা বললে না।

—এই, দেও না!

এবার লোকটা খাঁই-খাঁই করে উঠল : শালা চোপ্!

শুনে কোথায় রাগে গর্জে উঠবে, না, কালু আরো কেমন একটা নুয়ে-পড়া-কোমলতায় গদগদ হয়ে উঠল। বললে : আমাকে সাত লাথি মার, আমি আর কিছু কব না।

—চোপ্!

—আমি বিড়ি চাই না গো, শুধু কও যে মাফ করেছ আমাকে। এই, কও, তোমার মুখে চুম্ খাই, কও!

কোথেকে এল এই স্নেহের জোয়ার? এল মানুষের অন্তর থেকে, যার স্রোত মানুষ আটকে রাখে বাঁধ তুলে : দুনিয়ায় বাঁচতে হলে সে-স্রোতের বন্যা ক্ষতিকর। কিন্তু কালুর মনে সে-বাঁধ ভেঙে গেছে আচমকা, এবং হয়তো এ-ভাঙার মূলে রয়েছে সে-অশ্বত্থগাছটি। এখন সে বিড়ির লোভে ক্ষমা চাইছে না, ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে যে-নিবিড় আনন্দ, সে-আনন্দের লোভে চাইছে।

লোকটি কোনো কথা কইল না। এবং কালুর মনে হল সে-নীরবতায় কেমন যেন মেয়েলি ভাব। তার মিনতিতে যেন কোনো অভিমানী মেয়ের মান পড়েছে। কয়েক মুহূর্ত পর কাল আবার কথা কইল; কইল বটে কিন্তু আবেগে ফুটল না ভালো করে, কেমন ঠেকে গেল।

—তোমাকে মন্দ কয়েছি, তার জন্যে মনটা জ্বলতেছে। সত্যি গো...

তারপর একসময়ে কালুর মন কেঁদে উঠল হঠাৎ। মনে হলো বউটার কথা... ও যেন গাল ফুলিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে, কথা কয় না। কিন্তু কোথায় গেল সে? অনাহারে অথবা মহামারীতে মরেছে কি?

কালুর মনে কান্না হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠল, উঠে হু-হু করে বেড়াতে লাগল অন্তরময়! তারপর তেমনি হঠাৎ একসময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল; সে নীরবে চোখ মেলে তাকাল অন্ধকারের পানে—যে-অন্ধকার স্নেহ-মমতাকে বিদ্রূপ করে না আলোর মতো।

ঝরঝর করে জল ঝরছে। ঝরছে আর ঝরছে—অবিরাম। এবং সে-কোমল শব্দে কালুর মনটা দূরে-দূরে উড়ে বেড়াতে লাগল, বেদনার দূরত্বে আর আবছায়াতে ঘুরে বেড়াতে লাগল : যেন অভিমান করে দিগন্তের কোলঘেঁষে পালিয়ে রইল—আসবে না কাছে। কী হবে এসে? খামার শূন্য : মানুষ খেতে দেয় না : জমি বিক্রি হয়ে গেছে : বাড়ি বলে নেই কিছু দুনিয়াতে। আর সেই বউটা যে ছিল...যাক। সে ভাববে না কোনো কথা।

—এই, বিড়ি নেবা ?

নীরবতা।

—কথা কও না কেন?

অবশেষে কালু কথা কইল, কিন্তু প্রাণহীন কথা। হাত বাড়িয়ে বিড়িটাও নিল বটে তবে হাত নিস্তেজ। লোকটি যখন দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটি কালুর বিড়ির মুখে ধরলে, তখন দেখলে যে তার চোখদুটি চকচক করছে নীরব অশ্রুতে।

তারপর অনেকক্ষণ নীরবতা জমাট হয়ে রইল। শেষে লোকটি একসময়ে শুধাল : কোথেকে আসতেছ?

বেদনার অতল থেকে উঠে আসতে সময় নিল কিছু, তারপর কালু আস্তে বললে : কায়েমগঞ্জ হতে। তুমি?

—সোনাপুর।

আকাশ ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে এল। আলো হল, এরা জাগল : সূর্য উঠল দিগন্ত পেরিয়ে! ঘুম থেকে জেগে তারা পরস্পরের পানে ক্ষীণদৃষ্টিতে তাকাল, তারপর অন্যধারে দৃষ্টি সরিয়ে নিলে : তাদের অন্তর আবার বিরুদ্ধতায় খাড়া হয়ে উঠল।

তবু কালু বললে : একটা বিড়ি দেও গো—

—নেই।

—দেও না!

—নেই বলতেছি! বলে কালুকে উপেক্ষা করে নির্মম কঠিনতায় সে একটা বিড়ি ধরাল।

কালু চেয়ে দেখল, চেয়ে দেখল শুধু, তারপর তার অন্তরে শত-শত বিষাক্ত সাপ ফণা উদ্যত করে গর্জে উঠল হিংস্র শত্রুতায়।

এবং রাত্রির কাব্য মিছে হয়ে মুছে গেল সূর্যালোকে।

শ্রাবণ ১৩৫২ জুলাই ১৯৪৫

মাঝি

পদ্মাতে নতুন পানির শোরগোল পড়ে গেছে। পদ্মা নিজেকে বিস্তীর্ণ করেছে, যে-জমিগুলো কোনো প্রকারে মাথা জাগিয়ে রোদ-পোহানো কুমিরের মতো সূর্যের তলে নিজেকে প্রকাশ করেছিল, সে-গুলো আবার ঢেকে দিচ্ছে; কিন্তু ভাসিয়ে নিচ্ছে, আর দু-ধারের দুই দিগন্ত স্পর্শ করবার ব্যাকুলতা নিয়ে সে মুহূর্তে-মুহূর্তে নিজের সবল দেহ প্রসারিত করছে, ফুলে-ফুলে গর্জে-গর্জে হিংস্র ঔদার্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ওধারে ঘোলাটে আকাশে কেমন হাওয়া। থেকে-থেকে সে-হাওয়া এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, মনিরুদ্দিনের ঘাসী নৌকাটা কাত হয়ে ওঠে। হাল ধরছে সে নিজেই, মাঝি দুটো ছইয়ের এধারে উবু হয়ে বসে রাতের রান্নার ব্যবস্থা করছে। ছইয়ের ভেতরে ওদিকটায় দুটি প্রাণী—স্বামী আর স্ত্রী; তারা যাত্রী। কলকাতা থেকে আসছে তারা, সম্ভবত ধনী। বেশভূষা আর চেহারা দেখে তাই মনে হয়। মাঝি দুটো আড়চোখে কখনো-সখনো তাকিয়ে দেখে। দেখে তাদের লোভ হয়। হয়তো সৌন্দর্য দেখার লোভ, বা ধনীকে দেখার লোভ : একবার দেখে সাধ মেটে না, পরক্ষণেই আবার তাকাতে হয়। এদিকে মনিরুদ্দিনের সে-দুর্বলতা নেই। কড়া স্রোতে হাল নিয়ে ব্যস্ত, চিন্তা তার নদী, আকাশ, আর যাত্রীদের গন্তব্যস্থান। যাত্রীরা তার কাছে তুচ্ছ। তাছাড়া হাল ধরে দাঁড়িয়ে ছইয়ের ভেতরটা নজরে পড়েও না। দৃষ্টি তার সামনে, খোলা হাওয়া এসে থেকে-থেকে আঘাত দেয় বটে রোদ-পানি ও ঝড়ঝাপটায় রুক্ষ অথচ তীক্ষ্ণ-হয়ে-ওঠা চোখে, তবু সে দৃষ্টি চলে যায় দূরে, দিগন্তে, এবং দিগন্তের শেষে কেমন ঈষৎ বেগুনি-নীল রঙের মেঘ যে জমাট হয়ে রয়েছে, তাতেও সে-দৃষ্টি যেন বাধা পায় না, সে-পুঞ্জীভূত মেঘ ভেদ করে কোথায় চলে যায়—কোথায়? একদিন : সেদিনও এমনি। সেদিন এমনি এক বিকালে দূর-দিগন্ত ঘিরে মেঘ জমেছে—ঘন হয়ে আর স্তরে-স্তরে, আর দিগন্তপ্রসারিত পদ্মায় স্তব্ধতা। হয়তো পদ্মা আশঙ্কায় স্তব্ধ ছিল, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার অমঙ্গল চিন্তায় আচ্ছন্ন নিথর কপালের মতো। কিন্তু তার বাপ তখন সরকারের নৌকার মাঝি। পদ্মা-নদীর বুকে-বুকে অল্প পানির সাবধানী সঙ্কেত হিসেবে সন্ধ্যার পর আলো-জ্বেলে-দেয়া ছিল তার কাজ। ওই যে দূরে একটু বাঁকের মতো নজরে পড়ে সে-স্থানটা যেমনি চওড়া তেমনি তার ও-ধারটায় স্রোতটা খরতর। কিন্তু ঠিক মাঝখানে আবার একটু চরের মতো, অবশ্য পানিতে ডোবা। ওখানে ছিল একটি সাবধানী সঙ্কেত।

দূর-দিগন্তে মেঘ জমছিল, আর সূর্য ডুবতে-না-ডুবতেই অমাবস্যার সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠে একেবারে রাত হয়ে গেল। মনিরুদ্দিনের বাপ ছমিরুদ্দিন সেদিন ঝাঙরবাড়ির হাটে গিয়েছিল, ফিরতে একটু দেরি হওয়ায় এ-দিকে সাবধানী সঙ্কেতের কাছে গিয়ে পৌঁছাবার আগেই আকাশ এত কালো হয়ে উঠল যে, মনে হল যেন রাত অনেক গভীর হয়ে উঠেছে। মনিরুদ্দিন তখন ছোট বটে, তবে সেদিনের কথা তার মনে আছে। আকাশে কী রঙের মেঘ জমেছিল, এবং কোন কোণ হতে ধীরে-ধীরে তা মাথা জাগিয়ে উঠেছিল—তা তার মনে আছে স্পষ্ট। বাপ যাবার সময় তাড়াহুড়ো করেছিল—তাও মনে আছে। ওধারে ধান ঠেলে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে

সে ওধারে তাকিয়ে দেখেছিল। হয়তো অকারণে; কিন্তু তবু একটা কৌতূহল ছিল তার মনে। বাপ যাবার সময় তাড়াহুড়ো করেছিল, নৌকাও কি তাড়াহুড়ো করে চলেছে? কিন্তু নৌকা আর তার নজরে পড়ে নি, কেবল দিগন্ত-ঘিরে ক্রমে-ক্রমে জমাট-হয়ে-ওঠা মেঘের পানে সে তাকিয়ে দেখেছিল—তা স্পষ্ট মনে আছে। তারপর সে ঘরে এসে উঠল অমনি অকস্মাৎ ঝড় উঠল : সে কী ঝড়! রাত-দুপুরে ঝড় থামল; কিন্তু তার বাপ আর ফিরে এল না।

মেঘটা অমনিই হয়তো সেদিন ছিল,—সে-ভাবনাতেই মনিরুদ্দিনের রুক্ষ তীক্ষ্ণ চোখ স্তব্ধ হয়ে ছিল, এমন সময় ছইয়ের এ-মাথা দিয়ে বেরিয়ে যাত্রী ভদ্রলোকটি তার সামনে এসে দাঁড়াল। মনিরুদ্দিন তাকাল, গাঁট-পড়া হাতের তালুটা একবার পেছনে ঘষে আবার সেটি হালে রেখে ভালো করে তাকিয়ে দেখল লোকটিকে, দেখে মনে হয় তার চোখে কেমন একটু চিন্তার অস্পষ্ট ছায়া। বিপদে পড়েছে, বাড়িতে তার কে মরছে, বাবা না মা। আজ রাতেই তাদের পৌঁছিয়ে দিতে হবে। অমুক স্থানের চৌধুরীদের বাড়ির লোক কি তারা? হয়তো তাই হবে।

চৌধুরীদের বাড়ি ছাড়া এরা আর যাবে কোথায়?

—মিঁয়া, বারুইপুর পৌঁছতে রাত কত হবে ?

মনিরুদ্দিন হাসল হঠাৎ।

—তা কী কইরা কই বাবু? রাত কাবার হইবারও পারে।

ভদ্রলোক কপালের ওপর উড়ে-পড়া চুলগুলো একবারে পেছনে ঠেলে দিলে, কিছু বললে না। মনিরুদ্দিন হঠাৎ আরো উৎসুক হয়ে তাকিয়ে দেখল তাকে। বয়স অল্প, মিষ্টি চেহারা। হয়তো সদ্য বিয়ে করেছে, জীবনে তার নতুন স্বাদ লেগেছে, এবং সে-স্বাদেরই মাদকতা তার মুখেচোখে। তারপর হঠাৎ কেমন মায়া হল বলে আরো জোরে হেসে উঠে মনিরুদ্দিন বললে,

—না বাবু, পাড়ির সময় হাওয়া অনুকূলে পামু মোরা। হাওয়া জবর, চোখের নেমিষ্যে হেপাড়ে চইলা যামু দ্যাখবেন।

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করলে। সেকথার কোনো উত্তর না দিয়ে একটু পরে আবার বললে,

—পথে ঝড় উঠবে না তো মিঁয়া?

—ঝড়? আবার হাসল মনিরুদ্দিন, আসবারও পারে। খোদার মর্জি হইলে আসবারও পারে; কিন্তু সেকথার কী আছে? এমন দিনে ঝড় তুফান না হইলে হইব কী, তা বইলা কি মাইন্‌ষের যাতায়াত বন্ধ থাকব?

ভদ্রলোক আরো কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে আবার ঢুকে ছইয়ের তলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মনিরুদ্দিন একবার দাড়িতে হাত বুলাল। বাড়িতে তার বিপদ, কোনো মতে তাকে পৌঁছতেই হবে। অগ্রিম টাকা দিয়েছে, বাড়ি পৌঁছে আরো দেবে, এক রাতের কাজের জন্য তার জন্য তা যথেষ্ট। কাজেই দূর-দিগন্তে মেঘ ঘনাতে দেখলে তার হাল তুললে চলবে না। একবার সে আধা-নাবানো উল্টো-হাওয়ায় মাস্তুলে জড়িয়ে-যাওয়া কমলা রঙের পালের পানে তাকাল। পাড়ি দেবার সময় নৌকাকে পুব-উত্তরমুখী করে সে-পাল সে তুলে দেবে, তীরের মতো ছুটবে নৌকা। তাছাড়া ঝড় যে হবেই—একথা কে জানে। এমন কালে ঝড় হয় বটে, আবার সময়-সময় ভয়-খাওয়ানো মেঘও অমনি ঘন হয়ে ওঠে। বাঁ ধারের তীরঘেঁষে ঐ দূরের বাঁক পর্যন্ত-তো চলুক সে, তারপর এর মধ্যে ঝড় উঠে থেমে গেলে তারপর পাড়ি দেবে। বাঁক পর্যন্ত পৌঁছতে-পৌঁছতেই হয়তো মেঘটা মাথার ওপর ছেয়ে যাবে, এবং ঝড় যদি একান্ত আসেই তবে তা শুরু হয়ে যাবে।

হঠাৎ ঈষৎ ঝুঁকে মনিরুদ্দিন ডাকলে,

—আহ, হালটা ধরবা। আছরের ওক্ত কাবার হইয়া গেল, নামাজই পড়লাম না।

একটু পরে হাফিজ বেরিয়ে এল। এসে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিল মনিরুদ্দিনের পানে। মনিরুদ্দিন হাত বাড়িয়ে নিলে, ওজু করার আগে একবার দম কষে নেবে সে। নামাজ পড়তে হলে তার একমাত্র জায়গা সামনে। বিড়বিড় করে নামাজ পড়লে মনিরুদ্দিন, হাওয়ায় তার দাড়ি উড়ল আর মাথার লাল গামছাটাও উড়ল। শেষে মোনাজাত করে এক পলক ছইয়ের ভেতরে তাকালে, দেখলে এক নজর বউটিকে। শহুরে মেয়ে। খোলা-খোলা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু তার চোখে ছায়া। দূরে সামান্য রেখার মতো তীরের পানে চেয়ে রয়েছে সে। দৃষ্টির পথে অগাধ পানি আর ওধারে মেঘ বলেই হয়তো তার চোখে ঐ ছায়া। বাড়িতে কার অসুখ? মানুষের বিপদ শ্রেণী-ধর্ম বিচার করে না। বিপদের চিন্তায় হয়তো সে অমন স্তব্ধ হয়ে আছে। কিন্তু অগাধ এ-পানির মধ্যে ওকে অত্যন্ত অসহায় ও ক্ষুদ্র মনে হল, মনে হল যেন মহাশক্তির মধ্যে একবিন্দু দুর্বলতা। মনিরুদ্দিন তুলনাটা স্পষ্টভাবে বুঝলে না, কেবল এরকম একটা ভাব জাগল তার মনে, এবং মেয়েটির সে-অসহায়তার মধ্যে নিজেকে প্রচুর শক্তিশালী বোধ করল।

খোলা পানিতে ঢেউ। ওধারে একটা নৌকা নদী পাড়ি দিয়েছে, উত্তর দিকে তার গলুইর মুখ। নৌকার বাইরে দিয়ে সামান্য দু-তিন ইঞ্চি চওড়া কাঠের ওপর দিয়ে ছইয়ের বেড়া ধরে অভ্যস্ত নিপুণতায় নৌকা পেছনে ঘুরে আসতে-আসতে ছোট চোখে তাকাল মনির সেই দিকে। কার নৌকা? কিন্তু একটু পরে চিনলে যে ওটা সরকারের নৌকা—আলো দিতে যাচ্ছে নদীর বুকে। ওই বাঁকের কাছে পানিতে-ডোবা চরটা কি এখনো আছে? হয়তো নেই। হয়তো অনেক আগেই তা ভেসে গেছে, ভেসে গিয়ে অন্য কোথাও এবার পানির ওপরেই ভেসে উঠছে এবং মানুষের বসতি বসেছে তার বুকে। যে-মাটি একদিন তাদের সংসার অন্ধকার করেছে, সে-মাটিই আবার আলোকিত করেছে কত সংসার।

মনিরুদ্দিন ফের হাল ধরলে। আকাশে সন্ধ্যার আলো নদীর মতো ঘোলাটে হয়ে এসেছে। আকাশ যত ঘোলাটে হচ্ছে তত কালো হচ্ছে পানি। ঝড় হবেই কি? বাবুটির হয়তো অনেক সম্পত্তি শহরে, অর্থের প্রাচুর্যের মধ্যে হয়তো তার অনাবিল সানন্দ জীবন। কিন্তু এখানে সে শিশু, অসহায়। বউটির খোলা-খোলা ঝরঝরে চেহারার ঝকমকির মধ্যেও এখন আসলে যেন কিছু নেই, আরো অসহায় সে। এইখানে এই বিরাট বিশাল নদীবক্ষে অসহায় বৈকি। মনিরুদ্দিন—যে-জীবনের এত বছর কাটাল পদ্মার আর মেঘনার বুকে, তারও মনে কি ঈষৎ অসহায়তার আভাস লাগে না যখন সে কালো রাত্রিতে বিশাল নদীর বুকে পাড়ি জমায়? সে আল্লাকে ডেকে নেয়, আল্লাকে—যাঁর স্নেহের ও রহমানের সমুদ্রের কাছে এ-বিশাল নদী বিন্দুবৎ—তাঁকে সে স্মরণ করে নেয় এবং সেই জোরেই সে অথই পানির বিক্ষুব্ধতাকে উপেক্ষা করে আকাশে দুরন্ত মেঘের আনাগোনাকে তোয়াক্কা না করে নির্ভয়ে পাড়ি জমায়।

ছইয়ের তলে ভাত ফুটছে। বাঁক এদিকে এসে পড়ল প্রায়। বাঁকটা পেরিয়েই পাড়ি জমাতে হবে। হাওয়া এখনো জোরালো বটে; কিন্তু ওদিকে দিগন্তের কোণে মেঘের মধ্যে স্তব্ধতা। সে-মেঘে যেন গতি নেই; ঝড় কি তবে মাঝ-দরিয়ায় হঠাৎ হু-হু করে উঠবে? প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে বহুদিন বাস করে মনিরুদ্দিনের এ-অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, প্রকৃতি মাঝে-মাঝে ধরণীর কীট নীচ মানুষের মতো চালাকি খেলে, হিংস্র চতুরতা করে। ঐ যে দিগন্তের ওধারে মেঘ জমে আছে ঘন হয়ে কালো প্রবল তুফানের স্পষ্ট ইঙ্গিতের মতো, সে-মেঘ হয়তো শেষ পর্যন্ত এধারে নাও আসতে পারে, যা খণ্ড-খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ওধারে ভেসে যেতে পারে, বা খণ্ড-খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ে কম জোরালো হয়ে পড়তে পারে; কিন্তু আবার এও হতে পারে যে, সে-মেঘ গূঢ় ও হিংস্র অভিসন্ধি নিয়ে অমন ওত পেতে স্তব্ধ হয়ে আছে, তারা মাঝ-দরিয়ায় না পৌঁছলে গা ঝাড়া দেবে না।

সূর্য ওদিকে ডুবল কি ডুবল না—বোঝা গেল না, আকাশ কেমন হঠাৎ আঁধার হয়ে এল। হাওয়ার বেগও কমে এল কিছু। নৌকা যখন বাঁকে এসে বাঁয়ে ফিরল, তখন অন্ধকার আরো

জমাট হয়ে উঠেছে। এবার পাড়ি। কিন্তু কেমন একটা সমস্যায় হঠাৎ মনিরুদ্দিনের মন ছেয়ে এল : পাড়ি দেবে কি? যদি তুফান ওঠে? ছইয়ের ভেতর থেকে হাফিজ ও কালু বেরিয়ে এসেছে—পাল খাটাতে। মুখে তাদের চিন্তার রেখা নেই, মেঘের পানেও দৃষ্টি নেই। আকাশ আর পানিকে দেখে-দেখে তারা তাদের সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছে, আকাশের ঘনায়মান ঝড় তাদের কখনো চিন্তিত করে বটে, কিন্তু ভীত করে না। মনিরুদ্দিনই কি ভয় করে নাকি? তবে নৌকার দায়িত্বের জন্যে তাকে আকাশের পানে তাকাতে হয়, পাড়ি জমাবার আগে একবার ভাবতে হয়।

তবে আজ যেন সে ভীত হল। এমন অনেক কালো রাতে দিগন্তে ঝড়ের ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করে সে পাড়ি জমিয়েছে, কোনোদিন ভয় পায় নি। কিন্তু আজ সে হঠাৎ ভীত হল। ভীত হল নিজের জন্য নয়, পরের জন্য, বর্তমানে তার আশ্রয়ে দুটি অসহায় প্রাণীর জন্য ভীত হল। ওরা নির্ভর করেছে তার ওপর, নির্ভর করছে শিশুর মতো।

হাফিজ মুখ ফিরিয়ে তাকালে মনিরুদ্দিনের পানে, তাকিয়ে দেখলে তার চোখে চিন্তার ছায়া।

—পাল খাটাই—কী কও মনিরুদ্দি?

মনিরুদ্দিন উত্তর দিলে না। ওধারে মেঘগুলো যেন সঞ্চারমান হয়ে উঠেছে।

—ঝড় হইবার পারে। আরেকটি লোক বললে।

হাফিজ নাকে কেমন একটা শব্দ করলে। সে-আওয়াজ অবিশ্বাসসূচক।

—হে-বেলা থাইকা দেখতাছি ওই ম্যাঘ। ঝড়ের ম্যাঘ হইলে কবে উইড়া আসত গা।

তাও বটে, মনিরুদ্দিন ভাবলে। সেকথা জানে মনিরুদ্দিন। কিন্তু প্রকৃতির কথাও সে জানে : তার চতুরতার কথাও সে জানে। সেই বেলা থেকে ওই মেঘ জেগেছে ওই দিগন্তে বটে, কিন্তু কেবল হয়তো ওত পেতে আছে একটা নিষ্ঠুর অভিসন্ধি নিয়ে।

মনিরুদ্দিন হঠাৎ মাথাটা নিচে ঝুঁকিয়ে ডাকলে,

—বাবু, একটু শুইনা যান—

বাবুটি বেরিয়ে এল একটু পর। কিন্তু এলে পর মনিরুদ্দিন হঠাৎ কেমন লজ্জা বোধ করলে! নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করতে যেন লজ্জা বোধ করলে, ভুলে গেল এ-দুর্বলতা কার জন্যে। তবু গলা কেশে বললে,

—বাবু দ্যাখছেন ঐ ম্যাঘ। এখন পাড়ি দিলে মাঝ নদীতে ঝড় উঠবারও পারে। তা খোদার ইচ্ছা—

বাবুটি তাকাল। ওদিকে মেঘের পানে তাকাল, এদিকেও তাকাল। হয়তো নৌকাটি পাড়ের কাছে ভাসছে এখন। কারণ একটু দূরে থেকে মাথা-জাগিয়ে ভেসে থাকা বিস্তৃত ধানক্ষেতের শুরু; কিন্তু চারিধারে কোথাও কোনো বসতি নেই। আর ওধারে আকাশে অন্ধকার জমছে, মুহূর্তে ঘন হতে ঘনতর, ঘনতম হয়ে। তারপর হঠাৎ কেমন একটা তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালে বাবুটি। মনিরুদ্দিনও তাকালে তার পানে; কিন্তু সে-চোখের তীক্ষ্ণতায় সে চোখ নাবিয়ে ফেললে। দুজনেই বুঝলে দৃষ্টির অর্থ। হ্যাঁ, আজকাল একদল চোর ডাকাত গজিয়ে উঠেছে বটে মাঝিদের মধ্যে, যারা সুবিধে পেলে অর্থের লোভে যাত্রীদের নিদারুণ বিপদে ফেলে। একটু পর মনিরুদ্দিন তাকালে বাবুটির পানে, দেখলে সে ঠিক তেমনি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হাফিজের পানে। কিন্তু সে অন্য ধারে তাকিয়ে কেমন অস্বাভাবিক নির্লিপ্ততায় গা চুলকাচ্ছে।

অবশেষে বাবুটি বললে,

—তোমাকে বলেছি আমার বিশেষ জরুরি দরকার। যে-করে হোক পৌঁছুতেই হবে। মুহূর্তের জন্য মনিরুদ্দিন ভুলে গেল তার চোখের তীক্ষ্ণতা ও কণ্ঠের দৃঢ়তার কথা, তার সারা অন্তর আকুলভাবে প্রশ্ন করলে, বিপদ-তো অন্য কারো, ওই যে মেয়েটি মহাশক্তির মধ্যে

একবিন্দু দুর্বলতার মতো অসহায়ভাবে বসে রয়েছে তার-তো বিপদ নয়, তাকে কেন এক বিপদের মধ্যে সে টেনে নিয়ে যাবে? যদি মাঝ-দরিয়ায় ঝড় ওঠে, যদি ওঠে? কিন্তু মুখে কিছু সে বললে না, এবং অন্তরে এত কথা নিয়ে মুখে একটি শব্দও করল না বলে তার চোখে অস্থিরতা প্রকাশ পেলে, যা লক্ষ্য করে বাবুটি আবার দৃঢ়কণ্ঠে বললে,

—আর দেরি কোরো না মিঁয়া, পাড়ি দাও।

কালো রাত থমথম করছে। দিগন্তে এক ঝলক আলো। বহু দূরে কোথাও একটা স্টিমার চলছে—তারই আলো। এদিকে ওদের নৌকার পাল ফুলে আছে, অন্ধকারে গভীর পানির নির্জনতায় কেবল ছলাৎ-ছলাৎ আওয়াজ হচ্ছে। এধারে কয়েকটা তারা; কিন্তু ওধারে এখনো মেঘ। ঝড় হয়তো আসবে না। কে জানে।

একবার ছইয়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে মনিরুদ্দিন দুর্বল গলায় হেসে অস্বাভাবিক আন্তরিকতায়—যে আন্তরিকতা ভেঙে গেছে পরের সন্দেহে—বাবুটিকে বললে,

—বাবুরা, আপনারা আরাম কইরা ঘুমান না ক্যান—

বাবুটি কোনো উত্তর দিলে না। কেবল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল মনিরুদ্দিনের পানে। কিন্তু অত তীক্ষ্ণতা কোথায় পেল সে? মুখ উঠিয়ে আনবার সময় এক পলকের জন্য নজরে পড়ল তার—বাবুটির হাতের কাছে বন্দুকের মতো কী যেন। হয়তো সে-তীক্ষ্ণতা ঐ বন্দুক হতেই জেগেছে বাবুটির চোখে।

আকাশে মেঘ তেমনিই জমাট। হঠাৎ কেমন এক আকুলতায় মনিরুদ্দিন মনে-মনে বললে, খোদা, ঝড় কি আসব না? মাঝ-দরিয়ায় তো নাও পৌঁছল তবু ঝড় কি আসব না?

অগ্রহায়ণ ১৩৫২ নভেম্বর ১৯৪৫

অবসর কাব্য

হাতে এত অবসর যে মনে হয় আকাশটা কত বড় হয়ে উঠেছে : এত বিশাল এত গভীর এবং এত মৌন আকাশ সে যেন দেখে নি কখনো। দেহ শুধু ক্লান্তিতে জড়িয়ে ওঠে, আর সে-ক্লান্তিতে কেমন নেশা।

এখন সকাল। বোশেখি রোদ এখনো তেতে ওঠে নি, পশ্চিমের ঘরটায় এখনো কোমল ছায়া। দক্ষিণের জানলার পাশে ডেক-চেয়ারে আমজাদ বসে রয়েছে নিশ্চুপ হয়ে, আর হয়তো চেয়ে দেখছে অদূরে মাইল-স্তম্ভের পাশে বুড়ো জামগাছটার পানে। মৃদু-মৃদু হাওয়া বইছেই, জামগাছের পাতা নড়ছেই। কিন্তু কখনো-কখনো হাওয়া জোর হলে জোরে কেঁপে ওঠে, আবার স্তব্ধ হয়ে গেলে গাছময় এ-অবসরের মতো নিশ্চলতা জমে ওঠে। বাসাটা শহরের প্রান্তে বলে এধারে কোলাহল নেই এবং কোলাহল নেই বলে ওর মন শান্ত ও গভীর, স্বচ্ছ ও স্তব্ধ, যেন দিঘির মতো, যেন মনের তলে অনেকটা দূর দৃষ্টি চলে।

ওধারে আরেক জানলার ধারে বসে আমজাদের স্ত্রী আয়েশা যে মাথা নিচু করে সেলাই করছে নীরবে, ওর-ও দেহময় জমাট অবসর। হাত দুটি যে নড়ছে তা-যেন মৃদু হাওয়ায় কম্পমান জামগাছের পাতা। ওর এলোচুলে ঢালা বিরাম, মুখটি যেন ভাস্কর-মূর্তি। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ও, সাগরের অপর তীরে যেন বসে রয়েছে, কথা কওয়া যায় না তার সাথে।

তবু বাইরে কাকগুলো কর্ম-ব্যস্ত। এধার-ওধার ছুটোছুটি করছে ক্রমাগত। (কাক নাকি বাঁচে বহুদিন। কালের কালিমা কি তাদের কালো দেহে?) ছুটোছুটি করছে আর ডাকছে কর্কশভাবে, এবং দু-ই মনে বিরক্তি আনে। দেখ না চিলগুলোকে, দূর আকাশে উড়ছে

কেমন—ধীরে-ধীরে; যখন ডাকে তখন মনে হয় আকাশে একটা অদৃশ্য শব্দরেখা খেলে গেল, দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ এবং হয়তো-বা সোনালি সে-রেখা। আর ওরা কেমন প্রবুদ্ধ-ধীরতায়, মনে হয় ওরা জ্ঞানী, প্রচেতা, ঘুরে-ঘুরে উড়ে পৃথিবীর মানুষকে চেয়ে-চেয়ে দেখে (এবং দেখে দয়া করে কি মানুষদের?)।

বেশি চুপচাপ থাকলে অনেক সময় সত্তাকে টোকা মেরে দেখতে হয়। তাই আমজাদ কথা কইবার চেষ্টা করল। প্রথমে শ্লেষে কথা আটকে গেল, শেষে যা-বের হল হঠাৎ তা কর্কশ ও জোরালো শোনাল।

—কাকগুলো কেমন ডাকছে, কানে লাগে বড়।

কথা তেমন কিছু নয়। আয়েশাও মামুলি উত্তর দিলে :

—সত্যি কানে লাগে বড়।

একটু পরে আমজাদের মুখ দিয়ে একটা লম্বা বাক্য বের হল :

—বুঝলে, যখন তুমি জেগে থাক তখন কাক কানের কাছে চিৎকার করলেও শুনবে না তা, কিন্তু যে-ই তোমার চোখে একটু তন্দ্রা এসেছে অমনি সে-চিৎকার অতি কর্কশভাবে বাজতে থাকবে কানে—কানে-তো ঠিক নয়, যেন শিরায়-শিরায়।

বলে আমজাদ ভাবলে, এস্রাজের যদি প্রাণ থাকত, তাহলে আনাড়ি বাজিয়ে যথেচ্ছভাবে বাজালে এস্রাজের যে-ভাব হত, কাকের ডাকে ঠিক সে-রকম ভাব হয় যেন তন্দ্রাচ্ছন্নের। আমরা মানুষরা বাদ্যযন্ত্র বৈকি।

এবার আয়েশা চোখ তুলে তাকাল আমজাদের পানে। কী যেন তাকিয়ে দেখল, তারপর চোখ নাবিয়ে বললে :

—তোমার তন্দ্রা এসেছিল নাকি?

—না তো!

দৈহিক তন্দ্রা না এলেও হয়তো মানসিক তন্দ্রা এসেছিল।

তারপর কথা থেমে গেল। বাইরে রোদ চড়ছে, হাওয়া উঠছে গরম হয়ে। এখন রোদে দাঁড়ালে ত্বক চিনচিন করবে, আর হয়তো গরম হাওয়ায় নাক জ্বালা করবে। কিন্তু তবু, পশ্চিমের এ-ঘরটায় এখনো কিছু ছায়া কিছু শীতলতা, আর জামপাতা-কাঁপিয়ে মৃদু-মৃদু যে-হাওয়া আসে সে-হাওয়া ভারি ভালো লাগে। হালকা প্রেমালাপের মতো মিষ্টি সে-হাওয়া।

মনে কখন তন্দ্রা নাবল আবার। কোনো কথা নেই, হঠাৎ সে-তন্দ্রাচ্ছন্ন মনে অতি ক্ষীণভাবে কী একটা সুর বাজতে লাগল— নায়িকার গানের প্রারম্ভে নেপথ্যে যেমন সুর বেজে ওঠে বাদ্যযন্ত্রে। অবশেষে গানও হল শুরু, এবং সে-গান স্বপ্নের মতো মধুর, দিগন্তের মতো আবছা উঁচু স্তরের শ্লথগতি হালকা ধোঁয়াটে মেঘের মতো। দোল-দোল জামপাতা, আহা দোল না কেন! মৃদু হাওয়ায় দোল জামপাতা মৃদু-মৃদু দোল : সত্যি, ভারি ভালো লাগছে, জামপাতা তুমি দোল।

গান-তো হল শুরু, এবং সে-গান স্মৃতির গান। ছেলেবেলার একটা অস্পষ্ট রোদদীপ্ত দুপুরের কথা মনে জাগছে। তখনো জগৎ অজানা, পৃথিবীর লোকগুলো অচেনা, মনটা তুলতুলে নরম—মায়ের আদেশে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অনুভব করা সে-রোদদীপ্ত বোশেখি দুপুর এতদিন পরে হঠাৎ মনের কোণে সুর গুনগুনিয়ে তুলল আর বেদনায় নীল হয়ে উঠতে লাগল সারা অন্তর।

কাল রাতেও এমনি একবার হয়েছিল। এ-ঘরেই টেবিলে বসে সে ডায়রি লিখছে, এমন সময় হঠাৎ কেমন ঝিরঝিরে হাওয়া এল ভেসে। আমজাদ লেখা বন্ধ করে ভাবলে, এ-হাওয়া আমি ভালোবাসি। ভাবলে, এখন না রাত? বাইরে না এখন ঘন আঁধার? ওই আঁধারের মতো আমার জীবনে যে কেমন একটা অতীত—(কেমন একটা অতীত....অতীত। কার অতীত? আমার, আমার অতীত। ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা যদি আমার থাকত তবে এই অতীতের দেহ নিয়ে

গড়তাম আমার প্রিয়াকে।) কেমন একটা অতীত যে-গড়ে উঠেছে সে-অতীত থেকে ভেসে এসেছে এ-হাওয়া। আমজাদের বাস্তবিক মন সেকথা মানতে চায় না; কাব্যিক-মন আবার বলে : মান কি-না-মান তবু শোন, সেই যে আমার অতীত—আমার অতীত, সেই অতীতের মৌন-গভীর কৃষ্ণ-দেহ স্পর্শ করে এসেছে এই হাওয়া, এই হাওয়া।

আহা, জামপাতা তুমি দোল। দোল আর ঝিকমিক কর আলোতে। তখনো জগৎ অজানা, এখনো জগতের লোকেরা অচেনা... আহা ওগো জামপাতা—

কিন্তু ওধারে কী একটা আওয়াজ হল। কিসের আওয়াজ ওটা—এত মৃদু অথচ এত চমকানো? না, কিছু না, শুধু আয়েশা সেলাই বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বলে আওয়াজ হয়েছে চেয়ারে। তারপর আয়েশা কথা বললে :

—চল, গোসল করবে তুমি।

আমজাদের মনে ঘুম-ভাঙা অনুভূতি। তবু দ্রুতভাবে হতের ঘড়ির পানে চেয়ে ত্রস্তভঙ্গিতে সে উঠে পড়ল। দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় একবার বললে :

—দেখতে-দেখতে কেমন বেলা হয়ে গেল—

ওই কি প্রভাত? অতীতের মতো দিগন্তের পেছনে মধুর স্বপ্নের মতো কী যেন কী, ওই কি প্রভাত? মাথার কাছে জানলাটা সম্পূর্ণ খোলা, পর্দাও সরানো। ঘুম থেকে জেগে আমজাদ তাকাল আকাশের পানে দিগন্তের পানে, তারপর ভাবলে, ওই কি প্রভাত? হয়তো-বা। এবং অদ্ভুত—অতি অদ্ভুত এ-প্রভাত। ভাঙছে—দিন ভাঙছে ক্রমশ। বিশাল রাত্রিতে জমাট বেঁধেছিল, এবার দিন ভাঙছে—ভাঙছে ক্রমশ। অপূর্ব কল্পনাতীতভাবে মহান। অনির্বচনীয়।

এবং, উষা দেখা দিলে সর্বপ্রথম যে-পাখিগুলো ডেকে ওঠে, তারা এবার ডেকে উঠল (নিঃসন্দেহে প্রভাত, মহান প্রভাত।)। কিন্তু পাখিগুলোর ডাক লক্ষ্য করবার মতো। কাকও-তো সর্বপ্রথম ডেকে উঠতে পারত, কিন্তু তাহলে মানাত কি? রাত্রি শেষ, অতল সাগরের তলে না-দেখা লতাগুল্মের কল্পিত কম্পনের মতো উষা জাগছে, এ-সময়ে ওই পাখিদের আবছা-অস্পষ্ট নরম-কোমল উষার আগমনে ঈষৎ চঞ্চল কম্পমান রব ছাড়া আর কোনো রব মানাত না। তাদের মলয়-কথা ক্ষীণ-লতার মতো এঁকেবেঁকে উঠুক এখনো-ঘুমন্ত পৃথিবীর বুকে, ঊর্ধ্ব আকাশে, আর পশ্চিম-আকাশে উজ্জ্বল শুকতারা জ্বল-জ্বল করুক। কী ক্ষুদ্র তারা অথচ কী শক্তি! সত্যের মতো শক্তি, সত্যের মতো দীপ্তি ওই ক্ষুদ্র তারায়। আর, একটি বলে মনে হয় কিসের সাক্ষী যেন সেটি। (সমাজে সাক্ষী সংখ্যায় বহু, হৃদয়ে সাক্ষী একমেবাদ্বিতীয়াম।) কিসের সাক্ষী? কে জানে।

একটা বিরাট কথার দেহে সুচের ঘা লাগল যেন। অতি সূক্ষ্ম হলেও তীব্রতা আছে তার। পাশে আয়েশা নড়ে উঠেছে। এবং কিছুক্ষণ পর ঘুম-ভরা ভারি গলায় কথাও বললে সে :

—আজকাল খুব সকালে ঘুম ভেঙে যায় তোমার। কৈ, শোও-ও তো দেরি করে।

—তাই তো। কিন্তু বেলা করে ঘুমোবার বিশ্রী অভ্যেসটা গেল তাহলে—

—কাজ-কর্ম নেই কিনা কিছু...কাজে যোগ দিলে দেখবে আবার—

আমজাদ উত্তর দিলে না। একটু পরে আয়েশা আবার বললে :

—আজ থেকে সকাল-সকাল শুয়ে পড়বে।

আমজাদ এবারো উত্তর দিলে না, শুধু তাকাল ওর পানে অলস-দৃষ্টিতে। ওর গায়ের রং উষার মতো। কখনো তাতে রোদ লাগে নি যেন। এবং উষার আলোয় তার দেহের রং অপূর্ব দেখাচ্ছে।

বালিশে নাক গুঁজে অলস সুরে আয়েশা প্রশ্ন করল : কী দেখছ?

আমজাদ কোনো উত্তর দিলে না। তারপর হঠাৎ ভাবলে, এই দেহের একদা মৃত্যু হবে। (আচ্ছা, জীবিতদের মৃত্যু হবে হবে—এ-কথার চেয়ে মৃত্যুও ভালো নয় কি? একদা প্রাণশূন্য

হবে এই দেহ—উষার মতো রং যার।) কিন্তু আমজাদ মন থেকে এ-কথাটা তাড়াতে চাইল, এবং তাই বললে :

—তোমার শরীর এখানে এসে ভালো হয়েছে কিন্তু।

—আহা, কোন দিনই-বা খারাপ ছিল?

—ছিল না মানে?

বালিশে নাক গুঁজেই আয়েশা হাসল উষার মতো অস্পষ্ট হাসি।

এরপর তারা নীরব হয়ে রইল। অনেক আলো হয়েছে যেন এরই মধ্যে। তাই চেয়ে-চেয়ে দেখল আমজাদ, আর হাত বাড়িয়ে ওর চুল নিয়ে খেলা করল কতক্ষণ, তারপর দুজনেরই চোখ কখন ঘুমে ভরে উঠল, ঘুমিয়ে পড়ল তারা। আবার যখন ঘুম ভাঙল তাদের তখন রোদ খটখট করছে। আয়েশা উঠতে যাবে; কিন্তু কিসে যেন তার আঁচল বাধা পড়ছে: আমজাদ ওর আঁচল ধরে রেখেছে।

—বারে, উঠব না?

—না।

এবং আমজাদ বিস্মিত হল এই দেখে যে, আয়েশা একটুও আপত্তি না করে বিছনায় ভেঙে পড়ল আবার। তাতে আমজাদ হয়তো উৎসাহ পেল, তাই এবার বলে ফেললে যে, ওর গায়ের রং তার কাছে ভয়ানক ভালো লাগছে। সেকথার কোনো উত্তর আয়েশা দিলে না, শুধু গলার পাশ দিয়ে আঁচল টেনে দিলে। আমজাদের ভালোলাগা তাতে কিন্তু বিন্দুমাত্র ব্যাহত হল না, সে ভেবেই চলল : কী অদ্ভুত রং? আর তার বড় ভালো লাগতে লাগল, বড় ভালো লাগতে লাগল : এবং ভালোলাগার এ-অনুভূতি শারদীয় সূর্যালোকের মতো ঝলমলে আলো করে তুলল তার সারা মন। এ-আলোঝলমল মনে ছবি খেলতে লাগল—হরেক রকমের উজ্জ্বল বর্ণের সব ছবি। শেক্সপীয়রের সে রূপক : ত্রিসঙ্গমের ত্রিস্রোতের সংঘাতে যে-আবর্তের সৃষ্টি, তাতে যে-নীল বুদ্বুদ, সে-বুদ্বুদে যে-পরীরা নাচে সে-পরীদের ছবি ভাসল মনে। সঙ্গমনীয় মণির কল্পনা চলল মনে। উজ্জ্বল আলোর তলে ঝকমক করা ঈষৎ-রঙিন পেয়ালায় লালচে সুরার ছবিও ঝলকে উঠল মনে। রং, রং আর রং।

আয়েশা ওকে চুমু দিলে। কিন্তু ওর মধ্যে যে রঙের স্রোত বইছে—সেকথা না জেনে। আমজাদ চমকে উঠল। কী শীতল চুমু, যেন সাপের দেহের স্পর্শ লাগল ঠোঁটে; কী কঠিন চুমু, যেন লোহার ঠোক্কর লাগল ঠোঁটে। তার মনটা হঠাৎ সংকুচিত হয়ে উঠল : মনে যে-রঙের স্রোত বইছিল, ও-তো আর শুধু রং নয়, যেন গলিত সোনা গলে-গলে পড়ছে। কী বিশ্রী। কী ভয়ঙ্কর। কী অসহনীয়। এ-গলিত সোনার স্রোত থেকে মুক্তি চাই।

তারপর এক সময়ে আয়েশা যখন বললে : এই ওঠ। আমজাদ তক্ষুনি সেকথা মেনে নিলে, বললে, ওঠ। সে হাসল—আটপৌরে হাসি, সে হাই তুললে—বিকট হাই, এবং হাই শেষ না-হতেই বলতে শুরু করল : দেখেছ, রোদ কত চড়া হয়ে উঠেছে?

আয়েশা চুল ঠিক করছে বলে তার চুড়িতে আওয়াজ হচ্ছে।

অনেক সময় মনে হয় যেন মুহূর্তগুলো ঝরে। শ্রাবণের একটানা অথচ নরম বর্ষণের মতো শুধু ঝরে ঝরে ঝরে। ঝরে আর ঝরে। ইজিচেয়ারে দেহ এলিয়ে আমজাদ সে-মুহূর্তে বর্ষণ শুনছে। সত্যি শুনছেই যেন। ঘরে আবছা অন্ধকার। বাইরের তাপের জন্যে জানলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অল্প দূরে ঘরের মাঝখানে ঝকঝকে লাল মেঝেতে শীতলপাটি বিছিয়ে আয়েশা শুয়ে রয়েছে যেন আধা-বলা কথার মতো আবছা হয়ে, আর তার শোবার ভঙ্গি ধনুকের মতো বাঁকা। চোখে কি তার ঘুম? হয়তো-বা। মুহূর্তগুলো যে ঝরছে ঝর-ঝর করে অবিরাম, তাইতে তার ঘুম জমেছে ভালো। একথা সে ভেবেছে কী অমনি আয়েশা পাশে এলিয়ে-পড়া পাখাটা হাতড়ে খুঁজে নিয়ে (চোখ তাহলে এখনো বোজা) হাওয়া করতে লাগল সজোরে।

একটু পরে সে কথাও বললে : এত গরমে এত সিগ্রেট খাচ্ছ কেন?

আমজাদের পাশে ছাইদান পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তারপর আবার চুপচাপ। মুহূর্তগুলো ঝরছে, ঝর ঝর ঝর। আয়েশার শোয়ার ভঙ্গি এখনো তেমনি : ধনুকের মতো বাঁকা। দেখে আমজাদের মন এবার বলে উঠল হঠাৎ : সন্তান দাও সন্তান দাও, খাদ পুরিয়ে দাও। আয়েশা চায় কী? কে জানে। হয়তো কাঁদেও তার জন্যে, তার জন্যে হয়তো লুকিয়ে কখনো-সখনো কাঁদেও। এই কথা ভেবে মায়া লাগল আমজাদের, সে টলমল অন্তর দিয়ে তাকাল তার পানে : ওর হাতপাখা নাড়ছে; মুখটা বুকের দিকে গোঁজা বলে এখান থেকে দেখা যায় না তার মুখ। ওই মুখ ওই দেহ তার সঙ্গী এতদিনের, থাকবেও আজীবন। এবং থাকবেও আজীবন এ-কথায় তার অন্তর হঠাৎ মমতায় ছলছল করে উঠল।

আর মুহূর্তগুলো তখনো ঝরছে ঝর ঝর।

তারপর কোথেকে প্রচণ্ড হাওয়া এল, ঘর-বাড়ি কাঁপিয়ে, দরজা-জানলায় খটাখট আওয়াজ তুলে হাওয়া লাগল উদ্দামভাবে। বিরাট কিছুর যেন আগমন : এল কালবোশেখি ঝড়, (সার্থক হল মাসের নামের)। বিরাট আকাশে আর ধরণীর বুকে এল কালবোশেখি ঝড়, এল মত্ত-প্রাণ নিয়ে, যারা মৃত্যুর দোরে ঝুঁকেছে তাদের মাঝে প্রাণ-সঞ্চার করতে এল ঝড়। এস ঝড়, কাব্য উড়িয়ে তুলোর মতো এস ঝড় গুরু ভারি ঘন। কালো-কাজল হয়ে উঠুক আকাশ : ধরণীর আরাম-বিলাসী মরণভীতু মানুষের বুকে ত্রাস সঞ্চার কর, আর (আহা, আয়েশা যদি উড়িয়ে দিত কালো ঝড়ে তার কালো চুল?) আয়েশার মনে তোমারই মতো আরেকটি ঝড় তুলে দাও : জীবনের স্বাদ নিক সে।

ঝড় এল অবশেষে, প্রবল ও প্রচণ্ড। এবং ঝড়ের মাঝেও হঠাৎ ঘুমের মতো পড়ে থাকা আয়েশা মুখ তুললে, তুলে বললে যে বাগানে রজনীগন্ধাগাছে যে একটি রজনীগন্ধা ফুটেছে কী করে, এ-ঝড়ে নষ্ট হয়ে যাবে সেটি। আমজাদ কোনো উত্তর দিলে না; কিন্তু তার মনে স্রোতের মতো অবিরাম কথা বইতে লাগল : কিছু না, শুধু একটি রজনীগন্ধা দেখেছি, দেখেছি বৃন্তে, দেখেছি আকাশের তলে, আর দেখেছি অসীম জ্যোৎস্নালোকে। (কোথায় জ্যোৎস্নালোক এ-কৃষ্ণপক্ষে? তা না-থাক, কিন্তু ঝড়ের আওয়াজে কথা ছুটছে, ছুটছে....) দূরে যেন বহু দূরে নদীর (কোথায় নদী? কিন্তু ছুটছে কথা, ছুটছে....) অপর তীর ঘেঁষে ভেসে নৌকায় কে কোন মাঝি গেয়েছে গান, অন্তরের উৎস হতে উৎসারিত গান, অসীম আকাশে নীরব আকাশে ছড়ানো ভাসানো গান....। আরো কত সব কথা—

এক সময়ে আয়েশা মুখ তুলে নাক সিটকে বললে :

—আহ্, ধুলোয় যে ভরে গেল ঘর।

যে-জানলাটি খোলা ছিল আর খাঁচাবন্ধ নতুন-বন্দি পাখির মতো ডানা-ঝটপট করছিল, আমজাদ নীরবে সেটি বন্ধ করে দিয়ে এল। ফেরবার সময় এবার ইজিচেয়ারে নয়, আয়েশার পাশে শীতলপাটিতে বসে পড়ল। তারপর বৃষ্টি। শব্দে বোঝা যায় বল্লমের মতো তার ফোঁটাগুলো। আহ্ কী শব্দ কী শব্দ। রক্ত টগবগ করে ওঠে, দেহ শিউরে ওঠে। মুহূর্তগুলো উড়িয়ে এসেছে ঝড় মহারবে : জয় মহারবের। (এখনো যেন সে-মুহূর্তগুলো রয়েছে কোথায়; তবে সেগুলো আর ঝরছে না, বরফ-কণার মতো উড়ছে।)

আয়েশা ফিসফিস করে কী যেন বললে। প্রথমবার আমজাদ শুনল, একটু উঁচু গলায় দ্বিতীয়বার সে বললে : জান, কালবোশেখি ঝড় এলে ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে। ঝাল দিয়ে সেই কাঁচা আম...

শুনে আমজাদের হঠাৎ একটা কথা মনে হল। কথা ঠিক নয়, একটি উপমা। আয়েশা সোনার মূর্তি।

তার অনেকক্ষণ পরে। টুপটাপ-টুপটাপ। বারান্দার টিনের ছাদ হতে অবশিষ্ট জল গড়িয়ে পড়ছে বাঁধানো ড্রেনে : ঝড় থেমেছে, বৃষ্টিও এবং তারই আওয়াজ হচ্ছে : টুপটাপ

টুপটাপ। আয়েশা সেই ছন্দে চোখের পাতা ফেললে পারত। তাহলে সে-চোখের পানে চেয়ে নৃত্যশেষে যে-স্তব্ধতার নৃত্য রয়েছে, সে-নৃত্যশোনা যেন উপভোগ করা যেত হঠাৎ স্তব্ধ-হয়ে-ওঠা মন নিয়ে। কিন্তু আয়েশা-তো সোনায় গড়া : সে সোনার মূর্তি, শক্ত কঠিন অথচ জ্বলজ্বলে। এবং এবার তার স্পর্শ আমজাদের খারাপ লাগতে লাগল : সোনা হয়ে উঠবে নাকি সে-ও?

কিন্তু তা উঠুক। তবু সোনাকে সে স্পর্শ করবে। ঝড় যখন থেমে গেছে তখন আর ভয় কিসের? (উল্টো কথা নয় কি? কিন্তু বলি, ঝড় যখন থেমে গেছে তখন উল্টোই বা কী সিধেই-বা কী?) তাই সে আয়েশার শীতল গালে চুমু দিলে আস্তে : তারপর ঠোঁটে দিলে। এবার আস্তে নয়— নিবিড়ভাবে, দীর্ঘভাবে। এবং অনেকটা অকারণে যেন অবশ হয়ে এল তার চোখ, রক্তে ঘনিয়ে উঠল আবেশ—মধুর অথচ প্রগাঢ় আবেশ।—মৃত্যু কি এই রকম (উষার মতো যে-দেহের রং, সে-দেহেরও মৃত্যু হবে একদা। ওগো, একদা। তবু একদা হবে— এখন নয়, একদা হবে। একদা কী মধুর।)।

অসংখ্য তারাময় আকাশটি যেন মখমল : পৃথিবীময় মখমলের মতো রাত্রি এসেছে নিঃশব্দে। কত তারা আকাশে? আয়েশা করছে কী? বোধহয় স্বপ্ন দেখছে, চাঁদের স্বপ্ন। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে তার মন হয়তো আলোর বিরহে কাতর, আর চাঁদের স্বপ্ন দেখছে সে। ... রাত কত? খাওয়ার শেষে সেই-যে ওরা ছাতে বসেছে—। সেই থেকে আমজাদ তার সময়-জ্ঞান হারিয়েছে। সময় অচল যেন, কিংবা অন্য কোনো পথে চলছে, বহুদূর দিয়ে হয়তো চলছে : সে-চলার শব্দ এখানে পৌঁছয় না—কানে তার পৌঁছয় না।

কিছু পরে আয়েশা কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠল। আঁধারে ঢেউ তুলে বললে : আজ আমরা ছাতেই শুই—কেমন?

আমজাদের কথা কইতে একটু দেরি হল। মন তলিয়ে ছিল, ওপরে ভেসে আসতে যা সময় নিল। তারপর সে বলল : বেশ-তো।

শোবার আয়োজন হল। এবং আয়েশা বালিশের ওপর দিয়ে পেছনে চুলের রাশি ছড়িয়ে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে শুয়ে পড়ল, মাথাটি বুকের কাছে ঈষৎ গোঁজা। (এই তার শোবার স্বভাব-ভঙ্গি।) আমজাদ আর কী করে। কী আর করে সে। তাই পাশে শুয়ে সিগ্রেট ধরিয়ে তারার পানে ধুঁয়ো ছাড়তে লাগল নিঃশব্দে, আর কখন আবার ডুবে গেল বিপুল আকাশের বিপুল স্তব্ধতায়। কিন্তু এধারে আয়েশার মনে আকাশ নেই তারা নেই। সত্তা-নৈকট্যে ওর মাথা ঝিমঝিম করছে। শুয়েছে সে ঘুম নিয়ে নয়, মনে আবছা কথার ধোঁয়া নিয়ে নয় : ওর মাথায় ঝংকার, যে-ঝংকারে কামনার তীব্রতা। কিন্তু যে-কথাটা থেকে-থেকে সারা দেহে ঢেউ তুলছে সে-কথাটি এখনো অস্পষ্ট, চেতনা থেকে এখনো যেন পালিয়ে আছে দূরে। তবু তা ঢেউ তুলছে তার দেহে, ঢেউ তুলছে। সত্যিই যেন ঢেউ উঠছে সারা শরীরে, গায়ের ব্লাউজ আঁট-আঁট ঠেকছে।

কোথাও কোনো শব্দ নেই। তারাময় আকাশ ছাড়া আর কোনো বিপুল অতল উদাত্ত পৃথিবী যদি থাকে, তাতে আমজাদের মন তলিয়ে আছে। বাইরের থেকে মনে হবে ও-যেন প্রগাঢ় ঘুমে। কিন্তু আয়েশা-তো আড়চোখে চেয়ে দেখতে পাচ্ছে যে, ওর চোখদুটি মেলা, আকাশের পানে তার দৃষ্টি। (এত অসংখ্য তারার কোন বিশিষ্ট তারার ছায়া পড়েছে তার চোখে?) কিন্তু আয়েশা আড়চোখে চাইছে কেন? চাইছে এই কারণে যে, এখন তার মনে আকাশের উদারতা নেই : তার দেহের কথা ছাপিয়ে উঠেছে সবকিছু, প্রতি শিরার কম্পন তার কানে আওয়াজ তুলছে, এবং বিচিত্র সে-আওয়াজ : দেহের এত নৈকট্যে তার মন শঙ্কায়-আশঙ্কায় এবং কামনায় হৃৎপিণ্ডের তালে-তালে কেমন কথা কইছে বারেবারে। তবু আমজাদের মনে তো নীরবতার কঠিন পাহাড়, কঠিন কালো পাহাড়। না, তা যেন ঠিক নয়। ওর যে-মন

খানিক আগেও খণ্ড-খণ্ড ছড়িয়ে ছিল, কিছু ঝরনার মতো ঝরঝর করে ঝরে পড়ছিল, কিছু বয়ে চলেছিল নদী-স্রোতের মতো, কিছু সাগরের মতো বিলীন হয়েছিল সীমারেখা হারিয়ে—আলোড়ন-কম্পন বিক্ষেপ-আক্ষেপে চমকিত অথচ সহজ সরল বিপুল বিশাল তার সে-মন হঠাৎ জমাট বেঁধে গেল, জমাট বেঁধে গেল চাঁদের মতো, এবং সে-চাঁদমন ভাসছে বিপুল-শূন্যতায়। না, কালো-কঠিন পাহাড় নয়।

কী নীরবতা। কিন্তু সে-নীরবতা দূর রাস্তার একদল পথচারীদের উচ্চহাসিতে আর কথায় যে কেঁপে উঠল তা কি শুনল আমজাদ? বোঝা মুশকিল। ওগো, তবু কী নীরবতা (কী ভয়াবহ নীরবতা?)। যেন অতল জলে প্রাণময় দেহ ডুবিয়ে রেখেছে। আমজাদের চোখ একটুও কাঁপবে না কি? মনে হয় যেন কাঁপবে না। সে তাকিয়েই আছে আকাশের পানে, তাকিয়েই আছে... তার খোলা চোখ মৃতের চোখের মতো ভাষাশূন্য, স্থির। এবং একথা ভেবেছে কী অমনি আয়েশার মন হঠাৎ ঘৃণায় সচকিত ও সংকুচিত হয়ে উঠল, সে-বিশ্রী কথাটি ভুলতে চাইল বারেবারে। কিন্তু যত সে ভুলতে চাইল তত তার মনে আমজাদের চোখের শুভ্র অংশ কালো দিগন্তের বিজলি-চমকানোর মতো ঘন-ঘন চমকাতে লাগল, এবং অবশেষে সে অসহায় হয়ে ডাকলে : এই। কোনো উত্তর এল না, তারপর আবার চুপচাপ।

আমজাদের কানে কিন্তু সে-ডাক পৌঁছেছিল। তবে কোনো কথা হয়ে পৌঁছে নি, তার মনে নিয়ে এসেছে শুধু একটা কম্পন, একটু চাঞ্চল্য, এবং তাইতে তার জমাট মনের কোথাও যেন ধসে পড়ল। তারপর কোনো কথা নেই হঠাৎ বালুময় নদীর ছবি জেগে উঠল মনের চোখে। বালু ধু-ধু করছে রোদে, আর বালুর প্রান্তে কাশবন দুলছে হাওয়ায়। রোদ কী চিকচিক করছে অথচ কোনো শব্দ নেই, কাশবন কী দুলছে অথচ কোনো শব্দ নেই। একটু পরে আরো একটা কথা জাগল মনে। যখন সে স্কুলের ছাত্র, তখন একটি মেয়েকে সে ভালোবাসত ভয়ানকভাবে। একদিন তার সাথে অভিমান করে বালুময় ধরালা নদীর তীরে কাশবনের ধারে বুকভাঙা বেদনায় সে লুকিয়ে-লুকিয়ে কেঁদেছিল অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। কাঁচা বুকের সে-বেদনা কত তীব্র হয়েছিল? কিন্তু সে-বেদনার কথা এখন স্মরণ নেই, তবে সে-কান্নার কথা মনে পড়ে গিয়ে এখন তার মন বেদনায় ছলছল করে উঠল। সেই কাশবন, সেই ধু-ধু করা বালু আর ধরালা নদী...। অন্তরময় হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বইল। কিছু ভুল হল। অন্তরময় একটা কথা দমকা হাওয়ার মতো বইল এবং সে-হাওয়া বললে : কোথায় গো সে-দিন?

কিন্তু আয়েশার মাথায় সত্তা-নৈকট্য আর বাক্যবাগীশ চেতনা দপদপ করছে ধমনি-কম্পনের তালে-তালে। কেমন একটা অস্পষ্ট ঘৃণায়ও মনটা ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। তার চোখই শুধু মৃত চোখের মতো নয়, দেহও মৃতকের মতো নিস্পন্দ নিষ্কম্প। আমজাদকে খোঁচাতে, ধাক্কা দিতে তার কানে ঝাঁঝালো কণ্ঠে কথা কইতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু তার চেয়েও প্রবল যে অভিমান। আয়েশা একটুও নড়বে না, একটা কথাও কইবে না, ঘুমোবে না পর্যন্ত।

এখনো থেকে-থেকে একটা কথা দমকা হাওয়ার মতো গুমরে-গুমরে উঠছে আমজাদের সারা অন্তরময় : ওগো কোথায় সেদিন, কোথায় সেদিন? তারপর হঠাৎ কী হল, হাওয়া যেন দিক বদলাল, চমকে উঠে আমজাদ তাকাল আয়েশার পানে, তারপর পুলকে শিউরে উঠে, আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে তার মন উত্তর দিলে : এই তো সেদিন, ওগো এই তো সেদিন। তীব্র চাঞ্চল্যময় কৌতূহল নিয়ে আমজাদ কতক্ষণ তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখল, তারপর হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে জ্বালাময় চুমু দিলে।

আয়েশা প্রথমে চমকে উঠল। শেষে তার অভিমান ভেঙে খান-খান হয়ে গেল, চোখ এল পানিতে ভরে।

আবেগের ঝড় শান্ত হলে আয়েশা চোখ মেলে তাকাল, বলল :

—একটা কথা।

—কী?

—তোমার শরীর-তো সেরেছে, এবার চল কলকাতায় ফিরে যাই।

—ছুটি ফুরোতে এখনো-তো বিশ দিন।

—তা হোক। এখানে ভালো লাগছে না।

আয়েশা এখান থেকে পালাতে চায়। বিপুল অবসরকে তার ভয় হয়েছে কি? হ্যাঁ, হয়েছে। হবে না? অবসর যেন বিরাট পাথর। অবসর যেন দৈত্য। বর্তমানে সে-অবসরদৈত্য তার মনে চেপে আছে বিপুল ভারিত্বে।

আমজাদের মনে সুদূর-প্রাচ্যের কোন শিল্পীর আঁকা একটা ছবির কথা জাগছে। ছবিটার পটভূমি মস্ত। অথচ তাতে নেই এতটুকু রং। রং-স্পর্শশূন্য সারা পটভূমি ধু-ধু করছে বিপুল শূন্যতায়। শুধু যে ধু-ধু করছে তা নয়, মুক্তির কথাও যেন ঘোষণা করছে উদাত্তকণ্ঠে। কারণ সে-শুভ্রপটের এক কোণে গাছের কটা পাতা অশান্ত হাওয়ায় কম্পমান।

: ধু-ধু করা বিশাল মুক্তির পথ দিয়ে চল, চল কম্পমান কর্মের আন্দোলনে। এবং প্রাণময়তায়।

বৈশাখ ১৩৫৩ মার্চ ১৯৪৬

নকল

আফিয়ার আব্বা গম্ভীর প্রকৃতির লোক। চেহারাটা ভারি, বৃহৎ বাঁকা নাক। আর চোখদুটি অদ্ভুত রকম স্থির। কখনো-কখনো তাতে গাম্ভীর্য বা বিরক্তি ঘনিয়ে ওঠে বটে, কিন্তু হাসির উচ্ছলতা তাতে ধরা পড়ে না।

ছোটবেলায় আব্বার সঙ্গে আফিয়ার তবু ঘনিষ্ঠতা ছিল। আদর করে কথা কইতেন, মিষ্টি করে হাসতেন। তাছাড়া প্রয়োজন হলে শাসনও করতেন। বাড়িতে পয়সা চুরি যাওয়ার ব্যাপারটা এখনো স্পষ্ট মনে আছে তার। সেবার মুনু রেজিয়ারা এসেছিল। ওরা আত্মীয় বটে, কিন্তু বিদেশে তারা থাকত বলে আগে কখনো দেখি নি তাদের। মেহমান পেয়ে আফিয়ার আনন্দ হল, ভাব করল তাদের সঙ্গে। কিন্তু দুয়েক দিন পরে বুঝলে ওদের যেন কেমন ছ্যাঁচড়া অভ্যাস, এটা-সেটা চুরি করবার ঝোঁক। আব্বা বরাবর বাড়িতে পয়সা-সম্বন্ধে উদাসীন। বলেন, বাড়িতে যদি পয়সা ছড়িয়ে নির্ভয়ে থাকতে না পারলাম তবে বাড়ি আর বাড়ি হল কোথায়? একদিন যখন একটা টাকা চুরি গেল এবং এই নিয়ে আব্বা রেগে গেলেন তখন আফিয়া এক সময়ে আস্তে গিয়ে আব্বাকে বললেন—আব্বা, মুনু টাকা নিয়েছে।

তার চোখে হয়তো কিছু ছিল। তাই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তার পানে তাকিয়ে বললেন,—তুমি দেখেছ নিতে?

—না।

—তবে কী করে জান ও নিয়েছে?

আফিয়া তখন ছোট বলে বুদ্ধি গুলিয়ে গেল। যদিও সে মুনুকে টাকা চুরি করতে দেখে নি, কিন্তু তারই যে একাজ এ-বিষয়ে যে করেই হোক সে নিঃসন্দেহ ছিল। কিন্তু প্রমাণ নেই। ভেবে একবার ঢোক গিলে বললে,— মনে হয়।

আব্বা আবার কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে রইলেন। হয়তো ভাবলেন কিছু, তারপর বললেন,—মনে হয় কোনো কথা নয়। ধর, আমার মনে হয় এ তোমার কাজ।

আফিয়া অস্থির হয়ে উঠল। যে-ধারণার সত্যতা সম্বন্ধে এত নিঃসন্দিগ্ধ ছিল, তা কেবল

ব্যক্ত করে এমনি প্যাঁচে পড়ে যাবে সে ভাবতেই পারে নি। তাছাড়া আব্বার শেষোক্ত কথায় হঠাৎ তার অভিমান উথলে উঠল। কী করে আব্বা এই কথা বলতে পারেন?

আব্বা এখনো কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার পানে, তার চোখের ভাবে তাঁর চোখের কিছু পরিবর্তন হল না। তিনি আবার দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—বল মেয়ে, কথা বল। আমার মনে হয় একাজ তোমার, তুমি এর উত্তরে কী বল? এরপর অকস্মাৎ আফিয়ার মনে লড়াই শুরু হল। কী যে প্রাণপণে সে দমাতে চেষ্টা করল প্রথমে বুঝলে না। কিন্তু কান্না যখন ঠেলে বেরিয়ে এল তখন সে নিজেকে শিথিল করে দিল। আব্বা তাকিয়ে দেখলেন, বুঝলেন কেন এই কান্না, মেয়ের বুকে কোথায় সবচেয়ে বেশি আঘাত লেগেছে। সবল হাতে আস্তে তাকে কাছে টেনে এনে মাথায় এক হাত রেখে অতি ধীরে-ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে বললেন,—তোমাকে আদর করছি, কারণ তুমি কিছু গুরুতর দোষ কর নি। কিন্তু একথা মনে রেখো স্ব-চোখে কিছু না দেখে কখনো কারো নামে একটি কথা বোলো না। এবং স্ব-চোখে দেখলেও অকারণে তুমি-যে লোকের কাছে বলে বেড়াবে, সেটিও ঠিক নয়।

বলে তিনি এক কুটনী বুড়ির গল্প শোনালেন। এবং শুনতে-শুনতে আফিয়ার কান্না চোখেই শুকিয়ে গেল। অশ্রুকে আব্বা কোনোদিন বেশি আমল দেন না, কাজেই ওর মোছামুছির ব্যাপারে তিনি বরাবর নিরুৎসাহ। তাছাড়া বাইরের চোখের পানি সম্বন্ধে সজ্ঞান করে না দিয়ে বরঞ্চ ভেতরের আসল সত্তাকে টেনে আনেন বাইরে।

বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে সম্বন্ধটা কেমন অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার চরিত্রগঠন ব্যাপারে তাঁর কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে তিনি এখন মেয়ের সম্বন্ধে নির্লিপ্ত। মেয়েও যে বিনা প্রয়োজনে বাপের কাছে ঘেঁষে যায় তাও নয়। কখনো-কখনো তার ইচ্ছে করে বাপের একটু খেদমত করে। একবার হঠাৎ শুরুও করেছিল কিন্তু ব্যাপারটা লক্ষ্য করে তিনি মেয়েকে ঘরে ডেকে বললেন,— তুমি নিজেকে আমার কাছে ঋণী বোধ করছ?

আফিয়ার কপাল লাল হয়ে উঠল। আব্বার কথার প্রতিবাদ করতে যাওয়া নিজেকে আরো প্রকাশ করা মনে করে সে চুপ করে রইল। আব্বা শান্তভাবে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে তারপর বললেন,—ঋণী যদি বোধ কর সেটা খুব খারাপ নয়। তবে একথা এখনো শেখ নি যে স্নেহ-মমতার ঋণ পরিশোধটা টাকা লেন-দেনের মতো নয়। কারণ স্বার্থ থাকলে স্নেহ-মমতা থাকে না। আর সন্তান বাপ-মায়ের ঋণ শোধ করে পরে আপন সন্তানের কাছে। তুমি তোমার আব্বার কাছে ঋণী নও, তোমার সন্তানদের কাছে ঋণী।

আফিয়া পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে নীরবে শুনে গেল।

এরপর থেকে খেদমতের ব্যাপারে আব্বার ত্রিসীমানায় সে যায় নি। কেবল কখনো-কখনো আড়চোখে চেয়ে দেখে তাঁর মাথা ক্রমে-ক্রমে সাদা হয়ে উঠছে, মুখে ভাঁজ পড়ছে। দেখে বুক টনটনিয়ে ওঠে, অন্তরে প্রবল ইচ্ছে হয় যে, আব্বা যখন রাতে বিছানায় শুয়ে হুঁকা টানেন তখন তাঁর পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। কোনো-কোনো রাতে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। আব্বা বিছানায় শুয়ে জেগে আছেন অথচ চেতনা নেই। ও যে নীরবে বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তা তিনি টের পাচ্ছেন না। কিন্তু ঘরের নীরবতায় আর তার চোখের বিচিত্র শান্ততায় সে যে কালের মতো বিলম্বিত শান্তি পাচ্ছে তা যদি তিনি জানতেন তবে তিনি কি খুশি হতেন না, একবার তাকে বুকের কাছে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতেন না? আকুলভাবে আফিয়া তাকিয়ে থাকে আব্বার চোখের পানে। আশ্চর্য, তিনি জেগে আছেন বটে, কিন্তু তাঁর চেতনা নেই।

এই বাড়ির আম্মার অস্তিত্বটা তত স্পষ্ট নয়। তিনি আছেন, কিন্তু তাঁর থাকাটা নিরাকার। স্বামীকে নিয়েই তাঁর সব, তাঁর জন্যই এ-সংসার। তাঁর কাছে মেয়ে কিছু নয়; স্বামীর সঙ্গে যে অনন্তকালের সম্বন্ধ তার মধ্যে মেয়েটি যেন এক পলকের চাহনিমাত্র, যাকে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করা যায়। অথচ তিনি মেয়েকে উপেক্ষা করেন না। মেয়ের সুখ-সুবিধের দিকে তাঁর কড়া

দৃষ্টি। কিন্তু আবার সেটা নিয়ে হইচই নেই, সেটা যে গতানুগতিক খাওয়া-পরা থেকে আলাদা কিছু এমন কথা মেয়েরও কখনো খেয়াল হয় না। অতএব এ-পরিবারে আত্মসচেতন হবার উপায় নেই। নিজের সম্বন্ধে সচেতন নয় বলেই তার কাছে আকাশ অনন্ত, পৃথিবী বিশাল, যে-বিশালতা আপন ছায়ায় ঢাকা পড়ে না, বাধা পড়ে না।

মাঝে-মাঝে আব্বা তাকে ডাকেন। বিশেষ করে রাতে, যখন খেয়ে বিছানায় শুয়ে তিনি ধীরে-ধীরে হুঁকা টানেন। খাটের পাশে মোড়া, তাতে বসে আফিয়া অপেক্ষা করে। প্রথম আব্বা কিছুই বলেন না, শান্ত স্থির চোখে দেয়ালের পানে চেয়ে থেকে হালকা-হালকা ধোঁয়া ছাড়েন, স্থানটা মিষ্টি তামাকের গন্ধে ভুর-ভুর করে ওঠে। নীরবে আফিয়া তাকিয়ে থাকে, অপেক্ষা করে। অবশেষে আব্বা কথা বলেন দেয়ালের পানে চেয়ে থেকেই। কথাগুলো তাঁর বিশেষ চিন্তা, অথবা সাধারণ নীতিকথা—যা সবাই আওড়ায় বলে সেগুলো যে সত্যিকার নীতিকথা একথা মানুষ ভুলে যায়। তিনি যখন বলেন তখন আফিয়া শোনে, নীরবে, চুড়িতে পর্যন্ত সামান্য আওয়াজ হয় না। কথা যখন শেষ করেন তখনো আফিয়া নীরব থাকে, হয়তো তাঁর গভীর চোখের পানে চেয়ে, অথবা মেঝের পানে তাকিয়ে। তারপর ঘরে নীরবতা জমাট হয়ে ওঠে; এত নীরবতা যে আফিয়া তলিয়ে যায়, আর তার মধ্যে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আব্বার বলা-কথাগুলো বারেবারে কানে এসে লাগে। তারপর এক সময় তিনি আস্তে বলেন, যাও। শুনে সে আস্তে উঠে দাঁড়ায়, নীরবে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। কোনো-কোনোদিন কিন্তু এই সময় তার মনে সেই শৈশবের অভিমান মাথা ঠেলে ওঠে। সে যে আব্বার কথা মন দিয়ে শুনেছে, শুনে তার কেমন ভালো লেগেছে, এ-কথা জানাবার কি তার অধিকার নেই? আরো কিছুক্ষণ বসে আরো কিছু জানবার, শোনবার দাবি কি তার নেই? কিন্তু এ-পরিবারে আত্মসচেতন হবার যেমন উপায় নেই, তেমনি অভিমানকেও প্রাধান্য দেয়া যায় না।

২

বাড়ির সঙ্গে তাদের কোনোদিন সম্বন্ধ ছিল না। কাজেই একদিন যখন আফিয়ার এক মামাতো ভাই অকস্মাৎ কোথেকে এসে হাজির হল, সে বিস্মিত হল। তার নাম মোনায়েম। শুনে আফিয়ার মনে হল কবে স্বপ্নে যেন সে নাম শুনেছিল।

রাতে আব্বা আম্মাকে বললেন,—মনু আমাদের কাছে থেকে এখানে এম. এ. পড়বে। ছাত্র খারাপ নয়। ছেলেটা চঞ্চল, আর তার কথাগুলো অসংযত। কখনো হয়তো দ্রুতভাবে কয়ে সে তার বক্তব্য শেষ করে, কখনো আবার হাতড়িয়ে-হাতড়িয়ে তাকে কথা বের করতে হয়। আব্বা বলেছেন—ও ছাত্র খারাপ নয়, কিন্তু চলাফেরা কথাবার্তায় কেমন যে একটা অসামঞ্জস্য আছে তাতে মনে হয় না সে কখনো কিছু গুছিয়ে শৃঙ্খলভাবে করতে পারে।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে আফিয়া তেমন সন্তুষ্ট হল না। আব্বাকে দেখে মোনায়েম শান্ত হল না। তাঁর গভীর স্থির চোখের পানে চেয়ে তার অশৃঙ্খল চঞ্চলতা সংযত হল না।

প্রথম দুদিন মোনায়েম আফিয়ার সাথে কথা কইল না। হয়তো লজ্জায়। আফিয়া কিন্তু তা লক্ষ্য করলে না। তৃতীয় দিন সে বারান্দায় আফিয়াকে এড়িয়ে যেতে-যেতে শেষে কেমন থমকে দাঁড়িয়ে বলল,—বোন, তোমাদের কষ্ট দেবার জন্য এলাম। কিন্তু আমি দেখব তোমাদের যেন আমার জন্য একটুখানি কষ্টও না হয়।

তার কথা আফিয়ার ভালো লাগল। কিন্তু সে শুধু শুনলে, কিছু বলল না। তাছাড়া কথা শেষ করে মোনায়েম যেমন করে গেল তাতে কোনো উত্তর দেয়ার উপায়ও ছিল না।

সেদিন রাতেই সে অনেক কথা বললে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে মনে হয়তো মাত্রাতিরিক্ত চাঞ্চল্য এসেছে, তার কিছু মুক্তি না হলে তার অস্বস্তিকর লাগবে। হড়হড়িয়ে অনেক কথা বলে সে একবার থেমে হঠাৎ চোরাচোখে আফিয়ার পানে তাকাল, তারপর ইতস্তত করে বললে—বোন, কিছু মনে কোরো না তো?

আফিয়া মাথা নেড়ে জানালে, না।

কিন্তু তারপর মোনায়েম আর কিছু বললে না। তারপর দু-দিন কেটে গেল। আফিয়া লক্ষ্য করলে কি করলে না, কিন্তু এর মধ্যে মোনায়েম আর কিছুই বললে না। তৃতীয় দিন বাবুর্চি সকালে মুরগি-জবাই করবার জন্যে ছোঁড়াকে খুঁজছে এমন সময় বাইরের ঘর থেকে দ্রুতপায়ে মোনায়েম বেরিয়ে এসে বললে,—আমি ধরছি।

আম্মা আপত্তি করলেন। কিন্তু তাতেই তার উৎসাহ বেড়ে গেল। সে হাসল, তারপর হাসতে-হাসতে অনেক কথা শোনাল। রান্নাঘরের বারান্দায় বসে আফিয়া তরকারি কুটছিল, সে মাথা না-তুলে সব শুনল। কথা কিছু নয়; তার বাড়ির কথা। মফস্বলের ছেলে সে, গরুর ঠ্যাং পর্যন্ত ধরেছে, মুরগির ঠ্যাং-তো তুচ্ছ। তারপর মুরগি-জবাই করে সে যখন আবার বাইরের ঘরে ফিরে গেল তখন আফিয়ার হঠাৎ খেয়াল হল এ-পরিবারে কোথায় যেন মোনায়েম খাপ খাচ্ছে না। এ-কথাটা স্পষ্ট হল এই কারণে যে, সে এত হাসল এত কথা কইল শুনে আম্মা মাঝে-মাঝে মাথা নেড়ে মৃদু হাসলেন, কিন্তু কেউ কথা কইল না, কেবল বাবুর্চিটা ছাড়া। এ-পরিবারে অবশ্য বেশি কথা কওয়ার রেওয়াজ নেই, কিন্তু মোনায়েম কি মাত্রাতিরিক্ত কথা বলে না?

আব্বা কোত্থেকে একটা মোটা বই এনেছেন। দু-দিন রাত করে পড়লেন, তারপর তৃতীয় দিন রাতে আফিয়ার ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকে দেখলে মোড়া দখল করে বসে মোনায়েম। বসবার আর জায়গা নেই বলে সে আবার বেরিয়ে এসে আরেকটি মোড়া নিয়ে এল। আব্বা কিছু টের পেলেন না হয়তো, দেয়ালের দিকে চেয়ে যেমন হুঁকা টানছিলেন তেমনি ভঙ্গিতে নিশ্চল হয়ে রইলেন।

আফিয়া বসলে, বসে যথারীতি তাঁর শান্ত চোখের পানে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘরে এমন নীরবতা যে হুঁকার যে-সাদা ধোঁয়া উড়ছে মনে হচ্ছে তাও যেন শব্দ করে উড়ছে। ডান-ধারে জানলাটা খোলা; ওধারে মাঠের মতো বলে তাতে পর্দা নেই। কাজেই সরাসরি কটি উজ্জ্বল তারা দেখা যায় তার মধ্যে দিয়ে; কিন্তু আফিয়ার দৃষ্টি নেই সেদিকে।

মোনায়েমের অবশ্য এমনি অপেক্ষা করার অভ্যাস নেই। তাই কৌতূহল নিয়ে সে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল বটে তাঁর পানে, কিন্তু শীঘ্র তার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। সে বসবার ভঙ্গি বদলাতে শুরু করল, এধার-ওধার তাকাতে লাগল। ঘরের মধ্যে পাথরের মতো যে-নীরবতা তার মধ্যে আফিয়ার কাছে তার এই চঞ্চলতা কটু ঠেকল, কাজেই কিছু বিরক্তির চোখে তার পানে একবার চেয়ে দেখে যে, সে জানলা দিয়ে বাইরের পানে তাকিয়ে কেমন স্তব্ধ হয়ে আছে। তার অনুসরণ করে আফিয়াও তাকালে, কিন্তু দেখলে এক খণ্ড কালো আকাশ, যার বুকে ঝকঝক করছে কটি উজ্জ্বল তারা। মুহূর্তের জন্য আফিয়া বিস্মৃত হয়ে গেল; জগতে ভাষাতীত যে-সব উপলব্ধি রয়েছে তারই একটি তার অন্তরে ধরা দিল। তারপর আস্তে চোখ ফিরিয়ে সে আব্বার চোখের পানে তাকাল।

কিন্তু তিনি এবার কথা বললেন। দৃষ্টি না-সরিয়ে মুখ তেমনি নিশ্চল রেখে বললেন—তোমরা একদিক দিয়ে সৌভাগ্যবান। তোমরা আমাদের থেকে অনেক মুক্তি পেয়েছ। অনেক কুসংস্কার থেকে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছ। মুসলমানের রাজ্য-চ্যুতির পর যে-অধঃপতন এসেছিল সে-অধঃপতনের জের অনেক দিন চলেছে, এবং এখনো তার জের চলছে। অধঃপতনের মধ্যে মানুষ আপন সত্তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, কারণ সেটাই স্বভাব। কিন্তু সে-সময়ে মানুষ যত কুসংস্কার সব আঁকড়ে ধরে, নিজের সত্তা রক্ষা করবার নামে।

আমরা জেগে উঠছি। আমাদের আমলে যতটা না জেগেছি ততটা জেগেছি তোমাদের আমলে। আমাদের আমলের লোকদের দেখছ-তো। এঁরা তোমাদের চেয়েও খোদা-ভয় করেছেন বরাবর, কিন্তু তবু এঁরা অনেক দোষে দোষী। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা দুর্বলতা, যে-দুর্বলতা থেকে চরিত্রের অন্যান্য দোষের সৃষ্টি হয়। আমাদের আমলের হয়তো এইটুকু গর্ব থাকতে পারে যে তোমাদের জন্ম দিয়েছি।

তিনি থামলেন। মূর্তির মতো আফিয়া তাঁর চোখের পানে চেয়ে নীরব হয়ে রইল, আর ঘরের নীরবতা আবার জমে পাথর হয়ে গেল। কিন্তু কখন তার কপালে ক্ষীণ লালচে আভা জমে উঠল, উঠে আবার আস্তে মিলিয়ে গেল। সেকথা হয়তো সে জানল না, কিন্তু মনে ঈষৎ চাঞ্চল্য বোধ করল। শেষে সে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে মোনায়েমের পানে তাকালে, তাকিয়ে দেখলে আশ্চর্য রকমের স্থির হয়ে সে আব্বার পানে চেয়ে আছে, আর নির্বোধের মুখের মতো তার মুখটি নিস্পন্দভাবে ঝুলে রয়েছে। সে-মুখ হয়তো আফিয়াকে আহত করল তাই সে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের পানে তাকাল, চোখ ভরে দেখল ঝকঝকে উজ্জ্বল তারা কটা। সেখানে সে বিশালতা অনুভব করল, তারপর তার ঈষৎ চঞ্চল-হয়ে-ওঠা হৃদয় শান্ত হল। অবশেষে আব্বার মুখের পানে তাকিয়ে সে আবার স্থির হয়ে রইল। পাথরের মতো ভারি নীরবতায় কালের পিচ্ছিলতা নেই, অপেক্ষায় তারা নিশ্চল, যেন আব্বা যখন পর্যন্ত আবার কথা না কইবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার গতি রুদ্ধ হয়ে থাকবে!

তিনি আবার কথা শুরু করলেন : আমাদের এই সময়টি হল প্রভাতের সূচনা। এর আগে রাত কেটেছে; সে-অন্ধকারে কারা বেঁচেছে কারা মরেছে কেউ তার খোঁজ রাখে নি। এবার যে-ক্ষীণ আলো দেখা দিয়েছে এ-ক্ষীণ আলোয় তোমরা পরস্পরকে দেখবে, পরস্পরের দোষ-ভুল-ভ্রান্তি দেখে নিজেদের সম্বন্ধে সজ্ঞান হবে, এবং এখন আর রাত নয় বলে তোমাদের নগ্নতা ঢাকবার চেষ্টা করবে। এ-চেষ্টাতেই তোমাদের আমল হয়তো শেষ হবে।

তারপর তিনি আবার নীরব হয়ে গেলেন। আফিয়া তাঁর চোখের পানে চেয়ে মনের মধ্যে তলিয়ে গেল, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বারবার তার কানে আব্বার কথাগুলো আঘাত করতে লাগল। সে আর জানলার বাইরে তাকাল না; কারণ তারার আকর্ষণ তার কাছে মিছে বলে মনে হল। বিরাট একটা পঙ্গু জাতির ভার আব্বার শান্ত কয়েকটি কথার মধ্য দিয়ে তার অন্তরে ভারি হয়ে উঠল, যার ভারে সে স্তব্ধ হয়ে রইল। এর জন্য কোনো বেদনা অনুভব করল না, দুঃখ অনুভব করল না, এ-জাতির জন্য সমবেদনাও বোধ করল না।

তারপর এক সময়ে আস্তে হুঁকার নলটা নাবিয়ে রেখে আব্বা বললেন,—যাও।

মোনায়েম এরপর তীব্রভাবে আত্মচেতন হয়ে উঠল। জিল্লুমিঞা মতিমিঞার সঙ্গের প্রভাব তার এখনো কাটে নি; কাজেই এ-পরিবারের আলাদা একটা ধাঁচ তার চোখে যত স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল তত সে বিহ্বল হয়ে যেতে লাগল। এখানে দেখল মানুষের ব্যক্তিগত অস্তিত্বটা কেমন অস্পষ্ট, নিজেকে নিয়ে কেউ সজ্ঞান নয়। কিন্তু কোথায় যে এদের চেতনা নিমগ্ন হয়ে আছে একথা মোনায়েম-তো দূরের কথা, ও হয়তো জানে না। এবং এদের কারো ছায়া নেই বলে তার ছায়াই নিজের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, আর অহরহ তার চোখে ভেসে উঠে তাকে অস্থির করে তুলল। সদ্য নতুন বইগুলোতে সে মন ভোলাতে চাইল, কিন্তু ওতে মন বসল না। আফিয়াকে দেখে ছায়ার মতো। তার চোখে রহস্য নেই, কিন্তু সে-চোখ যেন কারো জন্য নয়। অবশেষে একদিন হাঁপিয়ে উঠে সে আফিয়ার আম্মাকে বোকার মতো একটি কথা বলে বসলে। বললে,—ফুফু, আপনাদের ঘাড়ে এসে চেপেছি বলে আপনারা কি আমার ওপর রাগ করেছেন? আফিয়ার আম্মা ঈষৎ চমকে উঠে যেন তাকালেন তার পানে। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, তোমার ফুফার দিল-তো অত ছোট নয়। তিনি নিজের কথাও বললেন না, মেয়ের কথাও বললেন না, যেন আফিয়ার আব্বা ব্যতীত অন্যের কথা এতে আসেই না।

বলবার সময়ই মোনায়েমের মনে হয়েছে এ কী কথা সে বলছে। কিন্তু কিছু একটা বলতে চেয়েছিল সে—এমন একটা কিছু যা এদেরকে আঘাত করবে, যে-আঘাতে তারা সচেতন হয়ে মোনায়েমের পানে ভালো করে তাকাবে, তার অন্তরের কথা বুঝবে। কিন্তু সেকথা বোঝানো গেল না, কেবল ফুফুর উত্তর শুনে তার মুখের ভাবটা নানা বিরুদ্ধভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে গেল।

সে আপত্তি জানাল। বললে,—না না, সে কী কথা। আমি কি সেকথা বলেছি!

কিন্তু আফিয়ার আম্মা আর কোনো কথা কইলেন না, মোনায়েমের মুখের শৃঙ্খলতাও ফিরে

এল না।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় মোনায়েম বাড়ি ফিরছে। ফিরতে-ফিরতে রাস্তাগুলো দীর্ঘ মনে হল, আর মানুষগুলো অস্পষ্ট। কদর্য বীভৎস একটি মুসলমান ফকির রাস্তার কোণে বসে অমানুষিক মুখভঙ্গি করে আর্তনাদ করছিল, তাকে দেখেও দেখল না। শেষে দীর্ঘরাস্তার এক প্রান্তে দেখল একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বয়স বেশি নয়, কিন্তু ঘাড় কাত করে সে তাকিয়ে আছে, দূরে কোথাও তার চাহনি যেন থমকে আছে।

বাড়ি ফিরে সে দেখলে আফিয়া হাসছে। খুব জোরে নয়, আস্তে। কিন্তু তবু হাসছে। রাস্তার দেখা মেয়েটির থমকে-থাকা দৃষ্টির জন্য সে কৌতূহলবোধ করে নি, কিন্তু এর হাসির জন্য সে কৌতূহলী হল, হল কেবল এই সুযোগে নিজেকে তার মধ্যে মিশিয়ে দেবার জন্য। কাছে গিয়ে বলল,—হাস কেন বোন?

আফিয়া ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে তার পানে তাকাল, তাকিয়ে একবার সিঁড়ির ধাপে বসে-থাকা পাড়ার মনার-মা বুড়ির চোখের দিকে এক পলকের জন্য চেয়ে থেমে গেল। অবশেষে আস্তে বললে,—না, কিছু না।

মোনায়েম স্তব্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ মুহূর্তগুলো গর্জন করে উঠল, আর তাতে আগুন ধরে গেল। তবু সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দেহ নিশ্চল। অকারণে পাশে অমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সপ্রশ্নে আফিয়া তাকাল মোনায়েমের পানে, তাকিয়ে দেখল স্থিরদৃষ্টিতে সে তারই পানে তাকিয়ে আছে। এবং সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার আগেই মোনায়েম হঠাৎ মোটা কর্কশ গলায় জড়িয়ে-জড়িয়ে বললে,—আমি গরিব। সেজন্য তোমরা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে?

আফিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত বিস্মিত চোখে তার পানে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করল,—এটা কী কথা ? কেন, আমি কি কখনো আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি?

—তাকে খারাপ নয়, জঘন্য ব্যবহার বলে। তোমরা ভুল করেছ, আমাকে যা-ভেবেছ আমি তা নই।

—আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

—বোঝার দরকার নেই। কিন্তু তোমরা অত নকল বলে বোধহয় তোমাদের এই ব্যবহার আরো বেশি জঘন্য লাগে।

—নকল! আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

আবার একটা কথা বলতে গিয়ে মোনায়েম হঠাৎ থেমে গেল, তারপর আফিয়ার সামনে থেকে সরে এল।

সে-রাতে আফিয়ার আব্বা তাদের ডাকলেন। আফিয়ার মন প্রশ্নে জর্জরিত হয়েছিল, তাছাড়া মোনায়েমের পানে একবার ভালো করে তাকাবার ইচ্ছে হচ্ছিল বলে সে ঈষৎ ব্যগ্র হয়ে আব্বার ঘরে গেল, কিন্তু দেখল মোড়া দুটোই খালি, মোনায়েম আসে নি। সে এলও না; চাকর এসে বলে গেল তার শরীর ভালো নেই।

মনটা তার প্রশ্নে জর্জরিত তবু সে আব্বার মুখের পানে শান্তভাবে চেয়ে রইল, প্রত্যেকটি শব্দ শুনল একাগ্রভাবে, মধ্যে-মধ্যে অপেক্ষা করল নিশ্চলভাবে। আব্বা বললেন যে, একটা জাতি সত্যিকার বড় হয় তখন যখন তার অধিকাংশ লোকের চরিত্রের মেরুদণ্ড সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। এবং এটা রাতারাতি হয় না, এর জন্য হয়তো বংশের পর বংশ কেটে যায়। মুসলমানদের আজ চরিত্র নেই, মেরুদণ্ড নেই : আলজিয়ার্স থেকে জাভা-সুমাত্রা-চীন পর্যন্ত কোথাও নেই। হয়তো এখানে-সেখানে ব্যতিক্রম-হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে আছে, কিন্তু জাতি হিসাবে নেই। তবে আবার হবে, হবে ধীরে-ধীরে। কিন্তু এই যে শুরু হয়েছে, এই শুরুতে একটি প্রশ্ন জাগে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মেরুদণ্ড কি সঙ্গে-সঙ্গে তিলে-তিলে ভাঙতে শুরু করবে? যদি তাই হয় তাহলে মানুষের সর্বজনীন মঙ্গল হল কোথায়? ধর্ম কি সর্বজনীন নয়?

অথবা সব ধর্মই সর্বজনীন বলেই পারস্পরিক সংঘর্ষে ব্যাপ্ত হতে পারে না, ক্ষেত্রে-ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে? এবং একটায় যখন ভাঙন ধরে আরেকটায় চর গজায়?

তারপর আব্বা থামলেন। আর আফিয়া চেয়েই রইল তাঁর চোখের পানে।

তিনি অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন, হয়তো উত্তর তিনি দেবেন, আবার হয়তো দেবেনও না। কিন্তু অপেক্ষা করা কর্তব্য, নিশ্চলভাবে বসে থেকে। অপেক্ষা করতে-করতে একবার আব্বার আধ-পাকা মাথার পানে তাকাল আফিয়া, তলোয়ারের মতো বাঁকা মস্ত নাকের পানে, কিন্তু কোনো গোপন উদ্বেলতা আজ অন্তরে বোধ করল না।

মুহূর্তগুলো অত্যন্ত স্তব্ধ। এবং এই স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ আজ আব্বা মেয়ের পানে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। আফিয়ার চোখের পানে কয়েক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন,—এসব কথা তুমি চিন্তা করবে। তোমাদের মন স্বচ্ছ, অনভিজ্ঞ। আমাদের মনে অভিজ্ঞতার জঞ্জাল বলে ওতে সত্যের আলো বাধা পায়। কিন্তু এ-জঞ্জাল ভেদ করে যে-সত্যটুকু লাভ করেছি সেটা মনকে আশান্বিত করে না, বরঞ্চ দমিয়ে দেয়। আমাদের এই যে জীবন এ-জীবনের সত্যিকার কোনো অর্থ হয় না। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আমরা নকল। ভাগ্য ভালো আমরা যে নকল একথা বুঝতে পেরেছি।

হঠাৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আফিয়া বাপের পানে তাকাল; কোথায় যেন আঘাত পেল সে, ক্ষণকাল পরে সে অদ্ভুত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,—কিন্তু সেদিন আপনি বললেন আমরা জাগছি, আমাদের মধ্যে প্রভাতের সূচনা দেখা দিয়েছে!

আবার কয়েক মুহূর্ত নীরব হয়ে রইলেন। তারপর আস্তে বললেন,—সেদিন আমাদের সবার কথা বলেছিলাম। আজ আমার-তোমার কথা বলছি। হয়তো কোনোদিন কালের দাবিতে ও জাগরণের স্রোতের ধাক্কায় তোমার আসল স্বরূপ বেরিয়ে পড়বে, কিন্তু আমি যে-শিক্ষা পেয়েছি, তোমাকে আমি যে-পরিবেশ দিয়েছি, তা নকল।

আফিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। দেহে সে অবশ্য নিশ্চল রইল, কিন্তু তার চোখ নড়তে লাগল, বিভ্রান্ত হয়ে। অবশেষে সে আবার বললে,—আজকে ও কিন্তু আমাকে নকল বলেছে। আমি ওর কথা বুঝি নি।

—ও কে?

—মোনায়েম ভাই।

—ছেলেটি কতখানি বুদ্ধিমান জানি না, কিন্তু ও ঠিক ধরেছে। আমাদের কিছু নেই, যাও-বা আছে তা নকল। যা আছে তা-নিয়ে পুতুলখেলা চলে, কিন্তু জীবন্ত কিছু চলে না।

তারপর আব্বা আর কিছু বললেন না। নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আফিয়া কালো আকাশের পানে তাকাল। ওতে তারা আছে, ঝকঝকে তারা, কিন্তু কিছু সে দেখলে না। মনে ঝড় উঠেছে, কিন্তু কেবল শূন্যতার ঝড়। তাদের ঘর ভেঙে গেছে। তারপর ধীরে-ধীরে যন্ত্রচালিতের মতো সে মোনায়েমের ঘরে গেল। দরজা ভেড়ানো, নিঃশব্দে ঠেলে ঢুকে দেখল ছোট চৌকিতে সে ঘুমিয়ে আছে। ঘরে আলো, পাশে খোলা বই। পড়তে-পড়তে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওই না প্রথম বলেছে তারা নকল?

ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আফিয়া তার পানে চেয়ে রইল, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। তার উস্কখুস্ক চুল দেখল, ঘুমের প্রলেপে নির্বোধ-হয়ে-ওঠা মুখটি দেখল, কিন্তু সে যা খুঁজল তা পেল না। অবশেষে দেখলে গলার কাছে ঝুলে আছে এক থোকা তাবিজ, কালো সুতোয় বাঁধা। তাবিজের পানে চেয়ে সে বিস্মিত হল, আশান্বিত হল, কিন্তু অবশেষে ভুল বুঝে দ্বিগুণ হতাশ হল।

যন্ত্রচালিতের মতো আবার কখন বেরিয়ে এল সে জানে না।

ফাল্গুন ১৩৫৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭

রক্ত ও আকাশ

বৃদ্ধ লোকটি যখন তার কথার মাঝামাঝি এসে পৌঁছেছে তখন যুবকটি মুখ তুলে তার পানে কয়েকবার তীক্ষ্ণভাবে তাকাল। ধারালো খাড়া নাক, মাথায় লাল ফেজ ; আর তার মোটা, রুক্ষ ঠোঁটটা কেমন আলগোছে ঝুলছে। তারপর সে বৃদ্ধের চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল, কতক্ষণ শুনল। কিন্তু আশ্চর্য, বৃদ্ধের কথা কখন শেষ হল সে টেরই পেল না, কারণ তার আগেই এক সময়ে হঠাৎ কী হল, সে যেন গড়িয়ে গেল, ধসে গেল, তারপর জানল যে সে রক্ত দেখেছে। অন্তত তেমনি তার মনে হল। সে রক্ত দেখল, যে-রক্ত কেমন একটু বিচিত্র ধরনের আর যা কেমন নিঃশব্দে গড়িয়ে-গড়িয়ে এসে রক্তের সাগর তৈরি করছে।

সে অনেকক্ষণ এসব দেখল। কিন্তু শীঘ্র তার বিরক্তি ধরে গেল। শুধু বিরক্তি নয়, সে যেন প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ল। লাল রক্তের একঘেয়েমি তাকে একেবারে কাহিল করে ফেলল। যে-রক্ত নদীর মতো নেবে আসছিল তা-জীবন্ত, আর তার শেষ নাই বলে মৃত্যুহীন। সুতরাং সে ভীত হয়ে উঠল : এ-সংকীর্ণ জীবন তাকে ভীত করল, এবং ক্ষিপ্তের মতো সে বৃহত্তর ও শক্তিশালী জীবনের জন্য এধার-ওধার খুঁজতে লাগল। তেমন জীবনের তার প্রয়োজন, যা-বয়-না কিন্তু ঠিক জীবন বটে।

শীঘ্র সে হাঁপাতে লাগল এবং ভাবলে তার মৃত্যু ঘনিয়েছে এমনি সময়ে সে ওপরের পানে তাকাল, তাকিয়ে দেখলে ওপরে নীলিমা : আকাশ। অবশ্য এখানে-সেখানে শুভ্র সাদা উড়ন্ত মেঘ ছিল বটে। কিন্তু সে-গুলো মৃত বলে কিছু এসে-গেল না। এবং এইভাবে সে বেঁচে গেল; পুনর্জন্ম লাভ হল তার।

বৃদ্ধ লোকটি ততক্ষণে থেমেছে। ঘরের নীরবতায় এবার যুবকটি সেকথা জানতে পেলে, পেয়ে তার পানে তাকিয়ে দেখলে উচ্চশিখরে লাল ফেজ। কিন্তু অত ওপরে তাকাতে তার যেন কষ্ট হল বলে সে-দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বাইরে নিক্ষিপ্ত করলে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার সে-দৃষ্টি বাইরের বিশালতায় ছড়িয়ে গেল, হয়তো হারিয়েও গেল। সেখানে আলো, রহস্যময় বিচিত্র আকাশ। এবং সেখানে বর্তমানেরও ছায়া; যে-ছায়া হিংস্র অপরাজেয় জন্তুর মতো কয়েক মুহূর্ত ঘোরাঘুরি করে মিলিয়ে গিয়ে অতীত হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু শীঘ্র বৃদ্ধ লোকটি আবার কথা কইতে শুরু করল। তার কণ্ঠ কিন্তু যুবকের কানে এমন শোনাল যে, তা-যেন কাঠের মেঝেতে ঘষে-ঘষে যাচ্ছে। কারণ সে যা-বলছিল তা নিতান্ত অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়। হয়তো সে খোদা ও শয়তান নিয়ে কিছু বললে। কিন্তু শীঘ্র যুবকের খেয়াল হল যে এ-অবান্তর কথার আবরণের অন্তরালে কিছু একটা আছে যা ধীরে-ধীরে, থেমে-থেমে, অতি সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে। সে ভাবল, তা হোক গে; আসুক আগে, তারপর দেখা যাবে। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি বলতে লাগল যে, ইদানীং খোদার দুনিয়া কেমন শুকিয়ে শুষ্ক হয়ে উঠেছে; কারণ তার লোকরা আর আজকাল কাঁদে না, অনুতাপ করে না, এবং এ-সমস্ত খোদা দেখছেন নিঃশব্দে, অগোচরে থেকে। তবে যুবকটি এ-ধরণীর তৃষ্ণাও বোধ করলে না, তার নীরব আর্তনাদও শুনল না।

বৃদ্ধের পাশে যে-ছোট মেয়েটি বসে ছিল আর থেকে-থেকে তার আধময়লা লম্বা কোর্তার প্রান্ত ধরে টানছিল সে এবার হঠাৎ ভীত হয়ে গেল। এক সময়ে সে তীক্ষ্ণ গলায় আর্তনাদ করে উঠল। দিশেহারার মতো বৃদ্ধের কোর্তার প্রান্ত টানতে-টানতে সে বললে,

—দেখ, দেখ, লোকটা পাগল।

বৃদ্ধ চমকে উঠল। মেয়েটির সুচের মতো তীক্ষ্ণ ধারালো গলা যুবকের কানেও প্রবেশ

করল। কিন্তু এই মুহূর্তে সে অতল সাগরে ডুবে ছিল বলে উঠে আসতে তার সময় নিল। কিন্তু সে উঠে এল ঠিক, এসে এধার-ওধারে খুঁজতে লাগল যেন একটা সম্বলের জন্য—যার ওপর সে ভর দিতে পারে। অনুসন্ধানের ফলে যা-পেল তা কিন্তু অতি মিষ্টি, শীতল-করা, এবং তাকে তার খুব ভালো লাগল।

তোমার নাম কী? আর তুমি কে?

তার মধ্যে এখন পাগলামির কিছু নেই বলে মেয়েটি মিষ্টিভাবে জবাব দিলে। বললে,

—জরিনা।

—ভারি মিষ্টি নাম।

মেয়েটি ছোট্ট বস্তু; বয়স নিশ্চয় দশের নিচে। এবং যেহেতু সে পূর্ণবয়স্কা যৌবনবতী নারী হয়ে ওঠে নি সেহেতু তার মধ্যে স্বভাবগত চেতনার প্রাচুর্য, যার সাহায্যে সে বোঝে, নড়ে-চড়ে। ঠিক জন্তুর মতো।

—জরিনা। সে আবার বললে, ভারি মিষ্টি নাম। কিন্তু শোন। তোমাকে কি আমি রক্ত ও আকাশের গল্পটা বলেছি?

বৃদ্ধ লোকটি রহস্যময়ভাবে নিশ্চুপ। সে বুঝলে অতি দ্রুত সে তার স্থান হারাচ্ছে এবং খোদার কোনো অর্থ নেই এখানে।

কিন্তু বৃদ্ধের পানে তাকিয়ে যুবকটি বললে,

—হ্যাঁ, আপনার গল্পটা অদ্ভুত। তাতে দুঃখের ভাবও আছে। বহুদিন আগে—যখন আপনি মাত্র দু-মাসের শিশু—তখন কে আপনার আব্বাকে হত্যা করল। পরে আপনি শুনলেন যে রক্তের মতো পড়ে-থাকা আপনার আব্বার মৃতদেহটি খুঁজে পাবার আগেই সে-খুনী পালিয়ে গিয়েছিল এবং সে-খুনীকে আর কখনো কেউ ধরতে পারল না। এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে এই—অন্তত তাই আমার মনে হচ্ছে—আপনার এখনো মনে হয় সে-খুনী আশেপাশে কোথাও আছে এবং এখনো তার শাস্তি হয় নি। অথচ আপনি বলছেন যে এখন আপনার বয়স একানব্বই। যাক, তবে এ-মজার দিকটাই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বেশি, কারণ এর কোনো অর্থ নেই।

যুবকটি যখন থামল তখন বৃদ্ধকে হঠাৎ অত্যন্ত নিরীহ মনে হল, যেন সে এখানে আছে তবে একেবারে মিইয়ে আছে। তার নাকটি রেখার মতো দেখাচ্ছে; নিচের মোটা কর্কশ ঠোঁটটা আর ঝুলছে না। সে বোধ করলে যে বলবার তার আর কিছু নেই।

যুবক তারপর বাইরে তাকালে, গতিশীল ছড়ানো মাঠ-ক্ষেতের পানে, দূর-দিগন্তের পানে। এ-বিস্তৃতি তাকে শক্তি দিল, এবং সে বুঝতে পারল, এই হচ্ছে যথোপযুক্ত সময়। মেয়েটির অবস্থান সম্বন্ধে সে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন হয়ে উঠল। মেয়েটিও পশুসুলভ সচেতনতা নিয়ে গভীর স্থৈর্যে তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল; বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই তার মধ্যে, যেন শিকার তার থাবার মধ্যে।

যুবক বৃদ্ধের পানে তাকাল।

—কে এ-মেয়েটি? আপনার নাতনি?

—না; আমার পুতনি।

—কিন্তু ভারি মিষ্টি মেয়েটি। কী নাম তার?

মেয়েটিই উত্তর দিলে, শান্তভাবে,

—জরিনা।

—জরিনা। ভারি মিষ্টি নাম-তো। আচ্ছা, ভালো কথা, আমি কি তোমাকে সেই রক্ত ও আকাশের কিচ্ছা বলেছি?

—না। মেয়েটি বললে। তারপর হঠাৎ কী একটা মনে করে বললে, এটা কি সেই বাঘের গল্প যে-বাঘকে নিজের রক্ত চাটতে হয়েছিল?

—না। তবে—বলে হঠাৎ যুবকটি থেমে গেল, থেমে মুহূর্তে কেমন কৌতূহলী হয়ে উঠল। বললে, আচ্ছা আমাকে বল তো খুকি, কেন সে-বাঘকে তার নিজের রক্ত চুষতে হয়েছিল?

—কারণ তাই তাকে করতে হয়েছিল।

—এ তো ভারি অদ্ভুত উত্তর হল। কিন্তু কেন?

মেয়েটি তার ঠোঁট চাটলে এবং এধারে-ওধারে যেন উত্তরের সন্ধানে তাকাল, একবার দিগন্তের পানেও, কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। সে যখন আবার যুবকটির পানে তাকাল তখন মনে হল সে যেন অতি দ্রুত তার পশুসুলভ বৃত্তিগুলো হারিয়ে ফেলছে, যার ফলে কেমন আত্মসচেতন হয়ে উঠছে, সঙ্গে-সঙ্গে ভীতও।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে বললে,

—আমি গল্পটা ভুলে গেছি।

—হ্যাঁ। সে সব ভুলে যায়, সব। বৃদ্ধটি দুঃখ করে মাথা নেড়ে বললে। কিন্তু তার কণ্ঠ কাঠের মেঝেয় ঘষে-ঘষে গেল।

মেয়েটি তারপর লাল হয়ে উঠল। যুবকটি তা দেখলে : তার শুভ্র মুখে লাল আভা, তার আত্মসচেতনতা—যা একদিন সে ফুটন্ত ফুলের মতো তার প্রেমিককে তুলে দেবে।

কিন্তু তারপর ওদের মধ্যে অর্থহীনভাবে নীরবতা নাবল, যে-নীরবতার মধ্যে যুবকটির চোখ ক্রমে-ক্রমে আবছা, ধোঁয়াটে হয়ে উঠল। এবং এর মধ্যে বৃদ্ধটি কেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটি তীক্ষ্ণকণ্ঠে আবার আর্তনাদ করে উঠল, আবার ক্ষিপ্তের মতো বৃদ্ধের আস্তিন ধরে টানাটানি করে বললে,

—লোকটা পাগল—দেখ দেখ।

সে অবশ্য নিকটেই ছিল, তাই প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে শুনতে পেলে। তারপর এর-ওর মুখের পানে তাকালে—যারা ঘুমোচ্ছে তাদের পানেও, কিন্তু কোথাও কোনো পাগল দেখলে না। ব্যর্থ হয়ে সে অবশেষে মেয়েটির কঠিন দৃষ্টির পানে তাকালে, তাকিয়ে বললে,

—তুমি কি কিছু বললে?

কিন্তু এখন তার মধ্যে কিছু পাগলামি নেই। অতএব মিষ্টি গলায় মেয়েটি বললে,

—আপনি-তো আমাকে গল্পটা বললেন না।

—গল্প, কোন্ গল্প?

—সেই বাঘের গল্প—যে-বাঘকে নিজের রক্ত চুষতে হয়েছিল।

যুবকটি বার কয়েক মাথা চুলকে ভাবিত হল। তারপর সে ভাবতেই লাগল, একঘেয়েভাবে; সে যেন সুতো তুলছে। এর ফলে তার মুখ শ্রান্তিতে রেখায়িত হয়ে উঠল।

—বাঘ, বাঘ? সে বললে, তারপর থামল। আবার বললে, তাই, বাঘ। কিন্তু, ভালো কথা, তোমাকে আমি সেই রক্ত ও আকাশের গল্প কখনো বলেছি কি?

সবকিছু বেশ ঠাণ্ডা, খোশমেজাজিই ছিল, তাই মেয়েটি যখন হঠাৎ ক্রোধে ফেটে পড়ল তখন যুবকটি সত্যিই প্রথমে কিছু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। সে চিৎকার করে বললে,

—না, বলেন নি, বলেন নি, বলেন নি!

—হয়তো বলি নি। যুবকটি কিন্তু মুখে হাসি বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করল।

—না, বলেন নি! আবার জরিনা চিৎকার করে বললে।

আরে, কী ব্যাপার, অবাক হয়ে যুবকটি ভাবলে, মেয়েটি এমনভাবে ব্যবহার করছে যেন বছরের পর বছর নির্যাতন সয়ে এখন ক্ষিপ্ত-হয়ে-ওঠা ধৈর্যহারা, এক অবুঝ স্ত্রী সে। মেয়েটি চিৎকার করল, হাত-পা ছুড়ল, তারপর কাঁদতে বসল। শুনে এমন কি বৃদ্ধও জীবন্ত হয়ে উঠল, সঙ্গে-সঙ্গে ভীতও। কিন্তু সে কেবল তার বসার ভঙ্গিটা একবার বদলাল এবং লাল ফেজটা

খুলে আবার ঠিক করে পরল, কিন্তু কিছু বললে না।

মেয়েটি আবার শান্ত হয়ে উঠলে এবার আবার নীরবতা নাবল। কামরার যাত্রীগুলো ছাড়া—যারা অন্য জগতে কথা কইতে থাকল, এরা কেউ আর কথা বললে না। যুবকটি কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল ভেসে-থাকবার জন্য, কারণ, সে যেন মেয়েটিকে কেমন ভয় করতে শুরু করেছে। সে আর ডুবতে পারে না। তাকে কথা বলতেই হবে, নইলে নির্বোধ মেয়েটি হয়তো আবার আর্তনাদ করে উঠবে। কাজেই সে বৃদ্ধের পানে তাকিয়ে বললে,

—হ্যাঁ, সত্যি, আপনার গল্পটা এমন মর্মস্পর্শী। আমার কিন্তু ভারি ভালো লেগেছে। তাছাড়া এ-গল্পটি আমাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে-কথা বহুদিন হল ভুলে গিয়েছিলাম।

বৃদ্ধ শুনল, তবে কিছু বলল না। মেয়েটি কিন্তু একটু নড়ে-চড়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল।

—সে কি সেই বাঘের গল্প?

—বাঘ? দেখ মেয়ে, তোমাকে একবার বলেছি যে জীবনে কখনো আমি বাঘ দেখি নি।

—কিন্তু আপনি ওয়াদা করেছেন যে আমাকে গল্প শোনাবেন।

—হয়তো আমি ওয়াদা করেছিলাম, কিন্তু তাতে কী আসে-যায়। তাছাড়া হয়তো আমি বলিই নি। এ-কথার উত্তরে তোমার কী বলবার আছে?

—কিন্তু আমার গল্প চাইই!

হঠাৎ যুবকটির অন্তর কালো হয়ে উঠল—যে-কালো অন্তরে শীঘ্র বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। কিন্তু কোনোমতে নিজেকে দমন করে সে শান্ত অথচ কঠিনভাবে বললে,

—দেখ, তোমার মতো ছোট মেয়ের বেয়াদবি করা একবারে অনুচিত। তাছাড়া তোমাদের মতো ছোট মেয়েদের মিছে-কথা-বলা আমি পছন্দ করি না, বলে দিলাম।

কিন্তু পর মুহূর্তেই সে হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠল। বৃদ্ধটি এদিকে কেমন ভয় যেন পেল; তার মুখের ওপর দিয়ে ছায়া আনাগোনা করতে লাগল, চোখের ওপর দিয়েও।

—হ্যাঁ, আপনাকে যা বলছিলাম। যুবকটি আবার জমিয়ে শুরু করলে। প্রত্যেক রঙেরই একটা Complementary রং থাকে। বহুদিন আগে এক প্রসিদ্ধ শিল্পী এ-কথাটা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু আমি যা-আবিষ্কার করেছি তা-হল এই যে নীল রং হল লাল রঙের প্রতিষেধক। আমি বিশ্বাস করি যে আমার এ-আবিষ্কার যদি প্রচারিত হয় তবে আমি নিঃসন্দেহে ইতিহাসের এক নায়ক হব। কিন্তু আপনার জানা দরকার কী পরিস্থিতিতে এ-কথাটা আমার খেয়াল হল। ব্যাপারটা ভারি মজার, শুনুন। আমাকে এত লাল রং দেখতে হয়েছিল যে সে-রঙে আমার চরম বিরক্তি ধরে গেল। এই সময়ে একদিন প্রায় অকারণে আমি নীল-আকাশের পানে তাকালাম বলে আশ্চর্য রকমে বেঁচে গেলাম। তা না-হলে, আপনি বুঝতে পারছেন, এখন যেমন সুস্থ মস্তিষ্কে আছি তেমনটি থাকা চলত না।

—কিন্তু এটা কোনো গল্প হল না। মেয়েটি মুখ ঝামটা দিয়ে বললে। শুনে যুবক তার পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল, তাকিয়ে ধীরে-ধীরে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললে,

—আমি কোনো গল্প বলছি না—একথা তোমার জানা দরকার। আমি বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছি, সেকথাও তোমার জানা দরকার। এখন আবার একটি আওয়াজ করবে তো মুশকিল হবে, বাঁদর মেয়ে!

—কিন্তু তুমি কি কাউকে খুন করেছ?

অজ্ঞাত কোণ থেকে তীরের মতো কথাটা এল। গলাটা কেমন পাতলা, আর এত নিচু যে প্রায় শব্দহীন। কিন্তু তাতেই যুবকটি হঠাৎ কেমন অস্থির হয়ে উঠে, কে কথাটা বলল তা খুঁজছে এমন সময় বৃদ্ধের শান্ত সাবধানী চোখের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল।

—কে বললে কথাটা? বজ্রকঠিন গলায় যুবক প্রশ্ন করল।

—আমি।

যুবক মেনে নিল প্রশ্নটা। কিন্তু উত্তর দিতে সময় নিল। বহুক্ষণ পর ধীরে-ধীরে নির্জীব কণ্ঠে সে বললে,

—না। আমি অস্বীকার করছি, কারণ আমি লোক খুন করি নি। আপনার বাবা যখন খুন হন তখন আমার বাবারও জন্ম হয় নি। তবে, স্বীকার করতে কী, আমি একটা, দুটো, হয়তো একশো-দুশো মানুষের মৃতদেহ রক্তের মধ্যে ভাসতে দেখেছি। কিন্তু সেগুলোকে আমি আমলই দেই নি তার কারণ আমার কর্তৃপক্ষ একথা কখনো বলে নি যে ওসব সত্যিকার খুনোখুনি। কাজেই আমি লাল রঙে-রঙে হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম, বিরক্তিতে প্রায় ভেঙে পড়েছিলাম আর কী। ঐ আবিষ্কারটি ঠিক সে-সময়ে না করতে পারলে দস্তুরমতো অসুবিধায় পড়তে হত। হয়তো প্রাণই হারাতাম।

একথা শুনে বৃদ্ধটি কিন্তু তৃপ্ত হল। আরেকবার সে লাল ফেজটা ঠিক করে পরলে, পরে হঠাৎ মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে গেল, কেবল ধারালো তলোয়ারের প্রান্তের মতো নাকটি তার থেকে-থেকে ঝলসাতে লাগল। কিন্তু তাতে যুবকটির কোনো তৃপ্তি হল না, কারণ তার মধ্যে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে, অন্তরে তার ঝড়। আশায়-আশায় সে বৃদ্ধের পানে চেয়ে রইল, কিন্তু প্রস্তরমূর্তি নিস্তব্ধ। তাকাতে-তাকাতে তার এমনও অবশেষে মনে হল যে শীঘ্র পাখিরা আসবে, এসে ঐ প্রস্তুরমূর্তির কাঁধে বসে ময়লা ফেলবে, যে-ময়লা দীর্ঘ জামাটি বেয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে নাববে। কিন্তু ওসব কিছু ঘটল না। কাজেই যুবকটি এবার ব্যর্থ হয়ে বাইরের পানে তাকাল। বাইরে তখন অতি দ্রুত সন্ধ্যা নাবছে, দিগন্ত ঘিরে কালো ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে। কিন্তু তাতেও সে তৃপ্ত হল না। কারণ যার অন্তরে একবার ঝড় জেগেছে, আর ভেতরে আগুন ধরেছে, তার কী করে তৃপ্তি হয়।

যে-মেয়েটি এতক্ষণ কোথায় হারিয়ে ছিল এবার সে আবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠে বললে,

—দেখ দেখ—লোকটা পাগল।

যুবক একথা শুনলে, শুনে ক্ষিপ্রভঙ্গিতে মেয়েটির পানে ফিরে তাকাল। তারপর এধার-ওধার, ঘরের আনাচে-কানাচে, সর্বস্থানে খুঁজল, কিন্তু কোথাও পাগলটিকে দেখতে পেল না। তবু যতক্ষণ পর্যন্ত সে হয়রান না হল ততক্ষণ পর্যন্ত সে পাগলটির সন্ধানে এধার-ওধার দেখে শেষে মেয়েটির পানে চেয়ে আরেকটি মিথ্যে প্রতিজ্ঞা করে বললে,

—দেখ মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে, তোমাকে আমি নিশ্চয়ই সেই রক্ত ও আকাশের গল্প শোনাব। তারপর যে-পাগলটি থেকে-থেকে তোমাকে বিরক্ত করছে তাকেও খুঁজে বের করব যদি তুমি আমাকে তোমার চোখের পানে তাকাতে দাও, তোমার দেহ ছুঁতে দাও। আমার আর কোনো আবিষ্কার করার বাসনা নেই, আমি কেবল বাঁচতে চাই।

—কিন্তু আপনি আমাকে মেরে ফেলবেন।

—না, আমি মারব না। কারণ আমি জানতে পেরেছি যে তোমার ও আমার রক্ত এক।

তারপর দূর-দিগন্তে কে যেন মর্মান্তিকভাবে আর্তনাদ করে উঠল। দ্রুতভঙ্গিতে যুবকটি বাইরের পানে তাকাল, তাকিয়ে দেখলে বিশাল ধরণী নিশ্চুপ, স্তব্ধ, চলমান অতি বৃহৎ মাছের মতো নীরব।

তারপর সময় আর অন্ধকার এখানে ধূলিকণায় ও ওপরে আকাশের শূন্যতায় একাকার হয়ে গেল, আর মৃত্যুর প্রশান্তি অনন্ত হয়ে উঠল। যদিও মেয়েটি এবার যৌবনসচেতন নারীর মতো থেকে-থেকে আড়চোখে যুবকটির চোখের পানে তাকাতে লাগল, কিন্তু যুবকের চোখ তখন জমে গেছে। নকল সত্যের সন্ধানে যে-চোখ এতক্ষণ চঞ্চল ছিল, খাঁটি সত্যলাভে এই মুহূর্তে সে-চোখে মৃত্যু।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ মে ১৯৪৭

মৃত্যু

খান সাহেব বদরুদ্দিন সেকেলে মানুষ। যে-যুগে তিনি অধ্যয়ন শেষ করেছেন তখন ডিপুটি মুনসেফ হওয়াটা প্রায় রাজা-বাদশা হওয়ার মতো ছিল মুসলমান সমাজে, এবং কর্তৃপক্ষরা কোনো প্রকারে চলনসই লোক পেলে এসব সরকারি চাকরিতে নিয়ে নিতেন; কাজেই তিনি যে মফস্বল শহরের একপ্রান্তে টিন-তর্জার ঘরে মক্কেলদের আশায় ওকালতি-ব্যবসা ফাঁদলেন তা সে-পথের মোহেও নয়, সরকারি গোলামি না করে স্বাধীন থাকবার প্রেরণায়ও নয়। বস্তুত কোনো পথ ছিল [না] বলেই এবং মেসের বাড়িতে থেকে চৌকিতে মোটা বালিশে তেল চকচকে আশৈশব থলথলে শরীরটা এলিয়ে বার-কয়েক চেষ্টার পর আইন পরীক্ষার শেষ-তোরণ অতিক্রম করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ওকালতির পথ ধরেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ব্যবসা মন্দ ফাঁদেন নি। মক্কেলরা ক্রমশ ভিড় করতে লাগল। তবে যে-মক্কেল হারজিতের দিকে লক্ষ্য না-রেখে অর্থ ব্যয় করবে বলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ তারা তাঁর ক্যানেস্তারায় লেখা মুছে-যাওয়া-প্রায় নামের সাইনবোর্ডে বেশি আকৃষ্ট হত না। যারা ঠেকায় ঠেকেছে, অথচ সংগতি নেই যে আইন-আদালতের ছায়া মাড়াবে স্ব-ইচ্ছায়, তারাই তাঁর বৈঠকঘরে কাঁঠালকাঠের বেঞ্চিতে এসে ঝুঁকে বসত দাতব্য চিকিৎসালয়ে হতাশ-রোগীর ভঙ্গিতে। কাচ-ভাঙা আলমিরায় তাঁর মোটামোটা সময়ে অনুকার হয়ে ওঠা আইনি-কেতাবগুলো দেখত, দেখত ওষুধের মতো এরা, হয়তো-বা আশা-মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগত খান সাহেবের প্রতি।

পসার জমাবার আগেই অবশ্য বদরুদ্দিন সাহেব ঝুনো উকিলের কায়দা-কানুন শিখে ফেলেছিলেন। সেটি সম্ভব হয়েছিল নিজের কাজের অভাবের জন্য। সহকর্মীরা যখন আপন কাজে ব্যস্ত তখন তিনি পরকে দেখেই সময় কাটান আর আকাশকুসুম রচনা করেন। আকাশকুসুম আকাশে না হয়ে অযাচিতভাবে অন্যখানে অন্যরূপে প্রতি বৎসর ফুটতে লাগল : প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে, ব্যতিক্রমশূন্যভাবে তাঁর স্ত্রী সন্তান প্রসব করতে লাগলেন।

তাঁর স্ত্রী আমেনা খাতুন কোন্ কালের মানুষ বলা মুশকিল, কিন্তু দুনিয়া সম্পর্কে তাঁর সম্পূর্ণ অসচেতন উদাসীনতার জন্য বলা যেতে পারে তিনি কোনো কালেরই মানুষ নন। স্বামী বৈঠকখানায় কী করেন, বা বাইরে ঝোলানো সাইনবোর্ডটার উদ্দেশ্য কী— সে-সব কথা নিয়ে চিন্তা করা তাঁর ধাতে নয়। তাছাড়া প্রতি বৎসর সন্তান জন্মলাভ করবার ফলে বেচারি হাঁফ ছাড়বারও ফুরসত পান নি, একটি বুকের দুধ খেয়ে একটু হাঁটি-হাঁটি পা-পা করতেই হঠাৎ ট্যাঁ করে চোখ-বোজা মাংসের পিণ্ড আরেকটি অতিথির আগমন হয়েছে। কাকে রেখে কাকে নেন, আবার কাউকে রেখেও চলে না।

এলোপাতাড়ি দিশেহারা দিনগুলো কাটিয়ে এক শান্ত অপরাহ্ণে পৌঁছে হঠাৎ তিনি যেন দুনিয়া আবিষ্কার করলেন, তিনি নিজেকে খুঁজে পেলেন, বাঁচার প্রয়োজন ও জীবনের অর্থও যেন তাঁর কাছে প্রতিভাত হল মামুলি ধরনে। সেদিন এ-পরিবারে একটি স্মরণীয় দিন। খান সাহেব বদরুদ্দিন (তখন তিনি সবেমাত্র খান সাহেব হয়েছেন) তাঁর কালো রংচটা ছেঁড়া আচকান পরে কোর্ট-অভিমুখে রওনা হচ্ছেন, এমনি সময়ে তাঁর স্ত্রী আমেনা খাতুন তাঁর মাথায় এক পাতিল ডাল ফেলে দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা এত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত হয়েছিল যে, তার সমার্থ বুঝবার জন্য খান সাহেবকে সারাদিন বৈঠকখানায় বসে গুড়গুড়ি ফুঁকতে হয়েছিল। বলাবাহুল্য তিনি সমার্থ ভেদ করতে পারেন নি, কাজেই স্ত্রী-প্রহারের সিদ্ধান্ত যে করেছিলেন সেটা যুক্তির ভিত্তিহীন উপসংহার।

ছেলেরা তখন বড়। প্রথম ছেলেটি বিড়ি ফুঁকে ঠোঁট কালো করে এনেছে প্রায়। বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে, মেজো মেয়েটি কোরান-হাদিস নামকেওয়াস্তে শেষ করে প্রেম করবার তল্লাশে আছে। তারা সবাই দেখল, এবং হয়তো মায়ের চোখে দেখল হঠাৎ জ্বলে ওঠা উন্মত্ততার আগুন। সুফিয়া—যার বয়স তখন আট—বাপকে ডালের মতো হলদে তরল পদার্থে ভূষিত দেখে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, শেষে ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করার পর মুখে আঁচল গুঁজে তার দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। আঁচলটি অবশ্য এক বোনের, যে হঠাৎ দরদ্‌বন্দ হয়ে আঁচলের প্রান্ত দিয়ে সাহায্য করেছিল তাকে।

সেই থেকে ঘরের আবহাওয়া বদলে গেল। খান সাহেব হুঁকার নল বদলালেন, আর তাঁর মিহিগলা হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে মোটা হয়ে উঠল। বৈঠকখানায় বহু ধোঁয়া উড়ল, এবং সে-ধোঁয়া যদি সাদা নীলাভ না হয়ে ইঞ্জিনের ধোঁয়ার মতো কালো হত তবে এতদিনে ওপরের ছাত কালো হয়ে উঠত রান্নাঘরের চালের মতো। শেষে একদিন তিনি আমেনা খাতুনকে, যিনি তখন অধিক সংখ্যায় খোদার বান্দা পয়দায়েশ করে, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তাদের লালনপালন করে স্বয়ং নিজে মালখালাস ফতুর হয়ে আছেন, তাঁকে মোটর-টায়ারের অংশ দিয়ে তৈরি খড়ম দিয়ে বার-কয়েক আঘাত করলেন। ছেলেমেয়েরা ছুটে এল, কিন্তু সুফিয়ার মুখে এবার কাপড় গুঁজতে হল না।

খান সাহেব খান বাহাদুর হবার আশা করছিলেন, এবার তিনি সে-আশা ত্যাগ করলেন। হুঁকার কেরের নলের মতো দীর্ঘ ও ঘোরালো হয়ে উঠল তাঁর চিন্তা। মক্কেলরা উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে থেকে হঠাৎ উপলব্ধি করে যে, উকিল সাহেব ভাবনায় মগ্ন; কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দাঁড়িয়ে এক কথা বলতে অন্য কথা বলে ফেলেন, আশি নম্বর কেসের মক্কেলকে দেখে পঁচাশি নম্বর কেস পড়েন। একটা কথা তাঁর মনে বিশেষভাবে দাগ কেটে আবির্ভূত হল। সেটা হচ্ছে এই : তাঁর স্ত্রী, আমেনা খাতুন, তাঁর জীবনকে ছারখার করে দিয়েছেন। আইনি বুদ্ধিতে এ-যুক্তির সমর্থন নেই, কিন্তু অন্তরে-অন্তরে বিশ্বাস হল : তাঁর জীবন যে সফলতায় মণ্ডিত হয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে নি তার প্রধান কারণ রক্তশূন্য ফ্যাকাসে চেহারায়-বোনা শীর্ণ আমেনা খাতুন যাঁর দেহের তোরণ-পথে এতগুলো সন্তান এ-বিচিত্র দুনিয়ায় প্রবেশ করেছে। তিনি সন্তানদের ঘৃণা করলেন না, করলেন সন্তানদের সাদি-সাধায়কে, ঘৃণা করলেন মনে-প্রাণে বিষাক্ত হিংসাত্মক ক্রোধে।

আমেনা খাতুনের মনে যুক্তির বালাই নেই। কোথেকে একটা কথা এসে তাঁর মনেও বাসা বেঁধেছে দৃঢ়ভাবে। আর সেটাও ঘৃণা; খান সাহেবের ঘৃণাটা যদি হয় বিষাক্ত হিংসাত্মক তবে আমেনা খাতুনেরটা মারাত্মক। তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মাল : তাঁর স্বামী, যাঁর সঙ্গে তিনি এতদিন ঘর করেছেন, তিনি তাঁর জন্য খোদার এ-সুন্দর দুনিয়াকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যত কিছু সুকোমলতা ও মাধুর্য সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছেন। কথায়-কথায় দু-জনে খিটিমিটি বাধে। খান সাহেব চিবিয়ে-চিবিয়ে ফোড়ন মারেন, আমেনা খাতুন চিৎকার করে বিষম ক্রোধে-রোষে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যান। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল, কেউ গেল মায়ের পক্ষে, কেউ বাপের পক্ষে। কেবল মেজো মেয়েটি ব্যাপারটা অন্যভাবে নিল। সে দেখলে যে নির্বিঘ্নে প্রেম করবার এই চরম সুযোগ। বাপ-মায়ে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণার তৃতীয় দিনেই জানলা দিয়ে সামনের বাড়ির কলেজের ছোকরাটাকে বেমালুম দু-পাটি দাঁত দেখিয়ে দিল।

একসময়ে রক্তশূন্য এমনিতেই রোগা মানুষ আমেনা খাতুন অসুখে পড়লেন। ঘুষঘুষে জ্বর, জিবে স্বাদ নেই, পেটে ক্ষিধে নেই। অসুখ এমন কিছু নয়, তবে দেহ কাহিল হয়ে পড়ল। এক ছেলে অবশেষে বাপকে বলল যে মায়ের অসুখ, একটু ডাক্তার দেখালে হয়।

গর্জে উঠে খান সাহেব বললেন, ও-সব তোর মায়ের পেকনাই।

পেকনাইটা বুঝলে না ছেলেটি ভালো করে। কেবল এ-কথা বুঝলে যে মায়ের চিকিৎসা

হবে না, মরে মরুক। ঘাড় কাত করে হেলে চলে গেল। মুরুব্বির সামনে মাথার পেছনটা চুলকাবার তার বদ-অভ্যাস, আড়ালে না গেলে হাত নাবে না। এবারো তার ব্যতিক্রম হল না। এক মেয়েও পান দিতে এসে আস্তে বাপকে ডাক্তার দেখানোর কথা পাড়ল। দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন বদরুদ্দিন সাহেব। তোদের দেখি মায়ের জন্য দরদের শেষ নাই। আমি এদিকে বাতের ব্যথা নিয়েও আপিস করছি রোজ তোদের জন্য, আমার জন্য কারো দেখি দীর্ঘশ্বাস পড়ে না। কৃতজ্ঞতা নেই একটু। যেদিন মরব সেদিন বুঝবি বাছা, বুঝবি। এ-মেয়েটির আবার হাতের নখ খোঁটার অভ্যাস; সে নিরুত্তরে নখ খুঁটে চলল।

লাইব্রেরিতে বদরুদ্দিন সাহেব বন্ধু আসমত খাঁ সাহেবকে জীবনের দুঃখ বুঝিয়ে বলেন। জীবনে সুখ নেই, শান্তি নেই। কংগ্রেসী উকিল বন্ধুকে বলেন, স্ত্রীর গোলামি ব্রিটিশের গোলামি থেকেও খারাপ। নতুন এক ছোকরা ধোপদুরস্ত কাপড় পরে কোর্টে আসা-যাওয়া করে। তাঁকে উপদেশ দেন, দেখুন, বিয়ে করবেন না কখনো। পাকা চুলের উপদেশ নিন। ঘরে কাতর হয়ে গোঙান আমেনা খাতুন। সুফিয়া হঠাৎ মায়ের বড় ভক্ত হয়ে উঠেছে; তাঁর পায়ের কাছটায় বসে পায়ের তালুতে হাত বুলোয়, ঝামা ঘষে, পানিটা পানটা দেয়। তাকে আমেনা খাতুন এক এক সময় গোপনে বলেন :

তোর বাপ হইল ডাকাইত, খুনী। বাস্, কথা কইলাম, বিশ্বাস করিস। কখনো আবার বলেন, তোর বাপ হইল জোঁক, রক্ত শুষে-শুষে নেয়। পায়ের তালুতে ঝামা ঘষতে-ঘষতে মেয়ে শোনে, শুনে তার মনে যে-প্রতিক্রিয়া হয় তা-সযত্নে ঢেকে রাখে। তবু তার চোখের পানে চেয়ে, নীরব মুখের পানে চেয়ে মার মেয়েতে বিশ্বাস হয়, ক্রমে-ক্রমে আরো কথা বলেন। বলেন, তোর বাপ আমার শরীরের রক্ত শুষে নিয়েছে বিন্দু বিন্দু করে। তার কারণ আমি সুন্দর না, আমি স্বাস্থ্যবতী না। এসব কথা বলেন নিঃসংকোচে তাঁর আট বছরের মেয়ের কাছে, তাঁর মুখে একটু লজ্জার আভাও জাগে না। মেয়ে নত মাথায় ঝামা ঘষে।

ঘরে কাউকে বিশ্বাস নেই বদরুদ্দিন সাহেবের। মায়ের স্তনের দুধ খেয়েছে বলে ছেলেমেয়েরা যে আপনা থেকেই মায়ের পক্ষে থাকবে, একথা তিনি স্বচ্ছন্দে মেনে নেন, নিয়ে আপন সংসারে নিঃসঙ্গ বোধ করেন। হয়তো তাঁর মনে যে-বিরূপতার সৃষ্টি হয়েছে, সে-বিরূপতা আরো শক্তিশালী করতে চান বলেই তিনি নিঃসঙ্গতাবোধটা আরো তাজিয়ে জোরালো করে তোলেন। তিনি সংসারকে অপরাধী করতে চান, এবং উইয়ে-ধরা, কালের হাওয়ায় অন্ধকার-হয়ে-ওঠা আইনি কেতাবগুলোর জীর্ণ পাতাগুলো জীবনে অনেকবার উল্‌টেছেন বলে সম্পূর্ণ নিরপরাধকে অপরাধী করবার ফন্দি জানা আছে তাঁর।

অসুখটাকে আমেনা খাতুনও প্রথমটায় বেশি কিছু ভাবেন নি। শরীরটা তেমন শাঁসালো নয় বলে থেকে-থেকে নানা অস্পষ্ট [আধনীত] উপসর্গে কাহিল হয়ে পড়েন, এবং আবার ডালভাত নুনঝাল খেতে-খেতেই সেরে ওঠেন এক ফাঁকে। এবার তিনি শহীদের অভিনয় করবার সুযোগ পুরোমাত্রায় নেবার চেষ্টায় ছিলেন, কেবল সামনে অন্তরে-অন্তরে বিশ্বাস করেছিলেন এটা কিছু নয়, ডাক্তার ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই। মেয়েকে বাপের নির্দয় প্রকৃতির স্বরূপ বর্ণনার পক্ষে প্রমাণ হিসেবেও ব্যাপারটা ব্যবহার করেছিলেন বটে কিন্তু অমন একটা অর্থহীন অপব্যয়কে ক্রোধান্বিত মনেও সমর্থন করতেন না। কিন্তু সে-অসুখ এমন জোরালো হয়ে উঠল যে, এক সন্ধ্যায় ম্লান নিস্তেজ অন্ধকারে তিনি হঠাৎ অনুভব করলেন, তিনি আর বাঁচবেন না।—অনেক মুমূর্ষু নাকি মৃত্যুর পদধ্বনি, অনেক সময়ে অনেকদূর থাকলেও, স্পষ্ট শুনতে পায়। হয়তো তিনিও শুনলেন, শুনে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন, কথা কইলেন না দুদিন। তৃতীয় দিন তিনি তাঁর ছোট মেয়েকে ডেকে অন্যজগতের যাত্রীর এক বিচিত্র অস্পষ্ট গলায় বললেন,

—তোর বাপ কই?

—বৈঠকখানায়।

—ডাক।

মেয়ে গেল, কিন্তু বদরুদ্দিন সাহেব এলেন না। বললেন, এখন ব্যস্ত মক্কেল নিয়ে। মক্কেল দু-একজন ছিলও।

আমেনা খাতুন বুঝলেন, কিন্তু তাঁর ঠোঁট কাঁপলও একটু। সকালের সোনালি রোদ তখন ঝলসে গেছে, জলুসহীন কড়া সে-রোদ বাইরে জৈষ্ঠ্যের দিনের পিঠ বেয়ে বীভৎস হয়ে উঠছিল, এখানে সে-রোদের আভায়—আমেনা খাতুনের চোখদুটো কেবল ক্ষণিকের জন্য ঝলসে উঠল। মনে-মনে বিচারতর্ক শুরু করলেন, এবং বৈঠকখানায় কাচভাঙা আলমিরায় মোটামোটা আইনি কেতাবগুলোর অক্ষর পর্যন্ত না চিনলেও তিনি চমৎকার একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন। বদরুদ্দিন সাহেব খুনী। শুধু খুনী নয়, অকৃতজ্ঞ খুনী। আমেনা খাতুন তাঁর সংসারকে ফুটন্ত করবার জন্য, তাঁর বংশের নাম উজ্জ্বল করবার জন্য তাঁর সারা জীবনকে তিনি তিলে-তিলে ধ্বংস করতে দ্বিধা করেন নি, অথচ সে-লোক আজ শুধু যে চরম অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে তা নয়, মনে-মনে চাইছে, তাঁর মৃত্যু হোক। মৃত্যুর মতো জ্বালাময়ী সর্বগ্রাসী একটা চক্রান্তের আগুন আমেনা খাতুনের সর্বাঙ্গ আবৃত করল।

ছেলেমেয়েরা দেখে, মা নেতিয়ে পড়ছেন। তাঁর মুখে কথা নেই, নড়াচড়া নেই, চোখে কেবল একটা ধারালো জ্যোতি। বদরুদ্দিন সাহেব নতুন করে আইনের কেতাবগুলো ঘাঁটছেন; একটা কেসের ব্যাপারে বিশেষ এক ধারার বিবরণ পড়তে গিয়ে শত ধারার বিবরণ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়েন : সংসার তাঁর দেখবার সময় নেই। মায়ের ঘরের ছায়ায় মেজো মেয়ে শুধু মৃত্যুর ছায়া দেখে। সে পাশের বাড়ির সে-ছেলেটার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে, কিন্তু বদরুদ্দিন কখনো এ-ঘরে এসে আড়চোখে আমেনা খাতুনকে দেখলেও বলেন, ও কিছু নয়, সেরে যাবে।

একদিন কিন্তু মুখ থেকে হুঁকোর নল নাবিয়ে বৈঠকখানা থেকে সোজা বেরিয়ে গেলেন বদরুদ্দিন সাহেব। গেলেন ডাক্তারের কাছে। পাড়ায় এক ডাক্তার ছিল, পসার জমাবার চেষ্টায় বিনে পয়সাতেই সে রোগী দেখে বেশি। তাকে নিয়ে এলেন ডেকে।

ডাক্তার এসেছে শুনে ছেলেমেয়েদের মুখ হঠাৎ আলো হয়ে উঠল, এবং কেউ-কেউ যে মনে-মনে বাপের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠছিল, তাদের সে-বিরূপতা ডাক্তারের গলায় ঝোলানো স্টেথস্কোপ দেখে এক মুহূর্তে কেটে গেল। অন্দরে আমেনা খাতুনের কানে মুহূর্তে গেল সেকথা, কিন্তু তাঁর মুখ আলো হল না। তিনি বুঝলেন, সব শেষ করে তাঁর শেষ সম্বল সে-সর্বগ্রাসী ক্রোধও তিনি নষ্ট করতে চান পানি ঢেলে।

মুখ পাশে ফিরিয়ে তিনি আস্তে-আস্তে বললেন, ডাক্তারের দরকার নেই। আমার খোদা আছে।

ডাক্তার তিনি দেখালেন না।

একদিন সন্ধ্যার দিকে তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এল। তিনি হয়তো বুঝলেন, কিন্তু কাউকে বললেন না কিছু। কিন্তু অবশেষে তাঁর কঠিন ইচ্ছাশক্তিও হাতের মুঠো থেকে আস্তে খসে গেল, তিনি জানতেও পারলেন না; মেয়েরাও এবার সন্ধ্যার অন্ধকারে আজরাইলের দীর্ঘ ছায়া দেখল।

শ্রান্তক্লান্ত হয়ে—খান সাহেব বদরুদ্দিন আপিস থেকে ফিরলেন। পায়ের তালি-দেওয়া জুতোজোড়া খুলে তিনি গরম-হয়ে-ওঠা পায়ে আরামে হাত বুলাচ্ছেন ও চামড়ার গায়ে ঘেমে-ওঠা বিচিত্র ঘামের গন্ধ শুঁকছেন চিরাভ্যাসে, এমন সময় ছেলে এসে মাথা চুলকিয়ে বলল,—আম্মা যেন কেমন করছেন।

পায়ের হাত বুলোবার আরাম-তো গেলই, মুহূর্তে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল। মুখ কালো করে তিনি গেলেন—মুমূর্ষু আমেনা খাতুনের ঘরে।

ঘরে লণ্ঠন জ্বালা উচিত ছিল, কিন্তু ভুল করে কেউ জ্বালে নি।—ভালোই হয়েছে, মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করে ক্লান্ত আমেনা খাতুনের মুখের ফ্যাকাসে রক্তশূন্যতা চোখে পড়ত তা

না-হলে।—আবছা সূর্যের পাশে নত মাথায় বসলেন বদরুদ্দিন সাহেব।

ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা, আমেনা খাতুন চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে আছেন। ঢ্যাবা ছেলেটি থেকে-থেকে আপনা থেকে কেঁপে উঠে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে দেখে।

মুহূর্ত কাটে। এক দুই তিন। অসংখ্য মুহূর্ত গায়ে ঢলে-ঢলে চলে যায়, এরা চুপ। বদরুদ্দিন সাহেবও চুপ করে আছেন। ভাবছেন না কিছু কিন্তু নত মাথায় বসে আছেন বলে ঘাড়টা যে চিনচিন করছে, তা অনুভব করছেন। শেষ সময়ে ডাক্তার ডাকাটা যে একটা ফরজ ভদ্রতা—সে-কথাটাও তাঁর খেয়াল হল না একবার। বেফজুল কাজ তাঁর খেয়ালে আসে না। সাধে কি মোটামোটা কেতাবগুলো সময়ে অমন অন্ধকার হয়ে উঠেছে ?

সন্ধ্যা তখন উতরিয়ে গেছে। এমন সময় অস্পষ্ট শব্দ করে, সামান্য একটু নড়বার চেষ্টা করে আমেনা খাতুন চেতনায় ফিরে এলেন। জীবনের শেষে—দৃষ্টিতে যে-আলোটুকু তখনো অবশিষ্ট রয়েছে সে-আলো দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন পাশে ছায়ার মতো—মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে আছে—ছেলেমেয়েরা, আর বুকের পাশে মোটাসোটা বদরুদ্দিন সাহেব মাথা নত করে চুপ হয়ে আছেন। খানিকক্ষণ চেয়ে-চেয়ে দেখলেন, দেখে মনে হল মানুষটির আপিসের ক্লান্তির কথা। গত যুগের কথা মনে হল, যখন আপিস থেকে ফিরে ক্ষুধার্তের মতো এতগুলো গুড়মুড়ি গিলতেন গোগ্রাসে। আমেনা খাতুনের চোখের পলক পড়ে না, তিনি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে-চেয়ে দেখেন। তারপর হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল : সে-সর্বগ্রাসী আগুন কোথায় গেল, যে-আগুনকে তাজিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা করেছেন দিনের পর দিন? তাঁর অন্তর ঠাণ্ডা। কোনো ক্রোধ নেই।

আমেনা খাতুন মাফ করে মারা গেলেন। আর মৃত্যুর পর কোনো ক্রোধ থাকতে পারে না বলে বদরুদ্দিন সাহেব নিঃসংকোচে স্ত্রীর মৃতদেহের জন্য অর্থ ব্যয় করলেন। ফকিরও খাওয়ালেন অনেক।

বৈশাখ ১৩৫৫ এপ্রিল ১৯৪৮

স্বপ্নের অধ্যায়

প্রথমে ধরা পড়ে না কিন্তু সময় নিয়ে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে কিসের যেন অভাব এ পরিবারে : হয়তো প্রাণের, বাহ্যিক ঝংকারের। সবাই কথা কম কয়, সবারই যেন একটা আলাদা জগৎ আছে যার মধ্যে প্রত্যেকে মগ্ন এবং যার সম্বন্ধে তারা পরস্পর অজ্ঞ। আম্মা হয়তো নামাজ শেষ করে জায়নামাজে বসেই দেয়ালের পানে বা মেঝের পানে চেয়ে মুহূর্তের পর মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকবেন, এবং একটু দূরে খাটের ওপর বসে বড়মেয়েটি আধা-চোখ বুজে মুরগির পালক দিয়ে কান খোঁচাতেই থাকবে, আম্মার পানে তাকালেও তার মনে কোনো প্রশ্ন জাগবে না। আব্বা হয়তো আপিস থেকে আসবেন, এসে চা-নাশতা খেয়ে বেলা গড়িয়ে এলে, সামনের মাঠটা গাঢ় সবুজ হয়ে উঠলে, বারান্দায় এসে আরামকুর্সিতে বসে গালের পাশে হাত রেখে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকবেন, হয়তো ঘাসের পানে অথবা কোথাও নয়। ছোট মেয়েটি কখন এসে একটা চক্কর দিয়ে যাবে, কিন্তু বাপের পানে তাকিয়ে বিস্মিত হবে না, মনে কৌতূহলও জাগবে না।

বড় মেয়ে আনোয়ারাকে দেখে মনে হবে প্রাণেরই অভাব এ-বাড়িতে। সে দেখতে কেমন নির্জীব, দেহটা লম্বা আর ভারি। প্রথমে ছিল হাড়ের ভার কিন্তু ক্রমে-ক্রমে সে কেবল মাংসল হয়ে উঠছে। নেশার মধ্যে দুটো নেশা : এক ঘুমানো। দ্বিতীয়ত, কান খোঁচানো।

প্রথমটির জন্য সময়-অসময় নেই, সুযোগ পেলেই তা ঘটতে পারে। স্কুলে যাবার আগেও সে ঘুমোতে পারে, স্কুল থেকে এসেও ঘুমোতে পারে, আর রাতে পড়ে উঠে না-খেয়েই ঘুমোতে পারে। আর দ্বিতীয়টির জন্য তার মুরগির প্রতি লোভ, মুরগি জবাই হলে মাংসের থেকে তার পালকের প্রতি বেশি দৃষ্টি। সে পালক নিয়ে সাফ করে সরু করে কান খোঁচাবার মতো করে একটা ছোট পিজবোর্ডের বাক্সে জমা করবে। আর কান খোঁচাবার সময় কেউ যত প্রয়োজনীয় কথা বলুক না কেন, সে কেবল আবেশে চোখ বুজে মাথা কাত করে খোঁচাতেই থাকবে, উত্তর দেয়ার বা সে-কথায় কান দেয়ারও কোনো প্রয়োজন বোধ করবে না। তার যে আলাদা জগৎ সে-জগৎ হয়তো এমনি একটা পুলকে আর ঘুমে-তন্দ্রায় মেশানো অস্পষ্ট এক জগৎ।

কিন্তু কখনো-কখনো সে পরিষ্কার চেতনায় জেগে ওঠে, রান্নাবান্না দেখে, ছেঁড়া কাপড় খুঁজে নিয়ে সেলাই করে, রিঠা দিয়ে মাথা ঘষে, নারকেলের ছোবড়া দিয়ে দেহ পরিষ্কার করে। এ-সময়ে ভাইবোনদের প্রতিও নজর দেয়। কার কানের পিঠে ময়লা, কার খাওয়া কমে গিয়ে কোথায় উঠেছে তা লক্ষ্য করে, উপদেশ দেয়, যদিও সে-উপদেশ কেমন কৃত্রিম শোনায়। তাছাড়া তখন হয়তো তার মনের কোথাও সামান্য সাড়া জাগে, একটু রং ধরে, জমাট-বাঁধা নিথর মনে বসন্তের দমকা হাওয়ার মতো একটা ঝিরঝিরে চাঞ্চল্য আসে। কিন্তু সেটা সাময়িক।

তার ছোট কামালের মাথাটা অত্যন্ত বড়, মস্ত রুমি টুপিটাও সে-মাথায় কেমন কষা হয়। আর মুখের রেখাগুলো কেমন ভোঁতা, থ্যাবড়ানো। সকালে দুলে-দুলে সুর করে কোরান তালাওয়াত হতে শুরু করে, পাঁচওক্ত নামাজ তার কোনো দিন বাদ যাবে না, স্কুলও কামাই হবে না। রোজকার নামাজে রুমি টুপিটা অবশ্য সে পরে না, শুধু দুই ঈদের নামাজের জন্য সেটা আলমিরায় তোলা থাকে। নিত্যকার নামাজ চলে গোলমতো একটা কাপড়ের টুপিতে, যা মাসে-ছ'মাসেও একবার ধোয়া হয় না। তেলের দাগে ও হাতের ময়লায় তা কালো, তাছাড়া এক স্থানে তার ফুটোও। রাতে এশার নামাজ পড়ে কখনো সেটা মাথায় পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ে, কখনো আবার সকালবেলায় খুঁজে না পেয়ে স্মরণ করতে পারে না গতরাতে কোথায় রেখেছিল। শেষে চৌকির তলা থেকে সেটা উদ্ধার করে দীর্ঘ জিব-কেটে ঝেড়ে-মুছে চুমো খায়, তারপর ফুঁ-দিয়ে সেটাকে ফুলিয়ে মাথায় পরে নামাজে দাঁড়ায়। পড়তে বসলে মাথাটা তার ঝুঁকে আসে, হয়তো ভারে। আর পড়বার সময় আস্তে-আস্তে পড়বে না, অথচ গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে কী যে পড়বে তাও বোঝা যাবে না। আম্মার কানে কোনো-কোনো দিন সে-আওয়াজ খারাপ ঠেকে, বারান্দায় বলে পাঠান অমন করে না-পড়তে, শুনে তাঁর নাকি বুকে কেমন অস্থিরতা হয়। কেবল সেদিন সে আস্তে-আস্তে পড়বে, তবু ঠোঁট নড়বে কিন্তু। স্কুলে দুবার ফেল সে হয়েছে, পড়াশোনা এগিয়েও যেন এগুতে চায় না, তবে ভরসা এই যে, তার চেষ্টার অন্ত নেই। কেবল মস্ত মাথাটা নিয়ে হয়তো সামলে উঠতে পারে না।

তাঁর ছোট বোন হালকা মেয়ে, নাম মালেকা। কিন্তু তার জগৎটা যেন এদের থেকে ভিন্ন, সামঞ্জস্যশূন্য; হয়তো-বা সামান্য বিচিত্রও। চেতনা-বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথা সে বুঝেছে যে, এ-বাড়িতে সে এলেও পারত না-এলেও পারত, এবং এ-জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে তারই অলক্ষ্যে তার সে-জগৎ ক্রমশ আরো দূরে সরে পড়েছে। চোখটা তার আবছা। থেকে-থেকে তাতে কালো ছায়াও ঘনিয়ে ওঠে, আবার কখনো প্রশ্নের তীক্ষ্ণতায় সে-চোখ দীপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রশ্নের ভাষা তাকে কেউ শেখায় নি। আর প্রশ্নই-বা কী। হয়তো অদ্ভুত, হয়তো ছেলেমানুষেমি; তার উত্তর দেয়া চলে না। উদাহরণ হিসেবে সেবারের নৌকার ব্যাপারটা বলা যায়। ওরা বাড়ি থেকে ফিরছিল। বর্ষাকাল। গাড়ির পথ ডুবে গেছে, তাই সারারাত নৌকায় আসতে হল। তা তাদের বাড়ির নৌকা ছিল, বড় ঘাসী নৌকা। মাঝিও ছিল গোটা ছয়েক; আর নৌকায় বিছানা করে ওদের সবার শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেয়েটি তখন ছিল ঘুম-কাতুরে, কাজেই নৌকা খালের ঢাল না-পেরুতেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল,

দেহভাঙা জমাট ঘুমে। তারপর কখন সে-ঘুম ভাঙল। জেগে সে প্রথমে দেখল মৃদু আলো, সাড়াশব্দ কিছুই পেল না। আসলে যে-সাড়া পেল তাকে সাড়া বলে মনে হয় না তার। নৌকা দুলছে, দাঁড়ের আওয়াজ নেই, কিন্তু যে-আওয়াজে তার সারা মনে বিস্ময় জমে উঠল তা হল পানির শব্দ। নদীর পানির শব্দ যে সে শোনে নি তা নয়, কারণ নদীর দেশের মেয়ে সে, আওয়াজ শুনেই অভ্যস্ত, কিন্তু মহানীরবতার মধ্যে সে আওয়াজ ঠাহর করতে পারল না। কেমন মনে হল, সারা আকাশ—যাকে ভেবেছিল শূন্য নীলাভ বর্ণ—তা হল কালো অন্ধকার, যে-অন্ধকার মহানীরবতা। এবং এ আওয়াজ হল সে-মহানীরবতার ঢেউয়ের আওয়াজ। কিন্তু এই সময়ে দুনিয়ার আওয়াজ কি কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতের নদীবক্ষের রহস্যময় মাঝিদের আওয়াজ কোত্থেকে ফেটে পড়ল, দূরে কে গান গেয়ে উঠল। গান গাইল যে সে কথা বুঝল না প্রথমে মেয়েটি, মনে হল কে বলল নদীটা অনেক চওড়া। নদীর গভীরতা যেমন মাপে তেমনি কে যেন বিচিত্র ভাষায় কথা কয়ে নদীর প্রশস্ততা মাপছে। ও ভাবল, ইস, কী চওড়া নদী, স্বপ্নের মতো চওড়া। এত চওড়া যে মনে ঘুম জমে ওঠে সুরের। শেষে মেয়েটি বুঝল দূরে কোনো মাঝি গান গেয়ে উঠেছে হঠাৎ। হঠাৎ হয়তো নীরবতার ভয় পেয়ে গান গেয়ে উঠেছে, নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে কণ্ঠকে আঘাত করে। ঘুম আর এল না মেয়েটির। মনে কেমন ছায়া নাবল ভারি হয়ে, কাকে যেন কী প্রশ্ন করবার জন্য থমকে রইল। এবং অবশেষে তার কান্না পেল, হঠাৎ ওই গানের মতো আচমকা কেঁদে উঠল, যেন তার অন্তরে যে-নদী সে-নদীর প্রশস্ততা মাপবার জন্য, তাকে অনুভব করবার জন্য। কিন্তু ইস, কী বড় নদী, কী চওড়া। কিন্তু তা-দেখে এবার চোখে ঘুম ভরে উঠল না, কান্নাই কেবল আরো ঘন হয়ে ফুলে উঠল, ফুলে-ফুলে ভেসে উঠল, তারপর প্রশ্নের ঢেউয়ে ভেঙে পড়ল। ও-ধারে আকাশে অসংখ্য তারা, অন্য জগতের ছায়া। আর নৌকা দুলছে, ছইয়ের পাশে ঝোলানো স্তিমিত আলো দুলছে, আর একটা যে-মাঝির দেহ দেখা যাচ্ছে সে-দেহ আঁধারের মধ্যে সত্য-মিথ্যায় মিশে আছে। কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না। মাঝিটাকে হয়তো প্রশ্ন করা যেত, কিন্তু সে বাইরে মহা-আঁধারের মধ্যে জড়িয়ে আছে, নদীর অপর তীরের ধূসরতার মতো আবছা হয়ে আছে। ও আরো কাঁদল, নিঃশব্দে আরো কাঁদল। এবং কেউ জাগল না, জেগে তাকে কোলে টেনে নিল না। সেদিন সকাল থেকে কেবল বৃষ্টিই হচ্ছে। সামনের রাস্তাটা কাদায়-কাদায় থ্যাকথ্যাকে হয়ে উঠেছে, আর পাশের পুকুরটা কানায়-কানায় টলোমলো। আনোয়ারাদের স্কুলটা আবার শহরের ও-মাথায়। ভয়ানক বর্ষায় শহরের এ-মাথা ও-মাথায় যোগাযোগ রাখা সম্ভবপর হয় না। রোগা টাট্টুর মতো বেঁটে ঘোড়ায়-টানা স্কুলের গাড়ি আসে, আজ সে-গাড়ি এল না। আনোয়ারা ভাবল, ভালোই হল, ঘুমোনো যাবে বর্ষার কালো ও ভিজে দুপুরে। মালেকা কিছু ভাবল না, কেবল তার মনে হঠাৎ একটা শূন্যতা নিঃশব্দে ছড়িয়ে উঠল, শৈশবে দেখা কোনো বিস্ময়কর এমনি এক বাদলা দিনের স্মৃতিতে এ-দিনের সংঘর্ষ লেগে মাঝখানে তার মন বেদনায় ঘনিয়ে উঠল। কাপড়-জামা বদলে পরল, খাতা-বই টেবিলে সাজিয়ে রাখল, তারপর দেখল আর কিছু করবার নেই। এবং নেই বলে আরো শূন্যতায় তার মন কেমন হয়ে উঠল। আব্বা আপিসে। কামাল স্কুলে। আনোয়ারা এখন ঘুমোবে। আম্মা গোসল আর খাওয়াদাওয়া শেষ করে হয়তো হজরতের জীবনীটা পড়তে বসবেন। জোহরের সময় হলে নামাজ পড়বেন, পড়ে এবার কোরান শরিফ পড়বেন। পড়তে-পড়তে হয়তো কাঁদবেন। অথবা পরে হয়তো মেঝের পানে চেয়ে বা দেয়ালের পানে চেয়ে নিশ্চল হয়ে থাকবেন। তারপর হয়তো, আজ বাদলা দিন বলে, একটু ঘুমোবেনও পা-টা গুটিয়ে শাড়ির আঁচলে। আর আনোয়ারা ঘুমোবে, কেবল ঘুমোবে। কখনো হয়তো ঝমঝম করে পানি নাববে, কখনো হয়তো আবার রোদ ঝকমক করবে, আনোয়ারা কিছু জানবে না।

কিন্তু এদিকে মালেকার জন্য বৃহৎ শূন্যতা। শূন্যতা হয়তো তত খারাপ লাগত না, কিন্তু মনে আবার কোন্ সে-শৈশবে দেখা বাদলা দিনের স্মৃতির বোঝা। স্পষ্টভাবে এ-কথা সে

বুঝল না বলেই আরো তার শংকা, বেদনা। কিন্তু এই সময়ে একটা আওয়াজ শুনে সে চমকে উঠল। বাইরে যেন একটা গাড়ি থেমেছে। স্কুলের গাড়ি? কিন্তু এত দেরি করে সে-গাড়ি তো আসবার কথা নয়! উঠে সে বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখল একটা ছ্যাকড়া গাড়ি সামনে দাঁড়িয়ে। একটু পরে একটা লোক নাবল, যাকে চেনা-চেনা মনে হলেও বুঝতে পারল না কে। লোকটি কাছে এল, এসে এধার-ওধার চেয়ে অবশেষে দরজার পানে তার দৃষ্টি পড়তেই হঠাৎ হেসে দিল, উঠে এল বারান্দায়। তবু কিছু বলবার আগে সে কেমন ইতস্তত করল, শেষে হঠাৎ হারিয়ে-যাওয়া নাম খুঁজে পেয়ে বলল,

—তুমি মাকা?

মালেকা কিছু বলল না, কেবল মাথা নাড়ল। লোকটি কৃত্রিম তীক্ষ্ণতায় তাকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে দেখল, তারপর বলল,

—আমাকে চেন?

এইবার মালেকার স্মরণ হল। স্মৃতির আবছায়ায় হঠাৎ একটা নাম ঝলকে উঠল। বলল,—আপনি মাজুভাই?

গাড়োয়ান ততক্ষণে সামান্য মালপত্র বারান্দায় এনে নাবিয়েছে, নাবিয়ে ভেজা-মুখ মুছে ভাড়ার জন্য দাঁড়িয়ে রইল। তাকে ভাড়া দিতে-দিতে মাজুভাই বলল,—ঠিক, ঠিক ধরেছ। থেমে বলল,—চাচা কোথায়?

—আপিসে।

—চাচি?

—আছেন। হঠাৎ খেয়াল হল মালেকার। একটু ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলল,

—আপনি দাঁড়ান, আমি আসি।

সে-কথা লোকটির কানে হয়তো গেল না, গেলেও তাকে আমল দিল না, মালেকার পেছন-পেছন পর্দা সরিয়ে সে ঘরে ঢুকল। ঢুকে বলল,

—কই চাচি?

ঘরটা ঈষৎ অন্ধকার। কিন্তু ঐ ঘরেই চৌকিটায় কাত হয়ে আনোয়ারা ঘুমে জমে আছে। দ্রুত পায়ে মালেকা এগিয়ে গেল, এ-ঘর পেরিয়ে ও-ঘরে। লোকটি কিন্তু তবু তাকে অনুসরণ করছে দেখে এবার আস্তে অথচ ক্ষিপ্রতায় মালেকা বলল,

—ও আম্মা, মাজুভাই এসেছে।

—কে?

—মাজুভাই।

আম্মা হয়তো কিছু বিস্মিত হলেন, কিন্তু দরজার ও-পাশে নবাগতর মূর্তি চোখে পড়তে তিনি মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে অস্পষ্ট গলায় কী যেন বললেন, এবং ও যখন দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে ঝুঁকে সালাম করে উঠে দাঁড়াল, তখনো যে তিনি কী কইলেন অনুচ্চ গলায় তাও বোঝা গেল না। আন্তরিক অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল না নিশ্চয়ই সে, কাজেই ঠাণ্ডা ব্যবহারে আহত হল না। এবং অভ্যর্থনার এ-ঠাণ্ডা ভাব কাটাবার জন্যই জোরে-জোরে কথা শুরু করল, হাসিতে মিশিয়ে, দরদে ভিজিয়ে। অনেকদিন সে চাচা-চাচিদের দেখে নি, ভাই-বোনদেরও না, তাই হঠাৎ তাঁদের দেখবার জন্য মনটা কেমন করে উঠল। নানা রকম কাজে-কামে ব্যস্ত থাকে বলে চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না, কিন্তু সব সময়েই তাঁদের কথা স্মরণ হয়। হাজার ভুলে থাকলেও রক্তের টান অস্বীকার করা যায় না ইত্যাদি। আম্মা হয়তো শুনছিলেন, শুনে ঈষৎ হাসিমুখে স্বীকৃতির ভঙ্গিতে থেকে-থেকে মাথা নাড়ছিলেন, কিন্তু মালেকা হঠাৎ লক্ষ্য করল তিনি বারকয়েক ও-ঘরে আনোয়ারার পানে কেমনভাবে তাকালেন। মালেকা বুঝল, আস্তে ও-ঘরে সরে আনোয়ারার গায়ে হাত দিয়ে ফিসফিস করে ডেকে তাকে জাগাতে লাগল, কিন্তু ওর ঘুম যেন কী রকম, সহজে কি ভাঙে? তাছাড়া জোরেও ডাকা যায় না, মাজুভাই যদি

শুনে ফেলে। কেবল নিঃশব্দে যত ধাক্কা দেয়া যায়। ধাক্কায় মাংসল শরীরটা দোলে, নড়ে, কিন্তু ঘুম ছোটে না !

কিন্তু এমনি সময়ে ও-ঘর থেকে নবাগতর কণ্ঠ শোনা গেল :

—আহা-হা, ওকে জাগাবার দরকার কী, ঘুম থেকে উঠলেই না হয় দেখবে মাকা। মাকা কেবল একবার তাকিয়ে দেখল মাজুভাইয়ের প্রতি, কোনো উত্তর দিল না। কারণ যে-কারণে তাকে নিঃশব্দে গোপনে-গোপনে জাগাবার চেষ্টা হচ্ছিল তা মেহমানকে অভ্যর্থনা করবার জন্য নয়। কী করবে ভেবে উঠবার আগে একবার আম্মার গলা শোনা গেল :

—না না, সে কী কথা! ওকে উঠা মাকা।

মাকা এবার গলায় ভাষা পেল। দেহের বলে আর গলার আওয়াজে তাকে অবশেষে জাগিয়ে তুলল, তুলে তখনো তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘুম-কাতর আনোয়ারাকে ফিসফিস করে বলল, ছি, ওঠ, মাজুভাই এসেছে। দেখছ না, ঐ যে ওই ঘরে।

আম্মা আর বেশি আলাপ করলেন না। একটা কথা শেষ করতেই বললেন,

—তুমি বাবা হয়রান হয়ে এসেছ, কাপড়-জামা বদলে গা-হাত ধুয়ে ঠাণ্ডা হও। মাকা, ছোঁড়াটাকে ডেকে সব ঠিক করে দিতে বল।

মাজুর হয়তো বক্তব্য তখনো শেষ হয় নি, তাই এবার কিছুটা ব্যর্থ হল। তবে মুহূর্তের জন্য। ওধারে তাকিয়ে আনোয়ারাকে দেখতে পেল না, তারপর মাকার পানে নজর পড়তেই হাসল, হেসে বলল,

—মাকা কেমন সুন্দর হয়েছে, না চাচি?

চকিত দৃষ্টিতে মালেকা তাকিয়ে দেখল তার পানে, তারপর ক্ষিপ্রভঙ্গিতে কালু ছোঁড়াটার উদ্দেশে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কালু ক্যাম্পখাট বাইরে পেতে তাতে মাজুর বিছানাটা পেতে দিয়েছিল। মাজুও খেতে-খেতে বলছিল যে রাতে ট্রেনে ঘুম হয় নি ভিড়ের জন্য। খাবার পরে বাইরের ঘরে গেলে একটু পরে মালেকা সে-ঘরে গেল, দরজা থেকে প্রশ্ন করল,

—আপনি পান খান?

বিছানায় বসে সিগারেট ধরাচ্ছিল মাজু, মুখ তুলে বলল, থাক। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বলল, তা মাকা, আমার কথা তোমার মনে ছিল?

মাকা ভাবল। ছিল না কথাটাই সত্য, কিন্তু, ও-কথা বললে খারাপ শোনাবে বলে চুপ করে রইল। কিন্তু এ-নীরবতা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হল না, হেসে উঠে সে আবার বলল,

—মনে না থাকলে লজ্জা নেই। সেই কবে দেখেছ, তখন তোমার বুদ্ধিই হয় নি। একটু থেমে আবার বলল, কিন্তু কারো কাছে কখনো আমার কথা শোন না?

ততক্ষণে বিছানায় মাঝবালিশে হেলান দিয়ে সে কাত হয়েছে, হয়ে ছাতের পানে চেয়ে ধোঁয়ার পর ধোঁয়া ছেড়ে শেষে আবার হাসল,

—গালাগাল করে বুঝি?

প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলা উচিত ছিল, কিন্তু মালেকা চুপ করেই রইল। তারপর বলল, যাই।

মালেকা চলে এল। ও-ঘরে তখন আম্মা নামাজ শেষ করে কোরান শরিফ নিয়ে বসেছেন, আর মাঝের ঘরে আনোয়ারা আবার কখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা আগমনে মালেকার মনের শূন্য বেদনা, স্মৃতির ধারালো ইঙ্গিতের ব্যথা কেটে গিয়েছিল, আবার তা নতুনভাবে ছেয়ে এল। ঘরে একজনের আগমন হল বটে, তবে সে-আগমন কেমন শূন্য। ওই কেবল হাসল, যে-হাসিতে এদের মনে কেবল অস্বস্তিই হল। যে-মানুষকে তারা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে না সেই কেমন যেন গা-ঘেঁষে এসে বসল। তবে মালেকা জানে না আসল কথা, কেবল জানে লোকটা ভালো নয়। কে বলেছে আর কারা এ-নিয়ে কখন আলোচনা করেছে তা খেয়াল

নেই, কিন্তু মনে হয় যেন সে-কথা সারা দুনিয়া বলে। আনোয়ারা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, না হলে তাকে প্রশ্ন করত। কিন্তু একটা কথা হঠাৎ ঝলক দিয়ে মনে হল, তারপর সারা চেতনা ঘিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। লোকটা খারাপ, কিন্তু সে তাকে প্রশংসা করেছে, বলেছে সে সুন্দর হয়েছে। তার ঘন ঘন হাসিটা যেমন এ-বাড়িতে কেমন নতুন ও অপরিচিত মনে হল, সে-কথাটাও তেমনি ঠেকল। বারেবারে মালেকার সারা চেতনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যে-চেতনাকেও মনে হল সম্পূর্ণ অপরিচিত, নতুন মানুষের সঙ্গে বা নতুন স্থানের সঙ্গে পরিচিত হবার মতো নতুন অভিজ্ঞতা। সঙ্গে-সঙ্গে তার অন্তর্মুখিন মন খাড়া দেয়াল টপকে বাইরে এল, যেখানে ঝকমক করে মানুষের আলো আকাশের তারার মতো। এবং তারই সঙ্গে মিশে স্মরণ হল কবে নদীর ধারে পানিতে আধাডোবা সবুজ ধানক্ষেতে সে ঢেউ দেখেছিল, কবে কে-কোথায় গুনগুনিয়ে উঠেছিল, কোন মেয়েটির মুখ হাসিতে কেমন মিষ্টি দেখিয়েছিল, আর দাঁতগুলো ঝিকমিক করে উঠেছিল।

ঘরে স্তব্ধতা। বাইরে তখন রোদশূন্য ম্লানিমা, কিন্তু বৃষ্টি ধরে আছে অনেকক্ষণ ধরে। আম্মা হয়তো কাঁদছেন, আঁচলে থেকে-থেকে চোখ মুছছেন, আর আনোয়ারার ঘুমন্ত মনে কিছু নেই, দেহ নিস্পন্দ। কানায়-কানায় ভরা পুকুরের পানে তাকিয়ে মালেকার মন অবশেষে ছলছল করে উঠল, অশ্রুতে নয়, বেদনাতেও নয়, কিসে কে জানে। সেবার বাড়ি থেকে আসবার পথে ঘুম থেকে জেগে হঠাৎ যে মহানীরবতার মতো পানির ছলছল আওয়াজ সে শুনেছিল, তেমিন একটা আওয়াজে সময় নিয়ে মালেকা আস্তে বলল :

—শুনি।

—কী শোন?

থেমে গিয়ে মালেকা আগের কথারই কেবল পুনরাবৃত্তি করল, সঠিক উত্তর করে উঠল তার মন। তবে এবার বিস্ময় হল না, কী যেন কেবল পূর্ণ হতে থাকল।

বহুক্ষণ পর এক সময়ে জানলা থেকে সরে মালেকা বাইরে বারান্দায় এল। মাজুভাইয়ের ঘুম হয় নি রাতে, ট্রেনে ভয়ানক ভিড় ছিল। কিন্তু আড়চোখে ও-ঘরের পানে তাকিয়ে দেখল মাজুভাই এখনো ঘুমোয় নি, প্রায় একঘণ্টা আগে যেমন তাকে হেলান দিয়ে বসে ছাতের পানে তাকিয়ে থাকতে দেখে গিয়েছিল এখনো তেমনি বসে আছে, দেহ নিশ্চল। তার নিশ্চলতায় মালেকাও কেমন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল, নিঃশব্দে সরে আসবার কথা খেয়াল হলেও নড়তে পারল না। একটু পরে মাজুভাই হঠাৎ তাকাল তার পানে, এবং তার চোখের পানে চেয়ে কিছু বিস্মিত হল, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। ইঙ্গিতে ইশারা করে সে মুখ ভরে হাসল, অজ্ঞাত দুনিয়ার রহস্য কেটে গেল। অন্য সময় হলে এমন কোনো মুহূর্তে মালেকা লজ্জিত হত, কিন্তু এবার তার লজ্জা হল না। ইতস্তত করে এগিয়ে গেল, তারপর দরজার কাঠে সামান্য হেলান দিয়ে নীরবে চেয়ে রইল তার পানে। মাজুভাই তখনো হাসছে। কী একটা বলবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার আগে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বলল :

—স্কুলে পড় না?

—পড়ি।

—আজ যাও নি?

—আজ গাড়ি আসে নি। বৃষ্টির জন্য বোধহয়।

—নামাজ পড়?

—পড়ি।

—আল্লাকে তোমার ভয় করে?

হঠাৎ কোনো উত্তর খুঁজে পেল না মালেকা। একবার মেঝের পানে, একবার জানলার পানে তাকিয়ে অবশেষে আবার মাজুভাইয়ের চোখের পানে চেয়ে সে নীরব হয়ে রইল।

মাজুভাই আবার হাসল। লোকটা যেন কেমন করে কেবল হাসে। কিন্তু মালেকার ঠোঁটে

হাসির কোনো ইঙ্গিত নেই, এমন কি এখন কেউ কাতুকুতু দিলেও সে হাসবে না, কেবল মুখ বাঁকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করবে। এবং হয়তো তার এই গম্ভীর মুখের পানে চেয়ে অবশেষে মাজুভাইও গম্ভীর হল। আল্লাহ্ সম্বন্ধে যে-প্রশ্ন তুলেছিল, সে-প্রশ্ন এড়িয়ে গেল। গিয়ে বলল যে, জায়গাটা কেমন গেঁয়ো-গেঁয়ো, ভালো বাড়িঘর নেই, রাস্তাগুলো বাঁধানো নয়। তাছাড়া সে শুনেছে এখানে খুব ম্যালেরিয়া হয়, সে-কথা কি ঠিক?

একথার উত্তর এড়িয়ে মালেকা হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল,

—আপনাকে ওরা সব অপছন্দ করে কেন?

এর জন্য প্রস্তুত ছিল না মাজুভাই। একটা চকিত বিস্ময়ে তার দৃষ্টি ঠিকরে পড়ল মালেকার গম্ভীর মুখের ওপর। কয়েক মুহূর্ত তেমনি তাকিয়ে থেকে সে আস্তে চোখ সরিয়ে নিল কেবল, কোনো উত্তর দিল না। তার এ-নিরুত্তর নির্বাকতায় মালেকার হয়তো ভয় হল, কিন্তু লজ্জা হল না। তবু কাঠের মতো নিস্পন্দ প্রাণশূন্য স্থিরতায় মাজুভাইয়ের পানে তাকিয়ে রইল, চোখের পলক পর্যন্ত পড়ল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো উত্তরই দিল না সে, মুহূর্তগুলো কেমন বিষম খেয়ে গড়িয়ে গেল, গড়িয়ে গেল আরো অস্বস্তিকর আবহাওয়ার মধ্যে। একটা কিছু যাহোক লোকটা বলে দিল না কেন?

মালেকা বেশ সুন্দর হয়েছে, না? সন্ধ্যার পরে ছায়া, টেবিলে আলো, সামনে বই। কিন্তু ওধারে অদ্ভুত অন্তরঙ্গতায় ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে, যার আওয়াজে কেমন একটা সুর, সুন্দর সুর। মালেকা সুন্দর হয়েছে। তুমি নামাজ পড়? তুমি খোদাকে ভয় কর? আকাশ তারাশূন্য, বাদলা আকাশে নীরবতা, কোনো কথা নেই। কিন্তু সুন্দর। মালেকা সুন্দর হয়েছে। তবে কী যেন বিদ্যুতের মতো খচ করে সোজা বুকে গিয়ে বেঁধে। শুধু বেঁধে নয়, ছিঁড়ে ফেলে। আপনাকে তারা অপছন্দ করে কেন? একটা কিছু লোকটা উত্তর দিল না কেন?

—তুমি পড়ছ না মালেকা?

মালেকা চমকে উঠে তাকাল, মাস্টারের চোখ দেখা গেল না। ঘোলাটে কাচে কেমন ধোঁয়া হয়ে আছে তাঁর চোখ। ওখানে চোখ নেই, কার পানে চাইবে? কিন্তু সে-ধোঁয়ার পেছন থেকে নিশ্চয়ই দুজোড়া চোখ তাকিয়ে আছে, তীক্ষ্ণ আর ধারালোভাবে। অবশেষে মালেকা উত্তর দিল :

—ভালো লাগছে না মাস্টারবাবু।

মাস্টারের কথাগুলো নাকে বাজে। মনটাও কেমন যেন কোথায় বেজে-বেজে আসে, আসতে-আসতে কিছু ক্ষয়ে যায়, বেরিয়ে আসে রসশূন্য হয়ে।

—না না, পড়।

নীরবে আবার সে অক্ষরগুলোর ওপর ঝুঁকল। কিন্তু ওখানে সৌন্দর্য নেই, যে-মানুষ ঘন-ঘন হেসেও শেষে একটা কথার প্রশ্নে হঠাৎ হারিয়ে গেল, সে-মানুষের উত্তরও এখানে নেই। তাছাড়া বাইরে যে কেমন অন্তরঙ্গ আওয়াজে ঝরঝর করে বর্ষা হচ্ছে, যা দেখা যায় না, অথচ কেবল ভেসে আসে কানে, তারও ছন্দ নেই ও-অক্ষরগুলোতে। একটু পরে মালেকা আবার মুখ তুলল, মাস্টারের ধোঁয়াটে চোখের পানে চেয়ে বলল :

—মাস্টারবাবু, ভালো লাগছে না।

মাস্টারের নাকীকণ্ঠ আবার কঁকিয়ে উঠল,

—না না, পড়।

আবার মাথা নত করল মালেকা। তুমি নামাজ পড়? পড়ি। অত্যন্ত চেষ্টায় অক্ষরগুলো পরিষ্কার হয়ে উঠল তার চোখে, কিন্তু সাময়িকভাবে। শীঘ্র তা-ঝাপসা হয়ে উঠল, মাস্টারের ঘোলাটে চশমার মতো। আবার মুখ তুলে তাকাল মালেকা।

—মাস্টারবাবু, ভালো লাগে না।

—কী ভালো লাগে না? কনকনিয়ে উঠল মাস্টারের রগ-বের হওয়া শীর্ণ গলা—না না,

পড়।

এবার হঠাৎ মালেকার চোখে ছায়া ঘনিয়ে উঠল, কোথায় একটা রগ বেঁকে গেল। নির্ভয়ে বিদ্রোহের ভঙ্গিতে সে দুটো ঘোলাটে কাচের পানে তাকিয়ে রইল। আর ভেতরে-ভেতরে কেমন একটা অভিমানে সিঞ্চিত কান্না উথলে-উথলে উঠতে লাগল। একবার কামালের পানে তাকাল। কিন্তু কামাল মাথা গুঁজে সেই যে কবে থেকে একটা অঙ্ক কষছে সেটা শেষই হচ্ছে না। এবার মাস্টারের পানে আবার তাকিয়ে মালেকা পরিষ্কার কণ্ঠে শেষবারের মতো বলল,

—আমার ভালো লাগছে না। আমি আর পড়ব না।

মাস্টার তাকিয়ে আছেন কি না বোঝা গেল না, কিন্তু এবার তিনি আর কিছু বললেন না। এবং এরপর মালেকা বই-খাতা গুটিয়ে উঠে গেল, পিঠের মতো বেণিটাও খাড়া, দীর্ঘ। মালেকা সুন্দর হয়ে উঠছে, না?

ও-ঘরে আব্বা হেলান-দেয়া চেয়ারে শুয়ে আছেন, দৃষ্টি হয়তো ছাতের পানে বা কোথাও নয়। পাশে চেয়ারে কেমন জড়োসড়ো হয়ে ঈষৎ ঝুঁকে মাজুভাই বসে আছে, মুখে হাসি নেই। কিন্তু একটু পরে আব্বার কণ্ঠ শোনা গেল, স্বচ্ছ গলা, ধীরভাবে উচ্চারিত শব্দগুলো,

—কিন্তু অত টাকা আমি তোমাকে দিতে পারব না।

মাজুভাই মূর্তির মতো নিশ্চল। কয়েক মুহূর্ত পরে তারও গলা শোনা গেল, আর সামান্য কটা কথা যেন স্তব্ধতার কোটর থেকে আলগোছে বেরিয়ে এল :

—তা বলে জেলে যাব?

আবার স্তব্ধতা। আব্বার চোখ কড়িকাঠের পানে বা কোথায় কে জানে! আর মাজুভাই মূর্তির মতো নিশ্চল, মুখের একপাশে ও দেহের একধারে ছায়া, ভাঁজ পড়ে জমে আছে। তাছাড়া সময় আছে কি নেই কোথাও থেমে গেছে, রাতের পাখির মতো আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার সাড়াও নেই। আর মালেকা, যে-মালেকা সুন্দর হয়ে উঠেছে, তার মনে একটু আগে যে-কান্না উথলে উঠেছিল অভিমানে সিঞ্চিত হয়ে, সে-কান্না স্তব্ধ, নিথর। কেউ কথা কয় না, কেউ আর কোনো প্রশ্নও করে না, জবাবও দেয় না, কিন্তু একটু পরে পাশের ঘরে অন্ধকার থেকে জবাব এল, চাপা দুর্বল গলায়। আম্মার গলা :

—আমাদের কেন ফাঁসাও বাবা?

আব্বার চোখে কম্পন নেই, কিন্তু মাজুভাইয়ের মূর্তি নড়ল, ঈষৎ স্বপ্নের মতো আবছাভাবে। শেষে সে কথা কইল, পাশের ঘরের দরজার পানে মাথা হেলিয়ে,

—তওবা চাচি, কী যে বলেন। কিন্তু এ-বিপদে আপনাদের কাছে না এসে কোথায় যাব? আমার আব্বা নেই, আম্মা নেই, না হলে—

মাজু কথা শেষ করল না, কেমন অস্বাভাবিকভাবে থেমে গেল। পাশের ঘর থেকে আবার কণ্ঠ ভেসে এল, আম্মার কণ্ঠে কিন্তু কোনো কম্পন নেই,

—তাঁরা নেই বলে তুমি এমন উচ্ছৃঙ্খল হবে তার কি কোনো মানে আছে?

এবার হাসল মাজুভাই। সামান্য, অস্পষ্টভাবে, কিন্তু এধারে সকলের অলক্ষ্যে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে থেকে মালেকা সে-হাসি চিনল, এবং যে-প্রাণ জমে ছিল স্তব্ধ হয়ে সে-প্রাণ ঈষৎ কেঁপে উঠল, নড়ে উঠল।

—আমি উচ্ছৃঙ্খল নই চাচি। ওটা আমার বদনাম। আসলে আমার কপাল খারাপ। দুনিয়াতে এমন মানুষও জন্মায় যাদের কপাল এমন খারাপ হয়, যারা যে-কিছুতেই হাত দিক না কেন তা কেমন করে যেন খারাপ হয়ে ওঠে। কোনা কারণ নেই তবু তারা পদে-পদে আছাড় খায়, দুঃখ পায়। এই যে ব্যবসা ধরেছিলাম চাচি, আমি কি ভাবতে পেরেছিলাম যে সে-ব্যবসা এমন হয়ে উঠবে? আমার টাকা ছিল না, ধার করতে হল; এবং যে-ব্যবসা ধরে অন্যদের ঘরে পানির মতো সহজে হাজার-হাজার টাকা এল, সে-ব্যবসায় আমার বেলায় নিয়ে এল কেবল মছিবত। তগদির চাচি, তগদির। তগদির কথাটায় আমার আগে বিশ্বাস ছিল না,

বারেবারে ঘা খেয়ে এখন বিশ্বাস হয়েছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবতা, তারপর আবার আম্মা কথা কইলেন,

—তুমি মদ খাও।

মাজুভাই মুখ তুলে ও-ঘরের দরজার পানে একবার তাকাল, কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। আম্মার কণ্ঠ এবার যে-তীক্ষ্ণতার পর্দা ভেদ করে এ-ঘরে এল তাতে মালেকা চমকে উঠল, এবং মাজু সে-সময়ের মতো তেমনি চকিত ক্ষিপ্রতায় বিস্মিতভাবে তাকাল দরজার পানে।

—কিন্তু বাবা তুমি-তো মুসলমানের ছেলে। তোমার কি খোদাকে ভয় হয় না?

খোদার কথায় অবশেষে আব্বাও নড়েচড়ে উঠলেন, ছাত থেকে দৃষ্টি নাবিয়ে এক পলকের জন্য মাজুভাইয়ের পানে তাকালেন। মাজুভাই নির্বাক। তারপর আব্বা পরিষ্কার গলায় বললেন,

—তুমি অন্য ব্যবস্থা কর, আমি পারব না। আমাকে মাফ কর।

মালেকা সরে গেল। নিঃশব্দে, বেড়ালের মতো পায়ে। কারো পানে আর তাকাল না, মাজুভাইয়ের পানেও নয়। আর যে-মালেকা সুন্দর হয়ে উঠেছে, সে-মালেকার দেহ কেমন অস্বাভাবিকভাবে ঝিমঝিম করে উঠল। নিঃশব্দে বেড়াল-পায়ে ঘরের ধার দিয়ে চলে সে ও-ঘরে গিয়ে সোজাসুজি বিছানার ওপর উঠল, কেমন হঠাৎ শ্রান্ত-দুর্বল হয়ে-ওঠা দেহকে টেনে নিয়ে। তারপর বালিশ খুঁজল হাতড়ে-হাতড়ে কারণ চোখটা কেমন অকারণে বন্ধ হয়ে গেছে, শেষে বালিশ পেয়ে তাতে মুখ গুঁজতেই হঠাৎ ঝরঝর করে কান্না ছাপিয়ে উঠল। তবে বর্ষার ঝরঝর আওয়াজের মতো এতে সুর নেই, কালো আবৃত আকাশের রহস্য নেই, কেবল ব্যথায় ঢালা স্রোত, বেদনার অন্ধ-প্রকাশ। আল্লাহকে তোমার ভয় করে? মালেকা কোনো উত্তর দেয় নি। এ-প্রশ্নে মাজুভাইও নীরব ছিল। কিন্তু সে-আল্লার কাছেই যেন এ-কান্না। কেমনভাবে মনে-মনে মালেকা বলল, আল্লাহ্ তোমার অনেক রহম, আল্লাহ্ মানুষ তোমার বান্দা। তোমার বান্দা না মানুষ? মৌলবী সাহেব বলেছেন। আম্মা তোমার কাছেই কাঁদেন। আমি তোমার ভয়েই কাঁদছি। তখন আমি উত্তর দেই নি, কিন্তু এখন কাঁদছি, ভয়ে। মাজুভাইও কাঁদবে, একাকী, নীরবে, কারণ সেও-তো তোমার বান্দা।

মালেকা কাঁদল আর কাঁদল, অজস্রভাবে। তারপর কান্নার মধ্যে কখন শ্রান্ত চোখ ঘুমে জড়িয়ে উঠল, আর যে-মালেকা সুন্দর হয়ে উঠেছে সে-মালেকার চোখে কান্নার রেখা শুকিয়ে জমে রইল, পাতলা দেহটা আস্তে ভেঙে রইল ঘুমে। চৌকিতে তেরছাভাবে শুয়ে, একটা পা তখনো বাইরে।

—আম্মা আমি তো জেগেই আছি। মাস্টারের চোখ দেখা যায় না। চোখ নেই বোধহয় মাস্টারের। মাস্টার বকেছে বলে আম্মা আমি তো জেগেই পড়ছি। এসব বলল মালেকা, কিন্তু একটা কণ্ঠ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে-ক্রমে এত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল যে সহ্য করা অসম্ভব।

—মাকা, খাবি না? এই মাকা—হঠাৎ মালেকার ঘুম ছুটে গেল, কিন্তু বিরক্তিতে কোথায় একটা রগ বেঁকে গেল হঠাৎ। একটু না-নড়ে সে গুম হয়ে পড়ে রইল।

—কী মেয়েরে খোদা, দিশে হারিয়ে ঘুমায়। এই মাকা—

—আমি খাব না। হঠাৎ তীক্ষ্ণভাবে মালেকা চেঁচিয়ে উঠল।

—সে-কথা আমি শুনব না মেয়ে, তোমাকে উঠতেই হবে।

—না, আমি খাব না, জিদ যখন চড়ে তখন কণ্ঠটা যেন অদ্ভুত মনে হয়, মনটাও যেন মনে হয় অন্য কারো বুঝি। কিন্তু সহ্য করা যায় না। আরো তীক্ষ্ণভাবে চেঁচিয়ে উঠল সে, আমি খাব না, খাব না।

কিছুতেই ওঠানো গেল না মালেকাকে। আম্মা যখন হয়রান হয়ে অবশেষে আপন মনে বকতে-বকতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখন তার অবশিষ্ট কান্নাটুকু আবার ছাপিয়ে উঠল। কিন্তু সামান্য ফুঁপিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালবেলায় উঠে শুনল যে মাজুভাই রাতেই চলে গেছে। কিন্তু সে-কথায় ব্যথাও হল না, বিস্ময়ও হল না, সারা মন কেবল আশ্চর্য শূন্যতায় শান্ত হয়ে রইল। ভূগোল, বাংলা আর সামান্য ইংরেজি পড়ে সে গোসল করল, তারপর শাড়ি বদলে বোনের সাথে সে টাট্টুর মতো বেঁটে দুর্বল ঘোড়ায়-টানা গাড়িতে করে শহরের ও-মাথায় স্কুলে গেল। সকাল থেকেই আজ রোদ উঠেছে—ঝকমকে রোদ এবং মালেকার এ-কথাও মনে হল না যে, কাল বৃষ্টি হয়েছিল, সারাদিন কেবল ঝরঝর করে পানি পড়েছিল।

আনোয়ারার মনে রং লেগেছিল কি না কে জানে, কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে তার বিয়ে হয়ে গেল, কিছু হেসে কি কেঁদে সে শ্বশুরবাড়িতে চলে গেল। তাকে হারিয়ে মালেকার দুঃখও হল না, আনন্দও হল না। কামালও একদিন ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় চলে গেল কলেজে পড়তে। তাকে হারিয়েও মালেকার কিছু বোধ হল না। কেবল কবে থেকে যে একটা কামনা—অস্পষ্ট দুর্বোধ্য কামনা—ধীরে-ধীরে মনে জেগে উঠেছে, তার জন্য থেকে-থেকে অস্থিরতা বোধ হয়। যেন অন্য কোনো জগতের জন্য মনে স্বপ্ন জাগে, অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে অন্তর।

তাকেও স্কুল ছাড়তে হবে আগামী বছর। আর কখনো হাওয়ায় ভেসে বিয়ের কথা কানে আসে, শুনে তার কান তো লাল হয়ই না, বরঞ্চ মনে কেমন বিরক্তি জন্মে, স্বপ্নে আঘাত লাগে।

তাদের ক্লাসের এক মেয়ে গতবার ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় কলেজে পড়তে গেছে। সে ভাবে যে, সে-ও তেমনি যাবে, কিন্তু সেকথা আজও প্রকাশ করে নাই কারো কাছে। এই জন্যই এক সময়ে হঠাৎ পড়াশোনায় মন দিল। যদি হঠাৎ পরীক্ষায় ফেল হয়ে বসে। গত বছর-তো একটা মেয়ে ফেল হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার গুলিয়ে আসে মন, আবার একটা স্বপ্ন, নিষ্কর্মা কামনা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ওঠে। থেকে-থেকে মনও ভালো যায় না, শান্ত মেয়ে থেকে-থেকে বদমেজাজি হয়ে ওঠে। স্কুলে ছাত্রীদের সঙ্গে ঝগড়া করে, বাড়িতে গুম হয়ে থাকে। একদিন এক বইতে নবাব আলিবর্দী খাঁর মেয়ে ঘাসিটি বেগম ও আমিনা বেগমের মর্মান্তিক শোচনীয় মৃত্যুর কথা পড়ে সারাদিন মন খারাপ হয়ে রইল। অমন করে কেউ কাকে মারতে পারে? কালো নদীতে ডুবিয়ে? ঘাসিটি বিবি ভয় পেয়েছিল, কিন্তু আমিনা পায় নি, শান্তভাবে সে মৃত্যুকে বরণ করেছিল—সেই নিষ্ঠুর মৃত্যু, আর কালো অগাধ পানি নিষ্ঠুরভাবে গ্রাস করেছিল তাদের। সারাদিন থেকে-থেকে মালেকা শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল। বদমেজাজি মনও হঠাৎ বেঁকে উঠল, মিরনের প্রতি ফুলে উঠল ক্রোধে। অবশেষে তার বজ্রাঘাতে মৃত্যুর কথায় তার মন শান্ত হল, প্রতিহিংসার জ্বালার প্রশমন হল। কেবল রাতে একবার স্বপ্ন দেখলে। দেখল যে আমিনা বলছে, কী হবে বোন কেঁদে? একদিন মরতে হবেই, না-হয় আজই মরণ হল। তারপর কালো পানি ফুঁসে উঠল, হিংস্র মানুষের পাশবিক আর্তনাদের মতো মিরনের অট্টহাসির মতো আর ভয়ে ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠল মালেকা। তারপর তন্দ্রায় কি স্বপ্নে একটা মুক্তিশূন্য চেতনা মনে ভারি হয়ে জমে উঠল, যার ভারে চেপে এল সারা বুক। স্বপ্নের জের হিসেবেই হয়তো এরপর ব্যক্তিগত মৃত্যুর ছায়া মালেকার মনে ঘনিয়ে উঠল : কালো কবরের কথা, অন্তহীন মুক্তিশূন্যতার করাল ভীতি স্পষ্ট হয়ে উঠে তার অন্তর দুর্বল করে তুলল। এ-দুর্বলতার ভার যখন অসহ্য হয়ে উঠল তখন একটা কথা মনে হল : মৃদু হাওয়ার মতো নিঃশব্দে ভেসে এল সে-কথা। খোদাকে তোমার ভয় হয়? মুহূর্তের জন্য ভাবল মালেকা, একটা স্মৃতি কেমন অন্তরঙ্গ হয়ে আর নির্ভয় সান্ত্বনায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। তার সারা অন্তর বলল, হ্যাঁ, খোদাকে ভয় হয়, ভয় হয়। তাতে অবশেষে মৃত্যুর কথা তলিয়ে গেল, জাগরণে দুঃস্বপ্নের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

একদিন স্কুলে ঝগড়া বাধল। কালোমতো নাক-উঁচু একটা হিন্দু মেয়ে তার সাথে

কখনো-কখনো গায়ে পড়ে এসে কথা কইত। তাকে কিন্তু মালেকার ভালো লাগত না—তার কথাতে কেমন ঝাঁঝ বলে। সেদিন আবার সে গায়ে পড়ে কথা কইতে এল। বলল,—আচ্ছা ভাই তোদের-তো স্বামীরা চার বিয়ে করতে পারে। তিন সতীন নিয়ে ঘর করবি কী করে?

মালেকা নীরব হয়ে রইল। কথাটা শুনল কি শুনল না। মেয়েটি দমল না, আবার বলল,

—তোর যদি একটা অশিক্ষিত দাড়িওয়ালা লুঙ্গিপরা স্বামী হয়, তাহলে তার সাথে ঘর করতে পারবি?

মালেকা তবুও চুপ করে রইল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মেয়েটি তরল গলায় বলল,

—রাগ করছিস? কিন্তু তোকে ভালোবাসি বলেই ও-সব কথা মনে হয়। তোর মতো অমন সুন্দর মেয়ে—। জানিস, তোকে দেখলে কেউ বলবে না যে তুই মুসলমান—তুই ঠিক আমাদের জাতের মতো।

এবার মালেকা কথা কইল। শান্তভাবে তার পানে চেয়ে ক্রোধে পিষে-যাওয়া কণ্ঠে বলল,

—তোমার সঙ্গে-তো ভাই আমি কথা কইছি না, তুমি কেন গায়ে পড়ে কথা কইছ? একথা জেনো, তোমাদের মতো ছোটলোক আমি নই।

তারপর ঝগড়া বাধল। মেয়েটি নাক উঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলল। শেষে একটি অল্পবয়সী মাস্টারনি এসে সে-ঝগড়া থামালেন। পরে তিনিই মালেকার পিঠে হাত রেখে মিষ্টিভাবে হেসে বললেন,

—তুমি রাগ কোরো না। ছোটলোক বলেছ ঠিক বলেছ। তবে বহুবচনে শব্দটা ব্যবহার করেছ সেটা অনুচিত হয়েছে।

লজ্জায় কান লাল হয়ে উঠল মালেকার। নিচু গলায় বলল,

—আমি সেভাবে বলি নি। কাউকে কোনো অপবাদ দিতে হলে মানুষে বহুবচনেই বলে, তাই বলেছিলাম। জাত নিয়ে কোনো কথা বলি নি। তবে আমি অন্যায় করেছি, কিন্তু মেয়েটি যা-তা বলছিল।

—কিন্তু অমন মেয়ের ওপর রাগ করতে নেই। তুমি তার চেয়ে বড়।

উদারচেতা সঈদা মেয়েটি এক ক্লাস নিচে পড়ত। ছুটির ঘণ্টা পড়তে সে একবার মালেকার কাছে এল, এসে সুরটা একটু কঠিন করে বলল,

—এসব বিশ্রী কথা তোল কেন? ছি, এতে ওরা আমাদেরই আরো ছোটলোক ভাবে।

মালেকার চোখে হঠাৎ ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে। অন্য সময়ে হলে আবার তার মাথা গরম হয়ে উঠত, কিন্তু এখন সে কিছুই যেন বোধ করল না। শেষে বাসায় ফিরতে-ফিরতে বহু দেরিতে কথাটির মর্মার্থ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল, এবং এবারো ক্রোধ না হয়ে কেবল হতাশায় মন ভারি হয়ে উঠল, আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা নিঃসঙ্গতার চেতনায় সারা অন্তর মুষড়ে এল। কোথাও কেউ নেই, যার চোখের দীপ্তিতে তার নত মাথা খাড়া হয়ে উঠতে পারে, যার দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে কালো ছায়াচ্ছন্ন সব—শক্তিতে ও বিশ্বাসে। বিশ্বাস ভেঙে গেছে বহুদিন হল। অন্যের বিশ্বাস নেই, নিজেরও নেই। বিশ্বাস সৃষ্টি করতেও আসছে না কেউ।

সেদিন রাতে অনেকদিন পর আবার সে কাঁদল। কেন, তার অর্থ নেই যেন। আর চেতনারও অলক্ষ্যে যেন এ-কান্না।

আবার মেঘ কেটে গেল। কাটল স্কুলে হঠাৎ নতুন নেশায়। অল্পবয়স্কা সে-মাস্টারনিটির সঙ্গে তার ভাব হল, পাখির পালকের মতো উষ্ণ নরম ভাব। মিষ্টি মুখ তাঁর, ঝকঝকে মধুর হাসি, কিন্তু তবু অসংযত হয়ে কথা কইতে ভয় হয়। সে-ভয় শ্রদ্ধার। স্কুলে কানাঘুষা হয় যে তিনি কাকে ভালোবাসেন। সে-কথা মিথ্যে যদি হয়েও থাকে তবু বিশ্বাস করতে চায় মালেকা। এমন মেয়ে ভালো না বাসলে কে তবে বাসবে?

একদিন কিন্তু নিরিবিলিতে মালেকা প্রশ্ন করল,

—তিনি কে?

মাস্টারনি অবাক হলেন। একটু সময় নিয়ে মালেকার চোখের পানে চেয়ে প্রশ্ন করলেন,

—কে তিনিটি?

মালেকা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, বুক কেঁপে উঠল ভয়ে আর আবেগে। মহিলাটি আবার কয়েক মুহূর্ত তার মুখের পানে চেয়ে শেষে বললেন,

—তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে। তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। থেমে বললেন, কিন্তু লজ্জার কিছু নেই। তোমাকে আমি চিনি, তোমার সঙ্গে এ-নিয়ে আমার আলোচনা করতে বাধবে না। বয়সে তুমি ছোট, কিন্তু তাতে কী? তোমার মতো বয়সে আমার কাছে প্রেমটা ছিল স্বর্গের মতো ব্যাপার। ওকে কল্পনা করতাম, শ্রদ্ধা করতাম। আসলে ওতে লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু কী জান, প্রেমে মানুষবিশেষে নানা রূপ ধারণ করে। তবে আমার কাছে ওটা ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়। ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়ে ওর ক্ষেত্র। যে-লোকটা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনকে তিলে-তিলে ক্ষয় করছে তাকে ভালোবাসা দায়িত্ব, সে-ভালোবাসায় স্বার্থ থাকতে পারে না।

মালেকা তাকিয়ে রইল, দিগন্তের ছায়া পড়ে চোখে যে-অস্পষ্টতা জন্মায়, তেমনি সুদূর অস্পষ্টতা তার চোখে। অথবা হয়তো অন্তরের নিঃসঙ্গতার ছায়া তাতে প্রতিফলিত হয়েছে। এবং সে-রাতে ঘুমোতে গিয়ে ঘরের হালকা অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ জেগে রইল আর কোরানের একটা সুরা ঘুরে-ঘুরে মনে আসতে লাগল, যাতে অবশেষে মনে শক্তি এল। কিন্তু শেষে সে অনুভব করল যে শুধু শক্তি এলেই হল না, শক্তিরও একটা খুঁটির দরকার হয় বাঁচবার জন্য, দীর্ঘ সময় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য। মনের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে আবার সে সুরা পড়তে লাগল, বারে-বারে, চোখ বুজে, রুদ্ধ আবেগে : পড়তে-পড়তে হলছলিয়ে উঠল চোখ, অকারণ অভিমানে টলোমলো হয়ে উঠল সারা প্রাণ। কিন্তু হঠাৎ আবার একটা কথায়, একটা কথায় সব তলিয়ে গেল, সব শূন্য হয়ে উঠল : মালেকা তোমাকে মুসলমানের মতো দেখায় না। শেষে অন্তর তার ক্রোধে আগুন হয়ে উঠল, ঠোঁট কেঁপে উঠল হিংস্র আবেগে। মন বলল, আমি জানি, আমি জানি সে-কথার অর্থ। মুসলমানরা বীভৎস; পেটে অন্ন নেই বলে, মনে বল নেই বলে। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যে-কুষ্ঠী খোদার নাম করে ভিক্ষা চায়, তাকে আর কিছু না হোক মুসলমানের মতো দেখায়; যে-চাষা শীর্ণ বুক নিয়ে সরু কোমরে ছেঁড়া লুঙ্গি জড়িয়ে মহাজনের হাতে টাকা তুলে দেবে বলে আকাশের পানে চেয়ে খোদার কাছে বৃষ্টি চায়, তাকে আর কিছু না হোক মুসলমানের মতো দেখায়। আর মালেকাকে মুসলমানের মতো দেখায় না যেহেতু সে দলশূন্য, যেহেতু তার মাথা উন্নত এবং সে খেতে পায়। কালোমতো নাকউঁচু সে-মেয়েটি ভুল বলেছে, কিন্তু অন্যায় বলে নি।

রাতটা হঠাৎ স্তব্ধ ঠেকল : পাথরের মতো স্তব্ধ। শীতের রাতে আকাশে কথা নেই, কেবল সে-আকাশ ধোঁয়াটে হয়ে রয়েছে। মুহূর্তগুলো তবু কাটে, কখনো চেতনার সংঘর্ষে দীপ্ত হয়ে ওঠে, কখনো ম্লান হয়ে, মুষ্টিচ্যুত হয়ে। এরই মধ্যে তারপর আরেকটা কথা মালেকার মনে জাগল, মহাদিগন্তের দূরত্ব থেকে স্বপ্নের মতো আবছায়ায়, আলগোছে এল সে-কথা। মালেকা সুন্দর হয়ে উঠেছে, না? শুনল কথাটা মালেকা, মুহূর্তের জন্য মুগ্ধ হয়ে। তারপর নতুন আলোয় সে নিজেকে দেখল। হ্যাঁ, মালেকা সুন্দর। একদিন এক মাতাল বলেছিল সেই প্রথম। তারপর এ-সে অনেকে বলেছে। কিন্তু সে মালেকার অন্তরে কেবল জ্বালা, নিঃসঙ্গতা আর কিসের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা; তাছাড়া একটা অসহ্য স্বপ্ন, যার শাণিত তীক্ষ্ণতায় সে-সুন্দর মালেকার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়। কেমন তার চোখ? গভীর, কালো। কিন্তু রিক্ত, হতাশায় শূন্য। সুন্দর চোখ কি এমন হয়? মালেকার দেহ হালকা, দীর্ঘ। কিন্তু তাতে শক্তির বিকাশ নেই, সহায় নেই বলে তার প্রকাশ দুর্বল। সুন্দর দেহ কি এমন হয়? কিন্তু মালেকার তাতে দুঃখ নেই কারণ একদিন একদল লোক আসবে, যাদের কথা এতদিন শুনেছিল কান্নায় আর গোঙানির সুরে, এসে বলবে : আমরা এসেছি। অনেক কষ্টশ্রম করে এসেছি বলে দেহ এখনো ক্ষতবিক্ষত, এখনো

আমরা সম্পূর্ণ সভ্য হবার উপযুক্ত হই নি, তবু এসেছি। তোমরা একা ছিলে বলে এতদিন তোমাদের ওরা ভুল করত, পরিচয় না দিলে চিনত না, এবার আর তারা ভুল করবে না। হয়তো তোমাকে জানবে তোমার নামে, কিন্তু তোমাকে তুমি বলে ঠিক চিনবে। তখন মালেকা বলবে যে, ওরা ভুল করে ভাবে ও সুন্দর, আসলে সে সুন্দর নয়, ওর দেহ তাদের মতো ক্ষতবিক্ষত। তবে একাকী ছিল বলে এতদিন নকল হয়ে ছিল। কিন্তু আজ তাকে সত্যরূপে চিনবে, কালোমতো নাকউঁচু মেয়েটি নীরব হয়ে যাবে, তাকে দেখে। আর ভুল করবে না, কেবল হয়তো বলবে যে, সুন্দর নয় বটে তবে সে মুসলমান। সঙ্গে-সঙ্গে সেই সঈদা নামে মেয়েটিও পথ খুঁজে এ-জমায়েতে এসে যোগ দেবে। তখন আর সে মালেকাকে নির্বোধ ভাববে না, নিজেও এমন বোকাভাবে ভাববে না যে, মেয়েটির অন্তর পরিষ্কার নয় যেহেতু সে ভুলতে পারে না যে মুসলমান, এবং তার ভুল ভাঙবে। যে-ভয়ে এতদিন নিজের কাছেই নিজে পালিয়ে থাকত সে-ভয় কেটে যাবে। এতদিন আত্মপরিচয়ের কথা উঠলেই সে শংকিত হত এই ভেবে ঘাঁটাঘাঁটি করলেই বেরিয়ে যাবে যে, তারা নিরানব্বই জন লোক খেতে পায় না, সভ্যতার আলো নেই তাদের মধ্যে, তখন তার সে-ভয় কেটে যাবে। তাদের কথা উঠলেই যে-মেয়ে সে-কথা চাপা দিত লজ্জায় আর দুর্বলতায়, সে এবার একাকী নয় দেখে মাথা তুলে দাঁড়াবে, কোনো প্রশ্নকে আর ভয় করবে না।

রাত্রির অন্ধকারে মালেকা হঠাৎ হাসল নিঃশব্দে। যেন কেবল অন্তরের হাসির সামান্য একটু উপচে পড়েছে বাইরে। কিন্তু স্বপ্ন হল স্বপ্ন, তার যেমন হঠাৎ সব আলো হয়ে ওঠে তেমনি হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে যায়। আবার একটা নিঃসঙ্গতায় মালেকার অন্তর শূন্য হয়ে উঠতে লাগল, বিস্তারে তীক্ষ্ণ বেদনা দিয়ে।

চোখ বীভৎস, শূন্য। নাম কী তোমার? মালেকাকে চেনে না। আশ্চর্য, সে-ও চেনে না। সন্দেহ ঘোর পাকিয়ে উঠল তার চোখে। শেষে গা চুলকে একবার থুতু ফেলে বললে, ছমিরুদ্দি। ছমিরুদ্দি মিঞা দু-দিন খায় নি, পোষ্যদের কথা ছেড়েই দিলাম।

মালেকা তাদের চেনে। কারণ তাদের রক্ত তার দেহে। সেজন্যই তাদের ভার অসহ্য। মালেকা সঈদা এরা কারা—যারা এখানে-সেখানে দু-একটা ছড়িয়ে আছে, নিঃসঙ্গ হয়ে, দলচ্যুত হয়ে? কিন্তু তবু যারা নিচে রয়েছে কেবল তাদের রক্তের টান পড়ে এদের রক্তে আর তখন মনটা কেমন করে ওঠে। সঈদা সেটা উপেক্ষা করে, কিন্তু মালেকা পারে না, কারণ তার মনেও তারা বিভীষিকা জাগায়, স্বপ্নে এক নতুন জগতের প্রলোভন দেখায়।

যে-পরিবারে মালেকা না-এলেও পারত, সে-পরিবার ছেড়ে সে প্রথম বের হল। কলেজে পড়তে কলকাতায় এল। হোস্টেলে যাবার আগে কয়েকদিন চাচার বাসায় তাকে থাকতে হল, কিন্তু প্রথম দিনেই হাঁপিয়ে উঠল, নতুন মুক্তির স্বাদ বিস্বাদ হয়ে গেল। বাসাটা খুব ছোট, কিন্তু তাতে নয়। আসল কারণ এ-বাড়ির কড়া পর্দা। জানলায় আগাগোড়া পর্দা এবং বৈঠকখানার পর্দাটা হাওয়ায় উড়লে ভেতরে খানিকটা দেখা যেতে পারে বলে তার সামনে আবার কাঠের পার্টিশন বসানো। ঘরে মেয়ে দুটো : রহিমা আর হোসনা। তাদের মন আইঢাই করে, বাইরের আলোর জন্য প্রাণ আকুল হয়ে থাকে। এবং সে-আলো দেখবার সুযোগ পায় না বলে এবং স্বাধীনতার কামনাকে দমিয়ে রাখা হয়েছে বলে ওদের চোখে এমন বীভৎস দৈন্য যে তাকিয়ে মালেকার চোখ আহত হয়। কখনো-কখনো, তাদের আব্বা যখন ঘরে থাকেন না তখন, ওরা বাইরের ঘরে আসে, এসে জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে রাস্তার পানে চেয়ে থাকে। রাস্তাটা গলি, কলকাতার বড় রাস্তার বিচিত্রতা তাতে নেই। কিন্তু মেয়েরা এতেই সন্তুষ্ট, এটার তবু অন্য ধারটা খোলা কাজেই যাতায়াত হয় এর ভিতর দিয়ে। আগে যে-বাড়িতে তারা ছিল সেটা ছিল কানা-গলির মধ্যে।

একদিন চাচার রাগের গলা শুনল মালেকা। ঘর ছোট, তার মধ্যে তাঁর মোটা গলার

আওয়াজ আঁটে না যেন। কাছে গিয়ে কিছু বুঝল না সে, দেখল হোসনা আর রহিমা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু একটু পরে ব্যাপারটা বুঝল। চাচা বাইরে থেকে আসছিলেন এবং আসতে-আসতে জানলার পানে নজর পড়তেই দেখলেন কে যেন সেখানে দাঁড়িয়ে।

—বল, কে দাঁড়িয়েছিল?

ওরা চুপ। বড়টার নাম হল রহিমা। ও চালাক তবু, কিন্তু ছোটটি, হোসনা, যেমন তার বোকাটে চেহারা তেমনি সে সোজা। এক একবার বাপের গলার আওয়াজে চমকে চোখ তুলে তাঁর পানে চাইছে, শেষে আপার পানে তাকিয়ে তাকে নত চোখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেও আবার চোখ নত করছে।

অবশেষে এতক্ষণ নীরব থেকে এত প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে সেই হোসনাই হঠাৎ কেঁদে উঠল, কেঁদে বলল,

—আমি দাঁড়িয়েছিলাম, আব্বা।

রহিমা পলকের জন্য তাকাল বোনের পানে, ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে। কিন্তু বোনটি যখন বাপের হাতে চড় খেল তখন কিন্তু আর তাকাল না, আস্তে পাশের ঘরে চলে গেল। আর হোসনা চড় খেল, চড় খেয়ে কেবল তার ফরসা গাল ঈষৎ লাল হয়ে উঠল। তবে লজ্জায় নয়। এ-বাড়িতে লজ্জা নেই : কারণ কেউ এখানে মান শেখায় না। চড় খেয়ে সে ভাবল যে এবার মামলা শেষ হল, বোনের মতো তাই আস্তে সেও সরে গেল পাশের ঘরে। সবার সামনে চোখ মুছল না, আড়ালে গিয়ে মুছবে।

ওদের আম্মা ছায়ার মতো দাঁড়িয়েছিলেন। তার পানে এবার মালেকার চাচা তাকিয়ে উগ্রভাবে বললেন যে, তাঁর মেয়েকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দিতে, কারণ আবার যদি তিনি এরকম বেশরমের মতো কাজ করতে দেখেন তাদের কাউকে, তাহলে তাকে তিনি আস্ত রাখবেন না। মুসলমানের বাড়িতে এরকম বেহায়াপনা সহ্য হয় না। ক্রোধ তখনো তাঁর শান্ত হল না। তাই এবার রহিমার ইচ্ছাকৃত নীরবতার কথা মনে পড়ে গিয়ে তাঁর একটা সন্দেহ হল। কিন্তু সন্দেহটা স্পষ্ট নয় বলে কেবল বললেন,

—তোমার ঐ বড় মেয়েটা মিচকি শয়তান।

মিচকি শয়তানের মা কথাটা সমর্থন করলেন। বিশ্বাসে নয়, ভয়ে। তারপর শান্ত হলেন তিনি।

কিন্তু ওদেরও মনে কামনা, স্বপ্ন। বাপকে তারা ভয় করে, খোদাকেও। কিন্তু লোভের তাড়না সহ্য করা যায় না সব সময়। বাইরের ঘরে না হলেও ভেতরে রয়েছে। পাকের ঘরের পাশে খোলা জায়গাটায় চট-টাঙানো বটে তবে তাতে দু-স্থানে ফুটো। সে-ফুটো দিয়ে ওরা তাকায় পাশের বাড়ির পানে, তাকিয়ে ক্ষুধার্তের মতো দেখে অন্যের মুক্ত জীবন।

তাদের এ-কাঙালপনা দেখে মালেকার মন কিন্তু কালো হয়ে উঠল, বেদনায় আর লজ্জায়। এদের তিলে-তিলে ধ্বংস করা হচ্ছে, ক-দিন পরে আর সুস্থ মানুষ থাকবে না। হোসনাটা কিন্তু সত্যিই বোকা। বলে, মুসলমানের মেয়ে কি বেপর্দা হতে পারে? অথচ পর্দার বাইরে যে-জগৎ তার জন্য মহা-আকুলতা মনে। মনটা তাদের বিফল হয়ে যেতে আর ক-দিন লাগবে?

ওদের ভাইটির কিন্তু সাত-খুন মাপ। এখনো স্কুলে পড়ে, কিন্তু বিড়ি টানে, মাথাভরে চুল রাখে, বইয়ের পাতায়-পাতায় সিনেমায় নারীদের ছবি লুকিয়ে রাখে, আর বাপের অনুপস্থিতিতে চোখে একটা অদ্ভুত আবেশ সৃষ্টি করে সিনেমায় শেখা মহব্বতের গান ধরে। এদিকে বিড়ি ছাড়া খাদ্যে নেশা নেই বলে দেহে মাংস নেই, হাড়গুলো লিকলিক করে। কোনো অন্যায় কাজে ধরা পড়লে তার আব্বা তাকে মারাটা কর্তব্যবোধ করেন বটে তবে না-খাবার জন্য একটি কথা বলবারও প্রয়োজন বোধ করেন না।

একদিন মালেকা ওর টেবিলে একটা বই পেল। সস্তা প্রেমের কাহিনী। খুব রস করে

পড়ছে বোঝা গেল, কারণ পড়ে সে পাতায়-পাতায় মন্তব্যও করেছে, এবং মন্তব্যের স্থানগুলো নিরানব্বই ক্ষেত্রে অশ্লীল অংশ। রহিমা তখন পাশে ছিল। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল,

—বইটা ভালো মাকাবু, আমি পড়েছি। তুমিও পড় না।

মালেকা তাকাল তার পানে, কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। একটু পরে বলল,

—এ সব ন্যাংটা মেয়েদের ছবি কি চাচা দেখেন না?

—না।

—কিন্তু তুমি তাঁকে এ-কথা বলে দাও না কেন?

—বাপ্‌রে, তাহলেই হয়েছে, আব্বা তাকে মেরে গুঁড়ো করে ফেলবেন। ওকে মারলেই কষ্ট হয়, এক ভাই কিনা! আম্মাকে কিন্তু বলেছি। তবে আম্মাও তাঁকে বলতে ভয় পান।

মালেকা আর কিছু কইল না। কেবল যখন ছবিগুলো বইয়ের ভাঁজে-ভাঁজে রেখে দিল তখন মনে হল সারা মনে কেমন একটা তিক্ততা ছড়িয়ে পড়েছে, জিহ্বায়ও তার স্বাদ।

কামাল বিকেলে একবার করে রোজ বোনকে দেখতে আসে। আজ যখন ও এল মালেকা বহুদিন পরে তাকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে দেখল। অনেক বড় হয়েছে ভাইটি, চেহারা দেখে এবার বড় ভাই বলে মনে হয় যেন। তবে খুঁটিয়ে দেখলে এখনো তার মুখের নির্বোধ নিরীহ ভাব নজরে ধরা পড়ে। জীবনে তার স্বপ্ন নেই, অব্যক্তব্য বিচিত্র কোনো স্বপ্নের স্পন্দন নেই তার চেতনায়—যার স্পর্শ থেকে-থেকে মালেকার অন্তরে আগুন ধরিয়ে দেয়। একটু সমবেদনা হল ভাইয়ের জন্য, আর আফসোস হল নিজের জন্য। কিন্তু পরক্ষণে ভাবল যে এই ভালো, দীপ্তি নেই তার ভাইয়ের এই কথা ঠিক, কিন্তু সে খাঁটি মানুষ : স্বপ্নের তাড়না নেই, কিন্তু সে মিথ্যে কথা কয় না, অন্যায় পথে চলে অন্যের খারাপ করবে না নিজের ভালোর জন্য। তাছাড়া হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই, অন্যের ভালোয় তার অন্তরে জ্বালা ধরে না। মানুষ তাকে হয়তো নির্বোধ বলে তুচ্ছ করবে, হেয় জ্ঞান করবে, কিন্তু তারা এ-কথা বুঝবে না যে, বুদ্ধি-দীপ্তির ত্যাগ স্বীকার করে এ-মানুষ লোকের চোখের অন্তরালে খাঁটি মানুষ হয়েছে।

আজ হঠাৎ স্নেহ উথলে উঠল মালেকার। বলল,—হোস্টেলে ভালো খেতে দেয় না, না ভাই? তুমি তাই অনেক শুকিয়ে গেছ। স্নেহের কথায় ওরা কেউ অভ্যস্ত নয়, কামালও নয়। অভ্যস্ত নয় বলে সে-কথা সহজভাবে নিতে পারে না। তাই প্রথমে আমতা-আমতা করে শেষে হঠাৎ বিস্ময় প্রকাশ করে কামাল বলল,

—কে বলে আমি শুকিয়েছি?

—না, তুমি অনেক শুকিয়েছ। মালেকার অন্তর ছলছল করে উঠল একটা অস্পষ্ট বেদনায়।

সন্ধ্যার সময় তার মনে বেদনা, রাতে আবার জ্বালাময় বিরক্তি। মধ্যরাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙলে মালেকার কানে এল পাশের ঘরে চাচা কেমন ফিসফিস করে কথা কইছেন। কেন কে জানে তার কাছে, সে-আওয়াজ অশ্লীল শোনাল, কুৎসিত ঠেকল। চাচিও যে থেকে-থেকে কথা কইছেন রুগ্‌ণ বেমারির মতো, তাও তেমনি ঠেকল। পালাবার জন্য যেন সে ঘরের পানে তাকাল : ছোট ঘর, কয়েদখানার মতো। ও-পাশে রহিমা হোসনা ঘুমিয়ে, তাদের মধ্যে নিশ্চলতা। কিন্তু কয়েদখানায় যেন প্রাণ আছে। মানুষ পিষে ফেলার প্রাণ আছে। এ নিপীড়ন-করা চেতনা থেকে মালেকা মুক্তি পাবার চেষ্টা করল। ভাবল আকাশের কথা, বাড়ির কাছে নদীটার বিস্তৃতির কথা, কিন্তু সাপের আওয়াজের মতো চাচার কণ্ঠ তাকে কেবল কাঁটা-কাঁটা করে তুলতে লাগল। এক-সময়ে সে কানে আঙ্গুল দিল। কিন্তু কানে আঙ্গুল দিয়ে বাইরের আওয়াজকে ক্ষীণ করা যায় বটে তবে একেবারে ঢাকা যায় না : তাছাড়া সে-আওয়াজ যেন মালেকার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত নেই যে সে ছাতে উঠে যাবে, খোলা বারান্দা নেই যে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে। অস্থির হয়ে উঠল মালেকা।

বহুক্ষণ পর পাশের ঘরের আওয়াজ যখন থামল তখন হঠাৎ মালেকার মনে হল যে, এতক্ষণ খালেবিলে স্রোতের বিরুদ্ধে ঠেলে সে যে-উন্মুক্ত ঢালা মোহানায় পৌঁছুবার চেষ্টা

করছিল, এবার সে সে-মোহানায় পৌঁছেছে, দূরে খোলা দিগন্ত। পাশে হোসনার পানে একবার সে তাকাল। গাঢ় ঘুমে তার নির্বোধ মুখ আরো নির্বোধ হয়ে উঠেছে, আবছা অন্ধকারেও তা ঢাকা পড়ে নি। এত নির্বোধ ভাব যে তাকিয়ে মালেকার মন 'আহা' করে উঠল। একটু পর আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল।

এর দু-দিন পরে মালেকা হোস্টেলে চলে এল। নতুন এসে তার খুব ভালো লাগল, পাখির মতো হালকা হয়ে উঠল মন। মনে হল নতুন জগতে এসেছে। নতুন এক আবহাওয়ায়, যে-আবহাওয়ায় নিজেকে এবার সে চিনবে। মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হল, কারো সঙ্গে কথা বলল, কাউকে অকারণে এড়িয়ে গেল।

একদিন কলেজ বসবার আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে সামনের মাঠের পানে চেয়ে দেখছিল। ঘাসগুলো সবুজ, তাছাড়া ও-পাশে কলেজের দালানে সূর্য দিনের এমন সময়ও বাধা পায় বলে মাঠের খানিকটা অংশে গাঢ় ছায়া। এই সময়ে বাস আসে, মেয়েদের নিয়ে। কালো, মস্ত বাস। কিন্তু তার দু-পাশে জানলায় কালো পর্দা ঝোলানো। যেন সে-বাস বন্দিদের নিয়ে আসে এক কয়েদখানা থেকে আরেক কয়েদখানায়। কিন্তু এ মেয়েরাই যখন ক্লাসে এসে বসে বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দল পাকিয়ে কথা কয় তখন তাদেরকে দেখে মনে হয় না তারা অমনি বন্দি হয়ে এসেছে, আবার বন্দি হয়েই ফিরে যাবে। তাদের শাড়ি ঝলমল করে, কারো মুখে-চোখে আবার জলুস। মালেকা হঠাৎ ভাবল যে দুনিয়াতে সবচেয়ে খারাপ যদি কিছু থাকে তবে তা হল কুসংস্কার, আর সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী হল ভালো কথার বিধিব্যবস্থা। মিথ্যে কথা বলা গুনাহ্ তাই তা নিষিদ্ধ, কিন্তু নিরানব্বই জন মানুষের মুখে মিথ্যে কথা আটকায় না। অথচ সে-মানুষেরাই আবার কোনো কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করবে না, এমন কি তার বিরুদ্ধে একটা সন্দেহের প্রশ্নও তুলবে না। এ-সব মেয়েদের বুদ্ধিমত্তায় কোনো দোষ নেই, কিন্তু এ-কথা তাদের মাথায় খেলবে না যে, এমনি ভূতের মতো কালো পর্দায় লুকিয়ে আসাটা কী অমানুষিক আর কী হাস্যকর! নিশ্চয়ই একদিন এ-কুসংস্কার কেটে যাবে এবং এদের নাতনি বা তারও এক-দুই পুরুষ পরের মেয়েরা এদের এ-প্রকার কথা পড়বে আর হাসবে।

বাস তখনো আসে নি। একটি মেয়ে এবার আস্তে পাশে এসে দাঁড়াল। ওকে দেখেছে মালেকা, কিন্তু আলাপ করে নি। আজ ও গায়ে পড়ে কথা কইল। বলল,

—আপনি কখনো বুঝি হোস্টেলে থাকেন নি?

মুখ ফিরিয়ে ওকে একবার চেয়ে দেখল মালেকা, তারপর বলল,

—না।

—আমি কিন্তু সেই ছোটবেলা থেকে কেবল হোস্টেলেই থাকছি। এমন কপাল। কিন্তু মাঝে-মাঝে হোস্টেল ভালো লাগে।

মালেকা কিছু বলল না। সে-মেয়েটিও শেষে নির্বাক হয়ে গেল।

কিন্তু এ-মেয়েটির সঙ্গেই ক-দিনের মধ্যে মালেকার ভাব জমে গেল। নাম তার নাজমা সুলতানা। মেয়েটি হালকা পাখির মতো, আর চোখে কেমন তরল দীপ্তি। আর তার কথাগুলো ঝরঝরে, প্রাণের তাপে উষ্ণ। একদিন ও হঠাৎ বলল,

—তুমি সুন্দর।

—তুমিও। বলে মালেকা অকারণে হাসল। তারপর হাসি মিলিয়ে যাবার আগেই আবার বলল,

—আচ্ছা, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

—আমাদের বাড়ি নেই। বলে খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি।—আমরা বেদুইন।

—মানে?

—মানে সোজা। আব্বা সরকারি চাকুরে। সরকারের হুকুমে কেবল এ-ধারে ও-ধারে

ঘুরে বেড়াতে হয়। বাড়ি কখনো দেখি নি। নেই-ই বোধহয়। আবার নাজমা হেসে উঠল।

কিছু বিস্মিত হল মালেকা। বলল,

—তবু-তো মানুষের একটা বাড়ি থাকে!

শেষে মেয়েটি গম্ভীর হল, চোখের কম্পমান দীপ্তি কিছু শান্ত হল। বলল,

—আসল কথা, আমার দাদারা খুব গরিব। বাবা কষ্ট করে লেখাপড়া করে বড় হয়েছেন। আম্মারা কিন্তু বরাবর বড়লোক। আমাদের সঙ্গে বনবে না বলেই হয়তো আব্বা তাঁর বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখেন নি। আমরা নানার বাড়ি যাই, দাদার বাড়ি যাই না।

—ওরা কেউ আসেন না?

—না। থেমে আবার বলল, কেবল একজন আসে। সে হল চাচাতো ভাই। তাই এমনিতে আসে না, সাহায্যের দরকার হলে আসে।

মালেকা গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল ওর চোখের দীপ্তি কোথাকার? তার আম্মারা বড় মানুষ, হয়তো তাঁদের—

মালেকাকে নীরব দেখে ও আবার কথা কইল।

—তোমাদের বাড়ি কোথায়?

মালেকা বলল, কিন্তু হঠাৎ ভাবিতা হয়ে উঠেছিল বলে আবছাভাবে বলল। মেয়েটি তা লক্ষ্য করল, কয়েক মুহূর্ত পরে বলল,

—তোমার চোখ ভালো, কেমন গম্ভীর। তুমি ভাব বুঝি?

কিছু বিস্মিত হয়ে তাকাল মালেকা, তারপর হঠাৎ হেসে দিল।

—ভাবি? না, কিছু ভাবি না। কিন্তু তুমি মিথ্যে কথা বলছ, আমার চোখ সুন্দর নয়। বরঞ্চ তোমারগুলো সুন্দর, অন্তরঙ্গতায় ভরা। সুন্দর, চঞ্চল, টলোমলো পানির মতো। দেখে অন্যের মন খুলে যায়, ঝকঝক করে ওঠে। থেমে মালেকা আবার বলল,

—তুমি কাউকে ভালোবেসেছ?

মেয়েটি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল, হাসতে-হাসতে তার চোখ ছলছল হয়ে উঠল। হাসির বেগ কিছু কমলে বলল,

—না, বাসি নি। কিন্তু একজন বেসেছিল, তোমার কথায় তার কথা মনে পড়ল।

—তাতে হাসির কী আছে?

উত্তরে আবার হেসে উঠল সে। কিছুক্ষণ পরে বলল,

—ওর কথা মনে হলেই আমার হাসি পায়। আমার জন্য সে চোখে সুরমা পরত, উর্দু গজল মুখস্থ করত, গায়ে আতর মেখে ভুরভুর হয়ে থাকত। আমি কেবল বলতাম, অত দাড়ি রাখেন কেন? শেষে একদিন সে দাড়ি কাটল, কিন্তু বড় চালাকি করে কাটল। খোদাকে তার অসীম ভয় কি বেহেশতে যাবার নেশা, আবার আমার সামনে আধুনিক হবারও ইচ্ছে। কাজেই দাড়ি কেটেও থুতনির কাছে এক ইঞ্চির চার ভাগ রেখে দিল। ভাবটা এই : খোদা যদি ধরে তবে সে উত্তর দেবে, কেন দাড়ি-তো রেখেছি, আর আমরা ধরলে বলবে, কেন দাড়ি-তো কেটেছি!

মালেকা হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে মনে হল এমনভাবে হাসে নি সে কোনোদিন, আর এমন মেয়ের সঙ্গেও মেশে নি কোনোদিন।

—তুমি তো ভারি দুষ্টু। তা মৌলবী মানুষ তোমায় নাগাল পেল কী করে?

—আমাকে আরবি পড়াত। পড়াত ছাই, অদ্ভুত আবেশ নিয়ে কেবল আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। একদিন বললাম, দেখুন অমন করে তাকিয়ে থাকলে এ-পেনসিল দিয়ে চোখ কানা করে দেব। সে বলল, বলল কেমন একটা কুৎসিত আবেশ নিয়ে, যে, দাও দাও—কথা শেষ না করে নাজমা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। শেষে বলল,

—বলতে পারব না কী বলেছে, হাসি পায়।

—তবু তার কাছে পড়তে?

—পড়তাম। কারণ ওকে ভয় হত না। তাছাড়া হাফেজ মানুষ, তবু যা হোক একটা সাহায্য পাচ্ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গেলে হয়তো টানাটানি পড়ত বেচারার।

—আর কেউ বাসে নি?

এবার এ-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নাজমা সোজাসুজি তাকাল তার পানে, তাকিয়ে বলল,

—কেন, তুমি বুঝি ভালোবাস কাউকে, মানে মহব্বত কর?

কথার সুরে ঠাট্টা, এবার সে-সুর মালেকার মনকে স্পর্শ করল বলে হঠাৎ সে চপল হয়ে উঠল। বলল,—না, এখনো কাউকে বাসি নি। তবে মানুষ খুঁজছি।

—পাচ্ছ না বুঝি?

—না। আসল কথা কী জান, আমার মনে অনেক স্বপ্ন; স্বপ্নের পর স্বপ্নের স্তূপ। সে-স্বপ্নের ঘোর যে কাটাতে পারবে সেই আমাকে ভালোবাসবে। আর তেমন মানুষই খুঁজছি।

মেয়েটি হয়তো এমন কথা কারো কাছে শোনে নি, তাই সে যেন বিস্মিত হল সামান্য। হঠাৎ বোকার মতো বলল,

—খুব সুন্দর হবে বুঝি ও?

—ধ্যুৎ! কিন্তু আর-কিছু না বলে মালেকা হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। একবার ও-দিকে তাকাল।

আকাশে সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে উঠছে, কিন্তু সন্ধ্যাটা কেমন অচেনা ঠেকল তার কাছে। এবং তারই মধ্যে হঠাৎ নতুন পৃথিবী, সজাগ পৃথিবীর রক্তে লালচে এ-সন্ধ্যা। তাদের বাড়ির কাছের মোহানার মতো প্রশস্ত নদীর বিস্তৃতি দূরের পাখির অস্পষ্ট গতিতে তার মনে ছেয়ে এল, আর তাই তো হালকা, আবছা হয়ে উঠল চেতনা। কিছুক্ষণ পরে আবার সে বলল, আস্তে-আস্তে, অস্পষ্টভাবে,

—আমার মনে অনেক স্বপ্ন। কাউকে বলি না, কিন্তু জমে-জমে স্তূপাকার হচ্ছে কেবল। এত স্বপ্ন যে হাঁপিয়ে ওঠে প্রাণ। কিন্তু কেউ কোথা থেকে ডাকে না, পথ দেখায় না। কেউ যেন কোথাও নেই। আমিও কী করব জানি না, কেবল স্বপ্নের অন্ত নেই আর সে-স্বপ্নের মুক্তি নেই।

নাজমার চোখের দীপ্তি হঠাৎ মিলিয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে সে বলল,

—তোমার অত কী স্বপ্ন?

—স্বপ্ন হল স্বপ্ন। আমাদের ইসলাম বলে যাই হোক না কেন স্বপ্ন তবু মোবারক। কিন্তু তা-হল ঘুমের স্বপ্ন-কথা। জাগরণের স্বপ্ন যতই আবোল-তাবোল হোক না কেন তা-হল সহস্রবার মোবারক। আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, এসব যেন শিশুর অস্পষ্ট চেতনার মতো—ধোঁয়াটে, রঙিন আর রহস্যময়। তাছাড়া এসব যেন একটা জাতির স্বপ্ন, যে-জাতি নতুন জন্মেছে। মানুষের পুনর্জন্ম হয় না, কিন্তু জাতির হয়। আমরা মরে গিয়েছিলাম ভারতে, মিসরে, আরবে, আলবেনিয়াতে, পৃথিবীর সর্বত্র। আমরা হয়তো আবার নতুনভাবে জন্মলাভ করেছি, কিন্তু কেউ হয়তো সে-কথা জানে না। জানলেও বিশ্বাস করে না। কিন্তু তাদের বিশ্বাস ভেঙে গেছে বলেই তারা কিছু বিশ্বাস করে না—তাতে কী এসে যায়? আসলে আমাদের জন্ম হয়েছে, এবং এই সময়ে আমাদেরকে ঘিরে দুর্বোধ্য স্বপ্ন, যার ভাষা নেই কিন্তু চেতনা আছে, একটা অব্যক্ত চেতনা। তবে আমাকে নিয়ে তোমাকে নিয়ে আসল মুশকিল হল যে, আমরা নিঃসঙ্গ, আমরা নকল, আমরা গুটিকয়েক মাত্র। আমরা হয়তো মনোহারী জিনিসের মতো লোভনীয় কিন্তু আসলে সত্যিই নকল, প্রাণশূন্য। হয়তো আমরা নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, কিন্তু সে তো তোমার ঐ মৌলবীটিও করত, কিন্তু কেন তাকে আমল দিতে না তুমি, তাকে মানুষ বলে ভাবতে না? সে-সব ছাড়িয়ে যে-একটা শক্তি আমাদের ছিল সে-শক্তি আজ নষ্ট হয়ে গেছে। যে-শক্তির বলে সারা দুনিয়ায় আমাদের মাথা উন্নত ছিল, সারা দুনিয়ায় আমরা এক ছিলাম। আজ এ-কথা ঠিক যে মিসর দেশের মুসলমান বাংলাদেশের মুসলমানের

কথা কিছুই ভাবে না, আমরা ধ্বংস হয়ে গেলেও ওদের সামান্য দুঃখ হবে না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ভেঙে গেছে বলেই আমরা এ-কথা মেনে নেই, এর বাইরে আর কিছু কল্পনা করতে পারি না। বিরাট বিশ্বজনীনতা যে রয়েছে আসল ইসলামের এ-শক্তিতে,—যে-শক্তি আজ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সে-শক্তি যে সম্ভব সে-কথায়ও বিশ্বাস নেই আজ। কিন্তু এটা সত্য। আজকাল সত্য না হলেও এর সম্বন্ধে সত্যাসত্যের কথা ওঠে না। আমি আজ নকল, আমার মুখের এসব কথাও নকল মনে হবে, ঠুনকো শোনাবে, যেহেতু আমার মধ্যেও সে-শক্তির অভাব। হয়তো আমার মধ্যে আজ কেবল শিশুর দুর্বোধ্য স্বপ্ন কিন্তু তা তো শক্তি নয়। তাছাড়া সে-শক্তিতে তোমার কি বিশ্বাস হবে যখন তুমি অগণ্য মুসলমান ভিক্ষুকের পানে তাকাবে, পর্দার অন্তরালে রুগ্‌ণ ফ্যাকাসে জীবজাতীয় নারীদের পানে তাকাবে, চাষা, গাড়োয়ান, বিড়িওয়ালা, লম্পট, জোচ্চোর এবং কুৎসিত চেহারার অন্তঃসারশূন্য কাটমোল্লাদের পানে তাকাবে? বিশ্বাস-তো দূরের কথা, লোকে শুনে হাসবে। কিন্তু তবু সত্য। এবং সে-সত্যের শক্তি নয় বটে তবে তার স্বপ্ন আমার মধ্যে।

মেয়েটি অনেকক্ষণ নীরব হয়ে রইল। শেষে আস্তে বলল,

—তুমি অদ্ভুত কথা বল। আর খুব সুন্দরভাবে বলতে পার।

মুখে কথা থাকলেও মালেকার অন্তরে তখন খরস্রোতের মতো কথা বইছে। ঘরে তাদের বেশি কথা কওয়ার রেওয়াজ নেই, তাই অন্তরে হয়তো অনেক কথা জমে আছে বছরের পর বছর—স্তূপাকার হয়ে, যার সামান্য আজ অকস্মাৎ বেরিয়ে এল। এমন অকস্মাৎ আর আলগোছে বেরিয়ে এল বলে সে কথা-কয়েছে বলেই মনে হল না, যেন কেবল ভাবছেই, যেমন সদাসর্বদা ভাবে নীরবে, নির্বাকভাবে। মালেকা মেয়েটির মন্তব্যে কোনো উত্তর দিল না।

রাতে আবার নাজমার সঙ্গে দেখা হল। প্রথমে মনে হল সে হাসছে, আর হাসতে-হাসতেই যেন বলল সে—আমার কান্না পাচ্ছে। তারপর তার হাসির সুর কেমন কান্নার মধ্যে মিলিয়ে গেল। মালেকার অন্তর হঠাৎ নরম হয়ে উঠল। মেয়েটাকে তার সত্যিই খুব ভালো লেগেছে। সস্নেহে বলল,

—কাঁদছ কেন?

নাজমা তখন বিছানায় শুয়ে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজেছে, কোনো উত্তর দিল না। মালেকা কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, তারপর তার ওপর ঝুঁকে কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করল,

—কেন কাঁদছ?

মেয়েটি কেবল ঈষৎ মাথা নাড়ল, কিছু বলল না। শেষে একসময় আপনা থেকেই মুখ তুলল, তুলে সজল চোখের মধ্যেই আবার হেসে বলল,

—বাড়ির জন্য মন কাঁদছে। আব্বার জন্য। আব্বার অত্যন্ত আদুরে আমি। স্নেহ-বেদনায় ছলছল করে উঠল মালেকার বুক। হঠাৎ ওর ওপর উপুড় হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল,

—কী আদুরে মেয়ে তুমি, ইস!

নাক উঁচু করে নাজমা বলল,

—আদুরে মেয়ে, একশো-বার আদুরে মেয়ে, হ্যাঁ। আদুরে হয়েছি কেন?

—হ্যাঁ, আদুরে হয়েছ চুমু খাবার জন্য। বলে মালেকা তাকে চুমো দিল, আর তার অন্তরে স্নেহ টলমল করে উঠল। মেয়েটি খুশি হল, মিষ্টি হাসিতে মুখটি মধুর হয়ে উঠল। একটু পরে হঠাৎ প্রশ্ন করল,

—তাঁদের জন্য তোমার মন জ্বলে, না?

জ্বলে কী? মালেকা ভাবল, তারপর বলল, না। আমি তো আর তোমার মতো আদুরে নই। আমাকে তারা নির্দিষ্ট করেন নি, আমাকে আমার মধ্যে নিঃসঙ্গ করে ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে হারানো শক্তির সন্ধান পেতে পারি, যাতে অনেক মানুষের জন্য ভালোবাসা মনে জাগে, যাতে নিজের একাকিত্বে নিজের দৈন্য দেখতে পাই।

কয়েক মুহূর্ত পর আস্তে নাজমা বলল,

—তুমি চমৎকার কথা বল।

মালেকা কোনো উত্তর দিল না, কিন্তু কথাটা এবার কানে গেল। তবে চোখ দেখে মনে হয় না যে, আত্মপ্রশংসায় তার কোনো পুলক হয়েছে। কিন্তু নাজমা যা বলেছে সে-কথা যদি সত্যিই হয় তবে সে এক কাজ করবে। বড় হয়ে, আরো বড় হয়ে সে বক্তৃতা দেবে। দেশে-দেশে বক্তৃতা দেবে। যারা জেগে নেই বা দু-চারজন যারা তার মতো স্বপ্ন দেখবে তাদের মনে শক্তির আগুন জ্বালিয়ে দেবে, আর যারা কিছুতেই বিশ্বাস করে না তাদের মনে বিশ্বাসের শক্তি দেবে। তার মানুষরা হয়তো তখনো তাকে নিজের লোক বলে চিনবে না, তার কথায় বিশ্বাস করবে না। কিন্তু শেষে করবে। কারণ তদ্দিনে তার স্বপ্ন কেটে যাবে, শক্তি আসবে মনে। সে-শক্তি ছড়িয়ে পড়বে, এবং সে-শক্তির জোরে তারাও উঠে আসবে, ওরা আর নিঃসঙ্গ থাকবে না। নাকউঁচু কালো মেয়েটি আর তাকে ভুল বুঝবে না, তাছাড়া সেদিন ট্রেনে যে-ফকিরটাও তাকে চিনতে পারল না তাদের লোক বলে, সে তখন চিনবে। কারণ সে-ও আর সকলের সঙ্গে উঠে আসবে ওপরে। ভাবতে-ভাবতে মালেকার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, আর চোখে ঝলক এল।

কিছুক্ষণ পর সে নাজমার পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,

—তখন যে তুমি বললে কথাটা, তা সত্যি কি?

কিন্তু নাজমা ঘুমিয়ে পড়েছে; গাঢ় ঘুম চোখে, আর মুখটি শিশুর মতো হয়ে উঠেছে।

মালেকা কিন্তু আহত হল না। অন্তরে তার ঝড়, এ-ঝড়ের মুখে উড়ে যায়।

অগ্রহায়ণ ১৩৫৫ নভেম্বর ১৯৪৮

সতীন

স্যাঁতস্যাঁতে দিনে মনটাও কেমন ভিজে-ভিজে হয়ে ওঠে। কেবল বৃষ্টি আর বৃষ্টি, ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটছে সর্বক্ষণ, তবু মেঘের যেন অন্ত নেই। কাছারির ওধারে বড় পুকুরটা কানায়-কানায় টলোমলো; আর ওধারের কাঁচা রাস্তাটায় কাদা ছাড়া কিছু নেই। কখনো একটা কিংবা দুটো জানলা-তোলা গাড়ি যাবে, অথবা একটা-দুটো লোক। কারো ছাতি আছে, কারো নেই। কিন্তু জুতো নেই কারো পায়ে। কাদা আর পানি রাস্তায়, জুতো সেখানে চলে না, খালি পায়েও অতি সাবধানে পা টিপে-টিপে চলতে হয়—পিচ্ছিল কাদায় একবার পিছলে গেলে দেহের আর কিছু থাকবে না।

খড়খড়িটা তুলে করিমন পথ দেখছিল। ঘরে আবছা অন্ধকার, তোলা-খড়খড়ি দিয়ে যা-বা ম্লান আলো আসছে, সে-আলো তার মুখে পড়ে তার ফ্যাকাসে মুখ আরো ফ্যাকাসে করে তুলেছে। বৃষ্টি দেখে ভালো লাগে না, তবু ঘরের স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা-ভেজা অন্ধকারের চেয়ে পানি পড়া দেখতে ভালো লাগে চোখে : তাছাড়া দুর্যোগের মধ্যে পথে যাদের বেরুতেই হয়েছে তাদের বিপদগ্রস্ত শংকিত চলাফেরা দেখতেও কৌতূহল হয়। তবু রাস্তায় যা-কিছু আকর্ষণ ভেতরে নেই; ভেতরে অন্ধকার-তো বটেই তাছাড়া ও ঘরে দেখে এসেছে হাফেজ আর রেজিয়া বড় খাটটায় একজন শুয়ে একজন বসে হাসাহাসি করছে। হাফেজের চোখে মাদকতা আর মনের কী একটা ভাব ঢাকবার জন্য রেজিয়া হাসছে বেশি।

একদিন হাফেজ এমনি ছিল না। চাকরিটি পেয়ে করিমনকে বিয়ে করে মফস্বল শহরে এসে যখন ছোট সংসারটি পাতল তখন হাফেজ এমনি ছিল না। তারপর একটি মেয়ে হল, হাফেজ কেমন হঠাৎ দূরে সরে গেল। তবু দিন যায়। সংসার নিয়ে—মেয়ে নিয়ে। তাছাড়া

সংসারের রোজকার ঝঞ্ঝাট। হাফেজ দূরে সরে কি গিয়েছে, কি কাছে রয়েছে ওকথা নিয়ে কোনোদিন সে মাথা ঘামায় নি। সোজা মানুষ, সেকেলে মানুষ, মায়ের থেকে এক আঙ্গুল বাড়া। বরঞ্চ এই ভালো লাগত। প্রথম-প্রথম হাফেজ যখন তার আশেপাশে সাধ্য-সময়মতো ঘুরপাক খেত, কেবল মিঠে-মিঠে কথা কইত, কথায়-কথায় চোখে হেসে ফিসফিসিয়ে আবোল-তাবোল কথা কইত, তখন থেকে-থেকে ভারি বিশ্রী লাগত তার। আরো একটি মেয়ে যখন হল তখন করিমনের কাছে হাফেজের অস্তিত্ব অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংসারের কাজের মধ্যে পাক-সাক নিয়ে, দু-মেয়েকে নিয়ে সেও ঘুরছে, হাফেজও ঘুরছে, কিন্তু তারা যেন আলাদা, প্রচুর দূরত্ব তাদের মধ্যে। আকাশে দুটো তারার মতো। কিন্তু এবং এটাকে অস্বাভাবিক কিছু ভাবে নি করিমন, পরস্পরের দুই চক্রের মধ্যে যতই তফাত থাকুক না কেন, তবু তারা একই সংসারের মধ্যে ঘুরছে বলে চক্রের ব্যবহার-সম্বন্ধে সে সজ্ঞান হয় নি কখনো। তারপর আরো একটি সন্তান হল : এবার এক ছেলে। কিন্তু ছেলে ছ-মাসে না পড়তেই হঠাৎ কানাঘুষায় কেমন একটা কথা করিমনের কানে এসে লাগল, কিন্তু সে নির্বাক হয়েই রইল। তিন সন্তানের দেখাশোনা, সংসার, তাছাড়া পাঁচ-ওয়াক্ত নামাজ, কোরান-তালাওয়াত,—এসব নিয়ে সারাদিন এত ব্যস্ত যে ওসব কানাঘুষা কানে তুলে তা-নিয়ে আলোচনা করবার মতো তার মনের অবসর নেই। কিন্তু একদিন রাতে সংসারের সমস্ত কাজ শেষ করে শান্ত মনে ও দিলে এশার নামাজ পড়ে সে আলো নিভিয়ে শুতে আসবে হঠাৎ মশারির ভেতর থেকে হাফেজের গলার আওয়াজ পেল। করিমন একটু বিস্মিত হল। কারণ হাফেজের স্বভাব হল যেই শোয়া অমনি ঘুম। কিন্তু কদ্দিন হতে লক্ষ্য করছিল, শুয়েও সে ঘুমোয় না, কেমন অস্থির-অস্থির ভাব করে কেবল, একবার এপাশ ফেরে একবার ওপাশ। আলো ততক্ষণে নিভিয়ে দিয়েছিল করিমন, এবং হঠাৎ ফিরে আসা অন্ধকারের মধ্যে করিমন শুনলে যে হাফেজের গলা কেমন অন্যরকম শোনাচ্ছে, কেমন অতি আত্মসচেতন, ভীরু, কথাগুলো যেন যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। এবং সে বললেও যেন কেমন এক কথা।

সে-রাতে অনেকক্ষণ গুম হয়ে জেগে ছিল করিমন, ঘুম এল না। কিন্তু পড়ে রইল অসাড় হয়ে, চুড়িতে মৃদু ঝংকার পর্যন্ত হল না। এবং পাশে হাফেজেরও কোনো সাড়া করিমন পেল না বটে কিন্তু তার শ্বসনের আওয়াজ ঘুমের শ্বসনের মতো ঠেকল না বলে সে বুঝল কল্পনার খরতর স্রোত মস্তিষ্কে নিয়ে সেও গুম হয়ে রয়েছে জেগে, হয়তো সংকোচ অথবা আত্মমগ্নতায়।

ভোরবেলায় ফজরের নামাজ পড়ে করিমন কোরান-শরিফ পড়লে। অন্যদিনের চেয়ে আজ অনেকক্ষণ পড়লে। পড়ে কাঁদল, আবার চোখ মুছে রেহেল থেকে কোরান-শরিফ তুলে গিলাফে ভরে তাকে বুকে-কপালে ঠেকিয়ে এবং তাতে একবার চুমু দিয়ে সে ভাবলে, দুঃখের কী আছে! সতীনকেও সে সহ্য করতে পারবে, তারপর সহনশীলতায় আরো সে শান্ত আরো স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু রঙের ফ্যাকাসে ভাব আরো বাড়ল যেন।

বৃষ্টির আর শেষ নেই। সেই কবে যে এক দুপুরে মেঘ ঘনিয়ে উঠে সামান্য ঝড়ের মতো-হয়ে বৃষ্টি শুরু হল, সে-বৃষ্টির আর থামা নেই। নতুন বিবির সম্পর্কীয় দু-চারজন লোক এসেছিল বিবির সঙ্গে, তারা এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে এতখানি পথ নৌকায় চলে গেল। করিমনের হঠাৎ মনে হল : তারা চলে গেল কেন? এই বাদলা দিন, আর অতখানি পানির পথ? কিন্তু অবচেতনায় যে আরেক কথা ছিল তা-হয়তো গভীরভাবে ও সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণে নিজের মনকে খুঁটিয়ে দেখলেও সে-কথা আন্দাজ করতে পারবে না। আসল কথা হল এই যে, মেহমানদের উপস্থিতিতে ওরা—হাফেজ আর রেজিয়া—হঠাৎ অতখানি অন্তরঙ্গ ও বেলাহাজ হয়ে উঠতে পারত না, হয়তো আরো কয়েকদিন প্রায় অস্তিত্বহীনতায় জড়োসড়ো হয়ে থাকত নতুন বউ, আর হাফেজ ঘুরে বেড়াত দূরে-দূরে। ওঘরে এখন হাসছে তারা, হাফেজ হাসছে নিঃশব্দে, কিন্তু রেজিয়ার কণ্ঠ থেকে-থেকে ফেটে পড়ছে। পরশু দিনও যার গলা দিয়ে আওয়াজ বের হয় নি, তার গলা দিয়ে আজ ঝিলিক দিয়ে যেন উঠছে উলঙ্গ পুলক।

দুপুরবেলায় হাফেজ ব্যক্তিগত কী একটা কাজে বেরিয়ে গেল। খাবার সময় সে একবার বললে, করিমন যেন নতুন বিবিকে খাবার সময় ডেকে নেয়।

করিমন উবু হয়ে কী যেন করছিল, ওর পানে একবার মুখ তুলে তাকাল, কোনো উত্তর দিলে না। উত্তর দেবার কিছু নেই, কারণ কথাটা অবান্তর। খাবার সময় নতুন বিবিকে ডেকে না-নিয়ে সে খেয়েছে এমন কখনো হয় নি, হতেও পারে না। বরঞ্চ প্রথম ক-দিন তাকেই আগে খাইয়ে সংসারের আর সব কাজ শেষ করে তবে সে নিজে খেয়েছে। হয়তো কথা কিছু বলার ছিল না বলে, অথচ নীরবতায় নতুন বিবিকে ঘিরে তার আত্মস্থতার কথা করিমনের মনে হতে পারে বলেই হয়তো ও-কথাটি সে বলল; অথবা আত্মবিস্মৃত মগ্নতায় সে নতুন বিবির প্রতি নিবিড় দরদ প্রকাশ করে ফেললে। কিন্তু করিমন শেষেও কিছু বললে না, ভাবলও না বিশেষ। সংসারে বাস্তব-অবাস্তব সব রকম কথা হয়ে থাকে, অত হিসেব নিলে—প্রতি কথায় অত ওজন করলে চলে না।

কাপড় কেচে গোসলের যখন সময় হল তখন বেলা বেড়েছে বেশ : মেঘলার ঘোলাটে ভাব যেন পাতলা হয়ে এসেছে। ভেজা ঠাণ্ডা হাত আঁচলে মুছতে-মুছতে করিমন এ-ঘরে এল নতুন বিবিকে স্নানের কথা বলতে। এসে দেখলে, হাত-পা ছড়িয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে সে। ঝলকের মতো একটা স্মৃতি জাগল করিমনের মনে। স্মৃতি কি তা : এই-তো সেদিনের কথা। সারা রাত ঘুমাতে পারে নি সে, বরঞ্চ তাকে ঘুমোতে দেয় নি হাফেজ, এবং দিনের বেলায় দেহ ভেঙে আসছে তার প্রচণ্ড ঘুমে অথচ তার ঘুমোবার উপায় নেই। উপায় যে ছিল না তা ঠিক নয়, বাড়ি-ভরা মানুষ বলে ঘুমোতে লজ্জা করছিল তার, অতি কষ্টে চোখ মেলে বসে থাকছিল। লজ্জা আর ঘুমের লড়াইতে লজ্জাই সেদিন জিতেছিল।

কিন্তু মেয়েটির যেন লজ্জা-শরম কম মনে হচ্ছে। ঘোমটাটা যেন থাকতেই চায় না তার মাথায়, বারেবারে টেনে তুলতে হয়। কিন্তু করিমন ঘোমটা যদি একবার মাথায় তোলে, পড়ুক দেখি সে ঘোমটা! জোর হাওয়াও-তো একচুল সরাতে পারবে না তাকে। মন উড়ুনি হলে ঘোমটাও উড়ুনি হয়।

ডাকবার আগে একবার করিমন তাকাল তার মুখের পানে। চোখে তার নিদারুণ ঘুম, আর—করিমন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখল সারা মুখে কেমন শিশুর মতো ঢালা লাবণ্য : রঙে স্নিগ্ধতা বেশি, রেখায় কাঠিন্য নেই। সুন্দর যে খুব সে তা নয়, কিন্তু তা মমতা জাগায়। মেয়েরা মেয়েদের চেহারা বিশ্লেষণ করে, প্রথম দৃষ্টিতেই আপাদমস্তক সমালোচনা করে নেয়, বিচার করে দেখে প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কিন্তু মেয়ে হয়েও করিমন তাকে এতদিন দেখে নি সে-বিশ্লেষণী চোখে, কখনো কৃচিৎ কেবল নতুন বউয়ের সংজ্ঞায় তাকে চেয়ে দেখেছে আবছা দৃষ্টিতে। এবার দেখে বুঝলে যে, ও মুখ মমতা জাগায়; কিন্তু হয়তো বয়স বেশি নয় বলেই। শিশুর চেহারা যেমনই হোক তার রেখা-শূন্য চেহারায় নিটোলতা বয়স্কদের মনে মমতা জাগায়—এও তাই। কিন্তু করিমনের কি বয়স তার চেয়ে অনেক বেশি? এই তো সেদিন—সেদিনকে স্মৃতি বলা চলে না—সে পুতুল খেলেছে, জিদ করে পা-ছড়িয়ে হেসেছে, কখনো অকারণে খুশি হয়ে নেচেছেও। আয়নায় সে মুখ দেখে না। গোসল করে একবার এমনিতে আন্দাজে সিঁতি করে, এবং আয়না ছাড়া সিঁতি করাতে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, কখনো তার প্রয়োজন বোধ করে না সে। এমন কি সিঁতির রেখাটিও একটু বাঁকা হয় না। নাক-বরাবর চিরনির কোণটা ঠেকিয়ে সেটা ঠেলে দেয় ওপরে এবং তা চুল স্পর্শ করলেই দু-ভাগ করে ফেলে চুলগুলো, দীর্ঘ ও ঋজু সাদা রেখা বেরিয়ে পড়ে। কাজেই নিজের চেহারায় এখনো যৌবন আছে কি না সে জানে না, বা দেখতে সে রূপসী এবং আকর্ষণীয় কি না তাও সে জানে না; কিন্তু ভেতরটা তার ভারি হয়ে উঠেছে বয়সে—সেখানে চপলতা নেই, যৌবনের আনন্দ নেই। তাই হঠাৎ ঘুমন্ত নতুন বউয়ের মুখে ঢালা লাবণ্য দেখে সে বিচলিত হল; কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। তারপর চোখের পানেই শুধু এবার তাকিয়ে দেখল, যে-চোখে রাজ্যের ঘুম

নিবিড় হয়ে রয়েছে। হয়তো সে স্বপ্ন দেখছে, সদ্য আস্বাদিত সোহাগপুলকের জ্বালাময়ী স্বপ্ন, যে-স্বপ্নে এত ঝাঁঝ যে নেশা ধরে গেছে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, রক্তের স্রোতে। একটা হিংসার মতো তীব্র চেতনা শিরশির করে উঠল করিমনের চেতনায়; কিন্তু তক্ষুনি হঠাৎ ডাকলে তাকে।

—বোন, অ বোন। ওঠ-গো বোন!

কিন্তু রেজিয়া নিঃসাড়। গায়ে হাত দেবে কি? কিন্তু জ্বলন্ত অঙ্গারকে ছুঁতে যেমন মানুষের মনে বাধা জন্মায়, ঠিক সেই রকম একটা বাধা হঠাৎ করিমনের মনে ধাক্কা খেয়ে যেন জেগে উঠল।

গলা চড়িয়ে আবার ডাকলে করিমন। আবার। কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ পেল তার গলায়। তারপর হঠাৎ মেয়েটি নড়ে উঠে তাকাল তার পানে, তারপর তাকিয়েই রইল, ঘুমের ছায়ায় তলিয়ে বিস্ময়ের বিভ্রান্ত তীক্ষ্ণতা। কিন্তু পরক্ষণেই সে মুখ গুঁজলে বালিশে। কয়েক মুহূর্ত পর আস্তে-আস্তে উঠে এল সে।

খাবার সময় একবার রেজিয়া বললে,

—তখন আপনি যে ডাকছিলেন, কী বলে ডাকছিলেন?

পোড়া পাকা লঙ্কা ডলতে-ডলতে করিমন বললে,

—কেন? বোন বলে ডাকছিলাম।

—তাই। অনেকক্ষণ ধরে ডাকছিলেন কি?

—যা ঘুম ছিল চোখে—অনেকক্ষণ ডাকতে হয়েছে না?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল রেজিয়া। তারপর হঠাৎ নিচু গলায় বললে, আপনার ডাকেই বোধহয় শুনছিলাম যে, আমার বুবু—যিনি আর বছর মারা গেছেন—আমাকে ডাকছেন। চোখ মেলে আপনাকে দেখে কিছু তাজ্জব হয়েছিলাম।

করিমন কিছু বললে না। এবং মনটা যে কোথায় খচখচ করে উঠল সে বুঝতে পারলে না।

হাফেজ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে উঠেছে করিমনের প্রতি! একথা সে অনুভব করলে। এ-কথা বুঝতে পারল না যে, এ-স্তব্ধতা গড়ে উঠেছে বহু আগে, কেবল এতদিন সে নিজের চক্রের মধ্যে চোখ নিবদ্ধ করে ঘুরেছে বলে তা টের পায় নি। ওর প্রতি তার স্তব্ধতা যেমন সে বোধ করলে, তেমনি তার মমতার মুখরতা দেখলে নতুন বউয়ের ওপর। অথচ সেও বউ।

কোলের ছেলেটার বছর পেরিয়ে গেছে। তবু যখন-তখন ট্যাঁ-ট্যাঁ করে, থামাতে গিয়ে মাই কেবল গুঁজতে হয়। বিকেলের দিকে হঠাৎ ওর কান্নার ধমক উঠল, মাই মুখে গোঁজাতেও থামতে চাইল না তা। মায়ের স্নেহ সন্তানের প্রতি অপার বটে এবং সে-স্নেহের জন্য মা সব যন্ত্রণা সইতে পারে বটে, তবু তারও একটা সীমা আছে। অদ্ভুত তীক্ষ্ণতায় এবং কিছুটা যেন হিংস্রতায়ও মেয়েটা যখন কেঁদেই চলেছে তখন হঠাৎ তাকে কোল হতে মাটিতে নাবিয়ে করিমন ঘর থেকে বেরিয়ে ভেতরের বারান্দায় গিয়ে থাম ধরে দাঁড়িয়ে ক্রোধে বিরক্তিতে ধুঁকতে থাকল। কিন্তু একটু পরে হঠাৎ একটা উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে সচকিত হয়ে উঠল। ওঘরে নতুন বউ হাসছে, তার সতীন হাসছে। কিন্তু হাফেজ কখন ফিরল?

মানুষের শরীরে ক্রোধ আছে। কিন্তু সে-ক্রোধে এত জ্বালা, তা সে কখনো অনুভব করে নি : আজ করল। ভেতরটা যেন হঠাৎ দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল, এবং তার শিখায় মনটা যেন মুহূর্তের জন্য পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণে চোখে তার কেমন আঁধার ঘনিয়ে এল, যে-আঁধারের মধ্যে সে কিছু কোনো অর্থ দেখলে না।

তবু পরে শান্ত হল করিমন। নামাজ পড়ল আছরের। সংসারের কাজকর্ম কিছু করে মেয়ে দুটোর হাত-পা ধুইয়ে দিয়ে মগরেব-ওক্ত আবার নামাজ পড়লে। ঘরের মৃদু আলোও তার সহ্য হল না—এত শান্তভাব তখন তার সারা মনে। তাই চোখ বুজে নামাজ পড়লে। শেষে অনেকক্ষণ মৃদু দুলে-দুলে তসবি টিপল। অবশেষে সে কাঁদল। কেন কাঁদল সে জানে

না, তবু কাঁদল। কেঁদে হয়তো কিছুটা ভালো বোধ করলে, হালকা-হালকা বোধ করলে ভেতরটা।

রাত্রিতে খাবার সময় লণ্ঠনের লাল আলোতে করিমন একবার তাকিয়ে দেখলে রেজিয়ার পানে। কী কথায় অত হাসে ও? কবে যে সে নিজে হেসেছে, সে-কথা মনে পড়ে না। কিন্তু অত জোরে অত উচ্ছ্বসিতভাবে-তো কখনো সে হাসে নি। তার মাও হাসেন নি, নানিও হাসেন নি। মেয়েমানুষের অত হাসি শোভা পায় না, তাছাড়া খোদার বান্দা অত হাসে না। কত সহস্র-সহস্র খোদার বান্দা যে দুনিয়ায় দুঃখে কাঁদে, শোকে জর্জরিত হয়—সে দুনিয়ায় তার হাসি আসে না।

মাছের কাঁটা বাছতে-বাছতে হঠাৎ রেজিয়া মুখ তুলে তাকাল তার পানে। তারপর নিষ্পলক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল। চোখ ফেরাবার আগেই করিমন চোখ সরিয়ে নিলে, কিছু ক্ষিপ্রভাবে। তার চোখে কি ঘৃণা ফুটেছিল, সে-ঘৃণা কি চোখে পড়েছে রেজিয়ার?

আবার যখন আড়চোখে রেজিয়া তাকাল তার পানে ততক্ষণে সে চোখ সরিয়ে নিয়েছে, কিন্তু তার চোখে যে কেমন হঠাৎ বেদনা ঘনিয়ে উঠেছে তা মুখটি নত হলেও বোঝা যায়।

করিমন শুনেছে, মা নেই—বাপ নেই মেয়েটির। চাচার ঘরে মানুষ। হয়তো তার মনে সঞ্চিত আঘাত : একটু খোঁচা দিলেই উথলে ওঠে। সে-সময়ে সে ঘুমের মধ্যে ওর ডাক শুনে চমকে উঠেছিল। তার বুবু যে মারা গেছে আর বছর—সেই তাকে ডাকছে ভেবেছিল।

করিমনের ফ্যাকাসে মুখ স্তব্ধ, চোখে নিষ্কম্পতা। দূর থেকে হঠাৎ বেদনা ঘনিয়ে উঠেছে এবং দূর থেকে সে-বেদনা এসেছে বলে তাতে জমাট ভাব নেই, কেমন ছড়ানো, বিস্তৃত। তখন হাফেজ যে আড়চোখে তাকিয়ে একটু দ্রুত পায়ে চলে গেল, দেখে করিমনের হঠাৎ খেয়াল হল, অপরাধের ভয়ে ও সংকুচিত। কিন্তু সে-অপরাধ শিশুর অপরাধ : ও শিশু। আজ তাহাজ্জাতের নামাজ পড়ল সে। গভীর রাতে কাঁদলও। ছড়ানো বেদনাও ভাসল হালকা হয়ে, কোথাও উথলে উঠবার সুযোগ পেল না। রাতের গভীরতায় নিজেকে অনেক বড় মনে হল, অথচ আবার দয়ামায়ায় ভেঙে খান-খান হয়ে গেল অন্তর। ওঘরে কোনো আওয়াজ নেই। দুটি শিশু ওঘরে ঘুমোচ্ছে। খোদা ওদের যেন শান্তি দেন।

বহুক্ষণ পরে হঠাৎ একটি পদশব্দে সে চমকে উঠল। ঘরের কোণে লণ্ঠনটা মৃদু মৃদু না-জ্বলার মতো জ্বলছিল, তার আলোয় দেখলে একটা আবছা মূর্তি।

—কে?

—আমি।

হয়তো কোনো দরকারে রেজিয়া ঘুম হতে জেগেছে। তাই কোনো কথা বললে না করিমন, আবার তসবি টিপতে লাগল। কিন্তু রেজিয়া এগিয়ে এসে ঝুপ করে বসে পড়লে তার জায়নামাজের পাশে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর। বসে-পড়াটার মধ্যে এমন অন্তরঙ্গতা যে করিমন তা অনুভব করলে বটে কিন্তু কোনো কথা বলতে পারলে না, বা মুখ ফিরিয়ে তার পানে তাকাতেও পারলে না। তসবি টিপবার সময় তার যে ঈষৎ দুলবার অভ্যাস, তেমনি দুলতে থাকল। কিন্তু কতক্ষণ আর চুপ করে থাকা যায়। কিছুক্ষণ পর আস্তে সে বললে,

—কী, বোন?

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতা। তারপর হঠাৎ রেজিয়া কেঁদে উঠল।

করিমন স্তম্ভিত।

—কী হল বোন, কী হল?

অনেকবার প্রশ্ন করলে করিমন—তার ওপর ঝুঁকে, মাথায় হাত দিয়ে, পিঠে হাত বুলিয়ে, কপাল হতে চুল সরিয়ে, কিন্তু কোনো উত্তর পেল না সে। অবশেষে কান্নার বেগ একটু থামলে রেজিয়া ফিসফিস করে অদ্ভুতভাবে বললে,

—না, কিছু না। কিন্তু আপনাকে দেখলে আমার আপার কথা মনে পড়ে। আপনি ঠিক আপার মতো। আপাকে বড় ভয় করতাম। এখন থেকে-থেকে জ্বলে যায় সারা বুক তার শাসনের জন্য।

করিমনের মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটল : স্নেহ ও বেদনার সংঘর্ষে যেন একটা মুখভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু অন্ধকারে তা বোঝা গেল না। করিমন কেবল তাকে হঠাৎ বুকে নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রইল, আর বুকে মুখ গুঁজে রেজিয়া তখনো কাঁদতে লাগল। তবে এবার স্নেহ-মমতার প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখাবার ভয়ে চেপে নিঃশব্দে।

মাঘ ১৩৫৫ জানুয়ারি ১৯৪৮

বংশের জের

মাত্র দু-বছরের কথা, কেন মনে থাকবে না। দিনেরবেলা মেঘ করেছিল, কিন্তু সারাদিনেও একটু বৃষ্টি হয় নি। বিকেলের দিকে রামধনু উঠেছিল। ছেলেমেয়েরা ছায়াপথে সূর্যের ঝিকিমিকি হলদে আলো দেখে লাফায়, ফানুস দেখে হররা তোলে, রামধনু দেখে-তো নাচবেই। তারা নেচেছিল উঠানে দাঁড়িয়ে একযোগে হররা তুলেছিল। আনিসা বউ হলে কী হবে, সে-ও পেছনে উঠানে বেরিয়ে খানিক চেঁচামেচি করেছিল। ঘরে মুরুব্বি অনেক। তাঁরা ভারিক্কি লোক। পুরুষদের মধ্যে গোরাবিবি লম্বায় ততটা না হলেও প্রস্থে অনেক। তা বলে তাঁরা কেউ যে কানপাতলা লোক নন, তা নয়। কাজেই আনিসার শাস্তি হয়েছিল।

তবে সেই প্রথম শাস্তি। শুধু যে শাস্তি পেয়ে আসামি খালাস তা নয়। সে-দিন থেকে তাকে ঢুকতে হল শ্বাসরুদ্ধ-করা ঘেরাটোপে, আর পড়ল আদাড়ের জঞ্জালের পর্যায়ে। তাছাড়া চারধারে সকলের সদা সতর্ক দৃষ্টি।

দুলার নাম কমর। তবে কমর নাম হলেও সে যেমন বদনের আদলে বা রঙে চাঁদের কাছাকাছিও যায় না, তেমনি নতুন দুলা হলেও তার মধ্যে নাই দয়া-মায়া-মহব্বতের লেশমাত্র। কিন্তু তা হলে কী হবে। বউ নাচন দিয়ে বাপের বাড়ি যেতে পারে না কারণ ধবালপুরের জমিদারদের মতো ইদানীং আভিজাত্যের পলেস্তারা দেয়া ফোতো নবাব নয় তারা। এককালে এদেশে কত এক-হাজারী দু-হাজারী পঞ্চ-হাজারী আমির-ওমরাহ ছিল, কত ধ্বংস হয়ে গেছে জীবিতকালেই। জীবিতকালে যারা যায় নি তারা নির্ঘাত গেছে মৃত্যুর পর। দুস্থ পরিবারবর্গের মধ্যে এমন কেউ থাকে নি যারা বংশপ্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে পারবে। সেই ছিল সেদিনকার নিয়ম, দিল্লির হুকুম। কিন্তু দেশের কানুনকে ফাঁকি দিয়ে টিমটিমে বংশপ্রদীপ পাকেপ্রকারে জ্বালিয়ে রেখে কেউ-কেউ কালের স্রোতে এখনো ভেসে আছে। কত ঝড় গেছে তবু সেকেলে মস্ত ভারি লোহার সিন্দুকটিও পার করে নিয়ে এসেছে নিরাপদে। তবে এত করেও অনেকের সিন্দুকের ভেতরটা ফক্কা মেরেছে, কারো-কারো আবার মারে নি। দশম নি ডালা তুললে এখনো সেখানে দু-চারটে আশরাফি বা বিচিত্র কারুকার্যময় হরফের লেখা ফরমান দৃষ্টিগোচর হবে। কারো-বা ফরমান ছাড়াও আছে বংশানুক্রমে স্তরে-স্তরে লিপিবদ্ধ করা বংশ-ইতিহাস, তার মূলের আর ঘোরালো শাখা-প্রশাখার বিস্তারিত কাহিনী। কার ছেলে সুবেহদারের কাছ থেকে রুপালি কাজ করা সের-আপাহ্ পুরস্কার লাভ করেছিল, কে কবে দিল্লির সৈন্যদের হাতে ওসমান খানের মৃত্যুর সময় সম্রাটের প্রতিনিধির সাহায্যার্থে মহলগিরি, পিয়ারা আর ডিঙির বাহিনী সাজিয়ে ব্রহ্মপুত্রের তীরে নিঃশব্দে অপেক্ষা করেছিল গোটা একটি কৃষ্ণপক্ষের রাত, কে প্রাদেশিকতার শত্রু ছিল বলে বার ভুঁইঞাদের বিরুদ্ধে লড়েছে সেনাপতি

ইহতিমাম খানের সঙ্গে, কে লোকদের আফিং আর ভাং খাইয়ে রাতারাতি খাল খনন করেছে নৌবাহিনীর গতিপথ সুগম করবার জন্য, কার সোনালি পিকদান ছিল, কোন বুজর্গ মানুষের দোয়ায় কে দুইডজন সন্তান লাভ করেছে। কার বৈঠকখানা সজ্জিত ছিল মুসলিমপট্টমের রংদার কাপড়ে, শুধু কোতরা গুড়ের জন্য কার ঘরে ছিল একশোটা ভাঁড়। বংশবৃক্ষ অঙ্কনের সময় আগাছার মতো এমনি অজস্র তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এদের তালিকায়। তা সংরক্ষিত আছে সে-সিন্দুকেই। অবশ্য ধবালপুরের চৌধুরীদের বাড়িতেও এমনি একটা সিন্দুক আছে। কিন্তু সেটা কবেকার তা গবেষণার বিষয়। ঘরেরই হোক, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তার ভেতরে ফক্কা। চুরিচামারির বা হাতবেহাতির মোহর থাকতে পারে, কিন্তু নেই বংশতালিকা। সেখানেই এরা তাদের ওপর দীর্ঘ দূরত্বে টেক্কা মারে।

এবং সে-জন্যই যুগ যুগ ধরে অতীব মন্দ পড়তার মধ্যেও গোরাবিবির গৌরমুখে অহঙ্কারের ধার, এত বাছাছোঁয়া, এত জাতবিচার। সে-জন্যেই গোরাবিবির স্বামীর দহলিজনশিন-শরিফ খান্দানের সঙ্গে দহরম-রেস্তাদারির এত চেষ্টা, অতীতকাল হতে বহমান রক্তস্রোতকে পরিশুদ্ধ রাখার সদাজাগ্রত খেয়াল। এককালে যেখানে মস্ত আটচালার ঘর ছিল, মাটিছোঁয়ানো একচালা ঘরের মধ্যে সুদৃশ্য জমকালো তোরণ ছিল, সেখানে আজ জংলা আর কাদাখোঁচার নির্বিবাদ বসবাস। তবু বংশের স্রোত চড়ায় পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। এককালে শত শত মানুষ যাদের পেটোয়া ছিল তাদেরই লোক সামান্য দরমাহার সবরেজিস্টারি পেয়ে ধন্য হয়। তবু মনের বংশগৌরবে ঘাটতি পড়ে নি। ক্ষমতার সহরদ্দ সংকীর্ণ হতে ঘরের দোরগোড়ায় এসে ঠেকেছে ডাল্লাভাঙা কপাটের জন্য মান-ইজ্জত বেপর্দা হবার যোগাড়। তবু কী একটা যেন রয়ে গেছে। তার সহজে মৃত্যু নেই। গোরাবিবির মেদবহুল দেহে স্তব্ধতা। সেদিকে তাকিয়ে আনিসার দৃষ্টি মাঝে-মাঝে হারিয়ে যায়। সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। চোখে অবসাদ আসে।

গোরাবিবি চোখ পাকিয়ে বলেন,—তুমি কেন বাইরে গিয়ে ডাকলে? সেদিনের কথা মনে নাই?

—উনি অনেকক্ষণ ধরে ডাকছিলেন। কুত্তাটা কেবল ঘেউ-ঘেউ করছিল। উনি মানুষের গলার আওয়াজ না পেলে আসেন না।

কমর কখনো-কখনো রাতে একদম ঘুমায় না। নিশাচরের মতো জেগে থাকে, দুষ্ট আত্মার মতো রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়। বাড়ির ডান দিকে মস্ত মাঠ। সে-মাঠে রাতে আলেয়া জ্বলে। কিন্তু আলেয়াকে তার ভয় নেই। মধ্যে-মধ্যে ভিন্‌গাঁয়ের লোক এ-মাঠে এসে পথ হারিয়ে ফেলে। পথের সন্ধানে সে গোলকধাঁধার মধ্যে যেন ঘোরে। তারপর ভয় পেয়ে ডাক পাড়তে শুরু করে। বিশেষ করে হাটের দিনে এইটে হয়। পথ-হারানো লোকটার ডাকের উত্তরে এদের বাড়ির বাঘা কুত্তাটা প্রথম বেরিয়ে তারার দিকে নাক তুলে ঘেউ-ঘেউ করে। তারপর কুত্তার ডাকে ঘুম ভাঙে মাজুর বাপের। সে লণ্ঠন জ্বালিয়ে বাইরে এসে পথভোলা লোকদের পথের সন্ধান দিয়ে দেয়। মাজুর বাপ সারাদিন মেহনত করে। তাই কোনো কোনোদিন তার ঘুম ভাঙে না। সেদিন বুড়ি দাদি সরু দুর্বল গলায় ঘরের লোকদের ডাকাডাকি করে তোলেন। বিপাকে-পড়া মানুষের জন্য তাঁর সর্বদা বড় দয়া।

কিন্তু ক-দিন ধরে বাতের ব্যথার জন্য রাত্রে তাকে আফিং খাওয়ানো হচ্ছে। মাজুর বাপ দু-দিন ধরে ঘরে নেই। গতরাতে কেবল কুত্তাটাই ঘেউ-ঘেউ করল, কেউ উঠল না। আনিসা জেগে ছিল। কমর যেদিন অমনি করে, সেদিন সে ভূতের ভয়ে চোখ খুলে পড়ে থাকে, ঘুমায় না। হাটের দিনে পথ-হারানো মানুষের মতো হঠাৎ মাঠ থেকে কমর যখন ডাকতে লাগল, এবং তার ডাকে কুত্তাটা ছাড়া আর কেউ যখন জাগল না, তখন লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এসেছিল আনিসা।

গোরাবিবি চোখ পাকিয়ে বলেন—মনে নাই তোমার সেদিনের কথা?

কেন থাকবে না? মাত্র দু-বছর আগেকার কথা। তখন সদ্য বিয়ে হয়ে এ-ঘরে এসেছে।

ঘরদুয়ার রীতিনীতি দেখে আর ভারিক্কি-গোছের লোকজন দেখে তখনো তার বিস্ময় কাটে নি। কিন্তু বাইরে ছেলেরা হঠাৎ যখন হররা তুলল রামধনু দেখে, তখন কী একটা পুলক তাকে মুহূর্তের মধ্যে আনন্দে উদ্‌ভ্রান্ত করে ফেললে। আর সেদিন থেকে সে ঢুকল বাধা-নিষেধের ও কড়াকড়ির ঘেরাটোপে। প্রথম শাস্তিও পেল সেদিন।

কথাটা মনে যে আছে আনিসা বলে না। গোরাবিবির মেদবহুল দেহের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে। সে-দৃষ্টি অসহায়। আর করুণা ভিক্ষা করে। ক্রোধের উত্তাপে বরফের মতো গলে করুণা হয়ে ঝরবে।

কিন্তু গোরাবিবি গলেন না। আরো বলেন,—

—দেখ, ছোটজাত বড়জাতের কথাটা বড় খাঁটি। তেলপানির মতো দুটো ফারাক্ থাকবে সব সময়েই। এ দুই-জাত মিশ খায় না। তুমি কি আর আমাদের বাড়ির মর্যাদা বুঝবে? আমাদের কমর আজন্ম ফকির গোছের মানুষ। দুনিয়াদারির প্রতি তার চরম ঘৃণা। সে-জন্যই তাঁরা তোমাকে আনলেন। বংশরক্ষা তো করতে হবে।

তাঁরা তাই বলেন। আনিসা প্রতিবাদ করে না। তার বাপের বাড়ির সকলে এ-বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ করে দুনিয়ায় বেহেশত পেয়ে বসে আছে। ভাবনা-চিন্তা নেই, জাতে উঠে গর্বের সীমা নেই। একা আনিসার কেন মাথাব্যথা হবে। তার জীবনের কথা আছে বটে। কিন্তু তার জীবনের কথা বলেই প্রতিবাদ করা যায় না। হঠাৎ অসম্ভব একটা পুলকের তাড়নায় সে ছেলেদের মতো হররা তুলতে পারে, তা-বলে সজ্ঞানে কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না। তাছাড়া, হয়তো-বা কমর মস্ত ফকির। সে মারা গেলে হয়তো তার কবর মাজার শরিফে পরিণত হবে। আনিসার-তো কেবল সন্দেহ। কমর যখন হঠাৎ হো-হো করে হাসে, বা কথা বললে সে-কথা বোঝে না, বা রাতে না ঘুমিয়ে বেমক্কাভাবে ঘুরে বেড়ায় আর অকারণে রক্তচুক্ষ নিয়ে তাকিয়ে থাকে তার পানে, তখন ব্যাপারটা তার কাছে কেমন খাপছাড়া মনে হয়। মনে হয় লোকটা হয়তো-বা পাগল। এরা যদি সে-কথা বলত তবে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকত না মনে। কিন্তু এরা বলে কমর ফকির। দুনিয়াদারির সাতে-পাঁচেও নেই এই কারণেই। রাতদিন সে নাকি এক বিচিত্র এবাদতে নিবিষ্ট; দুনিয়ার রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যস্ত।

একদৃষ্টিতে আনিসা তাকিয়ে আছে গোরাবিবির সোনার মতো মুখের দিকে। এমন সময় দুটো দাঁড়কাক হেঁড়ে গলায় ডাকতে শুরু করে। আঙিনায় একটা বাঁশ পোঁতা। একটা তার মাথায় বসে, আরেকটা নিচু ডালের ডগায় বসে। ওদিকে একবার তাকাবার ইচ্ছাটা অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠলেও আনিসা দৃষ্টি সরায় না। কিন্তু হঠাৎ গোরাবিবির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে! উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দাঁড়কাকের ডাক শুনে নয়, লাতুকে দেখে। বাঁশের কঞ্চি নিয়ে সে ঘরে ঢুকছে। ঢুকে আপন মনে বকতে থাকে, কারো দিকে খেয়াল নেই। হয়তো সে-ও আধ্যাত্মিকভাবে নিবিষ্ট। তবে ইদানীং কথা শিখেছে বলে অহরহ কথা বলে। এর মধ্যে একটা গানও শিখেছে। বলে—ডাণ্ডা মারিয়া ঠাণ্ডা করিব। একই লাইন। বারেবারে বলে। কিন্তু তাই শুনে ইনতেসার সাহেবের গোমড়া মুখ তরল হয়ে যায় খুশিতে; গোরাবিবির মুখ ঝলসে ওঠে গর্বে। বাড়িতে সেকেলে ঢাল-তলোয়ার আছে। মরচে পড়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে, কালের স্রোতে তার জলুসও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে চিরকালের জন্য। তবু লাতু যখন মাজেদের অনুকরণে ভ্রূ-কুঁচিয়ে ঐ গানটা গায়, আর শুনে যখন ইনতেসার সাহেবের এবং গোরাবিবির মুখটা ঝলসে ওঠে তখন সে মরচে-পড়া ঢাল-তলোয়ার ঝলসে ওঠে যেন।

হঠাৎ মধুরভাবে হেসে গোরাবিবি প্রশ্ন করেন,—

—কাকে তুই ঠাণ্ডা করবি ডাণ্ডা মেরে?

সে-কথার জবাব দেয় না লাতু। ভ্রূ-কুঁচিয়ে বলে, ডাণ্ডা মারিয়া ঠাণ্ডা করিব। ডাণ্ডা মারিয়া—

হঠাৎ আনিসা খিলখিল করে হাসতে শুরু করে। তারপর পরক্ষণে নিদারুণ ভয়ে গলার

মধ্যে আঁচল গুঁজে দেয়। শুষ্কপাড় জিহ্বায় খসখস করে, বেশি গুঁজেছে বলে বমি-বমি ভাব হয়। কিন্তু তার চোখ নিষ্পলকভাবে নিবদ্ধ থাকে গোরাবিবির মুখের ওপর। হাসি শুনে গোরাবিবি থ হয়ে গিয়েছিলেন, এবার ধীরে-ধীরে মাথা নাড়েন। তারপর বলেন,—বেহায়ার মতো হাস কী করে?

মুখ আঁচলে-ঠাসা বলে আনিসা উত্তর দেয় না।

তিন ইঞ্চি উঁচু মস্ত খড়মে খটখট কর হাঁটেন ইনতেসার সাহেব, আনিসার শ্বশুর। তোমদানের মতো তৈজি একেবারে শূন্য না হলেও কিছু জমাজমি তালুক-সম্পত্তি এখনো আছে। তাই শরিক আছে। ইনতেসার সাহেব সাত আনার শরিক। কাজেই উত্তরঘরেই হোক আর দক্ষিণঘরেই হোক তিনি যখন হাঁটেন তখন কাউকে তোয়াক্কা করে হাঁটেন না। বিয়ের পর প্রায় এক বছর তাঁর পায়ের আওয়াজ শুনে আনিসার বুক কাঁপত ধপ-ধপ করে। এখন কেবল ভেতরে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে। শ্বশুরের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। তাই আওয়াজটা যখন পাশ দিয়ে শব্দতরঙ্গে মহাবিক্ষোভ সৃষ্টি করে চলে যায় তখন মনে হয় একটা জিন যেন চলে গেল। জিনের কথা মনে হলেই ভয় করে। বাড়িটা যেন কেমন। এর আনাচে-কানাচে, চালের ভেতরের দিকটার ঘোর অন্ধকারের মধ্যে, পেছনে স্যাঁতস্যাঁতে জঙ্গলের জল ছায়ার মধ্যে কাদের প্রতিবিম্ব। কমর পাশে না থাকলে তাই তো তার ঘুম আসে না। যদি আসত তবে কাল রাতে বাঘা ডেকে-ডেকে হয়রান হয়ে শেষে চুপ করে যেত। কমর ডাকত, ডাকত।—দাদি আর ক-দিন আফিং খাবে?

কিন্তু দাদি মনের কথা বোঝেন। হামানদিস্তায় পান ছেঁচে দিলে তার এক অংশ আনিসাকে দিয়ে তিনি গোপনে গোপনে প্রশ্ন করেন,—সে তোকে আদর করে-তো?

চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে সজোরে মাথা নাড়ে আনিসা। মুখে স্বীকার না করলেও মাথা নেড়ে সে মনের কথা প্রকাশ করে, করে শুধু দাদির কাছেই। দাঁতশূন্য মুখে বিচিত্রভাবে পান চিবান তিনি। কথাটা শোনাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু উত্তর পেয়ে সহসা কিছু বলেন না। কেবল পান চিবান। কথাটা যেন ঘাঁটাতে চান না। কোনোদিন বলেন,—তুই তাকে আদর করিস-তো?

এ-প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় না আনিসা। তবে একদিন অকারণে এই সময়ে চোখটা ছলছল করে উঠেছিল। দাদির চোখে ছানি। তিনি দেখেন নি।

একদিন বড় গোপন কথা বলেছিলেন দাদি। আনিসা দাদির রক্তশূন্য হাতে ঝামা ঘষছিল। হঠাৎ তিনি বললেন,—তোরা নাকি জাতে আতরাফ?

—জাত নিয়ে মাথাব্যথা নেই বলে ঐ শব্দটা জানা ছিল না আনিসার। আধাকালা মানুষের সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কইতে হয় বলে কোনো প্রশ্ন করে না সে। তাই শুধু মাথা নেড়ে স্বীকার করে, তারা জাতে আতরাফ।

হেসে দাদি বলেন,—তোকে তারা মন্দ বলে কি? বউবিবি ঝামটা মেরে কথা কয় কি? পেট ভরে খেতে পাস-তো?

আনিসা এত প্রশ্নেরও কোনো জবাব দেয় না। কেমন চুপচাপ হয়ে থাকে। দাদি হঠাৎ বালিশে মাথা ঘুরিয়ে চোখের আবছা অন্ধকার ভেদ করে মেয়েটিকে ভালো করে দেখবার চেষ্টা করেন। তারপর হঠাৎ কাঁপতে-কাঁপতে চামড়া ঝুলে-পড়া ছাতাধরা শীর্ণ হাতটা তিনি বাড়িয়ে দেন। থরথর করে কাঁপে তার ভরশূন্য দুর্বল হাত কিন্তু তবু সেটা এগিয়ে আসে আনিসার মুখের দিকে। আনিসা পাথরের মতো জমে থাকে, নড়ে না কাঁপে না। তারপর সে-কম্পমান হাত আনিসার চোখ ছুঁয়ে দেখে। সেদিন তার চোখ শুষ্কই ছিল।

কিছুক্ষণ পর দাদি হঠাৎ মুখ বেঁকিয়ে বললেন,—জোরে-জোরে ঘষ্। পা-টাও কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আছে। কাঁথাটা কই?

—দেখতে না-দেখতে তাঁর মেজাজটা রুক্ষ হয়ে ওঠে। জরাজীর্ণ খাঁচায় অকারণে

বন্দি-হয়ে-থাকা প্রাণ তিক্ততায় ছটফট করে। এবার পায়ে ঝামা ঘষতে-ঘষতে আনিসা ভাবে হয়তো ঘরের কোণে ছায়ার মধ্যে আজরাইল দাঁড়িয়ে আছে তাঁর জানটা সংগ্রহ করবার জন্য। তার ভয় হয় এই ভেবে যে কখন দেখবে তাঁর চোখ উলটে গেছে আর পাটা শীতল হয়ে গেছে বরফের মতো। জান নিয়ে যাবার সময় জিনের চলার মতো আওয়াজ হবে কি হঠাৎ? জিনের পা মানুষের পায়ের মতো নাকি নয়। পা নয় তা, ক্ষুর। মসজিদে নামাজিরা সে-ক্ষুর দেখেই-তো চেনে জিনকে তাদের মধ্যে।

সে মুখ তুলে তাকায় না। কিন্তু তিন ইঞ্চি উঁচু কাঠাল কাঁঠের খড়মে জোরদার আওয়াজ করে পাশ কাটিয়ে ইনতেসার সাহেব ওধারে চলে যান। পাশ দিয়ে যাবার সময় তার পিঠটা শিরশির করে ওঠে, গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। শেষে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে, লাতু আবার ঘরে এসেছে। হাতে কঞ্চিটা আছে; চলবার সময় বুকে কালো সুতোয় ঝোলানো এক থোকা তাবিজ দোলে। হঠাৎ তার ভ্রূ-কুঁচিয়ে ওঠে। চলতে গিয়ে হোঁচটটা খাচ্ছিল প্রায় সামলে নিয়ে বলে,—ডাণ্ডা মারি। ঠাণ্ডা করিব। ডাণ্ডা মারিয়া—

খড়মের আওয়াজ শব্দতরঙ্গে যে-বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল সে-বিক্ষোভ তখনো শান্ত হয় নি তাই গোরাবিবি ডাণ্ডা মারার কথায় এবার কান দেন না। নিচু গলায় হঠাৎ ধমকে বলেন—মাথায় ঘোমটাটা ঠিকমতো থাকে না কেন?

আনিসা ঘোমটা টানে। মাথার তালুতে গিয়ে উঠেছিল, কপাল পর্যন্ত টেনে দেয়। কানটা এদিকে বন্ধ করে রাখে। লাতুর ডাণ্ডা মারার কথাটা শুনলে বড্ড হাসি পায়। সে-কথা সে শুনতে চায় না।

তারপর দাদির মেজাজের রুক্ষতা কাটলে আবার কথা শুরু হয়। জ্বরের ধমকের মতো মেজাজের রুক্ষতা আসে, আবার যায়। প্রথমে তিনি বলেন,—বোন, একটা পান দে।

চৌকির কোণে উঁচু হয়ে বসে আনিসা পান ছেঁচে। ছেঁচা পান হাতে দিলে তার সবটা মুখে পোরেন দাদি, তারপর হঠাৎ আনিসার কথা মনে পড়ায় মুখের থেকে খানিকটা পান বের করে আদর করে দেন নাতিবউকে।

—নে, খা।

আনিসা খায়। কতক্ষণ তারা চুপচাপ থাকে। তারপর দাদি সে-গোপন কথাটা বলেন। আনিসা তখন পায়ে ঝামা ঘষছিল। দাদি বলেন—

একটা বিবি দশটা বাঁদী। এই-তো দেখেছি। দাদার আমলে, বাপের আমলে। রক্তের আছে কী? জমিদারি যেমন গেছে তেমনি বংশের রক্তও গেছে। তোকে বলে দিলাম। তুই আমার খেদমত করিস, তাই বললাম। থেমে বলেন, রক্ত খারাপ না হলে মানুষ কি এমন নিমকহারাম হয় মুরুব্বির এমন অযত্ন করে? আমি মানুষ না লাশ কোন্ ছেলেটা খবর নেয়? আমার রুহ্-এর থেকে যদি বদ্‌দোয়া ওঠে তার জন্য কি আমি দায়ী?

দেখতে-না-দেখতে আবার দাদির মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে, শ্বাস দ্রুততর হয়। হঠাৎ আনিসার কেমন ফিচকি দিয়ে হাসি পায়। গভীর দুঃখে মাথা নিচু করে আছে এই রকম একটা ভঙ্গি করে সে-হাসিটা কোনো প্রকারে লুকায়।

আনিসা মনে করেছিল, ফিরবার সময় ইনতেসার সাহেব কিছু বলবেন। এর জন্য তৈরি হয়েই ছিল। বড় একটা ভয় যে পাচ্ছিল তা নয়। ও যদি ঘর থেকে বেরিয়ে থাকে তা বেরিয়েছে ওঁদেরই ছেলের জন্য। অমন করে কেন তাঁদের ছেলে? আদর-যত্ন না-করুক, কথা না-বলুক ভালোমানুষের মতো, কিন্তু অমন করে কেন? এবাদত নাকি করে। তা গভীর রাতে পথভোলা হাটের লোকদের মতো মস্ত মাঠটার মধ্যে যদি ডাকাডাকি করতে থাকে এবং উত্তর দেবার লোক যদি না থাকে কেউ, তবে বউ হয়ে আনিসা করবে কী?

আবার শব্দতরঙ্গে ঘোরতর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। খড়মের আওয়াজটা এসে পিঠের কাছ দিয়ে চলে যায়। শিরশির করে পিঠ, বিক্ষুব্ধ শব্দতরঙ্গ যেন সুড়সুড়ি দেয় সে-পিঠে।

কিন্তু আওয়াজটা কোথাও থামে না।

গোরাবিবিও আশা করছিলেন আওয়াজটা কাছাকাছি হঠাৎ থামবে, তারপর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিচার হবে আনিসার। কিন্তু হয় না বলে ক্ষুণ্ন হন।

হঠাৎ লাতুর ওপর ধমকে উঠে গোরাবিবি বলেন,—কী কেবল ডাণ্ডা মারিয়া ঠাণ্ডা করিব। সারা বাড়িতে এমন একটা লোক নাই যে বাচ্চাটাকে একটু খোদার নাম শেখাবে।

এক ধমক খেয়ে বীরশিশু কঞ্চি ফেলে কাঁদতে শুরু করে। বিরক্ত হয়ে গোরাবিবি বলেন,—যাও, ওকে শান্ত কর।

আনিসা লাতুকে কোলে নিয়ে হাঁটে। লাতু ক্ষুদ্র মানুষ হলে কী হবে, ওজন কম নয়। বেশিক্ষণ কোলে নিয়ে হাঁটলে ছোটখাটো মানুষ আনিসার কাঁকাল-এ ব্যথা ধরে। তবু একবার কোলে নিলে হঠাৎ তাকে কী করে নাবানো যায়। লাতু নাবতে চায় না। সে এক বিরক্তিকর বোঝা।

আরেকদিন পুরা তিন ঘণ্টা লাতু আনিসার কোলে চড়ে বেড়িয়েছে। সেদিন তার ভাই এসেছিল। সারাদিন ছিল, কিন্তু দেখা হয় নি। বাইরের ঘরে হয়তো চোরের মতো বসেছিল। বড়মানুষের বাড়িতে এলে খাতির নেই। আপন মনে কৃতার্থ হবার সুযোগ থাকে বলেই হয়তো খাতিরের বালাই থাকে না। কিন্তু ভাইয়ের গলার আওয়াজটা শোনবার জন্য পরখ করছিল আনিসা। অন্দরের উঠানে এমনি আর কত পায়চারি করা যায়। তাই কোলে লাতুকে নিয়ে হাঁটছিল। ভাইয়ের গলার আওয়াজও শোনে নি তার সঙ্গে দেখাও হয় নি।

—বল, আল্লা-আল্লা।

লাতু বলে—এ্যাঁ?

—বল, আল্লা-আল্লা।

হঠাৎ কী খেয়াল হয় লাতুর অনির্দিষ্টভাবে ক্ষুদ্র আঙ্গুল বিস্তার করে বলে,—হুই!

আনিসা এধার-ওধার তাকায়, কিছু দেখে না। কিন্তু লাতু খোদার নাম শেখে না বলে ভয় পায় না।

রাতে সে ভয় পায়। মনে করেছিল, আজ অন্ধকার মাঠে ঘুরে-ঘুরে কমর এবাদত করবে না। কারণ সন্ধে থেকেই সে শুয়ে ছিল বিছানায়। খেয়ে-দেয়ে আনিসা যখন শুতে গেল, তখন সে দুই হাঁটু হাত দিয়ে বেড়িয়ে ধরে চুপচাপ বসে আছে। আলোটা নিভিয়ে আনিসা শুয়ে পড়ল, কিন্তু অন্ধকারে কমর বসেই থাকল। তারপর কখন তন্দ্রার মতো এসেছে আনিসার, এমন সময় বিকট আওয়াজ করে কমর হেসে উঠল। হো হো হো। গলা যেন থাক-থাক। তাতে দৃঢ়ভাবে পদস্থাপন করে মোটা গলার স্বর লাফিয়ে ওঠে বারবার।

মাঝে-মাঝে কমর এমনি করে হাসে। তবে আজ তন্দ্রার আবছা পর্দার ওপর সে হাসি অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করে। আনিসার বুক ধড়াস-ধড়াস করে উঠল।

তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল আনিসা। হয়তো একপহর ঘুমিয়েছে নিরুপদ্রবে। স্বপ্ন না-দেখে, হাসির আওয়াজ না-শুনে। এক সময়ে মুখে আলো পড়াতে জেগে উঠে দেখে, লণ্ঠন হাতে তুলে ধরে কমর তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখছে। এত কাছে তার মুখ যে, তার উষ্ণ নিশ্বাস আনিসার গাল যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে। তারপর কমরের চোখ দেখে হঠাৎ ভয় পেল সে। রক্তাক্ত, দুটো সাদা পাথর যেন তার চোখ। নিশ্বাসরুদ্ধ করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আনিসা সে-চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। সময় কাটে, মুহূর্ত ঘষে-ঘষে এগিয়ে যায়। কিন্তু কমরের দৃষ্টি সরে না। শেষে আনিসার নিষ্কলঙ্ক চোখের সামনে রক্তাক্ত সাদা পাথর দুটি হঠাৎ নাচতে শুরু করে, ভয়াবহভাবে বড় হয়ে উঠে ঘুরপাক খেতে থাকে। লণ্ঠনটা বাঁকা-করে ধরা বলে কাচটার একদিকে নীরবে ধূমাচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

একসময়ে বোধহয় অসহ্য হয়ে ওঠে। বিদ্যুৎ গতিতে হঠাৎ উঠে পড়ে ঘরের শিকল খুলে আনিসা দেয় ছুট। ঘুটঘুটে অন্ধকারে প্রেতের ছায়া সর্বত্র। গোটা বাড়িটা ইনতেসার সাহেবের

ঘরের মস্ত সিন্দুকটার মতো রহস্যময়। চতুর্দিকে অর্গলবদ্ধ, পালাবার পথ নেই।

পথ আছে। তবে ভয়-পাওয়া আনিসা মনে করে নেই। কারণ শিকল খুলে যে-ঘরে ঢোকে আনিসা, সে ঘরেই থাকেন দাদি। আজও আফিং খেয়েছে তাই সাড়াশব্দ নেই। নিচে কাজুর মা হাত-পা ছড়িয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে আছে। তারই পাশে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে ঘুমায় আনিসা। দক্ষিণঘরে আমজাদের জ্বর হয়েছে, তার গোঙানি শোনা যায় রাত্রির গভীর নীরবতার মধ্যে। পাশের ঘরে আর সাড়া নেই। কমর আলো নিভিয়ে দিয়েছে। সে হাসে, সে কাঁদে, দুষ্ট আত্মার মতো অন্ধকার রাতে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কারো পেছনে ধাওয়া করে না। পাঠানদের পক্ষ নিয়ে মোঘলদের বিরুদ্ধে লড়লেও এরা কোনো কালে আরব-ইরান-তুরান থেকে আসে নি। আসে নি বলে এদের দীর্ঘ বংশতালিকার গোড়াটা বহুদিন হল উইয়ে খেয়ে ফেলেছে। গোড়াটা আদৌ ছিল কি না কে জানে।

দাদির নেশাও ভাঙে, ঘুমও ভাঙে। তখন অতি ভোরবেলা মেঘাবৃত চাঁদের আলোর মতো অস্পষ্ট প্রভাত। কোমরের ব্যথাটা টনটন করে। ঘুম থেকে জেগেই মেজাজটা কেমন খিটখিট করে। বিরক্ত হয়ে ডাকেন—কাজুর মা।

পাতলা তারের ঝংকারের মতো বাজে সে আওয়াজ। কাজুর মা অঘোরে ঘুমায়। কিন্তু দ্বিতীয় ডাকে ধড়মড়িয়ে ওঠে আনিসা। বলে—জি?

কাছে এলে ছানি পড়া চোখে আনিসাকে চিনবার চেষ্টা করে দাদি। কী করে বোঝেন সে কাজুর মা নয়। তারপর চেনেন ঠিক। তুই কোত্থেকে এলি?

অত ভোরে চেঁচাতে ভালো লাগে না। তাই আঙ্গুলের ইশারায় মেঝেটা দেখায় সে, মুখে কিছু বলে না।—কাজুর মা কই?

আবার মেঝের দিকে আঙ্গুল দেখায় আনিসা।

দাদির মেজাজ খিটখিট করে ওঠে।

তারা যে বলে ঠিক বলে। তিনি গজগজ করেন। —তোরা জাতে ছোটলোক।

আনিসা কিছুই বলে না। তবু দাদি কখনো-কখনো মন খুলে কথা বলেন। লোহার সিন্দুকের মধ্যে তার মনটা সব সময়ে বন্ধ থাকে না।

নীরবে পিকদানিটা তুলে ধরে আনিসা। দাদি মাথাটা ঈষৎ তুলে তাতে পিক ফেলেন। বালিশে যেটা পড়ে সেটা আঙ্গুল দিয়ে তুলে ফেলে দেয় আনিসা।

ও-ঘরে ইনতেসার সাহেব তখন উঠেছেন। শান্ত ভোরে শ্লেষ্মা-ভরা গলায় খকখক করে কাশেন। ছেলের মতো বাপেরও গলায় থাক্-থাক্। লাফিয়ে-লাফিয়ে ওঠে সে আওয়াজ। স্প্রিঙের মতো।

শ্রাবণ ১৩৫৬ জুলাই ১৯৪৯

নানির বাড়ির কেল্লা

ফনুর একটা মস্ত সুবিধা। সেটা হল তার নানিবাড়ি। নানিবাড়ি-তো নয় যেন সত্যিকার কেল্লা। গোটাকয়েক আম-জাম-লিচুগাছ আর কেমন জাতছাড়া হলদে রঙের বাঁশঝাড়ের পাশে নানির যে-ক্ষুদ্র বাড়িটি, সেটাই হল তার বিপদ-আপদের রক্ষাদুর্গ; এবং এ-রক্ষাদুর্গ থাকতে তার দুনিয়ায় ভয় নাই কিছুকে-এমন কি বাপের ঠেঙানিকেও না। মাঝে-মাঝে অবশ্য ভুঁই ফুঁড়ে যেন মছিবত ছোবল তুলে দাঁড়ায়। তখন আথালি-পাথালি ছুটেও দিশে পাওয়া যায় না, নানির বাড়ির কেল্লা রীতিমতো চোখে সর্ষে হয়ে ফোটে তখন। এমন মছিবতের সম্মুখীন হলে

অন্য কেউ হয়তো ঠাণ্ডা হয়ে যেত, কিন্তু ফনুর পেটে অহরহ শয়তান গুঁতায়, যে-গুঁতুনি আবার নানির বাড়ির কেল্লার নিশ্চিন্ত আরামে মাত্রাতিরিক্ত হয়ে ওঠে।

কেল্লায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকাকালে একদিন সকালে জীর্ণ জালটা কাঁধে ফেলে ফনু নদীতে যায়। জালটার ভার কম নয়, তবু সেটা এমন চমৎকার ঘাগরার মতো ঘুরিয়ে পানিতে ফেলে যে দেখে তাজ্জব হতে হয়।

খানিকটা উজানে নদীটা হঠাৎ কেচ্ছার মতো রহস্যময় হয়ে গেছে। ভাঙা, খাড়া তীরে বসে ফনু দশ-রকম চিন্তা করে খানিকক্ষণ। সাবধানী ছেলে ফনু, ডান-বাঁ না দেখে বা খারাপ-ভালো না ভেবে কোনো কাজ করে না। আকাশে এদিকে রোদ চড়ে, দূরে-দূরে শঙ্খচিলের নিঃশব্দ, মসৃণ চক্র শুরু হয়। সে-সব লক্ষ্য করে সে প্রায় শয়তানের মুখগহ্বরে থুতু ফেলে তীরে লুঙ্গি ছেড়ে খাড়াপাড় বেয়ে হনুমানের মতো নেবে যায়।

আধা-হাঁটু পানিতে হেঁটে-হেঁটে ফনু একঘণ্টার মধ্যে নানারকম মাছ ধরে। দেখতে না-দেখতে বাইলা, কাটাইরা, ডংকু, মুলন্দি ও আরো কয়েক কিছিমের মাছে ভরে ওঠে চাইটা। চাইটার পেছন দিকটা অবশ্য ভাঙা, কিন্তু মাছের বুদ্ধিতে ফনুর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই বলে সে-বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। একটা-দুটো চোখের সামনে দিয়ে যখন পালিয়ে গেল তখন সে একটা বিচিত্র হাসি হেসে বললে, যা বেটা, ভাগ। কপালে তোর মরণ নাই, আমি কি মারবার পারি?

কর্দমাক্ত কালো নগ্ন দেহে ফনু যখন আবার তীরে উঠে এল তখন দেখল যে, অদূরে বাবলাগাছের তলায় কে একটি লোক বসে। দেখেই কেমন সন্দেহ হয় তার, তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে চোখ।

লোকটি নিশ্চল হয়ে বসে আছে। ডান পাশে একটি কাপড়ের পুঁটলি, বসার ভঙ্গিতে শ্রান্ত মুসাফিরের ভাব। দেখেশুনে সন্দেহটা কিছু কমলে লুঙ্গি দিয়ে ভেজা-গা মুছতে-মুছতে ফন এগিয়ে যায়। নিকটে গিয়ে দাঁড়িয়েও কয়েক মুহূর্ত শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে তাকে, তারপর ভূমিকা না-করেই সরাসরি বলে, দেও গো বিড়িগা।

লোকটির ভুরুতে পথের ধুলো। চোখ আধা-বুজে গাল ভরে ধোঁয়া ছাড়ে। এবার শেষ টান মেরে ফনুকে বিড়িটা দেয়। তারপর গতর চুলকে হাই তুলে প্রশ্ন করে,

—কোন্ হানো তোর বাড়ি?

হাত প্রসারিত করে একসঙ্গে চতুর্দিকে দেখিয়ে ফনু বলে,

—ওই হানো। তারপর দূরে তাকিয়ে ঘন ঘন বিড়ি টানতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর হাত দিয়ে দূরে ইঙ্গিত করে বলে,

—মাইনষে কয় এইবার হেইহানো চর পড়ব। হেই চরে আমি ঘর বান্ধুম।

লোকটি কোনো কথা কয় না। কিন্তু কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে একটা আস্ত বিড়ি দেয় ফনুকে। বলে,

—যাবি আমার লগে?

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায় ফনু। আবার চোখে ফুটে ওঠে সে-সন্দেহ, আর সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র ইন্দ্রিয় যেন সজাগ হয়ে ওঠে। শেষে রুদ্ধনিশ্বাসে বলে,

—কোন্ হানো?

—শহরে।

ফনু সাবধানী ছেলে। সাত-পাঁচ না ভেবে কথা কয় না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সব ভাবনা যেন কেমন গোল পাকিয়ে যায়। দম খিঁচে ফনু বলে,

—যামু।

অল্পক্ষণ পর আকাশভরা কড়া রোদের তলে দুটি মূর্তি—একটা লম্বা আরেকটি বেঁটে—পথের ধুলো উড়িয়ে রামগঞ্জ অভিমুখে রওনা হয়। গ্রাম হয়েই পথ। সেই সুযোগে ফনু নানির

বাড়িতে জাল ও মাছের চাইটা রেখে যায়। নানিকে বলে, তুমি রান্ধ, আমি এই আইলাম বইলা। তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এসে বাঁশঝাড়ের কাছে অপেক্ষমাণ মুসাফিরের সাথে মিলিত হয়। ফনুর পা ডিগডিগিয়ে যেতে চায়, কিন্তু লোকটির যেন তেমন উৎসাহ নেই। লক্কড় ঘোড়ার মতো সে ধুঁকে-ধুঁকে চলে।

লোকটির নাম তোফাজ্জল। ভাগ্যের সন্ধানে সে ঘুরছে। পথ থেকে ফনুকে কুড়িয়ে ওকে যে সঙ্গী করেছে—তার পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে, যদিও ফনুকে এ-পর্যন্ত সে-বিষয়ে সে বলে নি কিছু। যে-শহর অভিমুখে তারা চলেছে সে-শহরের মহকুমা-হাকিমের চাপরাসি তার গ্রামের মানুষ, দূরসম্পর্কের কুটুম্বও বটে, সেই তাকে খবর দিয়েছে যে ফৌজদারি আদালতে পিয়ন নেয়া হচ্ছে আর একথাও বলেছে মহকুমা-হাকিমের ফুট-ফরমাশ খাটবার জন্য এক ছোকরা-চাকরের প্রয়োজন। দুই-দুইএ চার করে তোফাজ্জল দেখেছে যে, একটি ছোকরা-চাকর নিয়ে দিতে পারলে চাপরাসি দোস্তটি হয়তো হাকিমের সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দেবার একটা চমৎকার সুযোগ পাবে। তারপর একবার পরিচয় হলে কথায়-কথায় আরজিটা পেশ করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

শহরে এসে গাঁয়ের ঘেয়ো কুকুরটার মতো একটা নেড়ি কুকুর দেখে ফনুর মনটা কেমন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। অতখানি পথ পেরিয়ে অজানা জায়গায় আসতে-আসতে তার মনটা কেমন শংকাকুল হয়ে উঠেছিল, নেড়ি কুকুরটা দেখে তার সে-ভাবটা কাটল। তোফাজ্জলকে খোঁচা দিয়ে হেসে বলে,

—আমাগো লেড়ি কুত্তা গো।

কাছারিতে পৌঁছে ফনুকে একবার দম খিঁচতে হল। লাল ইটের কাছারি-দালানের সামনে কত যুগের পায়ের ঘষায়-ঘষায় নেড়া-হয়ে-ওঠা উঠানটিতে লোকের ভিড়, হই-হট্টগোল। এরই মধ্যে থেকে-থেকে কে বিচিত্র গলায় মানুষের নাম ডেকে-ডেকে উঠছে। তাছাড়া বড় বটগাছটির তলে চৌকিতে বসে চশমা-আঁটা লোকেরা কত কী লেখাপড়া করছে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটলে ফনু খাতিরজমা গলায় প্রশ্ন করে,

—এটা কী জায়গা গো?

লোকটি কোনো উত্তর দেয় না। শহরে পৌঁছে সে যেন কেমন হয়ে গেছে। ফনুর কথা তার খেয়ালেই নেই যেন।

লোকটি আসলে কাকে যেন খোঁজে। অবশেষে ভিড়ের মধ্যে বিচিত্র পোশাক-পরা একটি লোককে খুঁজে বের করে মুহূর্তের মধ্যে সে বাচাল হয়ে ওঠে। তার চোখ চকচক করে, শ্রান্ত দেহে প্রাণের বন্যা বয়, আর মুখ দিয়ে হড়হড়িয়ে কথা বেরুতে থাকে। এর সঙ্গে দেখা করার জন্যই যেন পথের ধুলো উড়িয়ে রোদ মাথায় করে এত পথ অতিক্রম করে এসেছে।

তোফাজ্জলের দোস্ত জুম্মুন চাপরাসি হঠাৎ ফনুর পানে তাকিয়ে খনখনে গলায় প্রশ্ন করে,

—তোর নাম কী ছ্যামড়া?

কথার ধরন দেখে ফনু ভাবে উত্তর দেবে কি দেবে না, কিন্তু শেষে দেয় না। তোফাজ্জলই তার পক্ষ হয়ে বলে,

—কলিমুদ্দি ভুঁইঞা।

—ভুইঞা? শুনে চাপরাসি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে।—ভুঁইঞা? জমিজোত আছে নি এক গণ্ডা?

ফনু চুপ। চাপরাসি আবার প্রশ্ন করে,

—বাসাবাড়িৎ ফুট-ফরমাইশের কাম করবি নি?

ফনুর মুখে রা নেই। আবার তোফাজ্জলই বলে,

—করব না ক্যান, একশোবার করব!

চাপরাসি ফনুর পানে চেয়ে বলে,

—সাহেব কলাম এ-জাগার হাকিম। কাম কইরা সুখ পাইবি। মাছভাত খাইয়া শার্টগেঞ্জি পইরা বাবু হইয়া ঘুরবি। কাম আবার কী?

গলা চড়িয়ে তোফাজ্জল বলে,

—হে কাম করব। করব না ক্যান? একশোবার করব।

বিকালের দিকে জুম্মুন চাপরাসির সঙ্গে তোফাজ্জল ও ফনু রওয়ানা হয় হাকিমের বাড়ি-অভিমুখে। ফনুর খুব যে উৎসাহ বোধ হচ্ছিল তা নয়। ব্যাপারটা সম্যকভাবে না বুঝলেও নিজেকে কেমন কোরবানির ছাগলের মতো মনে হয়। তবে শহরে এসে অবধি তার কৌতূহল এত চাড়িয়ে উঠেছে যে, তার স্বভাব-খাস্‌লতের তাগিদ কেমন ধামাচাপা হয়ে আছে যেন।

চাপরাসি ঝাঁ-ঝাঁ করে কথা কয়। যেতে-যেতে ফনুকে সে বিস্তর আদব-কায়দা শেখায়। সাহেবকে গিয়ে এইভাবে সালাম ঠুকবি, এইভাবে দাঁড়াবি, আর এমনভাবে কথা বলবি যাতে সাহেব তোকে বোকাও না ভাবেন, অতি চালাকও না ভাবেন।

ফনু শোনে আর জবাবগুলো পেটেই চেপে রাখে। মুখে আজ একবার খিল দিয়েছে সে-খিল সহজে খুলবে না।

—সাহেব কলাম হাকিম, পুলিশের বাবা। তেরিবেরি করলে মুশকিল। খেয়াল রাখিস হেই কথা।

কথাটা মোটেই সুবিধার মনে হয় না ফনুর। যে-পুলিশকে তার এত না-পসন্দ, খামাখা সে-পুলিশের কথা কেন? হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো তার সে-মজ্জাগত তাগিদটা—পেছন ফিরে চোঁ-চা দৌড় দেবার—সে-তাগিদটা মনে ঝিলিক দিয়ে ওঠে, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও নানির বাড়ির কেল্লা নেই বলে সে নিজেকে কোনোমতে নিরস্ত করে। আসলে, সত্যি বলতে কী, শহরে এসে তার কৌতূহলটা এমন উত্তেজনাময় হয়ে উঠেছে যে, এই মুহূর্তে পুলিশ-চৌকিদারের কথা তার মনে তেমন ভীতির দাগ কাটতে পারছে না।

লোকটির ফরফরানির অন্ত নাই। অবশেষে সে ফনুর নীরবতা নিয়েও ব্যঙ্গ করে।

—কী গো তফু, পোলাটি বোবা নাকি?

ফনু এবারো কথা কয় না বটে, কিন্তু তার উক্তি শুনে চোখে আগুনের স্ফুলিঙ্গ জাগে।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছলে ফনু অবাক হয়ে দেখে পাশের সঙ্গী দু-জন হঠাৎ কেমন যেন চুপসে গেছে। কেমন একটা সন্ত্রস্ত ভাব, আর গলা নেবে গেছে খাদে।

মরা বাগানের মধ্যে একটি দালান; বড়-বড় থাম্বার ওপর হল। তারই বারান্দায় ক্যানভাসের ঢালু চেয়ারে আধা-শোয়া হয়ে বসে একটি দাড়িওয়ালা লোক, পরনে তাঁর লুঙ্গি। তাঁকে দেখে কয়েক পলকের মধ্যে গাঁয়ের আফজল মোল্লা বলে ভুল করে ফনু। এই সময়ে চাপরাসি গুঁতো দেয় এবং গুঁতো খেয়ে ফনু বোঝে যে, লোকটি অবিকল আফজল মোল্লার মতো দেখালেও আসলে হাকিম, পুলিশের জন্মদাতা। যথারীতিভাবে সে সালাম করে, করে আড়চোখে একবার চাপরাসির পানে তাকায়। ভাবটা এই : দেখলে-তো কেমন সালাম করতে জানি। তুমি আবার তখন শেখাচ্ছিলে।

দাড়িতে হাত বুলিয়ে বাজখাঁই গলায় হাকিম প্রশ্ন করেন,

—বাড়ি কোথায়?

ফনু আশা করেছিল—গাঁয়ের আফজল মোল্লার মতো দেখতে যে, তার গলাটাও তেমনি মিহি হবে। কাজেই অমন বাজখাঁই গলা শুনে সে চমকে ওঠে। তারপর বলে,

—হাতিমপুর।

তোফাজ্জল তাড়াতাড়ি থানা-সাকিনের বিবরণ দিয়ে ফনুর জন্মস্থান বিশদভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে এমন সময় আবার বাজখাঁই গলায় হাকিম প্রশ্ন করেন,

—এ-লোকটি কে?

গলে গিয়ে চাপরাসি বলে,

—হুজুর, এই হল আমার কুটুম। হেই-ই তো হুজুর কষ্ট কইরা ছ্যামড়াগারে নিয়া আসছে দ্যাশের থন্।

কথা শেষ হবার আগেই হাকিম কৌতূহল হারিয়ে ফেলেন। আবার ফনুর পানে চেয়ে বলেন,

—কী রে, কাম কাজ করবি?

দ্বিধা না করে ফনু ঘাড় নেড়ে জানায়, সে করবে। কিন্তু জুম্মুন ধমকে ওঠে : বল্, জি হুজুর। মুখে কী হয়েছে? তারপর হাকিমের কাছে বিগলিত কণ্ঠে কৈফিয়ত দিয়ে বলে, গাঁইয়া পোলা হুজুর, আদব-কায়দা জানে না। কিন্তু বড়ই চটপইটা। কওনের আগে তীরের নাগাল ছোটে।

শুনে ফনুর অন্তরাত্মা রি রি করে জ্বলে। ফনু কাজে বহাল হয়। কিন্তু কাজ করতে মুশকিলে পড়ে। ফুট-ফরমাশ করা যে কী কাজ সেটা তার পরিষ্কার জানা ছিল না। ফলে সারাক্ষণ সে এর-ওর কথা শোনে : বিবি সাহেব বলেন, এটা আন, ওটা কর, বা কাপড়টা ঘরে তোল; সাহেবের ছেলে বলে, সাবানটা দে, পেনসিলটা আন্। সে সব কাজই করে আর আসল কাজের অপেক্ষায় থাকে।

কিন্তু ফনু চালাক ছেলে। ক্রমে-ক্রমে সে সব বোঝে। যেমন বোঝে যে গাঁয়ের আফজল মোল্লাকে এবং পুলিশের জন্মদাতা নামে অভিহিত ব্যক্তিটিকে চেহারায় একরকম দেখালেও দু-জনের মধ্যে কত আকাশ-পাতাল তফাত।

লোকগুলো মোটামুটি ভালোই। কিন্তু একটি লোককে তার বড় না-পসন্দ। সে হল বাবুর্চি। নারকেলের ছিবড়ার মতো শুষ্ক ও খসখসে সে। চুলার ধারে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ আগুনের তাতে তেতে গজগজ করে, সাহেব-বিবিদের নিয়ে মুখখিস্তি করে। তাতে ফনুর কিছু আসে যায় না। কিন্তু তার প্রতি বাবুর্চির যেন কেমন একটা অপরিসীম অবজ্ঞার ভাব। তাছাড়া যখন-তখন ধমকে ওঠে তার ওপর। অবশ্য মাঝে-মাঝে মেজাজটা তার সরস হয়ে ওঠে। বিশেষ করে দুপুরে কাজকর্ম শেষ করে খেয়ে-দেয়ে তেল জবজবে মাথায় টেরি কেটে কালচেটে বালিশে মাথা ঢেলে সে যখন গুনগুন করে গীত ধরে। কোনো-কোনো দিন রাতে কুপির আলোয় পাতাছেঁড়া জরাজীর্ণ পুঁথিটা নিয়ে বসলেও কেমন নরম হয়ে ওঠে সে। সে সুর করে পড়ে আর ফনু শোনে। রাজা-উজির-বাদশার কথা, ফকিরের কেরামতির কথা, সুন্দরী শাহজাদীর মহব্বতের কথা। ফনু মুগ্ধ হয়ে শোনে। শুনতে-শুনতে অকারণে নানির কথা ঝিলিক দিয়ে ওঠে মনে, চিনচিন করে বুকটা। ভাবের আয়েশে বাবুর্চি যখন ফনুকে অকস্মাৎ জড়িয়ে ধরে তখন তার স্বপ্ন ভাঙে। তড়াক করে উঠে বসে রীতিমতো মারাত্মক গলায় প্রশ্ন করে,

—কী ভাবছ মিঞা?

বাবুর্চির তখন শত কথায়ও রা নেই। অন্ধকারের মধ্যে কেমন হে-হে করে হাসে। মুনসেফ বাড়ির কাদেরের সঙ্গে তার দোস্তানি হয়। ছেলেটি দেখতে ক্যাবলামতো, ডামিশ মার্কা! মুনসেফবিবি কঞ্জুস মানুষ, আর তাঁর হৃদয় মায়াদয়াহীন। কথায়-কথায় গালিগালাজ করেন। দুধ খেয়ে বেড়াল হয়তো তখন দরজার আড়ালে জিব দিয়ে গোঁফ চাটছে, তবু তিনি বলবেন কাদেরই দুধ খেয়েছে। কাদেরকে কখনো বলেন ল্যাচ্ছড়, কখনো খ্যাচ্চড়! অবশ্য কাদের সুযোগ-সুবিধা পেলে, বিশেষ করে ক্ষিধে পেলে যে এটাসেটা মুখে না-দেয় তা নয়, কিন্তু তাই বলে অত থাবড়া-পিট্টি খাবে কেন?

ফনুর চোখ জ্বলে ওঠে। বলে,

—আহো ক্যান ওই মরার জায়গায়?

কিন্তু না থেকে তার উপায় কী। ওর বাপ বড় গরিব মানুষ। মনিবের হাতে-পায়ে ধরে কেঁদে-কেটে কাদেরকে গছিয়ে দিয়ে গেছে। দুবার পালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু দুবারই তার বাপ

ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। নিজে খেতে পাক-না-পাক, নিজের রক্তের ছেলেকে কী করে না খেয়ে মরতে দেখতে পারে। সে বলে যে হাকিমের বাসায় চড়চট্‌কানির সঙ্গে দুবেলা খেতেও-তো পায়। দ্বিতীয়বার কাদেরকে ফিরিয়ে দিতে এলে সাহেব কিছুতেই তাকে নেবেন না। বলেন, বজ্জাত ছেলে, ওকে কিছুতেই নেব না। শেষে কাদেরের বাপ ছেলের পক্ষ হয়ে নিজেই বারকয়েক নাকে খত দেয়।

ফনু চুপচাপ সব শোনে। দুপুরের শান্ত নীরবতায় দূরে ঘুঘু ডাকে, নিমগাছে হাওয়া বয়। অবশেষে ফনু মতলব আঁটে। ওরা পালিয়ে যাবে দূরে কোথাও। এই ফাঁকে দেশের নদীর চরটার কথাও বলে ফনু। লোকে বলে চরটা পড়বেই। সে-চরে তারা ঘর বাঁধবে, ক্ষেত-গেরস্তি করবে।

বাবুর্চির সঙ্গে তার একদিন খিটিমিটি লেগে যায়। বাবুর্চি কালো দাঁত দেখিয়ে তিক্তভাবে গালিগালাজ করে, ফনুও হাঁ করে এগিয়ে যায় তাকে কামড়ে দেবার জন্য। শেষে পিঠে এক কনুই বসিয়ে বাবুর্চি যখন দিনে-দুপুরেও তার চোখে তারা ফুটিয়ে দেয় তখন সে বোঝে এখানে তার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তবে যাবার আগে তাকে দেখিয়ে দিয়ে যেতে হবে কদিনে মাস হয়। সেই জন্যই সে চুপ করে থাকে, একটি কথাও বলে না।

সেদিন রাতে বাবুর্চি যখন ঘুমিয়েছে তখন তার মাথায় আস্ত একটা ইট ছেড়ে লুঙ্গি তুলে খিড়কির পথে ফনু দেয় ছুট। অবশ্য সে যদি জানত যে অন্ধকারের জন্য আর উত্তেজনার জন্য ইটটা ঠিক বাবুর্চির মাথায় না-পড়ে পড়েছে তেলজবজবে বালিশের ওপর, এবং বালিশের ওপর পড়েছে বলে কোনো আওয়াজ না হওয়ায় বাবুর্চির গভীর নিদ্রার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয় নি, তাহলে সে এক ছুটে মাইলখানেক চলে আসতে পারত কি না সন্দেহ।

যে-পথ ফনু ধরেছিল সে-পথ দিয়ে নাক বরাবর চললেই ঠিক নানির বাড়ি পৌঁছানো যেত। কিন্তু মাঝে নদীতে সে আটকে গেল। আসবার সময় তোফাজ্জল খেয়ার ভাড়া দিয়েছে, কিন্তু এবার পার হয় কী করে? তার পকেটে কানাকড়িও নেই যে সে পারানির ভাড়া দেবে।

জায়গাটা গঞ্জ। ধান ও পাটের আড়তের জন্য জোর ব্যবসা। ঘাটে বড়-বড় গোপালপুরী নৌকা, ক্রেতা-বিক্রেতা, দালাল ও মহাজনদের ভিড়। কত লোক পারাপার হয় ঘণ্টায়-ঘণ্টায়। কিন্তু ফনু পার হতে পারে না।

ফনু ঠেকেই গেল। নদী পেরুবার অনেক রকম চেষ্টা করে কিন্তু কোনোটাতে সফল হয় না। ছাউনিশূন্য চ্যাপ্‌টা খেয়া নৌকার গাট্টাগোট্টা হিন্দুস্তানি মাঝিদের বুকের ছাতি দেখেই এগুতে ভরসা হয় না, তবু সাহসী ছেলে ফনু তাকে গিয়ে প্রশ্ন করে যে, কোনো লোক যদি পয়সাশূন্য অবস্থায় ঠেকে যায় তাকে তারা দয়া করে পার করে কি না। লোকটি নির্বিকার বসে খইনি টেপে, একবার তাকায়ও না ফনুর পানে। খেয়া-নৌকা ছাড়া অন্য নৌকাও যাত্রী নিয়ে ওপারে যায়। তাদের একটির মাঝিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, একটি লোক হঠাৎ বেকায়দায় পড়েছে, তার ওপর দয়াপরবশ হয়ে তাকে ওপারে নিয়ে যাবে কি না। এক মাঝি পারের পানে চেয়ে শকুনের মতো যাত্রী খোঁজে, আরেকজন উবু হয়ে বসে কল্কিতে ফুঁ দেয়। কেউ কোনো কথা কয় না।

এদিকে বেলা বাড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে পেটের জ্বালাও নিদারুণ রকমে বাড়তে থাকে। শুধু ক্ষিধে নয়, তৃষ্ণায়ও বুকের ভেতরটা শুকিয়ে টান হয়ে থাকে। তবে পানির অভাব কী। সামনে নদী। জোড়াহাত ভরে-ভরে গলাপরিমাণ পানি খেয়ে ফনু যখন উঠে দাঁড়ায় তখন মাথা ঝিমঝিম করে আর চোখের সামনে অপর তীর ঘোলাটে হয়ে ওঠে। তবে ভেতরটা ভালোই লাগে। কাঠফাটা জ্যৈষ্ঠ মাসের মাটির মতো হয়ে উঠেছিল দেহ। সে-দেহের শিরা-উপশিরায় শিরশির করে ছড়িয়ে গেছে শীতল পানি। নানি হামেশা বঁলে, পানি খোদার নেয়ামত। ফনু এখন তৃপ্ত আরামে বলে, খোদা তোমার নেয়ামত খাইলাম। বলে নানির মতো দু-হাত

তুলে মোনাজাতের ভঙ্গি করে।

খোদা নিশ্চয় খুশি হন, নইলে ঠিক এই সময়ে নাইওর-যাত্রী কিশোরী বউ কুলসুমের ডুলিটা কেন ঘাটে এসে পৌঁছবে। ডুলির পাশে প্রৌঢ় মজিদ। হাতে এক কাঁড়ি কলা, একটা জলজলে কাতল মাছ আর বগলে বিবর্ণ ক্যানভাসের জুতাজোড়া। ডুলির পেছনে নিরীহ চেহারার একটা কুকুরও ছিল। (এক ক্রোশ আগে পঞ্চবটি গাছের তলা থেকে পিছু নিয়েছে কুকুরটা। কেন কে জানে। হয়তো মাছের লোভে বা ক্যানভাসের জুতোজোড়াটির লোভে। কিন্তু তার চেহারা দেখে সে-কথা বুঝবার উপায় নেই। সারাপথ জিব বের করে ধুঁকতে-ধুঁকতে এসেছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে কুলসুমের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে ক-বার। দেখে কুলসুম ভেবেছে, বেশ হয়েছে। তার শ্বশুরবাড়ি থেকে যাচ্ছে দু-জন লোক। একজন মজিদ, আর ঐ কুকুর।)

ফনু যে-কারণে আকৃষ্ট হয় এ-ক্ষুদ্র নাইওর-যাত্রী দলটির প্রতি, তার প্রধান কারণ হয়তো মর্তমান কলার কাঁড়িটা। মাছটা দেখে কেবল তারিফ করে। আরাঁধা মাছ দেখে তার জিব দিয়ে-তো লালা পড়তে পারে না। আড়চোখে ফনু কুকুরটার পানে তাকায়। উত্তরে একবার সে অকারণে লেজটা নাড়ে।

খেয়া তখন ওপারে। ডুলির কাছে মাছটা ও কলার কাঁড়িটা নাবিয়ে রেখে মজিদ ঘাটের দোকানে যায় বিড়ি কিনতে, আর বাহকরা অদূরে গাছের ছায়ায় বসে কাঁধের গামছা দিয়ে গায়ে হাওয়া করে। ক্ষেত্র পরিষ্কার দেখে কুলসুম কচ্ছপের সন্তর্পণতায় পর্দা ফাঁক করে।

সামনেই দাঁড়িয়ে তখন ফনু। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে কুলসুম। তারপর হঠাৎ অন্তরে তার মায়ার ঝড় জাগে। ইশারা করে কাছে ডাকে ফনুকে। ফনুর স্বভাবগত সন্দিগ্ধ মন একটুতেই সজাগ হয়ে ওঠে, কিন্তু এখন ফনু আর সে-ফনু নেই। কতক্ষণ তবু ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে সে লকলকিয়ে এগিয়ে আসে। বলে,

—কী কও?

কী বলবে ভেবে না পেয়েই হয়তো কুলসুম কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে,

—কেলা খাবি?

কেলা খাওয়া নানারকম হতে পারে। তাই সাবধানী ফনু টক করে জবাব দেয় না। দুজনে কেবল চোখাচোখি করে। অবশেষে ফনুর চোখ ছলছল করে ওঠে। দ্বিরুক্তি না করে সরাসরি মাথা নেড়ে জানায়, খাবে।

কাঁড়িটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে কুলসুম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায় ফনুর পানে, তারপর কাত করে তার থেকে একটা কলা ছেঁড়ে। লাল-নীল কাচের চুড়িভরা পাতলা হাতটি ফনুর দিকে ক্ষিপ্রভাবে বাড়িয়ে দিয়েই গলায় কেমন উত্তেজনা বোধ করে। কাঁপা গলায় বলে,

—খা।

কলা নিয়ে ফনু একবার মুখ বিকৃত করে। কাঁচা শক্ত কলা। কলিমুদ্দি ভুঁইঞা এমন কলা খায় না। তারপর মুখ আরো বিকৃত করে খোসা ছাড়িয়ে মুখে দেয় সেটা। পাশে কুকুরটা তখন পায়ে ভর দিয়ে বসে জিবটা ঝুলিয়ে হাঁপাচ্ছে—চোখে এমন একটা ভাব যে বুঝবার উপায় নেই এ-দৃশ্যে সে মোটেই আকৃষ্ট কি না। কুলসুম তার পানে চেয়ে একবার জিব বের করে ভেংচি কাটে। কুকুরটা নির্লিপ্তভাবেই সহ্য করে অপমানটা। ঝুলন্ত জিহ্বা টেনে নিয়ে মুখে সঞ্চিত লালা গিলে আবার হাঁপাতে থাকে।

ফনু হঠাৎ হাসে। যেমন এক যুগ পরে হাসে। তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে কুলসুমের পানে কেমন দৃষ্টিতে তাকায়। বলে,

—খাইছি কেলা।

কুলসুম গম্ভীর হয়ে ওঠে। হঠাৎ কঠিনভাবে বলে,

—বাস্, আর পাইবি না।

ফনু ক্ষুণ্ন হয়। বলে,

—আমি কি আর চাইছি, চাইছি?

একটু পরে ফনু অন্য একটা জিনিস চায়। বলে,

—আমারে চাইরটা পয়সা দেও—নদী পারামু। থেমে কঠিন গলায় বলে,—না দিলে নদীৎ ঝাঁপ দিমু।

পয়সা বস্তুটা কুলসুমের কাছে স্বর্ণালঙ্কারের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। তার কারণ প্রথমটা দেখে না, এবং দ্বিতীয়টি দেখলেও এত কম দেখে যে, না দেখারই মতো। বর্তমানে তার লাল শাড়ির খসখসে আঁচলে ছ-টি আনা বাঁধা ছিল। কিন্তু সেইটে বের করে তার কিছু ভাগ কাউকে দেয়া সহজ কথা নয়।

কতক্ষণ চুপ থেকে হঠাৎ একটা উৎসাহে কুলসুমের মুখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। ক্ষিপ্র গলায় বলে,

—আয়, এই ভিত্‌রে আইয়া বয়। কেও দেখব না। যে-ডুলিতে চড়ে কুলসুম নাইওর যাচ্ছে সেটা এমন বড় কিছু যান নয়। বাঁশের ফ্রেমে তাঁবুর মতো কৌণিক অতি সংকীর্ণ একটা ব্যাপার। পর্দার ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে ফনু ভেতরটা একবার দেখে কোনোপ্রকার উৎসাহ বোধ করে না।

তার নিরুৎসাহ ভাব দেখে কুলসুম হঠাৎ ভয়ানক তাড়া দিয়ে বলে,

—আয়, জলদি আয়, ওরা আবার আইয়া পড়ব নি।

মুখ যুগপৎ কালো ও তেড়া করে ফনু জবাব দেয়,

—তার চাইয়া আমারে পয়সা দেও। আমি কি মাইনষের বউ যে ডুলিৎ চইরা যামু?

কয়েক মুহূর্ত কুলসুম বোঝে না কী করবে। পয়সা দেয়া যায় না, কিন্তু কী করে তাকে পার করে? আরেকবার সে বিচিত্র কর্তৃত্বের কণ্ঠে ধমকে বলে,

—আয় ছ্যামড়া, আইয়া বয় ভিতরে।

ফনু অনড়। এমন একটা ভাব যে, নদীর ওপারে না যেয়ে মরতে হলেও সে ডুলিতে চড়বে না।

এমন সময় গাছের তলা থেকে ষণ্ডামার্কা বাহক দুটি উঠে দাঁড়ায়। বোঝা গেল মজিদ আসছে এদিকে, খেয়া-নৌকাও এ-পারে এসে পৌঁছেছে নিশ্চয়। ঝট করে ডুলির পর্দা সরে গেল।

যাবার আগে একটা ছোটখাটো কাণ্ড হল। কলার কাঁড়ির পানে তাকিয়ে মজিদ চেঁচিয়ে ওঠে,

—কেলা খাইছে কে?

বাহক কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ভেতর থেকে কিশোরী বউ কুলসুম ক্যাঁ-ক্যাঁ করে উঠল। মজিদ পর্দার কাছে মুখ নিতেই সে আবার বলে,

—আমিতেই খাইছি। ভুক লাগছিল, তাই খাইছি।

কথাটা মজিদের বিশ্বাস হয় না। এধার-ওধার তাকায় সন্দিগ্ধভাবে। ফনু তখন অনেক দূরে। কুকুরটা কেবল পাশে বসে আছে। তার ওপর মজিদের চোখ পড়তেই সে একবার লেজটা নেড়ে দেয়।

পথঘাট দেখে চুপ হয়ে যায় মজিদ। কিন্তু রাগে গরগর করতে থাকে ভেতরটা।

নৌকা তখন মাঝ-নদীতে। অতি সন্তর্পণে পর্দাটা ঈষৎ সরিয়ে ফেলে-আসা তীরের পানে সে তাকায়। ফাঁকা তীরে প্রথমেই নজর পড়ে কুকুরটার পানে। তীরে বসে কেমন তাকিয়ে আছে খেয়া-নৌকাটির দিকে। জিব বের করে তখনো তেমনি হাঁপাচ্ছে। দেখে কুলসুমের বুকে দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ো হাওয়া জাগে। ভাবে, আহা বেচারা! মানুষ হলে হয়তো বুক ভাসিয়ে কাঁদত।

সত্যিকার মানুষ ফনু তখন গুম হয়ে আছে। নির্মল আকাশে কড়া উজ্জ্বল রোদ। কিন্তু এত আলো তার চোখে অন্ধকার হয়ে ওঠে, এবং সে-অন্ধকারে জীবনে প্রথম একটি কথা বোঝে। বোঝে, নানির বাড়ির কেল্লাটা একটি আস্ত ভুয়ো কথা। আসল জীবনের নির্মমতা থেকে ওখানে পালিয়ে বাঁচা যায় না।

অদূরে খেয়ার মালিক সামনে পয়সাভর্তি হাতবাক্স নিয়ে স্থূল দেহটা শিথিল করে একটু চোখ বোজে। নাকে আওয়াজ হয়, ভুঁড়ি ধীরে-ধীরে ওঠে-নাবে। তার একটু সামনেই একটি ছেলের জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের যে সূত্রপাত হয় সে-খবর পায় না।

আশ্বিন ১৩৫৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯

না কান্দে বুবু

সোনাকান্দি হতে মাঝের হাট দূর নয়। কিন্তু বর্ষায় নৌকা ছাড়া গতি নেই। তখন এ-পথটা অতিক্রম করতে গোটা একদিন লেগে যায়। এ-নদী সে-নদী; এ-খাল সে-নালা। স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ পানির আর মাছের, কচুরিপানার আর ধানের; নৌকায় ভরাট গন্ধ ভেজা কাঠের, ডহরের পানির আর খাম্বুরি তামাকের। আকাশের বর্ষাশেষের শ্রান্ত মেঘ নিস্তেজভাবে ঘোরে। হাওয়া নেই। পালশূন্য শ্লথগতি পানসি-ঘাসী-গয়না ও ডিঙির আর তেজের গরম নেই। এত পানি আর দিগন্তপ্রসারী খোলামেলা প্রসারতার মধ্যেও দমবন্ধ-করা ভাব। হঠাৎ কখনো-সখনো একটু হাওয়া যদি আসে চুড়ির মতো মিহিন ঢেউ তুলে পানিতে, বড় ভালো লাগে। দেহ শীতল হয়।

নৌকা আর নদী আর প্রসারতা আর মেঘ কেউ দেখে না। পথটা বাড়ির : এ-বাড়ির পথ বদলায় না। এ-বাড়ির পথ জীবন। কেবল কখনো শ্লথগতি, হাওয়া নেই বলে পাল ওড়ে না; আবার কখনো ঢেউ-ভাঙানো তেজময় গতি, পাল ফুলে থাকে হাওয়া আছে বলে। কখনো ঘুম পায়। কখনো খড়ের বিছানায় শুয়ে ছইয়ের ভেতরে দুলতে-থাকা থলে হুঁকার পানে তাকিয়েই থাকতে হয়। মাঝি ভাবে না, মাঝির ছেলেটা ভাবে না। যে-মেঘ নিস্তেজ সে-মেঘ দেখে না; যে-পানিতে সে-নিস্তেজ মেঘের ছায়া সে-পানি দেখে না। কখনো-সখনো নড়ে বসে কেবল খাম্বুরি তামাক খায় আর তার কড়া গন্ধ ভেসে আসে ছইয়ের ভেতর।

এ-পথ বাড়ির।

আফতাব ভাবে, চার বছর। চার বছর পরে বাড়ি যাচ্ছে। কলাপাতা-ঘেরা আম-জাম-গাছের ধারে, খাল-বিল নালা-ডোবার পাশে শতসহস্র ঘনবসতির মধ্যে বসবাস-করা লোকদের জন্য চার বছর পরে বাড়ি যাওয়াটা বড় কথা। সে-কথা পুঁথির কাহিনীর মতো দেশময় ছড়িয়ে পড়বার মতো অসাধারণ, নাড়ি ছেঁড়ার মতো গায়র-মামুলি।

—আফতাব মিঞা দ্যাশে থাকে না, দ্যাশে আসে না। আফতাব মিঞা চাইর বচ্ছর দ্যাশে থাকে না, দ্যাশে আসে না। শহরে থাকে। হেই বড় শহরে। আফতাব মিঞা গাড়ি-ঘোড়ায় চলে। আফতাব মিঞা সিদ্ধভাত খায়, বরফের মাছ খায়। আফতাব মিঞা রঙে আছে।

খেদু মিঞা দাঁতের মাজন বিক্রি করে ঢং করে বক্তৃতা দিয়ে, হাত সাফাইয়ের ম্যাজিক দেখিয়ে। খেদু মিঞা সে-শহরের খবর রাখে। আফতাব মিঞা হেই শহরে থাকে। চার বচ্ছর আফতাব মিঞা দ্যাশে থাকে না, দ্যাশে আসে না।

—শহরে থাইকা আফতাব মিঞা বাড়িৎ কেবল টেকা পাঠায়। বাড়িৎ আছে নুনা মিঞা,

তার বুড়া বাপ। বুড়া জমিজমা দ্যাখে আর বাতের ব্যথায় কঁকায়। চোখে ছানি পড়ছে; কিন্তুক বুড়া মানে না সে-কথা, স্বীকার করে না সে-কথা। মায়ের কবর পুকুরের পাড়ে গাবগাছটার তলে।

—আফতাব মিঞা শহরে থাকে; কিন্তু নুনা মিঞা দ্যাশে থাকে। পোস্টকার্ডে চিঠি ল্যাখে ছেলের কাছে আর ছেলের গল্প করে। আর নুনা মিঞা আফসোস করে। ছেলেডা আসে-আসে বলে, কিন্তু আসে না।

—আফতাব মিঞা কিন্তু কাবেল ছেলে। চাকরি করে আর বই বাঁধানোর দোকান চালায়। তাই আফতাব মিঞা দ্যাশে আসে না। আফতাব মিঞার সময় নাই, ছুটি নাই। আফতাব মিঞা চাকরিও করে ব্যবসাও করে।

দেশের বাড়িতে আর আছে বুবু। মানুষের জীবনে কী হয় বোঝা যায় না। বুবুর বিয়ে হল, বুবু নাইওর এল, বুবু শ্বশুরবাড়ি গেল। বুবুর ঘোমটা খুলল, বুবু সংসার গড়ল আরেক মানুষের ঘরে, বুবুর ছেলে-মেয়ে হল। বুবু মাছ ছাড়াল পুকুরে, আমগাছে আম গুনল। সন্ধ্যার পরেও বুবু কুপি হাতে খড়ম পরে গোয়ালে গরু দেখল, মুরগির খোঁয়াড়ে ঝাপ আছে কি না দেখল। তারপর বুবুর দাড়িওয়ালা স্বামীটা মারা গেল।

—জোতজমি আছিল। সেয়ানা লোকডা। ধড়াস্ কইরা মারা গ্যাল। মস্ত বড় মদ্দ মানুষ, হেই জোয়ান। কাতলার মতো মুখ হা কইরা ধড়াস করি মারা গ্যাল চক্ষের সামনে।

বুবু আর মাছ ছাড়ায় না, আমগাছে আম গোনে না।

—নুনা মিঞার মাইয়া সাদা শাড়ি পরে হিন্দুগো মতো। চোখে ছানিপড়া বুড়া বাপের সংসারডা দ্যাখে। নুনা মিঞার মাইয়ার নাকফুলের গর্তে বাঁশের ছিলার ঢিপি। নুনা মিঞার মাইয়ার চলনে-বলনে আর জান নাই। ছয়ডা পোলা-মাইয়া রাইখা তার স্বামীডা ধড়াস কইরা মারা গ্যাল চক্ষের সামনে।

ছইয়ের তলে কলকি দোলে হুঁকা দোলে আর টোপা দোলে।

আফতাব ভাবে, অনেকদিন সে বুবুকে দেখে নি। বরাবর বুবু তাকে দেখে কাঁদে। ভাবে, চার বছর পরে তাকে দেখে বুবু এবারো কাঁদবে কি?

বুবু কাঁদে। বুবু দুঃখেও কাঁদে, সুখেও কাঁদে। বুকভরা স্নেহ-মমতা যেন, একটু কিছুতে পানি হয়ে উথলে ওঠে। ছেলেবেলায় বুবুকে সে ভয় পেত। যে-মানুষ সুখেও কাঁদে দুঃখেও কাঁদে সে-মানুষকে ভয় পায় বৈকি। এবারো কি বুবু কাঁদবে তাকে দেখে?

—আফতাব মিঞা থাকে রঙে, আফতাব মিঞা থাকে শহরে। গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে, সিদ্ধভাত খায়। দ্যাশে থাকে বুড়া বাপ নুনা মিঞা আর থাকে বেওয়া বইন অছিমন। নুনা মিঞা পটল তুললে কেডা গো দ্যাখবে তারে, কেডা দ্যাখবে তার ছাওয়াল-পাওয়াল?

—গাবগাছের তলে তার মায়ের কবর : গাবগাছেরই তলে বুড়ার হইব দাফন।

বুবু বিলাপ করে কাঁদে। দরদরিয়ে চোখের পানি পড়ে, গাল-চোয়াল ভেসে যায়। মুখ দিয়ে ব্যথার কথা আর শোকের কথা বেরোয়। যখন শোক-বিলাপ থামে তখন নিশ্বাস পড়ে বড়-বড়। যেন বাঁশবনে দমকা হাওয়া ওঠে থেকে-থেকে।

বুবু কাঁদবে এবার, আরো কাঁদবে। ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা বুবুর মনে দুঃখ-বেদনার অন্ত নেই। দেশছাড়া ভাইকে পেয়ে বুবু কাঁদবে।

—ভাই গো আমার, কী খাইবার শখ তোমার, কী বানামু তোমার জন্য?

বুবু কাঁদে শুধু, বুবু জানে না। নদীর বাঁকের পরে কী আছে বুবু জানে না। বুবু মুরগির খোঁয়াড়ে ঝাঁপ দিতে জানে, গরুর পেটের ব্যথার দাওয়াই জানে, কিন্তু বুবু জানে না শহরের সোনা ভাইয়ের মনের কথা। বুকের মধ্যে বুবুর দুঃখের দরিয়া, বুবু জানে না নদী কতদূর যায়। বাপ বলে ছানি নাই চোখে। বুবু বলে নাই, ছানি নাই চোখে।

বুবু পিঠা তৈরি করবে।

—আমার ভাই দ্যাশে ফিরছে। আমার কলিজার ভাইটা গো দ্যাশে ফিরছে। বুবু কাঁদবে, তারপর হাসবে। স্বামীর দুঃখ ভুলবে, পুকুরের মাছের দুঃখ আর আমের দুঃখ ভুলবে।

বুবু পিঠা তৈরি করবে নানান রকমের। শহরে-থাকা ভাইটার কী খেতে শখ করে? চিতল পিঠা? কেড়া পিঠা, হাতাই পিঠা?

নদী পথ শেষ হয় না যেন। এ-নদী, সে-নদী এ-খাল সে-নালা। কিন্তু থুতনিটা হাঁটুতে চেপে উবু হয়ে বসে নেই আফতাব। শহরের আফতাব খড়ের বিছানা ঢেলে শুয়ে আছে আর শুয়ে-শুয়ে টোপার দিকে চেয়ে সিগারেট ফুঁকছে। আলস্যভরে প্রশ্ন করে,

কী নদী?

—ধ্যামড়া নদী। তারপর কলতা।

ধ্যামড়া নদী, তারপর কলতা। নদী-খাল-নালা বদলায় না; বাড়ির পথ বদলায় না।

যদি বুবু না কাঁদে?

শ্যামলপুরে এক ছিল বাদশা যার ছিল এক ছেলে এক মেয়ে। ছোট ছেলে, বড় মেয়ে। মেয়ে কাঁদে, মেয়ে ধনী লোকের মেয়ে। মেয়ে আদুরে, ঘি-মাছ-দুধ-সরে পোষা মেয়ে। কেঁদে-কেটে মেয়ে পালঙ্গে গিয়ে শোয়, ঝালর-ওয়ালা দুধের মতো সাদা পালঙ্গে। কেঁদে-কেটে তুলতুলে নরম বিছানায় গা-ঢেলে শোয় আর তারপর আর কাঁদে না। আগে কাঁদে আদুরে বলে, বিছানায় গা-ঢেলে শুয়ে আর কাঁদে না ঘি-মাছ-দুধ-সরে পোষা বলে। হাওয়ার জন্য চামর দোলায় ঝি, যে-ঝি বাদশার পা টেপে।

বুবু শুধু কাঁদে; বুবু বোঝে না।

আল্লাহু-আকবর আল্লাহু-আকবর আল্লাহু-আকবর। ভাই সকল তোমরা সবে করহ শ্রবণ, নতুবা কারো নাহি পরিত্রাণ। হের শুন চারিদিকে, দোয়া মাঙ্গ পীর থেকে। শোন ভাই উটের কীর্তির যশ, শুনে দিলে হোক সাহস। খোদার কেরামতির কথা তাই, তোমাদের বলি তাই শুন ভাই, শুন ভাই মন দিয়ে শুন তাই। প্রস্রাব করিলে নিতে হবে ঢেলা, না হলে হাসরের মাঠে বুঝিবে ঠেলা। ফেলি রাখি অন্য কাজ, পাঁচ ওক্ত পড়িবে নামাজ। আর কী বলিব ভাই, মনে করে রেখো তাই, আল্লাহু-আকবর।

ঘরের মেয়ের পটলচেরা চোখও ছাপিয়ে আসে অশ্রুতে।—গুরুজনে মানিবে সদা, সম্মুখে না কহিবে কথা। আর প্রস্রাব করিয়া ভাই লইবে ঢেলা। আল্লাহু-আকবর।

বাদশার মেয়ে পালঙ্গে শোয়, না শোনে কথা। যে-ঝি বাদশার পা টেপে, সে-ঝি চামর নাড়ে।

আফতাব মিঞার পেটে জোর নেই সিদ্ধভাত খেয়ে। একটু নুন, একটু মরিচ, একটু মাছ। গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে না। সে রঙে নাই। রনকদার শহরে রঙে নাই।

—ভাই সকল কাতারে দাঁড়াইয়া যান। ভাই সকল, লাইন বাঁধেন, খোদার সামনে কাতার হইয়া দাঁড়াইয়া যান। আসুক হাতি, আসুক বাঘ, আসুক শয়তান। শোনভাই বন্ধুভাই মন দিয়ে শোন, হেনতেন মুখে রা করিবে না কোনো। আর গুরুজনে মানিবে সদা, সম্মুখে না কহিবে কথা। দেখিলাম কী দেখিলাম, শুনিলাম কী শুনিলাম। দেখিলাম শুনিলাম আর পাইলাম খাইলাম। মানিলাম কীর্তি-কুদরত তোমার, লহ লক্ষ কোটি সালাম শোকর। আর গুরুজনে মানিবে সদা, তাতে যেন না হয় অন্যথা।

হঠাৎ একটু হাওয়া আসে পানিতে চুড়ির মতো মিহি ঢেউ তুলে।

বুবু স্বামীর মৃত্যুর পর বিলাপ করে নি। কেঁদেছে নীরবে। ফিরতি পথে নদী দেখে নাই, তীর দেখে নাই, মেঘ দেখে নাই। কোনোদিন দেখে নাই, সেদিনও দেখে নাই! কাদের মুন্‌শির

তিন ছেলের এক ছেলে সিতাব জন্ম নিল, বড় হল সেয়ান-জোয়ান। হল তার চওড়া ছাতি, হল তার দীর্ঘ দাড়ি, দিল জন্ম সন্তানসন্ততির। দিয়ে একজন হল লোক, অতিশয় তেজবান। তারপর একদিন অতবড় জোয়ান-মর্দ ধড়াস করে পড়ে মারা গেল। ডাক শুনে দাঁড়াক লোক হাজারে-হাজার লাখে-লাখে কাতারে-কাতারে, আর নাই লোক! কিলবিল-করা অসংখ্য অগুন্তি লোকের মাঝে আর একটিও লোক নাই।

—কী নদী এটা?

—কলতা। ধ্যামড়ার কলতা, কলতার পর খাল।

আফতাব আবার সিগারেট ফোঁকে। লাট-বেলাটের মতো শুয়ে আছে। শহরের লোক দ্যাশে যায়, সঙ্গে তার টিনের সুটকেস আর একগাছি মর্তমান কলা। হাঁড়িতে মিষ্টি। সুটকেসে বুবুর জন্য কালো পাড়ের দু-খানা শাড়ি, বাপের জন্য লুঙ্গি-কোর্তা, ছেলেমেয়েদের জন্য জামা-পেনসিল-বিস্কুট। শুয়ে-শুয়ে জিজ্ঞাসা করে,

—কী নদী এটা?

—কলতা।

আফতাব কলতা নদী দেখে না; চোখ তার ছইয়ের দিকে। লাট-বেলাটের মতো সে সিগারেট ফোঁকে।

বুবু কাঁদলে সে কী করবে? সে বলবে,

—বুবু, তোমার জন্য শাড়ি আনছি, দ্যাখবা না?

বুবু তখন আরো কাঁদবে। কাঁদবে-তো কাঁদবে সে কী করবে। বলার কিছু নাই, করার কিছু নাই।

—গুরুজনে মানিবে সদা, সম্মুখে না কহিবে কথা।

বুবু কাঁদে শুধু, বুবু বোঝে না।

—বুবু, তোমার জন্য শাড়ি আনছি। দ্যাখবা না?

—মনে আছে বুবু, একদিন তুমি কাঁদছিলা ভয়ে? তুমি দুঃখে কাঁদ বুবু, কিন্তু ভয়ে ঐ দিনই কাঁদছিলা। ভূতের ভয়ে না, বাঘের ভয়ে না। মনে আছে? বেলতলায় গেছিলা। হঠাৎ একটা বেল পড়ল। খোদার রহমত, পড়ল মাথায় না, শরীরে না। পড়ল পায়ের কাছে। যে-বেল শরীরে না পইড়া পায়ের কাছে পড়ল, যে-বেল তোমার কোনোই ক্ষতি করে নাই, সেই বেলের ভয়ে তুমি কাইন্দা দিছিলা। কাঁইপ্‌তে-কাঁইপ্‌তে কাঁদলা তুমি গো বুবু। সে কী কান্দন তোমার!

ছই থেকে টোপা দোলে, থলে হুঁকা দোলে। বেলের কথা মনে হয়। হোক। অর্থহীন কথা। লোকে দেহে আঘাত পেয়ে কাঁদে, মৃত্যুতে কাঁদে, সুখে কাঁদে, সহবাসে কাঁদে, উটের কীর্তি দেখেও কাঁদে। শাক-ভাত খাই, উট দেখি না। উটের কীর্তির কথা শুনে কাঁদি। দেখিলাম শুনিলাম আর পাইলাম খাইলাম। মানিলাম কীর্তি-কুদরত তোমার, লহ লক্ষ কোটি সালাম শোকর। আল্লাহু-আকবর।

বেশুমার লোক। কিন্তু আর লোক নাই।

বুবু কাঁদলে তার বলার কিছুই নাই।

—আফতাব মিঞা দ্যাশে থাকে না দ্যাশে আসে না। শহরে থাইকা আফতাব মিঞা চাকরি করে, ব্যবসা করে। আফতাব মিঞা পয়সা করে, গাড়ি-ঘোড়ায় চলে আর রনকদার শহরে রং করে। বাপ নুনা মিঞা দ্যাশে নুলা হইয়া থাকে। চোখে ছানি, সারা গতরে মরণব্যথা। গাবগাছের তলে বুড়ি কেবল শান্তিতে ঘুমায়। বুড়া গো বুড়া, তোমার মধ্যে আর গাবগাছের মধ্যে ফারাকডা কত?

—টেকা পাঠায়। মানিওডার কইরা টেকা পাঠায়।

—আরো টাকা চাই। জমি বন্ধক হল, মান-সম্মান গেল। ও টাকায় হবে না, আরো

চাই। ও টাকায় কী হবে? কত হাতি গেল তল। কাবেল ছেলের শহরে ধুম ব্যবসা। এত পয়সা যে হিসেব নেই। রং করেও কত পয়সা থাকে। ছেলে বলে, দোয়া-সালাম পর আরজ এই যে, ব্যবসা চলিতেছে না, বাকি দেনা অনেক। বন্ধকী জমি ছাড়াইবার মতো টাকা হাতে নাই। কুশলে আছি। ছেলে আসেও না। আসে-আসে করে, কিন্তু আসে না। বলে, দোয়া-সালাম পর আরজ এই যে, আপিসের ছুটির সময় বই-বান্ধানীর কারবার দেখিতে হইবে, নচেৎ বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

অছিমনকে কে খাওয়ায়? অছিমনের ছেলেমেয়েদের কে খাওয়ায়? নুনা মিঞা বোঝে না। নুনা মিঞা ছেলের ওপর রাগ করে, কিন্তু বোঝে না।

বুবু কাঁদে, কিন্তু বোঝে না।

কেঁদে-কেটে যে-বাদশাহ্‌জাদী ঝালর-দেয়া পালঙ্গে গিয়ে শুয়ে আর কাঁদে না। ঘি-মাছ-দুধ-সরে পোষা শরীর। আল্লাহু-আকবর।

—কে আছে আপনার দেশে?

—বুড়ো বাপ আছে। আর বিধবা বইন আছে। আপনার কে আছে?

—ভাইবোন একগণ্ডা। বাপজান দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। সে-ঘরে পাঁচটা ছেলেমেয়ে। চাচা অসুখের ভান করে রাতদিন শুয়ে থাকে। কারো কিছু নাই। আমি পারি না। আমারও-তো ছেলেমেয়ে আছে, বউ আছে। কিন্তু খোদার হুকুম। আল্লাহু-আকবর।

তারপর হঠাৎ তার চোখ চকচক করে।

—বিধবা বোনকে আবার বিয়ে দেন না কেন?

—বড় বোন। ছ-টি ছেলেমেয়ে আছে।

বুবু, তোমার নিকট হতে পুকুরের পাড়ে গাবগাছটা অনেক দূর।

—দোয়া-সালাম পর আরজ এই যে, আগামী জুম্মাবাদ আমি দেশে পৌঁছাইব আপনার কদমবুছি করিতে।

আজ তাই এ-নদী সে-নদী এ-খাল সে-খাল দিয়ে খড়ের বিছানায় শুয়ে আফতাব মিঞা বাড়ি যায়। মাঝি কথা কয় না, তার ছেলে কথা কয় না। আকাশে নদীতে হাওয়া নাই।

—বুবু তোমার মনে কতই-বা দুঃখ? এক হাঁটু পানি, বুক উঁচু পানি, বিল-ভরা পানির মতো? টিনের সুটকেসে বুবুর একজোড়া শাড়ি আছে। মিহিন জমিন, সুন্দর কালো পাড়। বিধবা মানুষ, রংদার পাড় তোমাকে মানাবে না। কিন্তু আবার পাড়হীন শাড়ি পরাও ঠিক না। মুসলমান বিধবারা পাড়হীন শাড়ি পরে না।

—তোমার জন্য বুবু মিলের লেবেল-সমেত দু-খানা শাড়ি এনেছি। পেয়ে তুমি খুশি হবে। তখন যদি আরো কাঁদ, সে-কান্না হবে সুখের। তখন কেঁদে দিল ঠাণ্ডা হবে। উত্তপ্ত গ্রীষ্মে যেমন শীতল পানি খেয়ে দিল ঠাণ্ডা হয়। ও-কিছু না। শাড়িজোড়াটা দেখে তোমার আনন্দ হবে। তুমি স্বামীর শোক ভুলবে। তোমার মনে হবে খোদার স্নেহ-মমতা সিঞ্চিত দুনিয়ায় সত্যি কোনো দুঃখ নেই, কোনো ভাবনা নেই। জমি বন্ধক পড়ুক, স্বামী মারা যাক তোমাকে ফেলে আর দুটি সন্তানসন্ততি রেখে, বুড়ো বাপ যাক শুতে গাবগাছের তলে।

দেখিলাম শুনিলাম পাইলাম খাইলাম; মানিলাম কীর্তি-কুদরত তোমার, লহ লক্ষ-কোটি সালাম শোকর।

বুবু তুমি এত কাঁদ কেন? তোমার দাড়িওয়ালা জোয়ান-মর্দ স্বামীটা তোমারে আদর করত?

সন্ধ্যা হয়-হয়। খাল দিয়ে নৌকা চলে। ঘাট কোথায়? মাঝির ছেলে লগি ঠেলে। কূল ভেসে গেছে, কূলের গাছগুলো পানিতে দাঁড়িয়ে আছে। এ-বার গলা বাড়িয়ে আফতাব দেখে।

পানিতে সামান্য স্রোতের ধার। কচুরিপানা, শক্ত-সতেজ কচুরিপানা ভেসে যায়।

এই যে কচুরিপানা বুবু, এই কচুরিপানার কথা ভাব। এই কচুরিপানার মূল নাই, শিকড়

নাই জমিতে। এই কচুরিপানা ভেসে যায় আপন মনে। তার দুঃখ নাই, ভাবনা নাই, চিন্তা নাই। কত নদী কত খাল কত নালা আর কত কচুরিপানা। তুমি জান বুবু গরুর কথা। গরুকে কচুরিপানা খেতে দিতে নাই। বন্যার সময় গরু ঘাস-বিচালি খেতে না পেয়ে পানিতে দাঁড়িয়ে পেটের দায়ে কচুরিপানা খায়। জানে না কচুরিপানা খাওয়া তার নিষেধ। কিন্তু কচুরিপানা নির্ভাবনায় ভেসে চলে। তার ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, দুঃখ নাই। দেখ দেখ, কচুরিপানা দেখ।

কত তোমার দুঃখ বুবু?

তুমি থাকবে বুবু, বুড়াবাপ যাবে গাবগাছের তলে। তুমি থাকবে সন্তানসন্ততি নিয়ে। তারা লায়েক হবে। তোমার স্বামীর মতো ছেলেগুলো জোয়ান-মর্দ হবে। কী ভাবনা তোমার?

—আমার সোনামানিক ভাইটা গো দ্যাশে ফিরছে, আমার কলিজার ভাইটা গো দ্যাশে আসছে। আমার জানের ভাইটা সহিসালামতে ফিরছে। ফকির খাওয়াও, দান খয়রাত কর। আমার আবার দুঃখ কী? সোনামানিক ভাইটা শহরে চাকরি করে, ব্যবসা করে। টাকার অভাব কী? খোদা পরম দয়াময়, রহমানুর রহিম।

—সালাম আদাব হাজার-হাজার খেদমতে পৌঁছে; পর আরজ এই যে, কারবার করি বলিয়াই কারবার সম্পূর্ণ আমার নহে। ইহাতে আমার মূলগত দাবি মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। আয় বিশেষ হয় না। কারবার একবার দাঁড়াইয়া গেলে মুনাফার সম্ভাবনা আছে। বিশেষ আর কী। কুশলে আছি। আরজ ইতি। ফিদবদী শেখ আফতাবউদ্দিন।

বুবু, তোমার সোনামানিক ভাইটি তোমার জন্য একজোড়া কালো পাড়ের শাড়ি এনেছে। তারপর তুমি বুক ভরে কাঁদ বুবু, বুক ভাসিয়ে কাঁদ। কোনো ওজর আপত্তি থাকবে না।

তাছাড়া তোমার-তো আর ভয় নাই বুবু। জীবনে একবারই ভয় পেয়েছিলে। বেলতলায় বেল যখন তোমার পায়ের কাছে পড়েছিল। আর কিছুতেই তুমি ভয় পাবে না। ভয় হল সবকিছুর গোড়া। বাঘ কিছু করে না; কিন্তু বাঘের ভয়েই মানুষ মরে।

—এক কাতারে দাঁড়াইয়া যান, ভাই সকল, আসুক হাতি, আসুক বাঘ, আসুক শয়তান। আল্লাহু-আকবর।

শ্যামলপুরের বাদশার ছেলের কী হল আর কীই-বা হল তার মেয়ের যে দুধের মতো সাদা ঝালরওয়ালা পালঙ্গে শুয়ে আর কাঁদত না?

ছেলেটা মণিমাণিক্যখচিত অত্যাশ্চর্য লেবাস পরে শাদি করল, রাজত্ব করল, তারপর মরে গেল। গুম্বজওয়ালা সুদৃশ্য একটি ইমারত উঠল তার কবরের ওপর। আর মৃত্যুর দিনে এক সহস্র কবুতর ছাড়া হল। শাহজাদীরও শাদি হল আর স্বামীর ঘরে গোসা-ঘর পেল। শোয়ার ঘরে আর গোসা-ঘরে দিন কাটিয়ে সেও মরল। সেদিন এক সহস্র লোক দিনমোহর পেল।

বুড়ো বাপ নুনা মিঞা বোঝে না, বুবুও বোঝে না। একজন রাগে, আরেকজন কাঁদে।

রেগো না; তোমার জন্য লুঙ্গি আর কোর্তা এনেছি। কেঁদো না; তোমার জন্য একজোড়া কালো পেড়ে শাড়ি এনেছি।

মারহাবা, মারহাবা, মারহাবা।

ঐ যে ঘাট, ঐ যে বট, ঐ যে সিঁড়ি।

স্যাঁতস্যাঁত করে পাতাপড়া পানির গন্ধ।

একটি দীর্ঘ লোক লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসে। ছানিপড়া চোখ চকচক করে।

যাও, কদমবুছি কর, মাথা হেঁট করে থাক। কোথায় গাবগাছ? গাবগাছ নাই, নাই পুকুর, নাই কিছু। চোখ চকচক করে। লণ্ঠনের আলোতে চোখ চকচক করে। অতিশয় চকচক করে। রেগো না।

—দ্যাশে ফিরছে গো দ্যাশে ফিরছে; রাজ্য জয় কইরা নুনা মিঞার কাবেল ছেলে আফতাব মিঞা দ্যাশে ফিরছে।

টাকা আনি নি। টাকা নেই। কারবারে পয়সা নেই। শুধু খাটনি। থাক জমি বন্ধক পড়ে। একদিন সুবিধে হবে, একদিন সুযোগ হবে, সুদিন হবে। তখন বন্ধকী জমি ছাড়া পাবে। রেগো না; লুঙ্গি আর কোর্তা এনেছি তোমার জন্য। একটু পরে দেখাব। এসেই-তো সুটকেস খোলা যায় না। থাক না ফুল-তোলা সুটকেসটা অন্ধকারে পড়ে। আমি মাথা নত করে শুনি, কথা কই। তুমি প্রশ্ন কর, আমি প্রশ্ন করি। তুমি জবাব দেও, আমি জবাব দেই। পেটের ছেলে আর কত করতে পারে? ছেলের জন্ম দিয়ে বাপ আর কত করতে পারে?

চোখ কিন্তু চকচক করে।

হঠাৎ নুনা মিঞা কেমন করে বলে,

—তোমার কাছে কইতে আর লজ্জা নাই। আমার চোখে যেমুন ছানি পড়ছে! দ্যাখতে পাই না ভালো।

—নুনা মিঞার সাধের ছাওয়াল দ্যাশে ফিরছে চার বছর পরে কিন্তু বুড়া দ্যাখতে না পায় তার ছাওয়ালরে।

চোখ চকচক করে।

নুনা মিঞা রাগে না আর। বুড়া রাগে না।

নুনা মিঞার চোখ চকচক করে। নুনা মিঞা কাঁদে।

—ছাওয়ালরে দেইখা নুনা মিঞা কাঁদে রে, নুনা মিঞা কাঁদে।

—আর নুনা মিঞার মাইয়া অছিমনের চলনে-বলনে আর তেজ নাই।

আফতাবের কেমন সঙ্কোচ হয়। সে বুবুর পানে তাকায় একটু, কিন্তু আবার চোখ ফিরিয়ে নেয়। ঘরের মধ্যে ছাতের খুঁটি ধরে বুবু দাঁড়িয়ে থাকে নিঃশব্দে।

—সোনা ভাইরে পাইয়া অছিমন আর কী করে, থ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মাথায় ঘোমটা, চক্ষে নাই পানি।

বুবু কাঁদে না। বুবু গোয়ালঘরে কাঁদে না, চুলার আগুনের পাশে কাঁদে না, ঘাটে কাঁদে না, ঘরে কাঁদে না। তেজ নাই চলনে-বলনে, বুবু কাঁদেও না। সোনা ভাইটা দেশে ফিরেছে, বুবু কাঁদে না। শাড়ি দেখে বুবু। বুবু শাড়ি দেখে, কাঁদে না। বুবু নীরবে শাড়ির জমিন দেখে হাত নিচে রেখে, বুবু কাঁদে না।

যে-বুবু কাঁদত, সুখেও কাঁদত দুঃখেও কাঁদত, সে-বুবু কাঁদে না।

পৌষ ১৩৬১ ডিসেম্বর ১৯৫৪

পরিশিষ্ট : এক

হায়াৎ মামুদ

গ্রন্থপরিচয়

১৯৪৫
নয়নচারা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। সমকালীন সময়ে তিনি কলকাতার বাসিন্দা। গ্রন্থভুক্ত আটটি গল্পের মধ্যে পত্রপত্রিকায় সব ক'টি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল কি না, সে-বিষয়ে গবেষকবৃন্দের নিকটে তথ্যের অপ্রতুলতা আছে। জানা গেছে, "নয়নচারা" প্রথম বেরিয়েছিল সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকায়, আর "খণ্ড চাঁদের বক্রতায়" মাসিক 'সওগাতে'।

পূর্ব্বাশা লিমিটেড নামে প্রকাশনালয় 'নয়নচারা' প্রকাশ করে ১৩৫১-র চৈত্রে। প্রকাশনার স্থল প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কবিকোবিদ-ঔপন্যাসিক-সমালোচক সঞ্জয় ভট্টাচার্য পত্রিকা বা প্রকাশনসংস্থা কোনোটিই ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মুনাফার লোভে করেন নি। এর অর্থ—সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ব্যক্তিত্ব বা সৃজনশীলতা কলকাতার লেখক-বুদ্ধিজীবী সমাজকে আকৃষ্ট করেছে, অন্যথায় 'পূর্ব্বাশা' থেকে তা প্রকাশিত হত না। 'নয়নচারা' বইটির ১ম সংস্করণ এত দুষ্প্রাপ্য যে খুব কম লোকই চাক্ষুষ করেছেন। এর আকার ছিল ক্রাউন $\frac{১}{৮}$এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪+১০২; প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই, এবং সূচিপত্রে পৃষ্ঠাসংখ্যা মুদ্রিত হয় নি।

বর্তমান 'গল্পসমগ্রে'র পূর্বে একই শিরোনাম বহন করে বই প্রকাশ করেছিলেন কলকাতার 'শুকসারী', '১৯৭২-এর মার্চে। বর্তমান সম্পাদকের তা দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলীর সম্পাদক অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন জানিয়েছেন যে কলকাতায় প্রকাশিত 'গল্প-সমগ্র'তে অগ্রন্থিত কোনো গল্প স্থান পায় নি।

যাই হোক, এ-গ্রন্থভুক্ত 'নয়নচারা'র পাঠ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত পাঠের অনুরূপ।

১৯৬৫
দুই তীর ও অন্যান্য গল্প

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থের নাম 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প'; বেরিয়েছিল ১৯৬৫-র আগস্টে। ন'টি গল্পের এই সংকলনের প্রারম্ভেই লেখক জানিয়ে দেন এইসব কাহিনীর কিছু পুরাতন, কিছু নতুন, আবার দু'টি 'প্রথমে ইংরাজী ভাষায় লেখা এবং ছাপা হয়' যা বঙ্গভাষান্তরের পর গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছেন অধ্যাপক হোসেন রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে। অনেক গল্পই পত্রিকায় মুদ্রিত রূপের সঙ্গে মেলে না; লেখক বলেছেন যে গ্রন্থভুক্ত হওয়ার সময় "ঘষামাজা করেছি, নাম বদলেছি, স্থানে-স্থানে লেখকের অধিকারসূত্রে বেশ অদল-বদলও করেছি"। এর মধ্যে পড়বে 'কেরায়া', 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা', 'মতিনউদ্দিনের প্রেম', 'স্তন'। এসব বিষয়েও দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদক আলোচনা করেছেন।

'একটি তুলসীগাছের কাহিনী'রও প্রাথমিক একটি পাঠ আছে যা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অধ্যাপক-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ তা আবিষ্কার করে সর্বপ্রথম বিদ্বৎসমাজে জ্ঞাত করান।

এখানে গল্পটির সেই আদি রূপ পরিবেশিত হল :

ধনুকের মত বাঁকা ইট সিমেন্টের চওড়া পুলটির একশ' গজ পরে বাড়ীটা। দোতলা, মস্ত; রাস্তা থেকে খাড়া উঠে গেছে। এদেশে ফুটপাত নেই, তাই বাড়ীটারও একটু জমি ছাড়বার ভদ্রতার বালাই নেই। তবে বাড়ীটার পেছনে কিন্তু অনেক জায়গা। গোসলখানা-পাকঘর-পায়খানার মধ্যেকার খোলামেলা পরিষ্কার স্থানটি ছাড়াও আরো ঢের জায়গা। সেখানে আম-জাম-কাঁঠালের দুর্ভেদ্যপ্রায় জঙ্গল, মোটা ঘাসে আবৃত স্যাঁতসেঁতে মাটিতে ভাপসা গন্ধ, আর প্রখর সূর্যালোকেও সূর্যাস্তের ম্লান অন্ধকার।

অত জায়গা যখন, সামনে খানিকটা ছেড়ে একটা বাগানের মত করলে কি দোষ হতো? সে কথাই এরা ভাবে। মতিন ভাবে, বাগান না থাক, সামনে একটু জমি পেলে ওরা নিজেরাই বাগান করে নিতো, যত্ন করে লাগাতো মওশুমী ফুল, গন্ধরাজ-বকুল-হাস্নাহানা, দু'চারটে গোলাপও। তারপর সন্ধ্যার দিকে আপিস থেকে ফিরে ওখানে বসতো। বসবার জন্য না হয় একটা হাল্কা বেতের চেয়ার নয় ক্যানভাসের আরামকেদারা কিনে নিতো। গল্প করতো বসে-বসে। আমজাদের হুঁকোর অভ্যাস। সে না হয় বাগানের সম্মান বজায় রাখার মত মানানসই একটা নলওয়ালা সুদৃশ্য গুড়গুড়ি কিনে নিতো সন্ধ্যার বিশ্রামবিলাসের জন্য। গল্প জমিয়ে কাদেরও ছিলো। ফুরফুরে খোলা হাওয়ায় তার গলাটা কাহিনীময়, হাস্নাহানার গন্ধের সঙ্গে মিশে মধুর হয়ে উঠতো। কিংবা, জ্যোৎস্নারাতে কোন গল্প না করলেই বা কি এসে যেতো? মুখ বরাবর আস্ত চাঁদটার পানে চেয়ে চুপচাপ কি বসে থাকা যেতো না? আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকে ওঠা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে সে কথা তাদের আরো বারবার মনে হয়।

এরা দখল করেছে বাড়ীটা। অবশ্য দখল করবার সময় লড়াই করতে হয়নি, অথবা তাদের সাময়িক শক্তি অনুমান করে কেউ এমনি হার মেনে নেয়নি। দেশ-ভঙ্গের হুজুগে এ শহরে আসা অবধি উদয়াস্ত তারা একটা যেমন-তেমন ডেরার সন্ধানে ঘুরছিলো। একদিন দেখলো এই বাড়ীটা, মস্ত বড় বাড়ী জনমানবহীন অবস্থায় খাঁ-খাঁ করছে। প্রথমে তারা বিস্মিত হয়েছিলো পরে সদলবলে এসে দরজার তালা ভেঙে রৈ-রৈ আওয়াজ তুলে বাড়ীটায় প্রবেশ করে বৈশাখের আমকুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনায় এমন মত্ত হয়ে উঠলো যে ব্যাপারটা তাদের কাছে দিনদুপুরে ডাকাতির মত মোটেই মনে হলো না। মনে কোন অপরাধের চেতনা যদি বা ভার হয়ে নাব্‌বার প্রয়াস পেতো সে ভার তুলোধুনো হয়ে উড়ে যেতো তীক্ষ্ণ সে হাসির ঝলকে।

বিকেলের দিকে শহরে যখন খবরটা ছড়িয়ে গেলো তখন অবাঞ্ছিতদের আগমন শুরু হলো। মাথার উপর একটা ছাতের আশায় তারা দলে দলে আসতে লাগলো। এরা কিন্তু রুখে দাঁড়ালো। ডাকাতি নাকি? যথাসম্ভব মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে বললে, জায়গা কোথায়, সব ঘর ভর্তি। বললে, দেখুন সাহেব, এই ছোট অন্ধকার ঘরেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখন তো বিছানা, পরে ছ ফুট বাই তিন ফুটের চারটে চৌকি, খান ছয়েক চেয়ার বা টেবিল এনে ঘরে জায়গা বলে কোন বস্তু থাকবে না। কেউ সমবেদনা করে বললো, আপনাদের তকলিফ বুঝতে পারছি। আমরা কি এক দিন কম কষ্ট করেছি? তা ভাই আপনার কপাল মন্দ। যদি চার ঘণ্টা আগে আসতেন। চার ঘণ্টা কেন, ঘণ্টা দুয়েক আগেও তো নিচে কোণের ঘরটা এ্যাকাউন্টস আপিসের মোটামত একটা লোক এসে দখল করলো। রাস্তার উপর ঘর, তবু মন্দ কি। জানালার কাছেই সরকারী আলো, কোন দিন যদি আলো নিভে যায় রাস্তার ওই আলোতেই তোফা চলে যাবে।

দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন হয়েছে বটে তবু কোন প্রান্তে সঠিক মগের মুল্লুক বসেনি। কাজেই পরে এ বেআইনী কাজের তদারক করতে পুলিশ এসেছিলো।

পলাতক গৃহকর্তা যে বাড়ী উদ্ধারের জন্য সরকারের কাছে ধর্ণা দিয়েছিলেন তা নয়। দখলের কথা জানলে দিতেনও কিনা সন্দেহ। যিনি প্রাণের ভয়ে এত বড় একটা পরিবার দু'দিনের জন্য স্রেফ দেশ থেকে উধাও করে দিতে পারেন, তাঁর সম্পর্কে সেটা আশা করা বাড়াবাড়ি। পুলিশে খবর দিয়েছিলো ওরাই যারা শহরের অন্য কোন প্রান্তে তখন ডাকাতির ফিকিরে ছিলো বলে এখানে চারঘণ্টা আগে, বা দু'ঘণ্টা আগেও এসে পৌঁছুতে পারেনি। নেহাৎ কপালের কথা। তবে ওদের কথা হচ্ছে, এদের কপালেও মন্দ হবে না কেন। ভাগ্যের ফল রক্ষার্থে নিরীহ লোকেরাও আবার রীতিমত লেঠেল হয়ে উঠতে পারে। সত্যি সত্যি লাঠালাঠি না করলেও তার জন্য তৈরী হয়ে থেকে এরা সমগ্র ব্যাপারটা পুলিশকে এমনভাবে বুঝিয়ে দিলো যে সাব-ইনসপেক্টর দ্বিরুক্তি না করে সদলবলে ফিরে গেলো। রিপোর্ট দেবার কথা। তা এসব ঘোরালো করে রিপোর্ট দিলে যে সমার্থ উদ্ধারের ভয়ে তার ওপরওয়ালার কাছে সে রিপোর্ট ফাইল চাপা দিয়ে রাখাই শ্রেয় মনে হলো। তাছাড়া তাড়াতাড়িই বাকী যারা পালিয়ে গেছে তাদের প্রতি সমবেদনার কোন কথা ওঠে না এবং বাড়ীর নিরুদিষ্ট মালিক যদি এসে কিছু না কয় তবে কেন অনর্থক মাথা ব্যথা করা। তাছাড়া, এরা কেরানী হলেও ভদ্রলোকের ছেলে, দখল করে আছে বলে জানলা দরজা ভেঙে ফেলছে বা ছাতের আস্ত আস্ত বীম সরিয়ে সোজা চোরাবাজারে চালান করে দিচ্ছে, তা নয়।

রাতারাতি সরগরম হয়ে উঠলো বাড়ীটা। এদের অনেককেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেনে খালাসী পট্টিতে, বৈঠকখানায় দফতরীদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেনে তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অথবা চমরু খানসামা লেনের অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। এ বাড়ীর বড় বড় কামরা, নীলকুঠি দালানের ফ্যাশানে দেয়ালে মস্ত মস্ত জানালা, পেছনে খোলামেলা উঠান, আরো পেছনে বনজঙ্গলের মত আম, জাম, কাঁঠালের বাগান এদের কি যে ভালো লেগেছে বলবার নয়। একেকজন লাট বেলাটের মত এক-একখানা ঘর দখল করে নেই সত্যি তবু বড় বড় ঘরে নির্ঝঞ্ঝাট হাওয়া চলাচল, এবং আলোর ছড়াছড়ি দেখে অত্যন্ত খুশী। মনে হয় এবার বাঁচলাম, ফরাকত মত থেকে আলোবাতাস খেয়ে জীবনে এবার সতেজ সবুজ রক্ত ধরবে, হাজার দু'হাজার ওয়ালাদের মত মুখে জৌলুস আসবে, দেহ ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের জীবাণু থেকে মুক্ত হবে।

যেমন ইউনুস থাকতো ম্যাকলিওড স্ট্রীটে। সাহেবী নাম হলে কি হবে, গলিটার এক এক অংশ যেন সকালবেলাকার আবর্জনা ভরা আস্ত ডাস্টবিন। সে-গলিতেই একটা নড়বড়ে ধরনের কাঠের দোতলায় কর্চ দেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সে থাকতো। কে কবে বলেছিলো চামড়ার গন্ধ নাকি ভালো, যক্ষ্মার বীজাণু ধ্বংস করে। তাছাড়া সে উৎকট গন্ধ ড্রেনের পচা ভোসকা গন্ধও বেমালুম ডুবিয়ে দিত; ঘরের কোণে দশ দিন ধরে ইঁদুর কিংবা বিড়াল মরে পচে থাকলেও নাকে টের পাবার জো ছিল না। ইউনুস ভাবতো মন্দ কি। অন্ততপক্ষে যক্ষ্মার বীজাণু ধ্বংস হবার কথাটা মনে বড় ধরেছিলো। শরীরটা তার ভালো নয় তেমন; রোগাপটকা দুর্বল মানুষ। এখানে দোতলার দক্ষিণ দিকের বড় ঘরটায় জানালার পাশে শুয়ে সূর্যালোকের সোনালী ঝলকানি দেখে ম্যাকলিওড স্ট্রীটের আস্তানার কথা মনে করে শিউরে ওঠে। ভাবে, এতদিনে কি হয়ে গেছে কে জানে। টাকা থাকলে বুকটা একবার দেখিয়ে আসতো ডাক্তারকে। সাবধানের মার নেই।

ভেতরে রান্নাঘরের বাঁ ধারে একটা চৌ'কোনো আধ হাত উঁচু ইটের মঞ্চের ওপর একটি তুলসী গাছ। একদিন সকালবেলায় নিমের ডাল দিয়ে মেছোয়াক করতে করতে মোদাব্বের উঠোনে পায়চারী করছে হঠাৎ তার নজরে পড়লো তুলসী গাছটা। মোদাব্বের হুজুগে মানুষ, একটু কিছু হলেই প্রাণ শীতল করা রৈ রৈ আওয়াজ উঠিয়ে দেয়। এরা সব উঠে এলো। যতটা আওয়াজ ততটা গুরুতর না হলেও কিছু তো অন্তত ঘটেছে।

এই তুলসী গাছটা। এটাকে উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা যখন এসেছি বাড়ীতে কোন হিন্দুয়ানী চিহ্ন থাকবে না।

সবাই তাকালো সেদিকে। খয়েরী রঙের আভায় গাঢ় সবুজ পাতাগুলো কেমন ম্লান হয়ে আছে। নীচে ক'দিনের অযত্নে ঘাস গজিয়ে উঠেছে। আশ্চর্য, এটা এতদিন চোখেই পড়েনি। কেমন যেন লুকিয়ে ছিলো।

ওরা কিন্তু হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো। যে বাড়ী এত শূন্য মনে হয়েছে, সিঁড়ির ঘরের দেয়ালে কাঁচা হাতে লেখা কটা নাম থাকলেও এমন বেওয়ারিশ ঠেকেছে, যে বাড়ীর চেহারা হঠাৎ বদলে গেলো। তুলসী গাছটা আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে অনেক কথা যেন বলে উঠলো।

এদের স্তব্ধতা দেখে মোদাব্বের আরেকটা হুঙ্কার ছাড়লো। ভাবছো কি? কথা নেই, উপড়ে ফেলো।

হিন্দু রীতিনীতি এদের ভালো জানা নেই। তবু কোথায় শুনেছে হিন্দু বাড়ীতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসী গাছের তলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। ঘাস গজিয়ে ওঠা পরিত্যক্ত চেহারার এ তুলসী গাছের তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিতো। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারাটি বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো ঠিক সে সময়ে ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত ধীর প্রদীপ জ্বলে উঠতো, প্রতিদিন হয়তো বছরের পর বছর এমনি জ্বলেছে। ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবন-প্রদীপ নিভে গেছে, তবু হয়তো এ প্রদীপ দেয়া অনুষ্ঠান একদিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি।

যে গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ তুলসীতলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়? কেন চলে গেছে? মতিন এক সময়ে রেলওয়েতে কাজ করতো। সে ভাবে হয়তো কলকাতায়, নয় আসানসোল, নয়তো বৈদ্যবাটি হাওড়ায় কোন আত্মীয়ের আস্তানায়। লিলুয়া বা নয় কেন। বিশাল রেলইয়ার্ডের পাশে মসৃণ একটি কালো দোতলা বাড়ীর ছাত থেকে চওড়া লাল পাড়ের শাড়ীটা ঝুলছে হয়তো সেটা এ গৃহকর্ত্রীরই। কিন্তু যেখানেই থাকুন, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন হয়তো প্রতি সন্ধ্যায় এ তুলসীতলার কথা মনে করে গৃহকর্ত্রীর চোখ ছলছল করে।

গতকাল থেকে ইউনুসের সর্দি সর্দি ভাব। সে কথা বললে,

—থাক না ওটা। আমরা তো আর পূজা করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে একটা তুলসীগাছ থাকলে ভালোই। সর্দিকফে তার পাতার রস উপকারী।

—মোদাব্বের এধার ওধার চাইলো। সবার যেন তাই মত। ওদের মধ্যে এনায়েত মৌলভী ধরনের মানুষ। মুখে দাড়ি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আছে, সকালে নাকি সুরে কোরান তালাওয়াতও করে। সে পর্যন্ত চুপ। প্রতি সন্ধ্যায় ছলছল করে ওঠা গৃহকর্ত্রীর চোখের কথা কি ওরও মনে হলো? অক্ষতদেহে তুলসী গাছটা বিরাজ করতে থাকলো। বাড়ীটার আবহাওয়া ভালো। কলকাতার ঝিমিয়ে-আসা নিস্তেজ ভাবটা যেন কেটে গেছে। আড্ডাও তাই জমে ভালো, দেখতে না দেখতে মুখে ফেনা-ওঠা তর্ক-বিতর্ক লেগে যায়। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক সব রকম আলোচনা। সাম্প্রদায়িকতার কথাও ওঠে মাঝে মাঝে।

—ওরাই তো মূল, সবের বলে। বলে, হিন্দুদের নীচতা ও গোঁড়ামির জন্যই তো আজ দেশটা এমন ভাগ হয়ে গেলো। তারপর তাদের অবিচার-অত্যাচারের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেয়। রক্ত গরম হয়ে ওঠে সবার। দলের ভেতর বামপন্থী নামে চালু মকসুদ মিঞা কখনো কখনো প্রতিবাদ করে। বলে, অতটা নয়। এতটা হলেও আমরা বা কম কি। মোদাব্বের দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে। দেখে তথাকথিত বামপন্থীর কাঁটা নড়ে। সে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবে, কে জানে বাবা, আমরাও হলফ করে বলতে পারি দোষটা ওদের, ওরাও শালা তেমনি হলফ করে বলতে পারে দোষটা আমাদের, ব্যাপারটা বড় ঘোরালো, বোঝা মুশ্‌কিল। ভাবে, হয়তো আমরাই ঠিক। আমাদের ভুল হবে কেন।

আমরা কি জানি না আমাদের।

কাঁটা সংশয়ে দুলে দুলে হঠাৎ ডানে হেলে গিয়ে স্থির হয়ে গেলো। কাঁটাটি কখনো কখনো না বুঝে বাঁয়ে হেলে আসে বলেই ওর বামপন্থীর অপবাদ।

পায়খানার দিকে যেতে যেতে রান্নাঘরের পাশে তুলসীগাছটি চোখে পড়ে। কে আগাছা সাফ করে দিয়েছে। পাতাগুলো শুকিয়ে উঠে খয়েরী রঙ ধরেছিল আবার যেন গায়ের রঙের মধ্যে কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। কে তার গোড়ায় পানি দিচ্ছে। অবশ্য খোলাখুলিভাবে, লোক দেখিয়ে দিচ্ছে না। সমাজে চক্ষুলজ্জা বলে একটা কথা তো আছে।

ইউনুস ভেবেছিলো ম্যাকলিওড স্ট্রীটের চামড়া ব্যবসায়ীদের নোংরা আস্তানায় আর কখনো ফিরে যেতে হবে না—এখানে আলো-বাতাসের মাঝে জীবনের জন্য সে বেঁচে গেলো। কিন্তু সে ভুল ভেবেছিলা। শুধু ইউনুস কেন সবাই—যারা ভেবেছিলো এ মাঙ্গার দিন ভালো করে খেতে না পাক, বাড়ীতে প্রয়োজন মত টাকা পাঠাতে না পারুক, কিন্তু আলো হাওয়ার ভেতরে ফরাগত মত থেকে জীবনের দুষ্প্রাপ্য আরামটুকু করবে—তারা প্রত্যেকে ভুল করেছিলো। তবু যাহোক সামনে জমি নেই। থাকলে ওরা আজ বাগান করতো এবং এই সময়ে অন্য কিছু না হোক, গাঁদাফুলের গাছ বড় হয়ে উঠতো। তাহলে কি প্রচণ্ড ভুলই না হতো।

মোদাব্বের হন্তদন্ত হয়ে এসে বললো, পুলিশ এসেছে।—কেন? ভাবলো, হয়তো রাস্তা থেকে পালিয়ে একটা ছ্যাঁচড়া চোর বাড়ীটায় এসে ঢুকেছে। কিন্তু সেটা খরগোসের মত কথা হলো। শিকারীর সামনে পালাবার আর পথ না পেয়ে হঠাৎ বসে পড়ে চোখ বুজে খরগোস ভাবে, কই আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তারাই তো চোর, কেবল গা ঢাকা দিয়ে না থেকে চোখ বুজে আছে।

পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর সাবেকী আমলের হ্যাট বগলে রেখে তখন দাগ পড়া কপালের ঘাম মুছছে। কেমন একটা নিরীহ ভাব। পেছনে বন্দুকধারী কনস্টেবল দুটোকে মস্ত গোঁফ থাকা সত্ত্বেও আরো নিরীহ দেখাচ্ছে। ওরা নিস্তব্ধভাবে কড়িকাঠ গুনতে লাগলো। ওপরে গুলগুলির খোপে এক জোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। একটা সাদা আরেকটা ধূসর। তাও দেখতে পারে তারা তাকিয়ে তাকিয়ে। হাতে বন্দুক আছে কিনা।

মতিন সবিনয়ে বললে,—

—আপনার কাকে দরকার?

—আপনাদের সবাইকে। আপনারা বে-আইনীভাবে এ বাড়ী কবজা করেছেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের এ বাড়ী খালি করে দিতে হবে—বলে অর্ডার দেখালো।

বাড়ীর কর্তা তাহলে ফিরে এসেছে। ট্রেন থেকে নেমে এখানে এসে কাণ্ডটা দেখে সোজা থানায় চলে গেছে। এখন সঙ্গে এসেছে কিনা দেখবার জন্য আফজল একবার গলা উঁচিয়ে দেখলো। কেউ নেই। পেছনে কেবল গোঁফওয়ালা বন্দুকধারী কনস্টেবল দুটো।

—কেন? বাড়ীওয়ালা কি নালিশ করেছে?

—গভমেণ্ট বাড়ী রিকুইজিসন করেছে।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলো তারা। অবশেষে মতিন বললে,—

—আমরা তো গভমেন্টেরই লোক।

মাঝে মাঝে মানুষের নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হতে হয়। কথা শুনে নিস্তব্ধ কনস্টেবল দুটো পর্যন্ত কড়িকাঠ থেকে চোখ নামিয়ে তাকালো তাদের পানে, ভাবাচ্ছন্ন চোখ হঠাৎ কথা কয়ে উঠলো।

বাড়ীতে এর পর একটা ছায়া নেমে এলো। ভাবনার অন্ত নেই। কোথায় যাই এই চিন্তা। কেউ কেউ রেগে উঠে বলে, কোথাও যাব না, এইখানেই থাকবো। দেখি কে

উঠায়। কেউ যদি এ বাড়ীর চৌকাঠ পেরোয় তবে সে আমাদের লাশের ওপর দিয়ে আসবে। (কোথায় ছাত্ররা নাকি এমনি গায়ের জোরে একটা বাড়ী দখল করে আছে। তাদের ওঠাবার চেষ্টা করে সরকারের উচ্চতম কর্তারা পর্যন্ত নাকি নাস্তানাবুদ হয়ে গেছে। সে কথাই স্মরণ হয়।) অবশেষে রক্ত তাদের গরম হয়ে ওঠে। বলে, কখ্খনো ছাড়বো না। যে আসে আসুক, কিন্তু সে যেন এ কথা জেনে রাখে যে, তাকে আমাদের লাশের ওপর দিয়ে আসতে হবে।

ক-দিন গরম রক্ত টগবগ করলো। কাজে মন নেই, খাওয়ায় মন নেই। কেবল কথা, তিক্তরসে সিঞ্চিত ঝাঁঝালো কথা। কিন্তু ক্রমশ কথা কমতে লাগলো। এবং এদের কথা থামলে রক্ত ঠাণ্ডা হতে ক-দিন।

এরা তো আর ছাত্র নয়। এরা যে কি, সে কথা দর্প করে সেদিন পুলিশকে নিজেরাই তো বলেছিলো। বাড়ী রিকুইজিসন হবার কথা শুনে কিছুক্ষণ বিমুখ থেকে বলেছিলো, কেন, আমরা তো গভর্ণমেণ্টেরই লোক।

একদিন তারা সদলবলে চলে গেলো। যেমন ঝড়ের মত এসেছিলো তেমনি ঝড়ের মত চলে গেলো, ঘরময় ছিটিয়ে রেখে গেলো পুরোনো খবর কাগজের টুকরো, কাপড় ঝোলাবার দড়ির একটা দুর্বল অংশ, বিড়ি-সিগারেটের মোতা, বা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালীটা। নীল কুঠি-বাড়ীর ফ্যাশানে তৈরী দরজা-জানালা গুলো খাঁ-খাঁ করতে লাগলো। কিন্তু সে আর ক-দিন। রঙ বেরঙের পর্দা ঝুলবে সেখানে।

পেছনে রান্নাঘরের পাশে তুলসীগাছটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় আবার খয়েরী রঙ ধরেছে। যেদিন পুলিশ এসে বাড়ী ছাড়বার কথা জানিয়ে গেলো সেদিন থেকে তার গোড়ায় কেউ পানি দেয়নি। তুলসীগাছের কথা না হোক, গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও কি এদের আর মনে পড়েনি?

কেন পড়েনি সে কথা কেবল তুলসীগাছ জানে, যে তুলসীগাছকে মানুষ বাঁচাতে চাইলে বাঁচাতে পারে, ধ্বংস করতে চাইলে এক মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারে অর্থাৎ যার বাঁচা বা সমৃদ্ধ হওয়া আপন আত্মরক্ষার শক্তির উপর নির্ভর করে না।

'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' সর্বমোট তিন বার ছেপেছিলেন (১৯৬৫, ১৯৬৭, ১৯৭২) এর প্রকাশক নওরোজ কিতাবিস্তান। পরে স্থান পেয়েছে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ও অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী'র ২য় খণ্ডে। আমরা বর্তমান গল্পসমগ্রে রচনাবলীর পাঠই মান্য করেছি।

অগ্রন্থিত গল্পাবলি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবৎকালে তাঁর তৃতীয় কোনো গল্পগ্রন্থ বেরয় নি। সাংবাদিক গবেষক সৈয়দ আবদুল মকসুদ ও অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন অন্তত ৩২টি অগ্রন্থিত গল্প খুঁজে পেয়েছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র। লক্ষ করা যাচ্ছে, এদের সবই প্রায় চল্লিশের দশকে 'সওগাত' ও 'মোহাম্মদী'-তে প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ 'নয়নচারা'র যুগের রচনা এগুলো। স্বাভাবিক নিয়মে এসব গল্প নিয়ে এক বা একাধিক সংকলন প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার কথা, অথচ হয় নি। এর পশ্চাতে নানা কারণ থাকতে পারে যার কিছুই আমরা জ্ঞাত নই। প্রসঙ্গত, 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক আবদুল হকের উক্তি স্মরণে আসে। তিনি লিখেছিলেন : "স্বাধীনতাপূর্ব আমলে তাঁর প্রথম গল্প-সকলন 'নয়নচারা'র গল্পগুলি যখন বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই তিনি প্রতিশ্রুতিশীল লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন; সৃষ্টিশীলতার প্রাচুর্যের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়েছে বলা চলে না।" বোঝা যায়, এসব গল্পের কথা এত প্রচারিত হয় নি। আসলে ১৯৪০-৫০ সালের মধ্যে ওয়ালীউল্লাহ্ প্রচুর লিখেছিলেন।

'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী'র ২য় খণ্ডে 'অগ্রন্থিত গল্পগুচ্ছ'শিরোনামে এই লেখাগুলো ছাপা হয়েছে। আমরা অবিকল সেই পাঠ গ্রহণ করেছি, যদিও শিরোনামে যৎসামান্য পরিবর্তন ঘটিয়েছি।

পরিশিষ্ট : দুই

হায়াৎ মামুদ

জীবনপঞ্জি

জন্ম চট্টগ্রামের ষোলশহরে, ১৯২২ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে। পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান তিনি। বাবা সৈয়দ আহমদউল্লাহ্ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। মা নাসিম আরা খাতুনও একই ধরনের উচ্চশিক্ষিত ও রুচিশীল পরিবার থেকে এসেছিলেন, সম্ভবত অধিক বনেদি বংশের মেয়ে ছিলেন তিনি। ওয়ালীউল্লাহ্‌র আট বছর বয়সের সময় তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। দু' বৎসর পর তাঁর বাবা দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন টাঙ্গাইলের করটিয়ায়। বিমাতা এবং বৈমাত্রেয় দু-ভাই ও তিন-বোন সকলের সঙ্গেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র সম্পর্কের কখনো অবনতি হয় নি। তাঁর তেইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলকাতায় চিকিৎসা করতে গিয়ে বাবা মারা গেলেন।

শিক্ষা তাঁর পিতৃ-মাতৃবংশের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে কম ডিগ্রিধারী ছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্। বাবা এম. এ. পাস করে সরাসরি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে ঢুকে যান; মাতামহ ছিলেন কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে পাস করা আইনের স্নাতক; বড় মামা এম. এ. বি. এল পাস করে কর্মজীবনে কৃতী হয়ে 'খানবাহাদুর' উপাধি পেয়েছিলেন এবং এঁর স্ত্রী—ওয়ালীউল্লাহ্‌র বড় মামী ছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফ পরিবারের মেয়ে, উর্দু ভাষার লেখিকা ও রবীন্দ্রনাথের গল্প-নাটকের উর্দু-অনুবাদক।

পারিবারিক পরিমণ্ডলের এই সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মনন ও রুচিতে প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল ডিস্টিঙ্কশনসহ বি. এ., এবং অর্থনীতি নিয়ে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েও শেষে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এই বাহ্য তথ্যের সাহায্যে তাঁর মেধাশক্তি, মনের গড়ন ও রুচির শীর্ষচুম্বী মান ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বোঝা অসম্ভব হয়ে ওঠে যদি-না তাঁর মানুষ-হয়ে-ওঠার পরিপ্রেক্ষিত স্মরণে রাখি।

সরকারি চাকরির কারণে পিতার কর্মস্থল পরিবর্তনশীল হওয়ায় ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিক্ষাজীবন পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের স্কুল-কলেজে কেটেছিল। এ জাতীয় উল্লম্ফনবৃত্তির জীবনের একটি বড় অসুবিধে হল, জীবন কোনোখানে থিতু হয়ে বসবার অবকাশ পায় না এবং স্মৃতির পসরা কোথাও ভারি হয়ে জমে ওঠে না। এক্ষেত্রে বাড়তি প্রতিবন্ধক ছিল আমলা পিতার প্রাশাসনিক চাকরি; সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ সেখানে কম, 'সাধারণ' ও 'অসাধারণে'র মধ্যিখানে ভয়-সম্মান-

অবিশ্বাস-সন্দেহ এমন ব্যবধানের প্রাচীর তুলে রাখে যা ডিঙিয়ে যাওয়া দু' পক্ষেরই অসাধ্য।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র চরিত্রের ধাঁচ নির্মাণ করেছিল ঘর ও বাহিরের এই নৈঃসঙ্গ্য। এর ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অন্তর্চারী ও বহির্বিমুখ, লাজুক ও সঙ্কোচপ্রবণ, এবং বন্ধুনির্বাচনে অনুদার কিন্তু মেধাবী। লক্ষণীয় যে, তাঁর বন্ধুবৃত্ত বিশাল ছিল না, কিন্তু যাঁদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়েছে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয় নি। অন্য দিকে তাঁর অধিকাংশ সুহৃদই পরবর্তী কালে তাঁদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে এত খ্যাতিমান হয়েছেন যে তা ওয়ালীউল্লাহ্‌র অন্তর্গত প্রবণতা প্রমাণ করে। তাঁর মনের স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বৈদগ্ধ্য ও নান্দনিকতার দিকে, এবং এই কাঠামোটি তৈরি হয়ে উঠেছিল তাঁর খানবাহাদুর মাতুলের পারিবারিক সান্নিধ্যে ও প্রভাবে।

কর্মজীবন

পঠদ্দশাতেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কর্মজীবন শুরু হয়। বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সৈয়দ নসরুল্লাহ এম. এ. ও বি. এল পাস করেছিলেন। তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল এম. এ. পড়াটা, ভর্তি যখন হয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু ১৯৪৫ সালে তিনি ইংরেজি দৈনিক 'দ্য স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় চাকরি নেন। এ বৎসর তাঁর পিতাও প্রয়াত হন (২৬শে জুন)। তার তিন মাস আগে, মার্চ মাসে, তাঁর প্রথম বই 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থ বেরিয়ে গিয়েছিল। নিয়মিত লেখালেখি শুরু করেছিলেন ১৯৪১/৪২ নাগাদ। এমন মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে তিনি ভবিষ্যৎ-জীবন হিসেবে লেখকবৃত্তি বেছে নেওয়ার কথা হয়তো-বা ভাবছিলেন। পঁয়তাল্লিশে যখন প্রথম বই বেরয় সে-সমকালে কলকাতার বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে; সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ একাধারে পণ্ডিত ও সৃজনশীল ব্যক্তিত্বদের সংস্পর্শে আসছেন ক্রমান্বয়ে। পড়াশোনা ছেড়ে চাকরি নেওয়ার পিছনে এসব ঘটনাও কার্যকর ছিল হয়তো-বা।

১৯৪৭-এ দেশবিভাগ হওয়ার পরপরই 'স্টেট্‌সম্যান'-এর চাকরি ছেড়ে ঢাকা চলে আসেন সেপ্টেম্বরে নতুন চাকরি নিয়ে : রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা-সম্পাদক। কাজের ভার কম ছিল। 'লালসালু' উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন নিমতলির বাসায়। পরের বছরই এই উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশ করল কমরেড পাবলিশার্স। ঢাকা থেকেই বেরুল। তবে, প্রকাশনসংস্থাটি এক অর্থে তাঁদের নিজেদেরই ছিল; কারণ এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন তাঁর বড় মামা খানবাহাদুর সিরাজুল ইসলাম, উপরন্তু তিনি নিজে কিছুকাল এর কর্মাধ্যক্ষও ছিলেন।

করাচি কেন্দ্রে বার্তা-সম্পাদক হয়ে ঢাকা ছাড়েন ১৯৪৮ সালে। সেখান থেকে নয়াদিল্লিতে পাকিস্তান দূতাবাসে তৃতীয় সেক্রেটারির পদমর্যাদায় প্রেস-আতাশে হয়ে যান ১৯৫১-তে। অতঃপর একই পদে অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নিতে বদলি ১৯৫২-র শেষ দিকে, ১৯৫৪-য় ঢাকায় ফিরে এলেন তথ্য-অফিসার হিসেবে ঢাকাস্থ আঞ্চলিক তথ্য-অফিসে। '৫৫-তে পুনরায় বদলি করাচিতে, তথ্য মন্ত্রণালয়ে। এরপর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার

তথ্যপরিচালকের পদাভিষিক্ত হয়ে, ১৯৫৬-র জানুয়ারিতে; দেড় বছর পর এই পদটি বিলুপ্ত হয়ে গেলে জাকার্তার পাকিস্তানি দূতাবাসে দ্বিতীয় সেক্রেটারির পদমর্যাদায় প্রেস-আতাশে হয়ে রয়ে গেলেন ১৯৫৮-র ডিসেম্বর অবধি। এরপর ক্রমান্বয়ে করাচি-লণ্ডন-বন, বিভিন্ন পদে ও বিভিন্ন মেয়াদে। ১৯৬১-র এপ্রিলে ফার্স্ট সেক্রেটারির পদমর্যাদায় প্রেস-আতাশে হিসেবে যোগ দিলেন পারী-র পাকিস্তানি দূতাবাসে। একনাগাড়ে ছ' বছর ছিলেন তিনি এ-শহরে। এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল 'লালসালু'র ফরাসি অনুবাদ 'লার্‌ব্র্‌ সাঁ রাসিন্‌' (L' arbre sans racines), অর্থাৎ শিকড়হীন গাছ। দূতাবাসের চাকরি থেকে চুক্তিভিত্তিক পদ 'প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট' হিসেবে যোগ দেন ইউনেস্কোতে, ১৯৬৭-র ৮ই আগস্ট; চাকরিস্থল পারী শহরেই। এ বছরই লণ্ডনের শ্যাটো এ্যাণ্ড উইণ্ডাস প্রকাশনালয় 'লালসালু'র ইংরেজি ভাষান্তর বের করে Tree Without Roots নাম দিয়ে, ঔপন্যাসিকের নিজেরই করা অনুবাদ।

১৯৭০-এর ৩১শে ডিসেম্বর ইউনেস্কোয় তাঁর চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছিল। পাকিস্তান সরকার ইসলামাবাদে বদলি হওয়ার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু তিনি তাতে রাজি হন নি। পারীতেই থেকে গেলেন।

এর মধ্যে তাঁর স্বদেশে তাঁর পরিপ্রেক্ষিতগত অবস্থান পাল্টাতে থাকে। উনসত্তরের পর থেকে দুই পাকিস্তানের মধ্যে প্রতারণা ও অবিশ্বাস-সঞ্জাত দ্বন্দ্ব স্পষ্টতই রাজনৈতিক সংকট ও সংঘাতের দিকে এগোতে থাকে। ১৯৭১-এ যে ওয়ালীউল্লাহ্‌ ইসলামাবাদে ফেরেন নি, তার মাসুল তাঁকে দিতে হয়েছিল : বাইশ বছরের সরকারি চাকরির শেষে প্রাপ্য কোনো সুবিধা তিনি পান নি। শেষ জীবন বড় আর্থিক দুশ্চিন্তা ও কষ্টে কেটেছিল।

বিবাহ

তাঁর স্ত্রী ফরাসিনী। নাম : আন্‌-মারি লুই রোজিতা মার্সেল্‌ তিবো। তাঁদের আলাপ হয়েছিল সিড্‌নিতে। ওয়ালীউল্লাহ্‌ যেমন পাকিস্তানি দূতাবাসে, আন্‌-মারি তেমনি কর্মরতা ছিলেন ফরাসি দূতাবাসে। দেড়-দু' বছরের সখ্য ও ঘনিষ্ঠতা রূপান্তরিত হয় পরিণয়বন্ধনে। ওয়ালীউল্লাহ্‌ তখন করাচিতে। সেখানেই ১৯৫৫ সালের ৩রা অক্টোবর তাঁদের বিয়ে হয়। ধর্মান্তরিতা বিদেশিনীর নাম হয় আজিজা মোসাম্মত নাসরিন। নবলব্ধ নামকে বিয়ের কাবিননামাতেই নির্বাসন দিয়েছিলেন দু'-জনে। অনুমান করা চলে সর্বতোভাবে আধুনিক দুই মানুষের প্রাচীন ও অসংস্কৃত একটি প্রথার কাছে নতিস্বীকারে আনন্দ ছিল না; প্রেমের মূল্য ধর্মান্তরীকরণে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা।

তাঁদের দু' সন্তান : প্রথমে কন্যা সিমিন ওয়ালীউল্লাহ্‌, তার পরে পুত্র ইরাজ ওয়ালীউল্লাহ্‌।

সম্মাননা

পি. ই. এন. পুরস্কার পান 'বহিপীর' নাটকের জন্য। তখন তিনি করাচিতে, ১৯৫৫ সালে। নাটকটি গ্রন্থাকারে বের হয়েছিল পাঁচ বছর পরে। ঘটনাটি এরকম : ঢাকায় P.E.N. Club-এর উদ্যোগে পঞ্চান্ন সালে এক আন্তর্জাতিক লেখকসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বাংলা নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে 'বহিপীর' দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হয়।

১৯৬১ সালে উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কারে সম্মানিত হন।

১৯৬৫-তে আদমজী পুরস্কার লাভ করেন 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের জন্য।

জীবনাবসান

অত্যন্ত অকালে প্রয়াত হন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। মাত্র ঊনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে, ১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবর গভীর রাত্রে অধ্যয়নরত অবস্থায় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে। পারী-র উপকণ্ঠে তাঁরা একটি ফ্ল্যাট কিনেছিলেন, সেখানেই ঘটনাটি ঘটে। ওখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

তিনি রাজনীতিসম্পৃক্ত মানুষ ছিলেন না, কিন্তু সমাজ ও রাজনীতিসচেতন ছিলেন। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি চাকরিহীন, বেকার। তৎসত্ত্বেও ফ্রান্সে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জনমত তৈরির চেষ্টা করেছেন, সঙ্গতিতে যতটুকু কুলোয় তদনুযায়ী টাকা পাঠিয়েছেন কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধ তহবিলে। তাঁর সন্তানদের ধারণা, তাদের পিতার অকালমৃত্যুর একটি কারণ দেশ নিয়ে দুশ্চিন্তা, আশঙ্কা ও হতাশা। তিনি যে স্বাধীন মাতৃভূমি দেখে যেতে পারেন নি সে-বেদনা তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের সকলেই বোধ করেছেন। তাঁর ছাত্রজীবনের বন্ধু, পরে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, আবু সাঈদ চৌধুরী ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৃত্যুর সাত মাস পরে তাঁর স্ত্রীকে এক আধাসরকারি সান্ত্বনাবার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাতে লিখেছিলেন : আমাদের দুর্ভাগ্য যে মিঃ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মাপের প্রতিভার সেবা গ্রহণ থেকে এক মুক্ত বাংলাদেশ বঞ্চিত হল; আমাকে এটুকু বলার সুযোগ দিন যে আপনার ব্যক্তিগত ক্ষতি বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষতি।

আসলেই, আমাদের ক্ষতির পরিমাণ আমরা নিয়তই উপলব্ধি করি তাঁর সৃষ্টির সান্নিধ্যে গেলে।

গ্রন্থপঞ্জি

(কালানুক্রমিক)

নয়নচারা। [ছোটগল্প]। চৈত্র ১৩৫১/ মার্চ ১৯৪৫; কলকাতা
লালসালু। [উপন্যাস]। শ্রাবণ ১৩৫৫/ জুলাই ১৯৪৯; ঢাকা
বহিপীর। [নাটক]। ১৯৬০; ঢাকা
চাঁদের অবাবস্যা। [উপন্যাস]। ১৯৬৪; ঢাকা
সুড়ঙ্গ। [নাটক]। এপ্রিল ১৯৬৪; ঢাকা
তরঙ্গভঙ্গ। [নাটক]। আষাঢ় ১৩৭১/ জুন ১৯৬৫; ঢাকা
দুই তীর ও অন্যান্য গল্প। [ছোটগল্প]। আগস্ট ১৯৬৫; ঢাকা
কাঁদো নদী কাঁদো। [উপন্যাস]। মে ১৯৬৮; ঢাকা

রচনাবলি

গল্প–সমগ্র। মার্চ ১৯৭২; কলকাতা
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্–রচনাবলী : ১ (সম্পা. সৈয়দ আকরম হোসেন)। ১৯৮৬; ঢাকা
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্–রচনাবলী : ২ (সম্পা. সৈয়দ আকরম হোসেন)। ১৯৮৭; ঢাকা